সুধাকর-গ্রন্থাবলী।

নিত্যপাঠ্য

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

ও

চূড়ালা-চরিতামৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
আনন্দাশ্রম—বর্দ্ধমান।

প্রিণ্টার—শ্রীজনার্দ্দন বন্দ্যোপাধ্যায়
লরেন্স, প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩নং রমাপ্রসাদ রায়ের লেন, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি।
৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বৈশাখ। ১৩২৫।

 লেখা বৃদ্ধি ও পত্রবৃদ্ধি হেতু [মূল্য ।০ আট আনা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের অনেক স্থান সংশোধন করিয়া দিয়া মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থ এত সত্বর এরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

অভিমত প্রকাশ।

"দাদা মহাশয়, আপনার গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। শ্রীমান্ সরোজনাথের "মেহার-মাহাত্ম্য" পাঠ করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলাম। পাঠ করিতে করিতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে অশ্রুধারায় আপ্লুত হইয়াছি।"

শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়।
১৮০ নং গণেশ মহল, বেনারাস সিটি।

সুধাকর গ্রন্থাবলীর সমস্ত পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—

১। সর্ব্ববিধ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক—

জি, এন্, মুখার্জি,

১২নং বিনোদবিহারী সাহা লেন, কলিকাতা।

২। ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি
৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৩। গ্রন্থকারের, নিকট প্যারিচাঁদ মিত্র লেন, বর্দ্ধমান।

৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়,
১৮০ নং গণেশ মহল, বেনারাস সিটি।

৫। শ্রীযুক্ত রামলাল বসাক পুস্তক বিক্রেতা—
৬৫ নং খালিসপুরা, বেনারাস সিটি।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ মিত্র।

এ জীবনে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন,
দীন দুঃখী অনাথার সহায় যে জন,
পরহিত ব্রত যাঁর আজীবন ধরি,
পীড়িতে বাঁচান যিনি প্রাণ পণ করি,
যাঁহার "বিদ্যাসাগর—দাতব্য ভাণ্ডার"
বরষিছে বর্দ্ধমানে ধারা করুণার,
যাঁহার দাতব্য-সভা কি করে কোথায়,—
খুঁজিয়া সংবাদ-পত্র সংবাদ না পায়,
পিতৃনামে দান যাঁর—ভুলিবে না কেহ,
"শ্যাম চাঁদ মিত্রের সে হস্পিটাল গৃহ,"
রাজ-হস্তে সমর্পিত মাতৃ নামে যাঁর,
"প্যারিমণি ফণ্ড্" সেই দুঃখী অনাথার,
অগ্রজ-প্রতিম মম—ব্রহ্মবিদ্যা নিয়া,
নিরজনে যাঁর সনে জুড়াই এ হিয়া,
বর্দ্ধমানে প্রসিদ্ধ যে প্রাচীন ডাক্তার,
গঙ্গা-নারায়ণ মিত্র, মিত্র সবাকার,
নিজের "যোগবাশিষ্ঠ" দিলা যেই ধরি
অনুবাদ তরে মোরে অনুরোধ করি,
কৃতজ্ঞতা নাই মম স্বভাবে আপন!
মম সম জনে যাঁর স্নেহ বরষণ,
বিরাম নাহিক যাঁর পর উপকারে,
কি আছে আমার হেন, দিব আমি তাঁরে?

বেদান্তের সূতা, বশিষ্ঠের গাঁথা, মুক্তি-মুক্তাহার ভবে,
আনিয়াছি আমি, পর দাদা তুমি, অজর অমর হবে।

বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান টাউন হলে,
বিদ্যাসাগর-দাতব্য-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রের "চিত্র উন্মোচন" হয়।

তদুপলক্ষে লিখিত কবিতা।

পর দুঃখে দুঃখী যারা, জগতে দেবতা তারা!
যেই জন ধন মন দিয়াছে দুঃখীর তরে,
সে ভাগ্য সামান্য নয়, ওই তার পরিচয়,—
গঙ্গানারায়ণ-চিত্র উঠেছে রাজেন্দ্র করে!
অনাথা বিধবাগণ সে ঈশ্বর চন্দ্র-ধন
পেয়েছিল করতলে, সে চন্দ্রের নাহি তুল,
চন্দ্র গেলে এই চিত্র গঙ্গানারায়ণ মিত্র
দুঃখিনী-হৃদয়-সরে ফুটে ছিল পদ্মফুল!
সে বিদ্যাসাগর ছবি দয়ার প্রভাত রবি,
হেরি গঙ্গানারায়ণ ফুটেছিল শত দল,
সমুদ্রেতে দ্রুতগতি যান যেন ভাগীরথী,
সাগরাভিমুখে গঙ্গা ছুটে ছিল নিরমল!
আজ সুপ্রভাত নিশি, এস বর্দ্ধমান-বাসী,
মহত্ত্বের সমাদরে মহত্ত্বেরি পরিচয়,
রাজাধিরাজের করে যেই চিত্র শোভা করে,
পুষ্প মাল্য দিয়া তাঁরে, গাই তাঁর জয় জয়!
হে দেব, অমর তুমি,—গুণরাশি নিরমল
কুসুম-সৌরভ সম আমোদিছে ধরাতল!
আমার "যোগবাশিষ্ঠে" দৃষ্টি রেখ হাসি মুখে,—
অম্লান কুসুম-হার তোমার বিশাল বুকে!

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ভূমিকা।

যোগবাশিষ্ঠে প্রবেশাধিকার হওয়া বড়ই কঠিন। সেই কাঠিন্য দূর করিবার মানসেই এই সরল সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইল। সাধন-বিহীন সাধারণ লোক বেদান্তাদি পাঠ করিয়াই মনে করেন,—অদ্বৈত তত্ত্বে বুঝি কাষ্ঠপ্রস্তরের ন্যায় জড়-পিণ্ডই হইয়া থাকিতে হয়! বস্তুতঃ তাহা নহে। "আত্মদর্শিগণের শরীর ধারণ সুখের জন্যই হইয়া থাকে। এই দেহ ও জগৎ আত্মদর্শীর বিলাস-স্থান। এই জগৎ ব্রহ্মময় হওয়ায় নিত্য, সত্য ও মধুময় হইয়াছে। কেবল মূর্খের নিকটেই এই জগৎ অনিত্য ও অনন্ত দুঃখের আলয় হইয়া রহিয়াছে ও চিরদিন থাকিবে! অদ্বৈত তত্ত্বে অহং নষ্ট হয়। অহং পুষ্ট হইলে অবনতি, নষ্ট হইলে উন্নতি।"

দাম ব্যাল ও কট নামক দুর্জ্জয় তিন অসুর দেবগণকে প্রপীড়িত করিলে, পদ্মযোনি বলিলেন,—সহ্য করাই উত্তম উপায়। পুনঃ পুনঃ পীড়া দিয়া উহাদের উন্নত উদার অন্তরে অহঙ্কারের আধিক্য হইলেই আত্মনাশী দুর্ব্বুদ্ধি দেখা দিবে। "অহং অহং" রূপ প্রগাঢ় মেঘ চৈতন্য-সূর্য্যকে ঢাকিলে, তখন জড়তাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রূপেই স্বার্থজীর্ণ ঘোর অহঙ্কারী দাম, ব্যাল ও কট ক্রমে বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু, ভীম, ভাস ও দৃঢ় নামক বীরত্রয়কে কিছুতেই কেহ বিনষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, তত্ত্বজ্ঞ, নির্ম্মলাশয়, একাগ্রচিত্ত, অনাসক্ত ও একান্ত কর্ত্তব্য-তৎপর ছিলেন!"

(যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতি প্রকরণ, ২৩, ২৪ সর্গ)

"যে মহাপুরুষ নির্গুণ সূক্ষ্মতম ব্রহ্মস্বরূপ হন, তাঁহার কর্ত্তব্য আর না থাকিতে পারে। কিন্তু মুনি ঋষি সকলেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান অতি প্রবল ছিল। গল্পের ন্যায় বেদান্ত পাঠ করিলে কর্ত্তব্য-শূন্য হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিতে পারে।—অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। হায়, কবে আবার ভারতবর্ষ আমেরিকার ন্যায় বেদান্ত-সূর্য্যের আলোকে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইবে? কবে আবার এই নিদ্রিত ফণী বেদান্তরূপ মাথার মণি খুঁজিয়া পাইবে? পূর্ণব্রহ্মে লীন হইয়া সংসারে কর্ত্তব্য সাধন করা ত অসাধ্য নহে। পূর্ণব্রহ্মে লীন থাকিয়াই অতুলনীয় কর্ত্তব্য-তৎপরতা দেখাইবার জন্য ভগবান্ হরি ও হর জায়া সঙ্গে ভূতলে অবতীর্ণ হন। সূর্য্যসম তেজস্বী বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্য পুলস্ত্য নারদ প্রচেতা অঙ্গিরা শুকদেব ক্রতু অত্রি ও ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম-সমাধি লইয়াই পরম সুখে জগতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জনকাদি জীবন্মুক্তগণ সংসারে থাকিয়াই যুদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন, শিষ্টাচার ও লোকাচার প্রদর্শন, পূজার্চ্চনা যাগযজ্ঞাদি করিয়া ধর্ম্মপালন, ও উদ্যানে বা পুষ্পদোলায় ভার্য্যার সহিত হাস্যবিলাস করিয়াও সুখে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধগণ কাঠ পাথরের ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হন নাই।" (বাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ ১১, ১২ সর্গ)

শঙ্করাচার্য্য "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞানে লক্ষ লক্ষ অর্থ সংগ্রহ করিয়া বহু মঠাদি স্থাপন ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মসমাধি "কিছুই-না" নহে, বস্তুতঃ সমস্তই অন্তরে লইয়া "পূর্ণ"।

"যে আত্ম-প্রত্যয় বেদান্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি, সেই আত্ম-প্রত্যয় লোক-সমাজে ব্যবহারে আসিলে কি সুখের দিনই হইত! আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভর, পুরুষকার, ও অভ্রান্ত-বাদ প্রভৃতির বলেই আমাদের হৃদয়স্থ ব্রহ্ম-পুরুষ জাগিয়া উঠেন। ঐ আত্ম-প্রত্যয় ও

আত্ম-নির্ভরের অভাবেই সেই মহান্ পুরুষ ক্রমেই সঙ্কুচিত হন। আর যে জানে ও ভাবে—'আমাতেই মহাশক্তি, আমিই মহাশক্তির আধার, আমাতে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তিতে, কি না সম্ভবে?' সেই মানব মস্তক উত্তোলন করিয়া সমস্ত দেখে, বুকে অসীম সাহস ও শক্তি পায়, তাহারি অন্তরে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম-ধ্বনি উঠিতে থাকে— "উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ, জাগ্রত জাগ্রত।" যে ব্রহ্মজ্ঞান, আত্ম প্রত্যয় ও আত্ম-নির্ভরের বলে মোক্ষ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারা যায়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয়ের মহাবীর্য্যে ও মহাবলে সাংসারিক উন্নতি অতি অল্পেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বৈদান্তিক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় সংসারের সৎকর্ম্ম ও সুখ-সচ্ছন্দতাকে ক্রমেই সমুন্নত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই।" (বিবেকানন্দ)

"যিনি মানবিক বিবর্ত্তন শেষ করিয়া, লোক-সমাজকে উন্নত করিবার জন্যই পার্থিব সংস্পর্শ রাখিয়া, জীবন্মুক্ত ভাবে জগতে থাকিয়াই চিন্ময় দেশে বাস করেন, তাঁহাকেই "ঋষি" বলে।
(এনিবেসাণ্টের গীতা।)

"ভারতের মুনি ঋষি গণ যেরূপ ভাবে দার্শনিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, পিথ্যাগোরাস এবং প্লেটোর জ্ঞান-তত্ত্বও ঠিক সেই রূপ ভাবে সংগৃহীত,—বেদান্ত পাঠ করিলে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।" (প্রসিদ্ধ দার্শনিক সার্ উইলিয়ম্ জোনস্)

"সমস্ত জগতের মধ্যে উপনিষদের শিক্ষার ন্যায় মহোপকারী ও উন্নত শিক্ষা আর কোথাও নাই। ইহাতে আমার জীবনে শান্তি হইয়াছে; এবং মৃত্যু-কালে ইহাতেই আমার শান্তি হইবে।"
(প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সোপেন্-হ্বয়ার্)

"ইহাঁরা যাহা যাহা বলিলেন, বেদান্ত জ্ঞানে আমিও ঠিক তাহাই বুঝিয়াছি।" (বেদান্ত বিষয়ে মোক্ষমুলারের গ্রন্থ)

বেদান্ত বিজ্ঞানের "বাসনা-ত্যাগ" শুনিয়া কেহ যেন ভীত না হন। "বারংবার বিচার ও সাধন করিলেই 'বাসনা' ছুটিয়া যায়।—অর্থাৎ, বাসনার মলিন দোষ-ভাগ গিয়া উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ভাগ জন্মায়! তখন বিষয় উপভোগ করিলে ঐ বিষয়ই আবার অমৃতময়—সুখময় হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণের গীতাপাঠ বালকের পাঠের ন্যায়ই হইয়া থাকে। বাশিষ্ঠ পাঠ করিয়া পরে গীতা পাঠ করিলে, সর্ব্বোপনিষদ-সার দুর্ব্বোধ্য গীতার কোন্ শ্লোকের লক্ষ্য কত দূরে, কোন্ চিন্ময় দেশে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা বোধগম্য হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। "আত্ম নির্ভর" ও "আত্ম-বিশ্বাসের" এই মহা বিজ্ঞানে যে হৃদয় সতত উদ্‌ভাসিত থাকে, সেই শিবময় শান্ত হৃদয়ে আদ্যাশক্তি সতত নৃত্যপরায়ণা!

সত্য, ন্যায়, শুভ, শ্রী, মঙ্গল ইত্যাদি জগতের যত মহানন্দ, মাতৃস্নেহ, সতীর প্রেম ইত্যাদি যত মহাসুখ, সমস্তই সেই মোক্ষরূপ অমৃত-সাগরের বুদ্‌বুদ্ মাত্র। মোক্ষসুখে কোনও সুখ হারাইতে হয় না। অপূর্ণ সুখের পূর্ণতাই মোক্ষ। উহার পথে এক পদ উঠিলেই এত উন্নতি হয় যে, অপূর্ব্ব আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় আসিয়া মন-প্রাণকে একেবারে অসীম শক্তিসম্পন্ন ও ভয়শূন্য করিয়া তুলে। তখন জগতের সমস্ত ভয়ই কেবল মিথ্যা "জুজুর ভয়" বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মোক্ষে কাষ্ঠ প্রস্তরের ন্যায় জড়বৎ করে না। বস্তুতঃ চিরদিনের মত জড়ত্বকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সমাধিতে আছে—আত্মবোধ, (Self-consciousness) আত্মসুখ, অপার আনন্দ। সেই আত্মবোধের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টি থাকে, যার আবশ্যক বোধ হয়, সে দেখে, যার আবশ্যক না হয়, সে দেখে না। কিছুই হারাইতে হয় না! হারায় কেবল মূর্খতা, ভয় ও মরণ।

নিত্যপাঠ্য

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

সুরুচি অপ্‌সরা ও দেবদূত সংবাদ।

বৈরাগ্য প্রকরণ—প্রথম সর্গ।

সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, কটাক্ষেতে যাঁর,
সেই সত্য পূর্ণ ব্রহ্মে করি নমস্কার।
"যেই" জানে, "যাহা" জানে, "জানা" মাত্র আর,
জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান—এই তিন নাম তাঁর,
দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, ও কর্ত্তা, হেতু, ক্রিয়া
প্রকাশিত হয় যাঁর অস্তিত্ব লইয়া,
সেই নিত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞানরূপ-ধারী
পরাৎপর পূর্ণ ব্রহ্মে নমস্কার করি।
যে সিন্ধুর বিন্দু এই ভোগ-সুখাভাস,
সুর নর সর্ব্ব জীবে পাইছে প্রকাশ,

যাঁহার আনন্দ-কণা জীবন সবার,
সেই পরমাত্মা ব্রহ্মে পুনঃ নমস্কার।
সুতীক্ষ্ণ নামেতে এক ব্রাহ্মণ সুজন,
অগস্তি আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন।
মুনিরে জিজ্ঞাসে দ্বিজ কহ মহোদয়,
কর্ম্মেতেই মুক্তি কিংবা জ্ঞানে মুক্তি হয় ?
অগস্তি বলেন শুন ব্রাহ্মণ কুমার,
আকাশে বিহঙ্গগণ উড়ে যে প্রকার,—
উভয় পক্ষেতে যথা পক্ষিগণ চলে,
মুক্তি হয় জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ের বলে।
কহিব ইহার এক দৃষ্টান্ত সুন্দর,
প্রাচীন সে উপাখ্যান শুন দ্বিজবর।
পুরাকালে অগ্নিবেশ্য ঋষির তনয়,
কারুণ্য নামেতে দ্বিজ সদা পুণ্যময়,
বেদ-বেদাঙ্গের পাঠ সমাপন করি,
গৃহে আসি সদা বসি মৌন ভাব ধরি,
কোনো দিকে কোন কর্ম্মে নাহি দেন মন;
জিজ্ঞাসিলা অগ্নিবেশ্য ইহার কারণ।
কারুণ্য কহেন পিতঃ সাধুগণ ভবে,
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি মুক্তি পদ লভে।
শুনি নাই কেহ মুক্তি পায় ত্রিভুবনে,
ধন উপার্জ্জনে আর পুত্র-উৎপাদনে।
এত শুনি অগ্নিবেশ্য কহিলা উত্তরে,
বৎস, এক ইতিহাস কহিব তোমারে,—

ইহার যথার্থ অর্থ বুঝি এক বার,
যাহা ইচ্ছা তাহা কর—বাধা নাই আর।
হিমাচল শিরে যথা কলুষ-নাশিনী,
ছুটিছেন ভাগীরথী পূত-প্রবাহিণী,
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে মত্ত ময়ুর ময়ূরী,
ক্রীড়ামত্ত কামাসক্ত কিন্নর কিন্নরী,
সেই হিমালয় গিরি- ধবল শিখরে
অপ্সরা সুরুচি বসি সুখে ক্রীড়া করে।
হেন কালে নভঃস্থলে দেখিবারে পায়
বাসবের রথ নিয়া দেবদূত যায়।
সুরুচি সম্বোধি দূতে কহিলা তখন,
রথ নিয়া দেবদূত কোথায় গমন?
কহিলেন দেবদূত, শুন সুলোচনে,
রাজর্ষি অরিষ্টনেমী গিয়াছেন বনে;
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার গন্ধমাদনেতে
তপস্যা করেন রাজা বসি নির্জ্জনেতে।
ইন্দ্রের আদেশে সেথা গমন আমার,
কার্য্য সারি ইন্দ্রপুরী চলেছি আবার।
সুরুচি কহিলা দূতে বিনয়ে অশেষ,—
কহ সে অরিষ্টনেমী—বৃত্তান্ত বিশেষ।
দেবদূত কহে সুভ্রূ শুন মন দিয়া,
রাজর্ষি অরিষ্টনেমী সে অরণ্যে গিয়া
কঠোর তপস্যা করি জীবন কাটায়,
তুষ্ট হয়ে দেবরাজ কহিলা আমায়,—

রথ নিয়া আন গিয়া স্বর্গে সযতনে,
রাজর্ষি অরিষ্টনেমী মহা তপোধনে।
আমি গিয়া কহিলাম স্বর্গ-ভোগ তরে,
রাজর্ষি সমস্ত শুনি জিজ্ঞাসিলা মোরে,
দেবদূত কৃপা করি কহ মোর কাছে,
স্বর্গধামে কি কি গুণ, কি কি দোষ আছে ?
শুনিয়া কহিনু আমি—বহু পুণ্য যার
হয় বটে মহাসুখে স্বর্গভোগ তার,
কিন্তু বহু দিন সুখ সম্ভোগ কারণ,
পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যে পুনঃ হয় আগমন।
শুনিয়া অরিষ্টনেমী কহিলেন তাই—
ফিরে যাও দূত, আমি স্বর্গ নাহি চাই।
ইন্দ্রপাশে গিয়া সব কহিনু তাঁহায়,
বাসব কহিলা দূত, যাও পুনরায়
তত্ত্বজ্ঞান দান তরে মম আজ্ঞাক্রমে
অরিষ্টনেমীকে নিয়া বাল্মীকি আশ্রমে।
গিয়াছিনু ভূপে নিয়া বাল্মীকির পাশে,
মুনিরে প্রণমি রাজা কাতরে জিজ্ঞাসে,—
কহ দেব কৃপা করি অধম আমারে,
দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভ করি কি প্রকারে ?

বাল্মীকি ও ভরদ্বাজ সংবাদ।

বাল্মীকি কহিলা শুন রাজর্ষি সংপ্রতি
অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ রামায়ণ-গীতি।

ইহাতেই মুক্তি লাভ   হইবে তোমার,
ইহা ছাড়া অন্য কিছু   লাগিবে না আর।
আমি বদ্ধ—হেন বোধ   জন্মিয়াছে যার, (বৈরাগ্য ২য় সর্গ)
কিসে মুক্তি পাব—হেন চিন্তা অনিবার,
এমন মুমুক্ষু জন,   সত্ত্বশালী যিনি,
এই শাস্ত্র শ্রবণের   অধিকারী তিনি।
প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ   কহিলা আমায়,
শ্রীরাম-চরিত গুরো   শুনাও অমায়।
তাই সেই রাম-কথা   কহিনু তাহারে,—
ক্রমে ক্রমে জীবন্মুক্তি   হয় যে প্রকারে।
কহিলাম ভরদ্বাজ   শুন মন দিয়া, (বৈরাগ্য ৩য় সর্গ)
দ্বিবিধ বাসনা পূর্ণ   মানবের হিয়া।
পবিত্র বাসনা আর   মলিনতা ময়,
ভাল মন্দ দুই ভাবে   বাসনা উদয়।
মলিন বাসনা হ'তে   জন্ম পুনঃ পুনঃ,
শুদ্ধ বাসনাতে মুক্তি,   কহি পুনঃ পুনঃ।
শুদ্ধ বাসনাতে আর   কি ক'ব বিশেষ,
মানুবের পুনর্জন্ম—অঙ্কুর নিঃশেষ।
তাই শুন ভরদ্বাজ,   জুড়াইবে প্রাণ,
শ্রীরাম চরিত কথা,   অমৃত সমান।
বিদ্যাশিক্ষা শেষ করি   পুরুষ নবীন,
শ্রীরাম করেন লীলা   গৃহে কিছু দিন।
নানা তীর্থ তপোবন   আশ্রম দর্শনে,
পিতার আদেশে রাম   ভ্রাতৃদ্বয় সনে,

সহচরগণে নিয়া চলিলা তখন ;
করিলেন কিছু দিন তীর্থ পর্য্যটন।
নানা দেশে গিয়া শেষে আসিলেন ঘরে,
অযোধ্যা নগরে আর আনন্দ না ধরে।
গৃহেতে থাকেন রাম বয়স নবীন (বৈরাগ্য ৫ম সর্গ)
কথা বার্ত্তা নাহি কন, দিন দিন ক্ষীণ,—
বিষাদে বিবর্ণ মুখ বিষণ্ণ অন্তর,
নির্জ্জনে একাকী বসি চিন্তা নিরন্তর।
আহার বিহার ত্যাগ দেখিয়া সবাই,
চিন্তা করে পুরবাসী, শান্তি কারো নাই !
হেন কালে এক দিন বিশ্বামিত্র ঋষি (৬ সর্গ)
উপনীত আসি যেন ব্রহ্মতেজো রাশি।
করিয়া রাক্ষস বধ যজ্ঞ রক্ষা তরে
পাঠাইতে তাঁর সনে রাম লক্ষ্মণেরে,
দশরথে অনুরোধ করে ঋষিবর,
শুনি রাজা চিন্তান্বিত, ব্যাকুল অন্তর।
কৃতাঞ্জলি পুটে রাজা হয়ে অবনত,
পুনঃপুনঃ ঋষিবরে বুঝাইলা কত।
কহিলেন তীর্থ কথা, গৃহে ফিরে আসা,
শ্রীরামের মৌনভাব—শোচনীয় দশা !
আহার বিহার ত্যাগ, ক্ষীণ কলেবর,
বিস্তারিয়া ঋষিবরে কহে নরবর।
বিশ্বামিত্র কহে—রামে কর আনয়ন, (১১ সর্গ)
যূথপতি-মৃগে যথা আনে মৃগগণ।

আপদে বা অনুরাগে মোহ নয় তাঁর,
এ যে বিবেকীর শুভ জ্ঞানের সঞ্চার!
শ্যামগিরি-মেঘ যথা উড়ায় পবন,
এখনি রামের মোহ করিব হরণ।
অচিরে বিচারে তাঁর মোহ হ'লে গত,
পাবেন পরমা শান্তি আমাদের মত।
প্রাণে শান্তি স্থূল কান্তি, প্রফুল্ল শ্রীমুখ,
সত্যের সুন্দর মূর্ত্তি, চিদানন্দ সুখ,
সকলি অমৃত পানে লাভ হয় যথা,
জ্ঞানামৃত পানে রাম লভিবেন তথা।
হৃষ্ট পুষ্ট তুষ্ট হয়ে মান্য গণ্য ভবে,
করিবেন সর্ব্ব কর্ম্ম দেখিবেক সবে।
মহা জ্ঞান সত্ত্বগুণ বাড়িবে তখন,
জানিতে পাবেন কর্ম্ম করি কি কারণ।
সুবর্ণে প্রস্তরে তাঁর দিব্য জ্ঞান হবে,
সুখে দুঃখে এ দুর্দ্দশা আর নাহি রবে।
ঋষি বাক্যে রাজেন্দ্রের আনন্দ অপার,
শ্রীরামে আনিতে দূত পাঠান আবার।
এবে পিতৃপদ রাম করিতে দর্শন
উঠিলা উদয়াচলে অরুণ যেমন।
চলিলেন ভৃত্য আর ভ্রাতৃদ্বয় সনে,
অমরাবতীর মত পিতার ভবনে।
দূর হ'তে দেখিলেন কমল-লোচন,
বেষ্টিত অমর বৃন্দে সুরেন্দ্র যেমন,

নৃপমাঝে বসি রাজা মনোহর বেশে,
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দুই পার্শ্ব দেশে,
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ সচিব সকল
চারি দিকে, শান্তিময় কান্তি নিরমল।
নারী গণ করে চারু চামর ব্যজন,
অঙ্গ ধরি সেবে যেন দিগঙ্গনা গণ।
বশিষ্ঠাদি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ সকল,
দশরথ নরপতি, নৃপতি মণ্ডল,
দেখিছেন—আসিছেন রাজীব-লোচন,
বার্দ্ধক্যের সাম্য মাখা সম্পূর্ণ যৌবন।
উদার উন্নত তৃপ্ত অন্তর তাঁহার
সরলতা মুখে যেন হতেছে প্রচার।
প্রণমিয়া উপবিষ্ট শ্রীরাম যখন,
বশিষ্ঠ কহিলা শুন রাজীব-নয়ন,
দুর্জ্জয় দুঃসাধ্য মায়া—মোহের বিষয়
জয় করি দিলে তুমি বীর-পরিচয়।
তবে কেন মগ্ন পুনঃ নেহারি তোমারে
জড়তার মহাপঙ্কে ভ্রান্তির সাগরে?
কহিলেন বিশ্বামিত্র,—সর্ব্ব-গুণাধার,
বিষাদ জড়তা কেন মানসে তোমার?
গৃহ-তল নাশে খল মূষিক যেমন,
কি চিন্তায় চিত্ত তব নিত্য নিমগন?
মনোগত ভাব যত কহ যে প্রকার,
এখনই মনঃক্লেশ নাশিব তোমার।

পুলকিত রাম শুনি মুনির বচন
মেঘের গর্জ্জনে ফুল্ল ময়ূর যেমন।

শ্রীরামের বৈরাগ্য কথা।

মহামুনি বাল্মীকি বলিলেন,—

বিশ্বামিত্র মুনি-বাক্য করিয়া শ্রবণ, (বৈরাগ্য ১২ সর্গ)
কহিতে লাগিলা রাম মধুর বচন,—
মুনীন্দ্র, বিবেক-বলে করেছি বিচার,
অসার সংসারে কিবা সুখ আছে আর?
জন্মিছে কেবল লোক মরণ কারণ,
মরিতেছে পুনঃ জন্ম করিতে গ্রহণ!
লোক চেষ্টা আর সুখ সম্ভোগ সকল,
বিপদ-আপদ-পাপ কারণ কেবল!
মনোমাঝে মিথ্যা সাজে সজ্জিত সংসার,
মনেরি স্থিরতা কোথা? সকলি অসার!
বিষয়েতে মুগ্ধ হয়ে মরে সর্ব্ব জন,
মরে মরীচিকা মুগ্ধ কুরঙ্গ যেমন!
আমি ত বিক্রীত নই— তথাপি সংসার
ক্রীতদাস করিয়াছে কুহকে মায়ার!
এত দিনে বুঝিলাম পড়েছি এখন
মোহ গর্ত্ত মাঝে, ভ্রান্ত মৃগের মতন!
কে আমি? সংসার কিবা? কি হয় কি যোগে?
কিবা প্রয়োজন মম হেন রাজ্য ভোগে?

প’ড়ে থাক্! বীতরাগ হয়েছে এখন
মরু ভূমে পথিকের বিতৃষ্ণা যেমন!
ভগবন্, এ জগৎ সবি মিথ্যা হায়!
কেন হয়, কেন যায়? কেন বৃদ্ধি পায়?
জরাগ্রস্ত হয় লোক মিথ্যা ভোগে ভোগে,
শিথিল যেমন তরু বাত্যা যোগে যোগে!
অচেতন লোক যেন বাক্য বলে সব
বায়ু বশে বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের রব!
হৃদয় শ্মশান মোর, সহিতে ত নারি,
লোক ভয়ে নেত্র জল ফেলিতে না পারি!
সংসার অনিত্য হেরি কাঁদিতেছে মন,
দুরদৃষ্ট ধন ভ্রষ্ট ধনীর মতন!
বন্যহস্তী শান্তিহীন ভাবে বা কোথায়
আবরিত মহা গর্ত্ত ধরিতে তাহায়!
সেইরূপ প্রাণে মম নাই শান্তি লেশ,
কোথায় মরিব পড়ি, বুঝিয়াছি বেশ!
মুনিবর মূঢ় নর ভাবে গৌরবিণী (বৈরাগ্য ১৩সর্গ)
লক্ষ্মী বুঝি সর্ব্বোত্তমা সুখ প্রদায়িনী!
আবিল আবর্ত্ত ময় যেমন উত্তাল
ভাদ্র-তরঙ্গিণী তোলে তরঙ্গ বিশাল,
বাসনা-তরঙ্গ তুলি পর্ব্বতের মত,
মূর্খেরে ভাসান লক্ষ্মী জনমের মত!
তরঙ্গিণী বুকে দুষ্টা বীচি মালা যথা,
লক্ষ্মী কোলে নাচে লক্ষ চিন্তা নামে সুতা!

কোথাও না তিষ্ঠে লক্ষ্মী হইয়া অটল,
যেন সে চরণ দাহে চঞ্চলা কেবল!
রাজবুদ্ধি সমা মূঢ়া, অন্ধা গুণ দোষে,
আশে পাশে যারে দেখে তারে ধরি বসে!
দুগ্ধ পানে বল বৃদ্ধি—ভুজঙ্গিনী যাতে,
যে যে কর্ম্মে দোষ বৃদ্ধি লক্ষ্মী বৃদ্ধি তাতে!
তাবৎ বিনয়ী নম্র হয়ে থাকে নরে,
যাবৎ না মনিময়ী লক্ষ্মী আসে ঘরে!
বিনীত কৃতজ্ঞ প্রাজ্ঞ আছিল যে জন,
হায় তারে লক্ষ্মী করে উদ্ধত কেমন!
ভগবন্, লক্ষ্মী নন্ দুঃখ পারে সেতু,
সুরক্ষিতা বিষলতা বিনাশের হেতু!
যতেক দুঃখের ফণী লক্ষ্মীর গুহায়,
মুদিত সাধুত্ব পদ্ম লক্ষ্মীর নিশায়!
পরমার্থ-প্রদীপের লক্ষ্মী ঝঞ্ঝা বায়ু,
নাশেন বৈরাগ্য পুণ্য—লতিকার আয়ুঃ!
কামক্রোধ-পেচকের সুখের যামিনী,
বিবেক-বিধুর রাহু—শক্তি স্বরূপিণী!
সতত সমর প্রিয়া সিংহীর সমান,
দুষ্ট-দুরাশয় পাশে লক্ষ্মী-অবস্থান!
মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া অঞ্চলেতে ঢাকা,
ভুজঙ্গ-বেষ্টিতা লতা, সুখে যেন মাখা!

অসার সংসার।

বিষয়েতে জর্জ্জরিত, যারা জ্ঞান-বিরহিত, (বৈরাগ্য ১৪সর্গ)
হয়েছে তাদেরি আয়ুঃ দুঃখভার অতি,—
তত্ত্বজ্ঞান হৃদে আর লাভালাভ সম যার,
সুখের জীবন তার ব্রহ্মপদে মতি !
দেহকেই "আমি" বোধ, তাতেই জ্ঞানের রোধ,
তাতেই দেহের আয়ুঃ বিদ্যুৎ প্রমাণ ;
এ আয়ুতে আস্থা নাই, কোথাও না শান্তি পাই,
এ জীবন তৈল হীন প্রদীপ সমান !
বলিতেছে লোক যত, এই আয়ুঃ হবে গত,
আমি বলি এ যে গত হয়েছে এখন,
এ আয়ুঃ ত আয়ুঃ নয়, যাতে ব্রহ্ম লাভ হয়,
যে জীবন শান্তিময় সেই ত জীবন।
তরু গুল্ম লতিকার, পশুর জীবন আর,
করিলে বিচার সেই জীবনে কি ফল ?
যাতে জন্ম মৃত্যু নাই, যথার্থ জীবন তাই,
মোদের দীর্ঘায়ুঃ বৃদ্ধ গর্দ্দভ কেবল !
রূপ আয়ুঃ বুদ্ধি আর, সকলি ত দুঃখভার !
গৃহ নাশ করে ধূর্ত্ত মূষিক যেমন,
সে রূপ অদৃশ্য কাল, এ জগতে চিরকাল,
প্রতিদিন আয়ুঃ মূল করিছে কর্ত্তন।
যেমন ভুজঙ্গ প্রাণ বাঁচে করি বায়ু পান,
আয়ুঃ পান রোগ-সর্প দেহ-গর্ত্তে করে,

হেরিয়া মূষিক কম্প যেমন মার্জ্জার ঝম্প,
লম্ফ দিয়া পড়ে মৃত্যু রুগ্ন দেহ পরে।
যেমন পেটুক নরে অন্ন খেয়ে শেষ করে,
সেই রূপ জরা করে আয়ুঃ জীর্ণ হায়!
যেমন দুর্জ্জনে হেরে সুজন পলায় দূরে,
জীবেরে দুদিন হেরি যৌবন পলায়।
জীবের যে অহঙ্কার অজ্ঞানই মূল তার, (বৈরাগ্য ১৫সর্গ)
বড় ভয় পাছে পড়ি সেই শত্রু হাতে,
মূর্খের ক্ষমতা যাহা, অহঙ্কার দেয় তাহা,
আপদ মানস-ক্লেশ দেখি আমি তা'তে।
অহঙ্কার ছাড়ি তাই, মনে আমি শান্তি পাই,
অহঙ্কার-রূপী ঘোর মেঘের সঞ্চার,
যত ক্ষণ চিত্ত ঢাকে তত ক্ষণ ফুটে থাকে
কুটজ-কুসুম-কলি শত কামনার।
কামনার সূত্রে গাঁথি, নানাজন্ম-রত্নপাঁতি
ভব নাট্যশালে গলে অহঙ্কার পরে!
অহঙ্কার জলধর, বিলয় হইলে পর,
কামনা-বিদ্যুৎলতা চমকে না ফিরে।
ভবে যার মুখ-ছবি না দেখেন শান্তি-দেবী,
ছাড়িয়াছি যত্নে আমি সেই অহঙ্কার,
এবে তাত, দেখ হায়, আছি উদাসীন প্রায়,
তত্ত্বজ্ঞানে সুখী কর, প্রার্থনা আমার।
শান্তি নাই মনে যার অবশ্য কর্ত্তব্য তার (১৬ সর্গ)
শাস্ত্র আলোচনা আর সাধু সঙ্গ করা,

সে সকল পরিহরি বিষয় কামনা ধরি
মরে লোক চিন্তা করি—শান্তি সুখ হারা।
গ্রাম্য কুক্কুরের মত, কি যে তার মনোগত,
ব্যাকুল হইয়া কত ছুটিয়া বেড়ায়,
ভোগ সুখ অভিলাষে, শ্যাম দূর্ব্বাদল আশে
মরণ না মনে আসে, মন-মৃগ ধায়!
কুক্কুরীর সঙ্গে গিয়া, কুক্কুরটা শব নিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করি যথা গ্রাসে সে সকল,
তৃষ্ণা সঙ্গে আসি মন, হেরি মোরে অচেতন,
আনন্দে উদরসাৎ করিছে কেবল!
ঘূর্ণ্য বায়ু আসি যথা, লয়ে যায় লতা পাতা,
দূরে ফেলি শূন্যে তুলি আকাশে ঘুরায়,
আমায় প্রচণ্ড মন, দূরে করি আনয়ন,
সংসার শূন্যের মাঝে ঘুরাইছে হায়!
ভূতে ধরে বালকেরে, সে রূপ ধরেছে মোরে
কুৎসিৎ জঘন্য মন, পিশাচ যেমন,
কল্পনাতে রূপবান্ হ'য়ে হয় আগুয়ান,
অধ্যাত্ম বিচার শুনি করে পলায়ন।
এটা সেটা নিরবধি, মনের বিষম ব্যাধি,
ক্ষান্তি নাই শান্তি নাই, শ্রান্তি মাত্র সার,
বিষয়-লালসা-ভোগে, মনের বিষম রোগে,
উচিত সযত্নে শীঘ্র করা প্রতিকার!
রস রক্ত অস্ত্র আর মল মূত্র সার যার, (বৈরাগ্য ১৮সর্গ)
কিস্তূত ও কিমাকার—বিকার কেবল,

এই যে ভঙ্গুর দেহ, ইথে সুখী নহে কেহ,
আদি হ'তে অন্ত দেখি দুঃখই সকল !
সুখ দুঃখ ক্ষণে ক্ষণে, কি দুর্দ্দশা জীব মনে,
দেহ ঢক্কা মাঝে থাকি, বাদ্যেতে অস্থির,
কত কথা কাণে যায়, জীবনে না শুনি হায়,—
কি উপায়ে ঢক্কা হ'তে হইব বাহির ?
দুঃখ ঘুণে অতি-জীর্ণ, দেহ-বট বটে শীর্ণ,
শাখায় শাখায় চিত্ত-বানরের খেলা,
চিন্তার মঞ্জরী তা'তে, তৃষ্ণা সর্প কোটরেতে,
ইন্দ্রিয়াদি কলকল বিহঙ্গের মেলা।
অহং-গৃধ্র হয়ে হৃষ্ট, বৃক্ষচূড়ে উপবিষ্ট,
শাখাশিরে ক্রোধ-কাক কা-কা কা-কা করে ;
বাসনার রূপ ধরি, জটাজাল সারি সারি
আমূল বেষ্টনে ধরা দৃঢ় করি ধরে !
উঠিতে না চায় আর উচ্ছেদ কঠিন তার,
অহঙ্কার গৃহস্থের বাসগৃহ দেহ
থাক্ যাক্ অধঃপাতে, আমার কি ক্ষতি তা'তে ?
এ গৃহে কি থাকে তাত, বুদ্ধিমান কেহ ?
যে ঘরে সতত স'য়ে, আছি গো আকুল হয়ে,
কুক্কুরীর প্রায় দুষ্টা ক্ষুধার জ্বালায়,
প্রাণ বায়ু যেই ঘরে, ভোঁস ভোঁস সদা করে,
আর ত সে ঘর তাত, প্রাণ নাহি চায় !
হাস্য দীপ শিখা ফুটে, ক্ষণে ক্ষণে জ্বলি উঠে,
বিষাদ আঁধার তার পিছে পিছে ধায়,

যেই ঘরে করে খেলা, হাসি কান্না দুই বেলা,
আর ত সে ঘর তাত প্রাণ নাহি চায়!
রক্ত মাংস মলময়, ভিন্ন আর কিছু নয়,
দেহ ঘরে সুখতরে কিবা আছে হায়;—
সঙ্গে নাহি যাবে সে ত, কে কৃতঘ্ন তার মত?
আর ত সে ঘর তাত প্রাণ নাহি চায়!
আজ কি দু'দিন পরে সে দুষ্ট ছাড়িবে মোরে,
এই বেলা ছাড়ি আমি ভরসা তাহার,
লজ্জা নাই শোকে রোগে, পুনঃপুনঃ দুঃখ ভোগে,
নির্লজ্জ অধমে বল লজ্জা কোথা আর?
রোগে শোকে হয় ক্ষীণ তবু থাকে লজ্জাহীন
তৃষ্ণা গর্ত্তে মাটি ধরি কচ্ছপের মত,
প্রবঞ্চক এ সংসার, ক্ষণস্থায়ী দেহভার,
ইথে আস্থা যার তারে ধিক্ শত শত!
আকাশে কল্পনা-সার গন্ধর্ব্ব-নগর আর
বিদ্যুৎ লতার পরে আস্থাবান্ যেই,
এ দেহের পরে তার আস্থা হোক শত বার,
আমার হবে না আর, সার কথা এই।

ভীষণ যৌবন।

মানুষের বাল্য কাল, কেবল দুঃখের জাল! (বৈরাগ্য ১১সর্গ)
শৈশবের কাজ তুচ্ছ পশুর সমান,
অনল সলিল হ'তে কত ভয় শৈশবেতে,
পদে পদে কত দুঃখ, ভয়ে কাঁপে প্রাণ!

দুষ্টতা শৈশব ধর্ম্ম—দুঃখই কেবল,
চমকিয়া উঠে প্রাণ, অশান্তি সকল!
জানিনা যে শৈশবেতে, সকল অবস্থা হ'তে
দশগুণ চঞ্চলতা বৃদ্ধি কি কারণে?
যেন সেই বিদ্যুল্লতা লইয়াছে চঞ্চলতা,
বালকের মন হ'তে আপনার মনে!
অল্পে তুষ্ট অল্পে রুষ্ট অল্পে বশীভূত,
রোদন কর্দ্দম মাখি কুকুরের মত!
ভুবন ভোজন করে, আকাশের চাঁদ ধরে,
এতেই আনন্দ যার, তার কি বা গতি?
শৈশব-সৌন্দর্য্য-ফুল সদ্যপাতী দুঃখমূল,—
দেখিয়া আনন্দ পায় যত মন্দ-মতি!
সম্মুখেই মহামরু, ধূ ধূ করে ধূলি,—
দেখা'তে তুলেছে "কাল" শৈশব-অঙ্গুলি!
শৈশব-অনর্থ যত, সে সব করিয়া গত, (বৈরাগ্য ২০সর্গ)
আরোহণ করে জীব যৌবনেতে যেই,
অমনি বিষম কাল, পাতে ইন্দ্রিয়ের জাল,
আরোহণ নহে তাত, অধঃপাত সেই।
কামচিন্তা যুত হেরি নবীন যৌবন,
কুকর্ম্ম-অভ্যাস যত করে আক্রমণ!
তাড়িৎ প্রভার মত, দেখিতে দেখিতে গত,
নিমেষে উজ্জ্বল মাত্র, ধাঁধিয়া নয়ন,
ডুবায় জন্মের তরে বার্দ্ধক্যের অন্ধকারে,
এ যৌবন অনিষ্টের উষ্ণ প্রস্রবণ।

দুদিনে ফুরায়—নাম উচ্চারণে গত,
এ ছার যৌবন তাত ভাল লাগে না ত !
নিশীথ স্বপনে মরি নেহারি নবীনা নারী
স্বপ্নভঙ্গে যুবকের দুর্দ্দশা যেমন,
জীবের যৌবন তাত, বঞ্চনা তাহারি মত,
নিমেষে বার্দ্ধক্য পশে করা'তে রোদন।
শেষে কি লাঞ্ছনা আশু প্রবঞ্চনা জাত !
এ ছার যৌবন তাত ভাল লাগে না ত !
শরের পতন হ'তে যে টুকু সময় তাতে,
তত টুকু কাল মাত্র সুখের আভাস,
দুঃখময় এ যৌবন, ঠিক যেন করে মন
ক্ষণ কাল বেশ্যা সনে হাস্য পরিহাস !
শেষে মহা দুঃখ জরা-উপদংশ জাত,
এ ছার যৌবন তাত ভাল লাগে না ত !
কাম ক্রোধ পশু গণ গর্জ্জে ঘন কি ভীষণ !
সমাচ্ছন্ন অজ্ঞানের নিবিড় আঁধার,
যৌবন-রজনী ঘোরা, জীব পান্থ পথ হারা,
চমকিয়া দেখে যেন অকুল পাথার !
ভৈরবও ভীত হেরি হিংস্র রিপু ময়
যৌবনের অমাবস্যা—নিশীথ সময় !
বন-দাবানল প্রায়, যুবতী বিরহ হায়,
যুবক হৃদয় দগ্ধ করে নিশি দিন,
কর্দ্দমে আবিল যত বরষা নদীর মত
যৌবনের বুদ্ধি হয় পঙ্কিল মলিন !

তুফানে জলধি বক্ষে হয় কিন্তু পার,
যৌবনে নারীর বক্ষে ডুবিল সংসার!
আহা সেই মুখ খানি পূর্ণচন্দ্র শোভা জিনি
ঢল ঢল ছল ছল চক্ষু মনোহর,
ভাবি যুবা রাতি দিন দিন দিন হয় ক্ষীণ,
যত ক্ষীণ, তত দেখে পীন পয়োধর!
শত চিন্তা অলি গায় গুন্‌গুন্ স্বনে,
যৌবনের ক্ষণফুল্ল কমলের বনে।
নব যৌবনের মরি কুসুম মঞ্জরী হেরি,
মানস ভ্রমর ছুটে পাগলের প্রায়,
ছুটিতেছে বহু দূর, মন মৃগ তৃষ্ণাতুর,
যৌবনের মরীচিকা নিরখিয়া হায়।
পূর্ণ অধঃপাতে দিতে নবীন যৌবনে,
জ্বালাময় তৃষ্ণা উঠে মানবের মনে।
অনায়াসে পার হই বিপদ সঙ্কুল ওই
হাঙ্গর মকর পূর্ণ সাগর অপার,
এ মহা প্রলয় কারী, যৌবন সমুদ্র বারি,
কি অনন্ত, হায় তাত, হ'তে নারি পার!
বিচারিলে দেখি নারী জ্ঞান বুদ্ধি হীনা,
কিছু নাই তার অঙ্গে, রস রক্ত বিনা।
সেত পূর্ণ চন্দ্র নয়, অস্থি চর্ম্ম ক্লেদ ময়, (বৈরাগ্য ২১সর্গ)
নারী অঙ্গে মনোহর, কিবা আছে তাত?
ক্লেদ মল মূত্র বাহী হেন আর কিছু নাহি,
হেরিলে জনমে ঘৃণা, জনমের মত!

ইহা নিয়া কি করিবে মহামতি গণ ?
কুক্কুর ও শৃগালের শ্মশান-ভোজন!
মূঢ় নর পশু গণ, রাখিতে না পারে মন,
কাম রূপ হৃদ্ রোগ জ্বালায় কেবল
ভবজন মনোলোভা, কজ্জল কুন্তল শোভা,
নিরখি নিরখি ভাবে জনম সফল!
ঝাঁপ দিয়া তৃণবৎ পুড়ি মরে হায়,
চারু হাসিনীর দীপ্ত অনল-শিখায়!
নর-পাখী ধরিবারে, কাম-ব্যাধ চারি ধারে
পাতিয়াছে রমণীর রমণীয় জাল,
হতভম্ব নর-করী, নারী-স্তম্ভে সারি সারি,
বান্ধা ওই, পদে কাম শৃঙ্খল বিশাল!
নর-মীন গ্রাসিতেছে, আয়ু করি লোপ,
বাসনা-বড়িশ সূত্রে বিম্বাধরা টোপ!
নর-অশ্ব পালে পালে বান্ধা নারী-অশ্বশালে,
নর-হস্তী বান্ধিবারে নারী হস্তি-শালা,—
রমণী-বেদেনী ছুঁড়ী কামমন্ত্র পড়ি পড়ি
ধরি নর-কালসর্প পুরিতেছে ডালা!
ভাঙ্গিবে সে বিষদন্ত! সবে কত আর,
ত্রিলোক বিজয়ী আত্মা, অনাদি অপার!

কাল-রাজপুত্র ও মন-বানর।

না পুরিতে বাল্য সাধ যৌবন সাধয়ে বাদ! (বৈরাগ্য ২২ সর্গ)
বাল্যে ধরি করে গ্রাস যৌবন যেমন,

যৌবনেরে বলে ধরি, দুদিনেই গ্রাস করি,
আধিপত্য করে পুনঃ বার্দ্ধক্য তেমন।
নরে ধরি করে জরা রূপ গুণ হত,
জরাগ্রস্তে দেখে নারী গর্দ্দভের মত!
ক্রমে হ'লে জরা বৃদ্ধি, বুদ্ধি হন হতবুদ্ধি,
জরা-সপত্নীরে হেরি করে পলায়ন;
সুহৃদ্ বান্ধব যত, দাস দাসী দারা সুত,
জরাগ্রস্তে হেরি করে তাচ্ছল্য তখন!
ভাবিয়া ব্যাকুল বৃদ্ধ—খেতে নাহি পাই,
হায় কি হইবে মোর, কার কাছে যাই?
যেই দেখে সন্ধ্যা আর ধেয়ে আসে অন্ধকার,
যেই দেখে জরা, তার পিছে মৃত্যু যান,
যেই জরা পাকা ফল বৃক্ষে করে ঝলমল,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে মৃত্যু,—দুষ্ট হনুমান!
যৌবন-মূষিক যায় নাচিতে নাচিতে,
জানে না ছুটেছে জরা বিড়ালী পশ্চাতে!
মৃত্যু-রাজ আগমন— রোগ শোক সৈন্য গণ,
মার মার শব্দে সবে আগে আগে ধায়,
অদূরে রাজারে হেরি, জরা আসি ত্বরা করি,
শুভ্রকেশ-শ্বেতশ্মশ্রু—চামর ঢুলায়!
আগে আগে নাচে জরা বলে হরিবোল,
শ্বাস রোগ কাস রোগ বাজায় মাদোল!
হইয়াও জরাগ্রস্ত, তখনো বাঁচিতে ব্যস্ত,
স্বাস্থ্য ধন এ সংসারে ক'দিন বা থাকে?

গৃহে গৃহে ম্লান মুখ, ক'দিন বা থাকে সুখ?
কি আশায় জীব গণ এ জীবন রাখে?
রাখিবারে দুঃখময় নশ্বর জীবন,
বুঝি না ত কেন তাত আগ্রহ এমন?
সতত দেখিতে পাই, কাহারো অপেক্ষা নাই, (২৩ সর্গ)
সুমেরু হইতে দৃঢ় হইলেও তাহারে,
বিশ্বগ্রাসী মহা কাল গ্রাসিতেছে চির কাল,
আহা রে উদর তার পুরিছে না আহারে!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খায় কিছু বাকি রয় না,
কিছুতেই তৃপ্তি সেই পেটুকের হয় না!
সেই কাল শুক পাখী, সংসার-দাড়িম্ব দেখি,
বড় মিষ্ট জীব-বীজ খাইতেছে তুলিয়া!
যেন রে তাহারি তরে, জন্মে জীব এ সংসারে!
সব খায়, একটীও নাহি যায় ভুলিয়া;
দুষ্ট শুক নাহি দেয় একটীও রাখিতে,
মিষ্ট কত! হায় তাত, নাহি দেয় পাকিতে।
এই কাল রাজ পুত্র, নিয়া কর্ম্ম জাল সূত্র, (২৪ সর্গ)
এসেছেন মৃগয়ায়, জীব-মৃগ ধরিতে;
জগৎ-অরণ্যে তাই, ভ্রমণে বিরাম নাই।
তৃষ্ণাতুর অতিশয় বনে বনে ফিরিতে!
নানা রস পূর্ণ করি ধরেছেন যতনে,
এ সংসার সুবিশাল পানপাত্র বদনে!
বিষয়ের ফল ভাল, খাবে ব'লে এসেছিল,
মানব-মর্কট জাতি,—দুরদৃষ্ট কারণে

কাল-রাজ কুমারের ভব-বন বিহারের
উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত, মৃগয়ার তাড়নে।
বন হ'তে বনান্তরে প্রাণাকুল করিয়া,
শাখা হতে শাখান্তরে বেড়াইছে ছুটিয়া !
এ জগৎ দেখি আমি, কালের মৃগয়া ভূমি, (২৬ সর্গ)
এখানে কিরূপে থাকি মত্ত মায়া মোহতে ?
এ যে নিষ্ঠুরতা মাত্র, কালের করুণা পাত্র,
পীড়িত বিনীত তাত কেহ নাই জগতে।
দারা সুত সুখ যত মূর্খদেরি বাসনা,
কে বা কার, হাহাকার শেষে করে রসনা।
আয়ুর কি চঞ্চলতা ! মরণ কি নিষ্ঠুরতা !
যৌবন কি ক্ষণস্থায়ী ! বাল্য মরে আঁধারে !
দারা সুত বন্ধু যারা, প্রস্তুত করিছে তারা
কারা বন্ধনের রজ্জু বান্ধিবারে আমারে !
জগতের সুখ যত মরীচিকা-তামাসা !
হায় তাত, সংসার ত, মরুভূমি-পিপাসা !
সত্ত্বগুণ সুখ যাহা বহু দূরে গেছে তাহা,
রজোগুণ কর্ম্ম-মোহ দেখিতেছি নয়নে,
তমোগুণে অন্ধকার চারিদিকে হাহাকার,
দুঃখসার এ সংসার, পূর্ণ জরা মরণে !
জগতে সুখের আশা নাই আর আমাতে,
কোথা তত্ত্বজ্ঞান খনি, স্পর্শমণি যাহাতে !
পারি না যৌবন-রত্নে রাখিতে সহস্র যত্নে,
সাধুসঙ্গ সুপ্রসঙ্গ লুকায়েছে নীরবে,

প্রতারণা কুটিলতা, বাল বৃদ্ধ কি বনিতা,
সকলেই শিখিয়াছে জগতের স্বভাবে।
কহ তাত, মৃত্যু অত ব্যতিব্যস্ত হইয়া,
কোথা এ মানব পাল যাইতেছে লইয়া।
তত্ত্বজ্ঞান লভে যেই, জগতে মনুষ্য সেই,
লতা জালে বদ্ধ মৃগ অবসন্ন যেমতি,
আশা পাশে বিজড়িত, হইয়া অবোধ চিত
ভ্রান্ত ক্লান্ত শত শত, অবসন্ন তৈমতি;
হের তাত, দুঃখ কত স'য়ে স'য়ে রয়েছি,
দেখিয়া লোকের ভাব, বাক্যহীন হয়েছি!
ক্ষণিক প্রমোদ ভরে, ইন্দ্রিয় সুখের তরে,
কি না করে মূঢ় নরে, নৃত্য গীত বাজনা?
অদ্য কি সুখের হেতু, অদ্য যে বসন্ত ঋতু!
অদ্য হবে ও বাড়ীতে ফুলশয্যা রচনা!
অদ্য ভোজ মহোৎসব—মাতি হেন স্বভাবে,
নীচমতি নর জাতি দিবা রাতি কাটাবে!
এই তুচ্ছ নরলোকে, কি আশায় থাকে লোকে (বৈরাগ্য ২৭ সং)
এমন পদার্থ নাই অপদার্থ ভুবনে,
যাতে জীব শান্তি পায়, আর কিছু নাহি চায়,
চির সুখে সুখী হয় ধন্য মানি জীবনে!
কাম্য বনে লক্ষ শাখা লম্ফে ঝম্পে ঘুরিবে,
মন-বানরের কিন্তু উদর না পূরিবে!
বৃথা কাজে মত্ত অতি, বিষয়ান্ধ মন্দমতি
মনুষ্য আসন্ন মৃত্যু জানিবে বা কেমনে!

দেখে তত্ত্বজ্ঞানী জন যেন এই জীব গণ,
রজ্জুবান্ধা মেষ পাল থাকে যম বদনে!
ভঙ্গুর তরঙ্গ সম উঠি পড়ি ছুটিয়া,
কহ তাত জীব এত কোথা যায় চলিয়া?

কি বলি প্রবোধ দিবে?

যৌবন-শরতে বটে, মানব-কমল ফোটে,
বার্দ্ধক্য-হেমন্ত কাল কাল-সম আসিয়া
রূপ রস গন্ধ নাশি, চুষি রক্ত প্রভা রাশি
যায় ফুল-কুলেশ্বরে দুই পায়ে পিশিয়া!
তখন সে নিষ্ঠুরতা হেরি আহা আহা রে,
কি বলি প্রবোধ দিবে, কহ তাত, তাহারে?
ফল মূল ফুল দল, ছায়া কায়া রস বল,
অস্থি চর্ম্ম এ সকল দিয়া এই সংসারে,
নর-তরু রাজ যবে, হাহাকার করি ভবে,
পড়ে কাল-কাঠুরের তীক্ষ্ণধার কুঠারে,
তখন সে নিষ্ঠুরতা হেরি আহা আহা রে,
কি বলি প্রবোধ দিবে, কহ তাত, তাহারে?
সংসারে দেখিতে পাই, দোষহীন দৃষ্টি নাই,
হেন দেশ নাই যথা দুঃখ দেখা যায় না;
হেন কোন সৃষ্টি নাই, যার আর ধ্বংস নাই!
ছল শূন্য কাজ কেহ দেখিতে ত পায় না।
দুঃখে দোষে ছলে নাশে কান্দাইছে যাহারে,
কি বলি প্রবোধ দিবে, কহ তাত, তাহারে?

অলীক আকাশ লতা, তার ফলে সুমিষ্টতা
যত বাড়ে তত লোক মরে ভুলি আপনা,
পার্ব্বতীয় ছাগ যথা, নিরখি হরিত লতা,
বহু দূরে থাকি করি পক্ক ফল কামনা,
দূর শৃঙ্গ হতে লম্ফে পড়ি মরে পাষাণে,
মানব মনের দোষে মরে তথা এখানে!
এ কি ঘোর বিড়ম্বন ভয়ে মরে জন গণ,
এ যে পাপ প্রলোভন, ডাকে শুধু মরণে,
কোন দিকে রক্ষা নাই, রক্ষার উপায় তাই
আছে বা কি কহ তাত? পাব কি তা জীবনে?
আজীবন দুঃখময় এ জীবন ধরিয়া,
মরণ পর্য্যন্ত তাত, রহিব কি করিয়া?
আজ যে তেজস্বী নর সকলের অধীশ্বর, (বৈ, ২৮ সর্গ)
দুদিনের পর দেখি ভস্ম রাশি হয়েছে,
প্রবল বায়ুতে হেথা, দীপশিখা কাঁপে যথা
সংসারে জীবন দীপ নিবিয়াই রয়েছে!
চপলা নয়ন ধাঁধি চলি যায় যেমতি,
সংসারের সুখ-শোভা মনোলোভা তেমতি!
যাবৎ না মৃত্যু জাগে, এ সংসার ভাল লাগে,
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ আর পুনর্জ্জন্ম জগতে,
দিবস রজনী প্রায় ঘুরে ফিরে আসে যায়,
বার বার দেখি তায় কর্ম্মসূত্র সহিতে।
অবনীতে অবিচার দেখিতেছি নিয়ত,
দুর্ব্বলেও বলবানে করিতেছে নিহত!

কভু দেখি এক জনে নষ্ট করে শত জনে
অধর্ম্মের আধিপত্য উচ্চ জন উপরে,
সাধু জনে অধোগতি, অসাধুর সমুন্নতি,
এ জগতে বুদ্ধিমান্ থাকিবে কি প্রকারে ?
আসিতে আসিতে সুখ, দুঃখ রাশি আসিল,
খল্ খল্ হাসি আসি, হাহাকারে মিশিল !
এ সংসার মহা বন, জীব-ফল অগণন,
সময়ের সমীরণ দোলাইছে সতত,
নিয়তই টুপ্ টাপ্ পড়িতেছে ঝুপ্ ঝাপ্,
নিশি দিন এক দণ্ড নাহি হয় বিরত।
কত ফল পাকে কিন্তু একটিও থাকে না,
কাঁচাতেই বৃন্তচ্যুত, কত ফল পাকে না।
নিম্ব বৃক্ষে উঠি লতা, ক্রমে তিক্ত হয় যথা,
মনোবৃক্ষে কাম্যলতা ক্রমে তিক্ত তেমতি,
ভোগ মাত্রে করে জীর্ণ, চিত্ত হয় চিন্তা পূর্ণ,
রাজ্য ভোগে চিন্তা-রোগে নষ্ট হয় সুমতি !
চিন্তা শূন্য সুখ যাহা শান্তি-পদে নিরখি,
রাজ্য ভোগ হ'তে তাহা সুখকর নহে কি ?
প্রাসাদ ঐশ্বর্য্য-ভার প্রমোদ-কানন আর
বিভব বিলাস সুখ, ধন জন রমণী,
কিছুই ত ভাল নয়,— স্থায়ী সুখ কিসে হয় ?
কিসে মনে শান্তি রয়, ভব-ভয় বারিণী।
মৃত্যু আসি পদ তলে দলিতেছে যাহারে,
কি বলি প্রবোধ দিবে, কহ তাত, তাহারে ?

অনলে শীতল শিখা।

মনের দুঃসাধ্য রোগে চিকিৎসা না হ'লে আগে,
শেষে আর চিকিৎসার সময় ত পায় না,
যৌবনে না করে যদি কঠিন সাধন বিধি,
শক্তি গেলে মুক্তি লাভ কখন ত হয় না!
যারা বলে শেষে ধর্ম্ম, ধন দারা যৌবনে,
মুক্তি কি তাদের তাত, কৃতান্তের বদনে?
লোকে যারে বিষ বলে নহে বিষ ধরাতলে,
বিষম বিষয়-বিষ হৃদে থাকে পশিয়া,
সাধারণ বিষে হায়, এক জন্মে দেহ যায়,
নাশিবে বিষয় বিষ বহু জন্ম ধরিয়া।
তত্ত্বজ্ঞানি গণে কেহ নাশিতে না পারিবে,
কহ তাত জ্ঞান-তত্ত্ব, যাতে প্রাণ বাঁচিবে!
করাতে কাটিলে শির, তখনও থাকি স্থির,
কাটিছে বিষয়-আশা করাতের দশনে,
দুদণ্ড থাকিতে নারি, অস্থির হইয়া মরি,
আশা-করাতের এই আসা-যাওয়া ঘর্ষণে!
শত দুঃখ সহ্য করি রাজ্য সুখে থাকিলে,
ত্রিতাপে কি তাপ তাত, সাধু সঙ্গ পাইলে?
স্কন্ধ হীন বৃক্ষবরে, নিরখি নিশীথ ঘোরে, (বৈ, ৩০ সর্গ)
ভয়ে ভয়ে ভাবে লোক অতি দূরে থাকিয়া,
এ টা কি চক্ষুর ঘোর, অথবা দাঁড়ায়ে চোর,
কি এ টা গাছের গোড়া স্কন্ধ হীন হইয়া?

সেই রূপ মনে মম হইতেছে ধারণা,
এই সত্য তত্ত্ব জ্ঞান, কিংবা মম কল্পনা ?
কহ তাত বিবরিয়া, কোথা বা জুড়াবে হিয়া,
কোথা রোগ শোক শূন্য শান্তিময় বসতি ?
সর্ব্ব কর্ম্ম করি ভবে, জনকাদি ঋষি সবে,
কি রূপে লভিলা শান্তি, কহ পদে মিনতি!
তব সম জীবন্মুক্ত মুনি ঋষি সকলে,
ধরিয়া কি রূপ দৃষ্টি, বিহরেন ভূতলে ?
কুটিল ভুজঙ্গ প্রায়, বিষম সংসার হায়,
প্রলোভিত করে নরে পাপময় নরকে ;
সে আবার কিসে হয়, কেবল মঙ্গল ময় ?
শান্তির আলয় পূর্ণ সুখময় পুলকে ?
মোহ মাতঙ্গের এই আন্দোলিত সরসি,
কি রূপে নির্ম্মল স্বচ্ছ হয় যেন আরসি ?
কর্ম্ম করি এ সংসারে, থাকা যায় কি প্রকারে
নির্লিপ্ত পদ্মের পাতে স্বচ্ছ জল যেমতি ?
কাম ক্রোধ রিপু গণ, না করিয়া পরশন,
মাঝে থাকে কি প্রকারে কর্ম্মবীর সুমতি ?
অন্তরে অতুল্য বিশ্ব সুধাময় হেরিয়া,
বাহিরে তৃণের তুল্য দেখে বা কি করিয়া ?
বুঝিবার কথা না ত, এ ও কি সম্ভব তাত ?
অজ্ঞান-সমুদ্র পারে শান্তিময় প্রদেশে,
কে মহা পুরুষ আছে, শিক্ষা লভি যার কাছে
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশে ?

কি রূপে চঞ্চল মন, কহ দেব মিনতি,
অটল অচল হবে হিমাচল যেমতি ?
অন্তরের অহমিকা, সংসারের বিসূচিকা,
কি ঔষধ মন্ত্রে দেব ক্ষান্ত হবে এখনি ?
ঘুচিবে ত্রিতাপ ভ্রম, পূর্ণ সুধাকর সম,
কহ শীঘ্র কিসে হবে সুশীতল অবনী ?
কুক্কুরী চিবায় দেখ মৃত দেহ যেমতি,
মনোবৃত্তি করে ওই মানবেরে তেমতি।
মুনীন্দ্র, যাতনা ময় শুষ্ক দগ্ধ সংসারে, (বৈ, ৩১ সর্গ)
অমৃতের সুধা-রস পাইব কি প্রকারে ?
সুমিষ্ট সরস হবে, অথচ মোহ না রবে,
আসক্তি না হবে তায়,—হয় কি তা জগতে ?
উথলিবে সুখ সিন্ধু, রবে না আসক্তি বিন্দু,
সে সুখের পূর্ণ ইন্দু উদিবে কি মরতে ?
চির তরে সংসারের দুঃখ জ্বালা যাবে গো!
চিরস্থির সুবসন্ত ভবে কবে হবে গো ?
এ সংসারে শান্তি তাত, কখন কি হয়েছে ?
অনলে শীতল শিখা—কেহ কি তা দেখেছে ?
যদি শান্তি নাহি হয়, যদি কেহ নাহি কয়,—
কিংবা জ্ঞান উপদেশ যায় যদি বিফলে,
তেয়াগি আহার পান, তখনি ত্যজিব প্রাণ,
বিষ ময় নর দেহ দিব কাল-কবলে!
এত বলি শ্রান্তি বশে মৌন ভাব ধরিয়া,
রহিলেন রঘু বীর গুরু মুখ চাহিয়া।

উদ্ভাসিত ব্রহ্মতেজঃ।

মহামুনি বাল্মীকি বলিলেন,—

রঘুকুল চূড়ামণি শ্রীরামের বচনে, (৩২ সর্গ)
চাহে সবে পরস্পর সবিস্ময় লোচনে!
আনন্দে উৎফুল্ল আঁখি, অমৃত সাগরে থাকি,
জাগে সর্ব্ব প্রাণ হেরি অমৃতের লহরী,
মুণি গণ রাজ গণ, সভ্য গণ পৌর জন,
ব্রাহ্মণ অমাত্য ভৃত্য উঠে সবে সিহরি!
কৌশল্যাদি মহিষীরা, অন্তঃপুর বাসিনী,
স্ব স্ব বাতায়নে বসি শুনিছেন কাহিনী।
নীরব নিস্পন্দ সবে অচঞ্চল অঞ্চলে,
কিঙ্কিনী বলয় হার স্পন্দ হীন সকলে।
রঘু কুল চন্দ্র যবে, বসিলেন মৌন ভাবে,
সাধু সাধু! বলি সবে উঠে সিদ্ধ-মণ্ডলী,
অমর ললনা গণ করিলেন বরষণ,
ধরাতলে হাস্য-সুধা সুর-পুষ্প অঞ্জলি!
উল্লাসে আনন্দে সুখে রাম-বাক্য শুনিয়া,
স্ফীততেজ সিদ্ধ গণ কহিলেন উঠিয়া,—
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে ভ্রমি মোরা ত্রিলোকে,
আজ যাহা শুনিলাম, নাচে মন পুলকে!
রামের অমৃত-বাণী কভু না এমন শুনি,
অহো কি আশ্চর্য্য কথা—অমৃতের লহরী,

-না জানেন বৃহস্পতি এমন পবিত্র গীতী !
কি পবিত্র পুণ্যময় ! অঙ্গ উঠে সিহরি !
যে অমৃত বরষিলা রঘুকুল চন্দ্রমা
তাহে হ'ল দিব্য জ্ঞান, গেল জ্ঞান গরিমা ।
রঘুকুল সুধাকর কহিলা যে কাহিনী, (বৈ, ৩৩ সর্গ)
সর্ব্ব জন মনোহর সুধা-রস বাহিনী !
সে পবিত্র বিবরণ শুনিয়া মহর্ষি গণ
যে বচনে রামচন্দ্রে তুষিবেন সকলে,
শুনিতে সে মহা কথা, আমরা ব্যাকুল হেথা,
শুনি আজ, কভু যাহা শুনিনাই ভূতলে !
নারদ ব্যাসাদি যত ঋষি দেহ নিঃসৃত
উদ্ভাসিত ব্রহ্মতেজে সভাস্থল শোভিত !
মুনি মণ্ডলীর অগ্রে সমাসীন আসনে,
সুশুভ্র নারদ বসি মত্ত বীণা বাদনে ।
পশ্চাতে সজলোজ্জ্বল পীন ঘন সুশ্যামল
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস, হেরে পুর বাসীরা ;
অঙ্গিরা পুলস্ত্য যোগে, শোভিছেন মধ্য ভাগে,
উদ্দালক শরলোমা উশীরাদি ঋষিরা !
গাত্রে গাত্র ঘরষণে তাড়িতাগ্নি স্ফুরিত,
আলু থালু মৃগ চর্ম্ম জটা জুট জড়িত !
আলোড়িত অক্ষ মালা বক্ষ পটে শোভিত,
করে ধরা কমণ্ডলু তেজে বিশ্ব মোহিত !
বল বীর্য্যে ব্রহ্মচর্য্যে সে তেজের আতিশয্যে
উজ্জ্বল পাটল বর্ণ প্রজ্বলিত শরীরে,

জটা জুট যায় দেখা, তাম্র বর্ণ অগ্নি শিখা,
মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেন পূত করে মহীরে।
সেই স্থানে সিদ্ধ গণ উপস্থিত আসিয়া,
মোহিয়া মানব নেত্র দিব্য শোভা ধরিয়া!
বল্কল কৌষেয় বাস কটি তটে শোভিত!
মল্লিকা-মেখলা-পাশ আছে তায় জড়িত!
দূর্ব্বাঙ্কুর বান্ধা শীরে, পুষ্প মালা চারি ধারে,
কর-পদ্মে লীলা পদ্ম খেলিতেছে ঘুরিয়া,
বেণুদণ্ড আছে ধরা কুণ্ডলেতে মণি পরা,
মল্লিকা-বলয় করে, অক্ষ মালা বেড়িয়া!
পৃষ্ঠ দেশে জটা জাল ব্রহ্ম তেজে কম্পিত,
ধরিয়া কপিল বর্ণ পদ তলে লম্বিত!

সদুত্তর।

বিশ্বামিত্র বামদেব নিয়া সব তাপসে,
অঙ্গিরস পুলস্ত্যাদি ভরদ্বাজ হরষে,
বাল্মীকি ঋচিক ঋষি মরীচি পুলহ আসি,
ক্রতু আদি মুনি গণ চারি দিকে থাকিয়া,
বশিষ্ঠাদি বাৎস্যায়ন, নারদাদি ঋষি গণ,
উচ্চ কণ্ঠে সবে মিলি বলিলেন উঠিয়া,—
অহো কি বৈরাগ্য কথা, গাঁথা জ্ঞান আলোকে,
মহা বাক্য উপযোগী রঘুকুল-তিলকে!
কমল দল লোচন শ্রীরামের বচনে,
সুব্যক্ত প্রাঞ্জল প্রিয় দিব্যভাব শ্রবনে,

সকলেই আহ্লাদিত, হেন বাক্য আর্য্যোচিত,
মৃত-সঞ্জীবনী কথা আত্মজ্ঞান দায়িনী ;
প্রাণপ্রদ এই কথা, যে জনের হৃদে গাঁথা,
সে পুরুষে হৃদে ধরি ধন্য হন মেদিনী।
অস্থিমাংস-যন্ত্র মাত্র জীব যত জগতে,
উদ্ভাসিত-মহাপ্রাণ কটী আছে তাহাতে ?
যন্ত্রবৎ চলে জীব নিদ্রা আর আহারে,
কে বুঝাবে জ্ঞান তত্ত্ব ভোগ-মত্ত তাহারে ?
আহার ও নিদ্রা আর নারী সেবা সুখ-সার
জ্ঞান যার বুদ্ধি তার পশু সম মরতে,
সৌম্য মূর্ত্তি দৃঢ়ব্রত জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত
হেন মহা পুরুষ ত দুর্লভ এ জগতে!
কটী বা চন্দন তরু কোটী তরু মাঝারে,
সৌরভে দিগন্ত ছায় প্রহারিলে কুঠারে!
চন্দ্রমা হইতে যেন সুধা রাশি ক্ষরিত,
কুসুম হইতে যেন পরিমল বাহিত,
শশধর মনোহর রঘুকুল সুধাকর
পরম সুন্দর রাম মুখ-পদ্ম হইতে,
পূত করি বসুন্ধরা বহিল যে মধু ধারা
সুধার আস্বাদ লোক পাইবেক মহীতে!
শুন দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ, এই দগ্ধ সংসারে
মুগ্ধ জীব মহা জ্ঞান পাবে বা কি প্রকারে ?
অসার সংসার সার জ্ঞান সুধা লভিতে,
একাগ্র হইয়া যিনি জাগ্রত এ মহীতে,

ধন্য সে পুরুষবর ধন্য সে অমর নর,
চেতন হইলা যেই মোহ নিদ্রা ত্যজিয়া,
তাঁহারি যথার্থ প্রাণ, যথার্থ সে মহাপ্রাণ,
আর সবে আছে ভবে জড়ভাবে মরিয়া !
কুমার রামের মত দেখি নাই নয়নে,
বিবেক বৈরাগ্য যুত মানব এ ভুবনে।
সূর্য্যবংশ-প্রভাকর এই জ্ঞান-প্রভাতে
প্রকাশিলা যেই জ্যোতিঃ পূত মহী তাহাতে !
বিশ্বের বিস্ময়-কর রাম প্রশ্ন মনোহর,
এ কথার সদুত্তর না থাকিলে ভারতে,
না হ'লে অভীষ্ট সিদ্ধি, রামের আনন্দ বৃদ্ধি,
ঋষি-বুদ্ধি একেবারে নিষ্ফল এ জগতে !
এ সংসার মরু মাঝে ঋষিবাক্য ভরসা—
সত্যের ও অমৃতের অবিশ্রান্ত বরষা !

পুরুষকার।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবই শ্রীরামকে উপদেশ দান করুন—বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে, মহামুনি বশিষ্ঠ দেব বলিলেন,—

কমল লোচন রাম কহিলা যা তুমি, (মুমুক্ষু ৪ সর্গ)
হেরিয়া বৈরাগ্য তব মহা সুখী আমি !
এ হেন বৈরাগ্য বিনা অসার সংসারে,
মহাশক্তি মহা জ্ঞান লভিতে কে পারে ?
পুরুষ আনন্দে ভাসে এই পৃথিবীতে,
কি রূপে বলি তা শুন অবহিত চিতে,—

যে জন পুরুষ নামে জন্মিয়াছে হেথা,
পুরুষার্থ বিনা তার পুরুষত্ব কোথা ?
কার্য্য সাধনের যত্ন, পুরুষার্থ তাই,
বিনা পুরুষার্থে কোন কার্য্য হয় নাই।
উপযুক্ত পুরুষার্থ থাকিলেই তবে
জীবের অভীষ্ট সিদ্ধি হবে এই ভবে।
চন্দ্র হ'তে ক্ষরে যথা সুধা নিরমল,
পুরুষার্থ হ'তে ক্ষরে আনন্দ কেবল !
জ্ঞান-প্রাপ্তি জীবন্মুক্তি—আনন্দের কণা,
নাহি মিলে পুরুষের পুরুষার্থ বিনা।
দাঁড়ান পুরুষকার কর্ম্ম মাত্র ধরি,
পুরুষার্থ চরিতার্থ কর্ম্ম করি করি !
ইহা ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, অদৃষ্ট ত নয়,
নির্ব্বোধেরা বলে সব দৈব বশে হয়।
আকাশ হইতে "দৈব" পড়ে কি ভূতলে ?
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফল, "দৈব" তারে বলে।
এই সে পুরুষকার পূর্ব্ব জন্মে ছিল,
তার কর্ম্ম ফলে জীব এই জন্ম নিল।
বহু-জ্ঞানী সাধুদের উপদেশ পথে,
দেহ মন বাক্যের যে চালনা জগতে,
প্রকৃত পুরুষকার তাহাই কেবল,
ভূতলে তাহারি কর্ম্ম সতত সফল !
আপন ইচ্ছায় শুধু কার্য্য করে যেই,
কুপৌরুষ তার নাম, স্বেচ্ছাচার সেই !

নিয়ত নিষ্ফল তাহা, বিশৃঙ্খল ভাবে,
কি রূপে সে লক্ষ্য হারা মোক্ষপথে যাবে
যেই জন শাস্ত্রপথে যায় যত্ন করি,
মহা পুরুষের স্থির মহা পথ ধরি,
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরেই হয়,
শাস্ত্র-পথ রাজপথ ভিন্ন কিছু নয়!
যে জন বিপথ গামী করে স্বেচ্ছাচার,
অর্দ্ধ পথে মনোরথ ভগ্ন হয় তার!
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যাহা, সেও ত কেবল,
জীবের পুরুষকার প্রযত্নের ফল!
ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ পুরুষেই ফলে,
কেবল পুরুষকার প্রযত্নের বলে!
পুরুষ-কারেই লভি চিদানন্দ-ধাম,
কেহ বা পুরুষোত্তম ধরেছেন নাম।
শিবত্ব লভেন শিব,—তাহার কারণ,
মহান্ পুরুষকার—প্রযত্ন আপন!
শূদ্র নারী ক্ষুদ্র হোক, প্রযত্নের বলে
কীটে পায় ব্রহ্মপদ, সাধু গণ বলে।
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফল চলিছে, আবার
এ জন্মের কর্ম্মফল পাশাপাশি তার।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল দৈব বলে তায়,
এ জন্মের কর্ম্মে তারে জয় করা যায়!
ঐহিক পুরুষকার সাধনের বলে,
অসাধ্য কিছুই নাই অবনী মণ্ডলে!

উৎসাহ অভ্যাসে দৃঢ় যত্নশীল নর,
সহজেই জয় করে সুমেরু শিখর!
অশাস্ত্রীয় পথে কর্ম্ম নিষ্ফল নিশ্চয়,
সাধু প্রদর্শিত পথে সিদ্ধি নিঃসংশয়।

কর্ম্ম-বিজ্ঞান।

যে করে যেমন যত্ন, ফলেও তেমন রত্ন (বৈ ৫ সর্গ)
দুই রূপ কর্ম্ম আছে, সংসারে;
এক শাস্ত্র সুশাসিত, আর শাস্ত্র-বহির্ভূত,—
স্বেচ্ছাচার বলে লোক যাহারে।
শাস্ত্র ছাড়া স্বেচ্ছাচার, অনিষ্টই ফল তার,
শাস্ত্রপথে ইষ্ট লাভ, ঝটিতে,
(১) (২)
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফল এ জন্মের কর্ম্মবল
মেষ সম যুদ্ধ করে, দু'টাতে!
শক্তি যার কম হয়, তারি হয় পরাজয়;
পূর্ব্বের কুকর্ম্ম ফল নাশিতে,
এ জন্মে কর রে সার, সজোর পুরুষকার,
পূর্ব্বের সুকর্ম্ম ফল, সহিতে।
শাস্ত্রকর্ম্ম করি বটে, তথাপি অনিষ্ট ঘটে,—
এখানে বুঝিতে হবে, বিচারি,
পূর্ব্বের দুষ্কর্ম্ম ফল এখনো প্রকাশে বল,
এ সব অনিষ্ট ফল, তাহারি।
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম-মেষ, এখনো সজোর বেশ,
বর্ত্তমান কর্ম্ম-মেষে, তাড়াবে,

যত ক্ষণ নাহি হয় পূর্ব্ব মেষ পরাজয়,
ঐহিক সুকর্ম্ম-মেষে, বাড়াবে।
ঐহিকের শাস্ত্রকর্ম্ম,— তাহার নিশ্চয় ধর্ম্ম
পূর্ব্বের কুকর্ম্ম-ফল, নাশিবে,
ভবিষ্যৎ দোষ যত, করি সব দূরীভূত,
কেবল মঙ্গল পথে আনিবে।
ক্ষীণ কর্ম্ম ক্ষীণ পুণ্য, উৎসাহ উদ্যম শূন্য,
পুরুষ-গর্দ্দভ হয়ে, থেক'না,
শাস্ত্র মতে কর কর্ম্ম, উৎসাহ পুরুষ-ধর্ম্ম,
উৎসাহ উদ্যোগে ত্রুটি, রেখ' না!
ইহলোকে পরলোকে আনন্দ উঠিয়া থাকে,
উৎসাহে শাস্ত্রের কর্ম্ম, করিলে,
বিষাদ জড়তা যাবে, সিংহের বিক্রম পাবে,
শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম, ধরিলে।
সতত মক্ষিকা যত ক্ষত আস্বাদনে রত,
সেই মত ভোগে মত্ত, হ'ও না;
আহার বিহার সুখে নিরখি রমণী-মুখে
পুরুষত্বে জলাঞ্জলি, দিও না।
মহান্ পুরুষকার প্রযত্ন করিয়া সার,
বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব, লভিল,—
দেখিয়া শুনিয়া তাঁকে, যে জন বসিয়া থাকে,
ধিক্ তাকে—আত্মহত্যা করিল!
কি বা সত্য কি অসত্য, কিবা নিত্য কি অনিত্য,
আগেই বিচারি তাহা, দেখিবে,

শাস্ত্রজ্ঞান পরমার্থ, তাহার নিগূঢ় অর্থ,
পুরুষার্থ বলে সব, বুঝিবে।
সহস্র প্রযত্ন দিয়া, প্রস্তরের খণ্ড নিয়া
তাহারে সুবর্ণ করা, যায় না,
সে টা যে অশাস্ত্র কথা,— শাস্ত্রকর্ম্ম হয় যথা,
তথায় নিষ্ফল কিছু, হয় না।
শাস্ত্র যে প্রত্যক্ষীভূত, বহুকাল পরীক্ষিত,
সত্য পথ, মুক্তিধন, পাইতে,
ঠিক্ যেন রাজপথ, মুক্তির পুষ্পক রথ,—
অন্ধেও স্বচ্ছন্দে পারে, যাইতে!
করিলেও শাস্ত্রকর্ম্ম, ফলের যে তারতম্য,
পূর্ব্বাপর দোষে সে টা, ঘটনা;
গুরু উপদেশ আর শাস্ত্র-পাঠ বার বার,
সাধু সঙ্গে হয় যদি, সাধনা,
তাহে জন্মে মহাবল, পুরুষকারের ফল,
অবিকল সিদ্ধিলাভ, অমনি,
বসি থাকি দৈব আশে, কেবল আলস্য দোষে,
মূর্খ ও দরিদ্রে পূর্ণ অবনী! *

---

* যদি বল, পূর্ব্ব কর্ম্মফলে এখন ত পুরুষকার জাগিতেই পারিতেছে না, সুকর্ম্ম করে কে?—তাহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যদিও এখন পুরুষকার চাপা আছে, তথাপি সাধু গুরু শাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া এই যে করিতেছ, ইহা করিতে করিতে নিদ্রিত পুরুষকার জাগ্রত হইবে। ক্রমে শক্তি সঞ্চারিত হইবে। তাই তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মফলেই বশিষ্ঠ দেব তোমার নিকট উপস্থিত।

শাস্ত্র সাধু গুরু।

যেমন বলিষ্ঠ নরে জয় করে দুর্ব্বলেরে (বৈ ৬ সর্গ)
তেমতি পূর্ব্বের কর্ম্ম ধরিয়া,
বর্ত্তমান সাধু-কর্ম্ম প্রকাশি আপন ধর্ম্ম
অনায়াসে বসে জয়, করিয়া!
পূর্ব্ব কর্ম্ম নাশ তরে, যে জন না যত্ন করে
শাস্ত্রীয় সাধুর কর্ম্ম, আচরি,
সে যে স্বেচ্ছাচারী হায়, তারে কি বুঝান যায়,—
এ সংসার অমৃতের, লহরী!
অন্নগ্রাস নিয়া মুখে দন্তে চূর্ণ কর সুখে,
তাহাও প্রযত্ন বিনা, হয় কি?
শাস্ত্রকর্ম্ম-চক্র ধর, পূর্ব্ব কর্ম্ম চূর্ণ কর,
হবে ভবে জীবন্মুক্ত, ভয় কি?
মহা পুরুষের সার মহান্ পুরুষকার,
মর্ম্ম তার নাহি বুঝে, সকলে;
পুরুষত্ব-হীনে বলে— "সবি দৈব ধরাতলে,
সাধনা সকলি বৃথা, ভূতলে!"
আপনাতে যত্ন যার, দৈবও সহায় তার,—
পুরুষত্ব দৈব দোঁহে, মিলিল,
দৈবই আসিয়া ঘুরে, পুরুষত্ব রূপ ধরে,
পুরুষত্ব ঘুরে দৈব, হইল!
ভিখারী দরিদ্র ধরি, দেও যদি রাজা করি,—
সে যে পূর্ব্ব কর্ম্ম ফল, জানিবে;

ইহাকেই দৈব বলে ; পুরুষকারের ফলে
হেন দৈব শত শত আসিবে।
পূর্ব্ব কর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ, বর্ত্তমান সুপ্রত্যক্ষ,
প্রত্যক্ষে বিচারি কর্ম্ম, করিলে,
পূর্ব্বের কুকর্ম্ম ফল দেওয়া যায় রসাতল,
অব্যর্থ সাধুর কর্ম্ম ধরিলে।
যাহা না করিতে পার, যত্ন কর, ধৈর্য্য ধর ;—
পারি না করিতে জয় মরণে,
তাই বলি বসি বসি কাঁদিব কি দিবা নিশি ?
মুক্তি কি অবলা সম, রোদনে ?
পাত্রাপাত্র সুবিচারে, দেশ-কাল অনুসারে,
সিদ্ধি হয় পুরুষত্ব-সাধনে,
অল্পাধিক সিদ্ধি হেরি, অথবা বিলম্ব স্মরি,
ছাড়িও না সহিষ্ণুতা রতনে !
সাধুসঙ্গ সাধুভক্তি সাধুশাস্ত্রে অনুরক্তি
অভ্যাসে নির্ম্মল বুদ্ধি হইবে,
তবে সেই মনোলোভা অনন্ত বসন্ত-শোভা—
অন্তরে অব্যর্থ সিদ্ধি পাইবে।
পুরুষত্ব করি চূর্ণ অবলা-আলস্যে পূর্ণ
থাকিও না দৈবশয্যা শয়নে,
রামভদ্র কণ্ঠহার, কর সে পুরুষকার,
পদাঘাত করি তুচ্ছ মরণে !
আচার্য্যেরে শ্রেষ্ঠ মানি, শিরোধার্য্য আর্য্যবাণী,
ব্রহ্মচর্য্য বল-বীর্য্য ধরিয়া,

মায়া মোহ ছুঁড়ে ফেলি, বীরসিংহ যাও চলি,
পদ তলে মৃত্যুকীট দলিয়া!
ভাল মন্দ শত শত, সতত সম্মুখাগত,
না করিয়া রাগ দ্বেষ তাহাতে,
সমুচিত কর তার, শাস্ত্র মতে ব্যবহার,
কর্ত্তব্য পালন হয় যাহাতে।
অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা প্রযত্নে সাধিলে তাহা
তাকেই পৌরুষ বলে সকলে,
শাস্ত্র মতে সেই যত্ন আনি দিবে মহা রত্ন,
মহানন্দ পুরুষার্থ ভূতলে।
দিয়া দেহ মন প্রাণ করে যত বুদ্ধিমান
শাস্ত্রপাঠ সাধুসঙ্গ সতত,
শ্রবণ কীর্ত্তন ক্রিয়া করে কায় মন দিয়া
গুরু-পাদপদ্ম সেবা নিয়ত।
অজ্ঞান-আঁধার-পাপ আনে দুঃখ শোক তাপ
পুরুষত্ব নাশে সেই আঁধারে,
ভাবি ভাবি কেন আর ডাকি আন দুঃখভার?
ডাকিছে পুরুষকার তোমারে।
সাধু সেবা কর গিয়া ধন মন প্রাণ দিয়া
অজর-অমরানন্দ ফলিবে,
সাধু-পাদপদ্ম ধন নিত্য সুখ-প্রস্রবণ,—
বহু সাধু সেবাতে তা মিলিবে।
কেবল আলস্য-খনি মূর্খদের দৈব মানি
ডাকিও না শোক তাপ মরণে,

পূর্ব্বের সুকর্ম্ম-ফল কর আরো সমুজ্জ্বল,
এ জন্মের সাধুকর্ম্ম সাধনে।
ছাড়িয়া বিষাদ ভয়, লও ঋষি-পদাশ্রয়,
তাঁদের শাস্ত্রের মর্ম্ম শিখিলে,
জয় করি এ সংসার সাধিয়া পুরুষকার
দেখিবে অমৃতময় অখিলে!
সাধুদের সুপ্রবোধে সে অব্যর্থ মহৌষধে
জন্ম মৃত্যু ভবরোগ নাশিবে,
রামভদ্র পাবে স্ফূর্ত্তি, লভিবে আনন্দ-মূর্ত্তি,
চরাচর ব্রহ্মানন্দে ভাসিবে!

তিন সাধন।

আচরিয়া ধর্ম্ম পুণ্য, হ'য়ে রোগ শোক শূন্য, (বৈ ৭ সর্গ)
এমন সাধন কর, জীবনে,
যাতে সিদ্ধি লাভ করি জন্ম মৃত্যু পরিহরি
দেখিবে অমর লোক, নয়নে।
যত্ন যার পূর্ব্ব কর্ম্ম-মন্দফল নাশিতে,
নাহি হয় তার আর মরভূমে আসিতে।
প্রথমেই চিত্তশুদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞান মার্জ্জনা,
পরেতে পুরুষকার সাধনের বাসনা,
পরে তাতে কর রত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যত,—
এই তিন হইতেই অমঙ্গল নিবৃত্তি,
এই তিন হ'তে হয় শাস্ত্রকর্ম্ম-ফলোদয়,
রামভদ্র এই তিনে হোক তব প্রবৃত্তি।

এই তিনে বৃহস্পতি দেবগুরু-আসনে,
শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু এই তিন সাধনে।
এই তিন অভাবেই কত শত নৃপতি,
নহুষ প্রভৃতি সবে নরকের অতিথি!
শাস্ত্র শিক্ষা-তৎপরতা, গুরুবাক্যে একাগ্রতা
নিজ যত্ন-প্রগাঢ়তা—এই তিন ধরিলে,
এ জগতে কি না হয়? হয় ত্রিভুবন জয়!
অসাধ্য সাধন হয় ঋষি বাক্য শুনিলে!
চালাইয়া মনোরথ যাইও না জঙ্গলে!
ঋষিদের রাজপথ পূর্ণ সত্য মঙ্গলে!
বিষাদে অধীর হ'য়ে কাঁদে যেই বসিয়া,
তাহারি আশ্বাস মাত্র "দৈব দৈব" বলিয়া!
অনর্থ সাধনে যত্ন, সে নহে পৌরুষ রত্ন,
সে ত মহাপাপ, বলে স্বেচ্ছাচার তাহারে,
না করি সে স্বেচ্ছাচার, গুরু সাধু শাস্ত্র আর
এ তিনে পুরুষকার দিয়া চল সংসারে।
গুরু উপদেশ সহ সাধু সঙ্গ সতত,
আর শাস্ত্র করে চিত্ত সুপবিত্র নিয়ত!
সর্ব্ব লোকে সাধু গুরু শাস্ত্র আছে বিদিত,
নিজ বুদ্ধি-স্বেচ্ছাচার সর্ব্ব লোকে নিন্দিত!
ধরি সাধু শাস্ত্র অর্থ, লক্ষ্য করি পরমার্থ,
প্রযত্ন-পুরুষকার ব্যবহার করিয়া,
জ্ঞানের সঞ্চার হ'তে লিপ্ত যদি থাক তাতে
অজর অমর দেশে সুখে যাবে চলিয়া!

না করেন সৃষ্টি দৈববলে রচনা,—
আপন পৌরুষ বল, আপনারি সাধনা!
রঘুকুল-চূড়ামণি নবোৎসাহে উঠিয়া,
বিকসিত কর মন তত্ত্বজ্ঞান শুনিয়া!
দেখাও উৎসাহ স্ফূর্ত্তি, ধর সে আনন্দ-মূর্ত্তি,
পাদপ পাথর কিংবা পশু তুল্য দশাতে,
থাকিও না রঘুবীর, চিত্তকে করিয়া স্থির,
উঠ বিশ্বজয়ী জ্ঞান লভিবার আশাতে!
স্বেচ্ছাচার মহাপাপ ডাকে মাত্র মরণে,
অজর অমর হবে ঋষিপদ শরণে।
হৃদয়ে বিবেক রূপে ঈশ্বরের স্থাপনা!
বিবেক পুরুষকার ঈশ্বরেরি যোজনা!
দৈব মানি থাকে যারা, দৈবকে ধরিয়া তারা,
জ্বলন্ত অগ্নিতে কেন ঝাঁপ দিতে চাবে না?
দৈব যদি সব করে, তবে কেন ভয়ে মরে?
দৈবে না থাকিলে দেহ দগ্ধ কভু হবে না!
"সবি দৈব"—তবে কেন সাধুশিক্ষা ভুবনে?
মৃত ভাবে থাক তবে অন্ধকারে শয়নে!
পূর্ব্বাপর কর্ম্মবুদ্ধি বলে লোকে যাহাকে,
পণ্ডিতেরা দৈব-শক্তি বলেছেন তাহাকে।
কেবল পৌরুষ বলে আমরাও ক্ষিতি তলে,
হইয়াছি মুনি ঋষি সর্ব্ব দুঃখ নাশিয়া,
কেবল পৌরুষ ধরি বিমানে ভ্রমণ করি,
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণে ভাল বাসিয়া!

দৈবাৎ হয়েছে ঋষি— যদি কেহ বাখানে,
বুঝিবে, পুরুষকার পূর্ব্বকার সেখানে।
রঘুকুল-চূড়ামণি কহিতেছি তোমারে,
মোক্ষ যদি চাও তবে লক্ষ্য কর আমারে।
শান্তির অমৃত মাখা মুক্তি পদ পাবে দেখা
দৈব মুখাপেক্ষা ছাড়ি পুরুষত্ব ধরিয়া,
কর বৎস গাত্রোত্থান, মৃত দেহে পাবে প্রাণ,
পরম পুরুষকারে বারংবার পূজিয়া!
ধন্য সে পুরুষকার, যার মহা প্রভাবে,
মৃত দেহে দেয় প্রাণ, পূর্ণ করে অভাবে।

পুরুষকার মধ্যেই ঈশ্বর।

মন কর্ম্ম দৈব আর বাসনাদি সব,
পুরুষকারের ভাব জানিবে রাঘব। (বৈ ৯ সর্গ)
সজ্জিত অপূর্ব্ব সাজে পুরুষকারের মাঝে,
পরম পুরুষ সেই সর্ব্ব মূলাধার,
তিনিই ঈশ্বর স্রষ্টা, তিনিই ত সর্ব্বদ্রষ্টা,
তাঁরে ধরি যায় লোক ভবসিন্ধু পার!
মহান্ পুরুষকারে পুরুষ মহান্,
দেহে থাকি করিছেন কর্ম্মফল দান।
অচিন্ত্য অব্যক্ত দৈব অথবা ঈশ্বর,—
পুরুষত্ব মাঝে সেই পুরুষ সুন্দর।
পৌরুষে থাকিলে বুদ্ধি, সকল অভীষ্ট সিদ্ধি ;
তাহা ভিন্ন আর নাই কর্ম্মফল-দাতা,

সে মহা পুরুষকার, সকল মঙ্গলাধার,
সেইমাত্র সকলের পিতা মাতা ধাতা।
তোমার পুরুষকার, তোমার প্রভায়,
পুরুষত্বে উৎসাহিত করুন তোমায়।
জড় বস্তু নহ তুমি চেতন কেবল,
চেতন পুরুষকার তোমার সম্বল!
চিন্ময় পুরুষ সেই বিদ্যমান্ তোমাতেই;
তাহার অধীন তুমি, কারো নহে আর,
তোমার সর্ব্বস্ব সার মহান্ পুরুষকার,
তারে ছাড়ি যাবে কোথা, কে আছে তোমার?
জীবন্ত পুরুষ রাখে জীবন্ত তোমায়,
কেন বৎস বসি আছ অচেতন প্রায়?
যে অশুভ পথে ধায় বাসনার নদী,
শুভ পথে ফিরাইতে পার তায় যদি,
ধন্য সে পুরুষকার, ধন্য সুবাসনা আর,
কুপথে প্রযত্ন হলে পুরুষত্ব নয়,
পুরুষকারের অর্থ— সে পরম পুরুষার্থ,
কেবল মঙ্গল পথ নিত্য শুভ ময়!
সুবাসনা বৃদ্ধি কর, কহিতেছি আমি,
অভ্যাস করিবে যাহা তাই পাবে তুমি!
যত দিন না বুঝিবে, কমল-লোচন,
মনের স্বরূপ স্থির অবস্থা কেমন,
যাবৎ ঘুচিয়া ভ্রান্তি না হয় একান্ত শান্তি,
তাবৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সযতনে ধর,

পূর্ণানন্দে যত দিন না হয় মানস লীন
তত দিন সাধুসঙ্গ গুরু সেবা কর।
তাতেই হইবে পূর্ণ জ্ঞানের উদয়,
দুঃখের একান্ত শান্তি হইবে নিশ্চয়!
সর্ব্বত্র আছেন ব্রহ্ম, তাই সব নিত্য,
ব্রহ্মের সম্বন্ধ হেতু এ জগৎ সত্য।
না থাকিলে ব্রহ্ম দৃষ্টি, স্বপ্নবৎ সব সৃষ্টি,
ব্রহ্ম দৃষ্টিতেই মাত্র সত্যের প্রমাণ,
উঠ বৎস এক বার ধর সে পুরুষকার,
পৌরুষ রূপেতে ওই পুরুষ মহান্!
চিত্ত তব নিত্য বন্ধু প্রফুল্লিত করি,
অমৃত সাগরে চল ব্রহ্মপথ ধরি।
বীর কুল রবি, আজ অমরত্ব তরে,
জাগাইয়া সুবাসনা উৎসাহ অন্তরে,
সুকর্ম্ম শাণিত অসি, প্রহারে কলুশ নাশি,
জন্ম মৃত্যু পরিপূর্ণ বিষাদ-সংসার,
অমৃত-সাগরে নিয়া, ফেল বৎস ডুবাইয়া,
খুঁজিয়া না পাবে কেহ চিহ্ন আর তার,
অজর অমর হ'য়ে মোদের মতন,
কি ভূতলে নভঃস্থলে কর বিচরণ!

আকাশ বাসী ব্রাহ্মণের কথা।

উৎপত্তি প্রকরণ।

ব্রহ্মরূপ হয় জীব আত্ম তত্ত্ব যোগে, (১ম সর্গ)
সংসার বন্ধন তাই স্বপ্নবৎ আগে!
জাগরণে স্বপ্ন যথা আপনি পলায়,
আত্ম জাগরণে তথা ভববন্ধ যায়!
যাঁদের অন্তরে সদা আত্ম জ্ঞান ফুটে,
ব্রহ্মভাব পান তাঁরা, ভববন্ধ ছুটে!
রজ্জু দেখে সর্পবোধ হয় যেই রূপ,
হতেছে জগৎ বোধ ব্রহ্মে সেইরূপ!
বিশেষ বলিব শুন কমল লোচন,
নিরাকার পরমাত্মা আকাশ যেমন,
কেবল চৈতন্য তিনি নিত্য নির্ব্বিকার,
জ্যোতিঃ রূপে মহাশক্তি স্ফুরণ তাঁহার।
শক্তি ছায়া ঘোরে তিনি জীব ভাব লন,
জগৎ দর্শন তাঁর স্বপ্ন দরশন!
আদি জীব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ যেমন,
তাঁদের উজ্জ্বল থাকে আত্মার স্মরণ।
ক্রমে হয় স্তরে স্তরে মলিনতা ময়,
মায়াশক্তি বশে শেষে বিস্মৃতি উদয়।
আগেও যেমন আত্মা শেষেও তেমন,
আভাযোগে মাত্র যেন জীব ভাব লন।
সেই নির্ব্বিকার আত্মা আত্মশক্তি বলে
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হন মায়ার কৌশলে।

মিথ্যাভ্রান্তি দেখায় যে সেই শক্তি মায়া,
স্থনিয়মে বিধি বদ্ধ ব্রহ্মের সে ছায়া!
বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মা, তাঁর যে স্বভাব
বাসনা তুলিয়া যেন ধরে মনো ভাব।
আত্ম ভাব ভুলি ক্রমে মনো ভাব ধরে,
অস্থির তরঙ্গ যেন সুস্থির সাগরে!
শুদ্ধ চৈতন্যের বশে আভারূপী যিনি,
সব সত্য সঙ্কল্পের মূল হন তিনি।
মূল চৈতন্যের জোরে যত সৃষ্টি হয়,
সব মিথ্যা, ভাঙ্গে গড়ে, মূল মিথ্যা নয়।
স্বর্ণ-বালা স্বর্ণ মাত্র, বালাটি মৌখিক,
ব্রহ্ম-সৃষ্টি ব্রহ্ম মাত্র, সৃষ্টি ত ক্ষণিক!
আত্মার প্রভাবে আদি মনটি প্রবল,
কল্পনায় গড়ে বিশ্ব মরীচিকা-জল!
চৈতন্যের আভা মাত্র প্রতিবিম্ব মন,
দ্রষ্টা হয়ে দৃশ্য দেখে, সেইটি বন্ধন!
মিথ্যা দৃশ্য দেখে মন ইন্দ্রধনু প্রায়,
"তুমি আমি" শব্দ বলে ভেদ কল্পনায়।
সুরা মত্তত্তার মত মত্ততা মায়ার,
ছাড়া যায় অভ্যাসেতে ধ্যান ধারণার।
গাঢ়নিদ্রা ভঙ্গে যথা পূর্ব্ব জ্ঞান আসে,
সমাধির শেষে বিশ্ব চিত্তে পুনঃ ভাসে।
তপ জপ ধ্যানে শুধু চিত্ত শুদ্ধি হয়,
নির্ব্বিকল্প সমাধিও চিরস্থায়ী নয়।

যখনি সমাধি ভঙ্গে মন-মেঘ উঠে,
তখনি সংসার দৃশ্য ফুল গুলি ফুটে।
কি প্রকারে চিরমুক্তি পাবে তবে নর,
মনোহর যুক্তি তার শুন রঘুবর!
জীবনে যথার্থ সুখ কিরূপে এ ভবে
সম্ভোগ করিতে হবে শুন বলি তবে।
নামেতে আকাশ-বাসী ছিলেন ব্রাহ্মণ, (উৎ, ২য় সর্গ)
চিরজীবী হিত-ব্রত ধর্ম্ম-পরায়ণ।
তাঁরে ধরিবারে মৃত্যু ঘোরে আশে পাশে,
পরশিতে শক্তি নাই, তিনি যে আকাশে!
সর্ব্ব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল তাই মৃত্যু গিয়া,
যম রাজে কহিলেন সব বিবরিয়া।
মৃত্যুরাজ কহে, মৃত্যু তব কর্ম্ম নয়,
সঞ্চিত যে কর্ম্মফল, তাতে মৃত্যু হয়।
কর্ম্মফল না থাকিলে ধর তুমি কারে?
কর্ম্মাসক্তি আছে যার, মার তুমি তারে।
"আমি কর্ত্তা" এই ভাবি কর্ম্ম করে যারা,
কর্ম্মফলে আসি মৃত্যু-গ্রাসে পড়ে তারা।
উপায় কি দেখ সেই বিপ্রে ধরিবার,
পূর্ব্বাপর কর্ম্ম কিছু আছে কিনা তার।
সন্ধান করেন মৃত্যু গিয়া সংগোপনে
কোথা কর্ম্ম আকাশস্থ ব্রাহ্মণের মনে।
সঙ্গে সঙ্গে ধায় যত যমের কিঙ্কর,
তন্ন তন্ন করি দেখে দ্বিজের অন্তর।

দেখে তারা ত্রিভুবনে যত প্রলোভন,—
কোথা আছে আকাশস্থ ব্রাহ্মণের মন?
বিন্দু বিন্দু খুঁজি দেখে সর্ব্ব সংসারের,
নাহি দেখে ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্ব মনের।
সন্ধানে সন্ধানে শেষে হইল হতাশ,
মনঃক্ষোভে ফিরে আসে যমরাজ পাশ।
কহে তারা, হে রাজন্, কি কহিব আর,
বিন্দু বিন্দু করি ধরি দেখেছি সংসার,
কামিনী কাঞ্চন গিরি সাগর কানন
সুরপুরী-বিদ্যাধরী যত প্রলোভন,
ত্রিভুবন পর্য্যটন করিনু সবাই,
কোথাও সে ব্রাহ্মণের মন দেখি নাই।
কহ প্রভো বিবরিয়া, একি চমৎকার,
ছাড়িল কি দুষ্ট বিপ্র তব অধিকার?
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত কন ধর্ম্মপতি,
শুন মৃত্যু গূঢ় তত্ত্ব কহিব সংপ্রতি,
থাকে সে আকাশবাসী আকাশের পরে,
বিশুদ্ধ চৈতন্যে মন, থাকে শূন্য ভরে।
অহং-বুদ্ধি নাই তাই চিত্ত নির্ব্বিকার,
নিষ্কাম বিবেক জ্ঞান আছে মাত্র তার।
অহং-বোধ ভাসা বুদ্ধি, মরণের হেতু,
গভীর নিষ্কাম-বুদ্ধি ভবার্ণবে সেতু।
চিরসুখে চিদাকাশে চিন্ময় চেতন
সতত জাগ্রত আছে সে দুষ্ট ব্রাহ্মণ।

কর্ম্ম করি কর্ম্মফল সঞ্চয় না করে,
এই কৌশলেই বিপ্র আকাশে বিহরে।
দেহ আছে প্রাণ আছে, কর্ম্ম করে তাই,
অহংকর্ত্তা-রূপী তার মন কিন্তু নাই!
দেখায় মনের মত, সেটি নহে মন,
চিদাকাশে করেছে সে মন-বিসর্জ্জন!
চিদাকাশে থাকে বিপ্র, কারে তুমি মার?
খড়্গাঘাতে আকাশকে কাটিতে কি পার?
সৃষ্টি-কর্ত্তা করেছেন সৃষ্টি সমুদায়,
সৃষ্টি করিয়াও কিন্তু লিপ্ত নহে তায়।
আকাশস্থ বিপ্র সেই ব্রহ্মার মতন,
সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত নাহি হন।
চিদাকাশে থাকি সত্য সঙ্কল্পের জোরে,
সতত নির্লিপ্ত বিপ্র যাহা ইচ্ছা করে!
বিবেক-বৈরাগ্য-ঘন মহাজ্ঞানে পূর্ণ,
সে বিপ্র মোদের গর্ব্ব করিয়াছে চূর্ণ!
রামভদ্র, ওই মুক্ত ব্রাহ্মণের প্রায়,
সংসারে নির্লিপ্ত জীব চির শান্তি পায়।
তিনে এক, একে তিন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,
সব চিদাকাশ জানি মুক্ত হয় জীব।
মহাসুখ চিদাকাশে মহাচৈতন্যের,
সর্ব্ব-শক্তি সর্ব্ব-প্রাপ্তি মহা প্রকাশের।
সে যে প্রাণ মহাপ্রাণ সর্ব্ব প্রাণ-সার,
সর্ব্ব প্রাণ এক করি সর্ব্ব-মূলাধার!

পূর্ণ শক্তি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ সুখে ভরা,
যে সুখের বিন্দু স্পর্শে সুখে ভাসে ধরা!
সতী-প্রেম, মাতৃস্নেহ যে সুখের বিন্দু,
চিদাকাশ-চৈতন্যই সে সুখের সিন্ধু!
সে চৈতন্যে গেলে কিছু ছাড়িতে না হয়,
চিদাকাশ-চৈতন্যই সর্ব্ব দেবময়!
স্বপ্রকাশ আত্মবোধ সর্ব্ব সুখ-সার,
চিদাকাশ অমৃতের স্থির পারাবার!
স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাদি সবে চৈতন্য নির্ম্মল,
আদি মধ্য অন্ত হীন অনন্ত কেবল,
যোগমায়া শক্তি যোগে শরীর বিহারী,
পদ্মহস্ত পদ্মচক্ষু পাদপদ্ম ধারী!
এই জ্ঞান দৃঢ় করি, ধ্যান যোগ সহ,
সংসারে থাকিলে সুখ পাবে অহরহঃ!
প্রাণীমাত্রে দুটি দেহ, সূক্ষ্ম আর স্থূল, (উৎ, ৩য় স)
চিন্ময় সে সূক্ষ্ম দেহ, চিদাকাশে মূল!
সঙ্কল্প-শরীরী ব্রহ্মা, পূর্ব্ব কর্ম্ম নাই,
চিদাকাশ রূপী তিনি চিরমুক্ত তাই!
তাঁহার সঙ্কল্প-সৃষ্টি সব চিদাকাশ,
কল্পনার গুণে মাত্র স্থূলতা প্রকাশ।
দেবগণ অনাসক্ত সঙ্কল্প-বিহারী,
সংসারে নির্লিপ্ত যথা নিষ্কাম-সংসারী।
এক চিদাকাশে সব সুর-নর-দেহ,
দেখা যায় সূক্ষ্মতম, স্থূলতম কেহ।

মনোময় সূক্ষ্মদেহ স্থূল দেখা যায়,
স্বপনে যুবতী দেহ যেমন দেখায় ।
সূক্ষ্মযোগে কর্ম্মফল ফলিছে কেমন ?
স্বপনে সুন্দরী দেহ সুখদ যেমন ।
স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ চিন্ময় আকাশ,
ভিন্ন নয়, চিন্ময় সে একের প্রকাশ ।
ব্রহ্মার মনন-সৃষ্টি সঙ্কল্পের সার,
মন ভিন্ন কিছু নাই; মনেই সংসার ।
পদ্মবীজে থাকে যথা কমলের লতা,
জগৎ সংসার থাকে মনোমধ্যে তথা ।
মনোমধ্যে হইতেছে জগৎ দর্শন,
অন্ধকারে ভূত দেখে বালক যেমন ।
মায়ার এ অভিনয়—"আমি ও আমার",
মিথ্যা কিন্তু মূলে তার আছে সত্যসার ।
অভিনয় আরম্ভেই আত্ম-বিস্মরণ,
অভিনয়-শেষে হয় আত্মার স্মরণ ।
ভাল মন্দ অভিনয়ে ফলাফল আছে,
শেষ করি ব'স গিয়ে মালিকের কাছে ;
সে মালিক রামভদ্র, সর্ব্বসুখ-সার,
সর্ব্বপ্রাপ্তি সর্ব্বজ্ঞান আত্মাই তোমার ।

তত্ত্বজ্ঞান ।

মন কি ? নিশ্চয় করি বুঝিবে সে কথা (উৎ, ৪ সর্গ)
নাম ভিন্ন মনের আকার আছে কোথা ?

অথচ সর্ব্বত্র মন আকাশের মত,
যাহা হতে এ সংসার উঠে ক্রমাগত।
আগে পাছে নাই মন বর্ত্তমানে থাকে,
পূর্ব্বাপর বিষয়ের টান মাত্র রাখে।
সঙ্কল্পই মন, মাত্র মায়ার আকর,
স্বপ্নে দেখা অট্টালিকা যেমন সুন্দর।
প্রতিবিম্ব হীন স্বচ্ছ দর্পণের মত,
বিষয় বিহীন মন বিমল সতত!
বাহিরে থাকুক বিশ্ব মরীচিকা-সার,
সে যে মিথ্যা, জানিলে তা দোষ নাই আর।
সকলি অখণ্ড আত্মা, দেখুক অন্তর,
জীবন্মুক্তি চিরশান্তি পাবে নিরন্তর।
রত্নাকরে রত্ন তোলে ডুবারি যেমন,
মুনি ঋষি তপস্বীরা তাদের মতন,
মনোরূপ ভাসা স্রোতে ভাসিয়া না যান,
বিবেক বৈরাগ্য-জ্ঞান-গভীরে লুকান।
অহং-বুদ্ধি ভেদজ্ঞানে সর্ব্ব জীব মত্ত,
সে ত মাত্র বাহিরের লোকাচারে সত্য।
পরমার্থে রঘুনাথ সব শিবময়,
অহং-বুদ্ধি ভেদ-জ্ঞান কোন দিন নয়।
দেখিয়া সকল দিক যাহা ইচ্ছা কর,
যেই খানে ধরে মন সেইখানে ধর।
জগতে যেনন আসে রবির কিরণ, (উৎ, ৫ সর্গ)
সেইরূপ চৈতন্যের রশ্মি দেবগণ।

সূর্য্যের নিকট তম কিরণ সমান
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের ব্রহ্মে অবস্থান,
তাহতে তেত্রিশ কোটী শক্তি সচেতন,
অধোগামী হন যেন সূর্য্যের কিরণ।
ব্রহ্মার কল্পনারূপী যোগমায়া যোগে
নিত্যই সাকার তাঁরা ব্যবহার-ভোগে।
নিরাকারে সাকারের রূপ দেখা যায়,
যে যেমন সে তেমন দেখিবারে পায়।
ব্যোমচিন্তা কারীদের ব্যোমরূপী যিনি,
বস্তুচিন্তা কারীদের বস্তুরূপী তিনি।
আকাশে আকাশ তিনি রূপে রূপবান্,
অরূপের রূপরাশি অখিলের প্রাণ।
বীরেন্দ্র, অনিত্য রসে ডুবে কেন থাক ?
যতদূর পার দৃষ্টি নিত্য রসে রাখ।
এই সে দেবাদিদেব সর্ব্বদেব ময়, (উৎ, ৬ স)
পরমাত্মাকেই ধর করিয়া নিশ্চয়।
দেহমধ্যে খুঁজিলেই পাওয়া যায় তাঁরে,
জ্বলিতেছে মধ্যমণি যেন কণ্ঠ হারে।
কঠোর তপস্যা যোগে কাম ক্রোধ জয়
চিত্ত শুদ্ধি হয় মাত্র, আর কিছু নয়।
শাস্ত্র পাঠে সাধু সঙ্গে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি,
মনোলয় হইলেই, ব্রহ্মলাভ সিদ্ধি।
স্বল্পে তুষ্ট থাকিয়াই বৈরাগ্যের সনে
ব্রহ্মে যুক্ত হতে যারা পারে মনে মনে,

তাহাদের হবে ভবে ব্রহ্ম দরশন,
পরমাত্মা জীবাত্মার যুগল মিলন।
সেই সে দেবাদিদেব জীব ঘটে ঘটে, (উৎ, ৭ সর্গ)
আছেন চৈতন্যরূপে অতি সন্নিকটে।
শুধু চিত্তরোধ করি থাকিলে বসিয়া,
দেখা নাহি দেন তিনি অমনি আসিয়া।
না গেলে সংসার ভ্রান্তি "আমি ও আমার"
কখনও ব্রহ্মদৃষ্টি হবে না তোমার।
"আমি তুমি" ব্রহ্ম নয়—আমি তুমি ভ্রান্তি,
"আমি তুমি" ঘুচিলেই ব্রহ্ম সুখশান্তি।
"আমি আমি" স্পষ্ট বোধ, "আমি" যাবে কোথা ?
রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম, সর্প যাবে যথা।
বলয় কঙ্কণ যথা কথাতেই আছে,
স্বর্ণ ভিন্ন নয় কিছু স্বর্ণকার কাছে,
"আমি তুমি" সেইরূপ লোক ব্যবহার,
অখণ্ড চৈতন্য মূলে সব একাকার।
ক্ষুদ্র আমিটুকু মাত্র হয় দুঃখ ময়,
যত "আমি" কাটে তত হয় সুখোদয়।
জীব কভু ব্রহ্ম নয়, জীব যেন ছায়া,
ব্রহ্মই ব্রহ্ম, তাঁহাতেই অহং-ভ্রান্তি মায়া।
চৈতন্যই মূল সত্য, তাঁহারি স্বভাব
লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি সব বিবর্ত্তন-ভাব।
মূল চৈতন্যেরে জানি ব্রহ্মদৃষ্টি ধর,
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত লীলা ভোগ কর।

ব্রহ্মদৃষ্টি হলে কিছু ছাড়িতে না হয়,
দেবলীলা জীবলীলা ব্রহ্ম ভাব ময়।
সংসারটি অভিনয়—বুঝিলেই লোক,
হাসি হাসি মুছে ফেলে পতি পুত্র শোক।
সাধু সঙ্গ ধরি হও শাস্ত্র পরায়ণ, (উৎ, ৮সর্গ)
দিনে দিনে কেটে যাবে মায়ার বন্ধন।
ব্রহ্মকথা নিত্য যারা পরস্পরে মিলি (উৎ, ১সর্গ)
সতত আলাপ্ করে মন প্রাণ খুলি,
তাহাদের জীবন্মুক্তি হয় সুনিশ্চয়,
নিত্য সুখে সুখী তারা নিত্য রসময়।
স্বর্ণ বলয়ের মধ্যে স্বর্ণ শুধু সত্য,
বলয় কঙ্কণ সব ক্ষণিক অনিত্য।
সেইরূপ ত্রিভুবন অলঙ্কার প্রায়,
গড়িছে ভাঙ্গিছে মহা চৈতন্যের গায়।
কাঠের খেলানা কাঠে আছে নিরন্তর, (উৎ, ১০ স)
কাটিয়া বাহির তারে করে সূত্র ধর;
সম্ভাবনা রূপে বিশ্ব ব্রহ্মে আছে স্থির,
ব্রহ্ম কাটি ব্রহ্মা করে ব্রহ্মাণ্ড বাহির।
যোগ-মায়া যোগে ব্রহ্ম সুন্দর সাকার,
তত্ত্বযোগে নিরাকার, অদ্বৈত আবার।
চিরশান্ত চৈতন্যের মহাসত্তা আছে,
চপলা-সুন্দরী সৃষ্টি তার বুকে নাচে!
তিনিই সে সদাশিব, নাহি তাঁর তুল,
বিম্বিত তেত্রিশ কোটী দেবতার মূল!

দেব লীলা নর লীলা সব ব্রহ্ম ময়,
আমূল জানিয়া ধর, নিষেধ ত নয়!
গাঢ় নিদ্রা মাঝে মাঝে স্বপ্ন যথা আসে, (১২ স)
নির্ব্বিকার ব্রহ্মপদে সৃষ্টি তথা ভাসে!
মহান্ চৈতন্য-জ্ঞান মহান্ প্রকাশ
অনন্ত সে পরমাত্মা যেমন আকাশ;
নির্ম্মল আকাশ হ'তে আরো স্বচ্ছতম,
তার আভা নিয়ে শোভা—সত্ত্ব রজঃ তমঃ।
অহং-ভাবে প্রথমই ব্রহ্মের যে আভা,
তিনিই বিরিঞ্চি, তাঁর সৃষ্টি মনোলোভা!
স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় স্থূলের দর্শন,
আদিতে সে অতি সূক্ষ্ম আকাশ যেমন।
অহং হ'তে বুদ্ধি হয়, বুদ্ধি হতে মন, (১৩ স)
এ জগৎ গুল্ম-রোগ জন্মায় তখন,
শুদ্ধ চৈতন্যই ওই মনোদৃষ্টি দিয়া,
জীবরূপে মুগ্ধ হন সৃষ্টি নিরখিয়া।
চৈতন্যই নিজ বলে করেন কল্পনা,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের যোজনা,
আগে যেন বোধ হয় ক্ষণিকের খেলা,
ব্রহ্মে দৃষ্টি প'লে তবে হয় নিত্যলীলা!
সূক্ষ্ম পঞ্চভূত নিয়া বিরিঞ্চির মন
করিছেন স্থূল বিশ্ব—কল্পনা সৃজন।
সূক্ষ্ম তত্ত্ব দেখাইয়া তিনিই আবার,
নাশিছেন জড়ত্বের প্রলাপ-বিকার।

বিবেক বৈরাগ্যে শেষে স্পষ্ট বোধ হয়,
চৈতন্যের ভান্ মাত্র সৃষ্টি স্থিতি লয় !
জগৎ বলিয়া কোন জড় বস্তু নাই,
ব্রহ্ম হতে ভিন্ন নয়, অনুৎপন্ন তাই !
জীবনেই নিজ মৃত্যু স্বপ্নে দেখে নরে,
একই পদার্থ যেন দুই ভাব ধরে !
সেইরূপ ব্রহ্মে হলে অহং-স্বপ্নোদয়,
এক ব্রহ্ম দুই হন, মূলে দুই নয় !
অহং-স্বপ্ন ছাড়িলেই মুক্তি তার নাম,
বুঝিলেই জীবন্মুক্তি নিত্য লীলা-ধাম !
ধর এই আত্মজ্ঞান ঔষধের সার,
মায়ার প্রলাপজ্বর ছাড়িবে তোমার !
আত্ম বিচারের বুদ্ধি সত্ত্বগুণে হয়,
সত্ত্বগুণ ক্রমে হয় ব্রহ্মভাব ময় !
রজঃ তমঃ দুই গুণে অহংবুদ্ধি বলে,
অহংফুল ঝরিলেই ব্রহ্মফল ফলে !
অভ্রভেদী গিরি ক্ষুদ্র দর্পণের মাঝে,
অহংরূপে মহৎব্রহ্ম চিত্তমাঝে সাজে !
সূক্ষ্মতম চিত্তরূপ প্রজাপতি যিনি,
ক্রীড়া ছলে মায়াবিশ্ব গড়িছেন তিনি !
ব্রহ্ম হতে অভিন্ন সে ব্রহ্মা-সৃষ্টিপতি,
অগ্নি-অঙ্গে তাপ যেন, মণি অঙ্গে জ্যোতিঃ !
অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্ম যেন খণ্ড হন, (উৎ ১৪ স)
নিজ ইচ্ছাশক্তিতেই স্বপ্নক্রীড়া লন ।

খণ্ড জীবে গুপ্ত থাকে সেই ইচ্ছাশক্তি,
ইচ্ছাশক্তিতেই বন্ধ, ইচ্ছাতেই মুক্তি।
অখণ্ড মনন ব্রহ্মা—তাঁর মত যাঁরা,
খণ্ড মন তাঁহাদের করতলে ধরা;
তাই যোগী ইচ্ছাবলে কার্য্য সিদ্ধি করে,
অখণ্ড মনের শক্তি যখন সে ধরে।
অখণ্ড মনই মূল, সর্ব্ব-মূলাধার,
তিনিই পরমেশ্বর, এ সৃষ্টি তাঁহার!
যাঁরে ভজ তাঁরে পাবে, অব্যর্থ সন্ধান,
সকামে কামনা সিদ্ধি, নিষ্কামে নির্ব্বাণ।
চিৎমধু মাখা বিশ্ব, তিক্ত নহে আর,
ব্রহ্ম-সুবর্ণেতে গড়া বিশ্ব-অলঙ্কার।
বৃক্ষপত্র হতে ভিন্ন নহে পত্র-রেখা,
সেরূপ চৈতন্য-অঙ্গে সৃষ্টিরেখা আঁকা!
জ্ঞানেতে অভেদ বুদ্ধি, তাই সুখোদয়,
না হ'লে অভেদ দৃষ্টি, সৃষ্টি দুঃখময়!
যতই অভেদ দেখে সর্ব্বভেদী দৃষ্টি,
ততই অমৃত ময় বোধ হয় সৃষ্টি!
অনাবদ্ধ আত্মা আমি, কভু বদ্ধ নই, (উৎ ৪০ স)
অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম অনুতেও রই,—
হেন অনুভব যার হয় বারংবার,
যথাইচ্ছা বিহারের শক্তি জন্মে তার।
চিত্তরূপী হয়ে সেই যথা-ইচ্ছা যায়,
যাহা ইচ্ছা তাহা করে, বদ্ধ নহে তায়।

সর্ব্বগামী শক্তি আছে চিৎ-চৈতন্যের,
বায়ু মধ্যে সূক্ষ্ম গতি চিন্ময় চিত্তের,
আত্মানন্দে পূর্ণ তাই নির্লিপ্ত নিষ্কাম,
চিত্ত রূপে গতি শীল, চৈতন্যে বিরাম।
"অগতির গতি" তাই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,
গতির বিরাম হ'লে ব্রহ্ম হয় জীব।
এই আমি ওই তুমি ঊর্দ্ধেতে আকাশ,
এই মর্ত্ত্য, ওই স্বর্গ ঈশ্বর নিবাস,—
এ প্রভেদ অজ্ঞানীর বচনেই আছে,
ব্রহ্মই সর্ব্বত্র সম জ্ঞানীদের কাছে।
মেঘেতে আকাশ যথা খণ্ড বোধ হয়,
আমি তুমি ভেদ তথা চৈতন্যে উদয়!
কুলবধূ খোঁজে শুধু ভাল অলঙ্কার, (৪২ স)
হার বালা কণ্ঠমালা দেখে চমৎকার!
কি দরের স্বর্ণ সেই দেখিতে না জানে,
পিত্তল গহনা কেহ গিল্টি করি আনে!
সেরূপ নির্ব্বোধ লোকে সাজায় সংসার,
সে যে গিল্টিসোণা নাহি ভাবে একবার!
সচ্ছতম সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের মাঝে, (৪৪ স)
যেখানে যেমন চিত্তে যে ভাব বিরাজে,
অন্তরে কল্পিত তাই বাহিরে দাঁড়ায়,
তাই জড়ময় স্থূল বিশ্ব দেখা যায়!
সেই রূপ দেখা যায় স্বপ্ন-বস্তু যত,
অন্তরে উদিত কিন্তু বাহিরের মত।

সত্য বা অসত্য বল যাহা ইচ্ছা হয়,
এ জগৎ চিদাকাশ ভিন্ন কিছু নয়।
বিশুদ্ধ চৈতন্য ময় আকাশের গায়,
নিষ্কাম সঙ্কল্প-প্রভা খেলিয়া বেড়ায়!
মগ্ন সে চৈতন্য-রসে রস আছে যত,
ময়ূরের ডিম্বরসে পেখমের মত!
খণ্ড মন এক হলে অখণ্ড মনন,
সে মনন যেই ভাবে হবে নিমগন,
সেই ভাবে ফুটিবেই অরূপের রূপ,
এবে বুঝি দেখ বৎস, এ বিশ্ব কিরূপ।
সঙ্কল্প-জগতে তাই দৃঢ়তা নিশ্চয়,
অগ্নিতে উষ্ণতা যথা অন্যথা না হয়।
চৈতন্যই মূর্ত্তি ধরি দেব-দেবী হন,
অখণ্ড চৈতন্যে শেষে এক করি লন।
বিবিধ মেঠাই-মূলে সর্করা যেমন,
পার্থিব সুখের মূলে কামিনী-কাঞ্চন;
মূলে সে মাটির রস যত দেখ ফুল,
যত সে চেতন রস, চৈতন্যই মূল;
কুসুম কেশর মূলে মুখ দিলে মধু,
আমিত্বের মূলে আত্মা রসে ভরা শুধু!
মোহ নিদ্রা পরিহরি রামভদ্র জাগ,
তোমার সর্ব্বস্ব আত্মা রসে ডগমগ!
লক্ষ লক্ষ দেবদেবী আত্মার কিরণ,
লক্ষ লক্ষ রবিকর অখণ্ড যেমন।

বক্ষপাটা রসে ফাটা দাড়িম্বের মত
নিত্য রসে ফাটে বৎস নিত্যজীব যত!
অখণ্ড চৈতন্যে গেলে ত্যজ্য কিছু নয়,
যে রসে যখন দৃষ্টি সে রস উদয়!
সর্ব্বধন-পূর্ণ চিত্তে ধীরতা যেমন,
সর্ব্ব রস পূর্ণ ব্রহ্মে স্থিরতা তেমন!
স্ফটিক নির্ম্মল থাকি প্রতিবিম্ব লয়,
নির্ম্মল চৈতন্যে তথা মনের উদয়,
রক্তজবা-ছায়া মাখা স্ফটিক যেমন,
চৈতন্য-আভাস মাখা চৈতন্যই মন।
মনটি ভাসন্ত স্রোত, ভাসন্ত অজ্ঞান,
তলেতে অভ্রান্ত রত্ন বিবেক-বিজ্ঞান!
জড়-মন গেলে সব চৈতন্যই হবে,
না থাকিলে ভ্রমদর্শী ভ্রম কোথা রবে?
চৈতন্য-ধারায় রাখ ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি,
উড়ে যাবে একফোঁটা অহংমাখা সৃষ্টি!
নুনের পুতুল গলে সিন্ধু-জলে যথা,
জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে অহং-বিন্দু গলে তথা!
যখন আতিবাহিক সূক্ষ্ম দেহ হয়, (৫৭ স)
সব সূক্ষ্ম হয়, স্থূল জড়ত্ব না রয়;
ক্রমে ক্রমে স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নবস্তু মত,
সূক্ষ্ম জ্ঞানে লয় পায় জড় বস্তু যত।
আদৌ বাসনা যার মনে নাহি হয়,
ব্রহ্মার উপরে গিয়া হয় ব্রহ্মময়। (৫৮ স)

মহা বায়ু বশে যথা বায়ু-লেখা চলে,
চেতন চলিছে মহা চৈতন্যের বলে।
মহাবায়ু বায়ু-লেখা অভিন্ন নিশ্চয়,
চেতনে মহাচৈতন্যে ভিন্ন কভু নয়!
শাখা পত্র ছাড়িলে কি বৃক্ষ হয় কভু?
সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব লীলা নিয়া এক বিভু।
সুস্থির চৈতন্য-অঙ্গে লীলা শক্তি ধায়,
ছুটে যেন ভাগীরথী হিমগিরি-গায়!
চিদঙ্গে সুন্দরী মায়া ছুটিছে সাদরে,
যেমন ভাসন্ত স্রোত প্রশান্ত সাগরে।
বিশুদ্ধ চৈতন্যে নাচে ভ্রান্তিময়ী সৃষ্টি,
শূন্য আকাশেতে নীল চন্দ্রাতপ-দৃষ্টি!
ব্রহ্ম বক্ষে যেন ব্রহ্ম-বালকের মেলা,
চোখ বাঁধি করে যেন কাণাকাণা খেলা!
বিশুদ্ধ চৈতন্য অঙ্গে যোগ-মায়া হেন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নিয়া লীলা করে যেন!
চৈতন্যে উঠিছে মহামায়ার বিভ্রমে,
দেব-লীলা নর-লীলা অবলীলা ক্রমে!
অখণ্ড চৈতন্যে জানি অশেষ বিশেষ,
আগে কর মায়ামোহ বিভ্রম নিঃশেষ,
তার পরে দেখ মহা চৈতন্যের বুকে,
মহামায়া খেলিছেন মোহ শূন্য সুখে!
চৈতন্যের অঙ্গে খেলে প্রকৃতি সুন্দর,
এক ব্রহ্ম দুই হয়ে লীলা নিরন্তর!

বেদান্তের মর্ম্ম এক ব্রহ্ম নিরূপণ,
তা ছাড়িলে লীলা খেলা নিশার স্বপন।
এক ব্রহ্মে দৃষ্টি রাখি শেষে লীলা যোগ,
বেদান্তে নিষেধ নাই নিত্য লীলা ভোগ!

স্থিতি প্রকরণ।

হয় যায় যাহা, তাহা মূল সত্য নয়,
জল-বুদ্‌বুদের মত ছায়ার উদয়। (স্থিতি ৬১সর্গ)
তার মধ্যে থাকি কর ব্রহ্ম দরশন,
সৃষ্টি লীলা সব সেই ব্রহ্মের স্ফুরণ!
অখণ্ড নিয়তি জীবে আপনিই ফুটে,
অমনি জীবের চেষ্টা সেই দিকে ছুটে! (৬২সর্গ)
ব্রহ্মচর্য্য ধৈর্য্য বীর্য্য বৈরাগ্যের বলে,
মুক্তি পথে উঠ বৎস নিয়তির ফলে।
যা করিবে তুমি, তাই নিয়তি তোমার,
তরিবে পৌরুষ-বলে মৃত্যু-পারাবার!
করেছেন সত্বশালী জীবন্মুক্ত গণ
আপন পৌরুষ বলে যে পথে গমন,
সেই পথে রামভদ্র হও অগ্রসর,
অখণ্ড চৈতন্যে রাখি দৃষ্টি নিরন্তর।

উপশম প্রকরণ।

কহিলা বশিষ্ঠদেব, শুন শুন রঘুবর, (উপশম ৫সর্গ)
রজঃ আর তমোগুণে ধৃত এ সংসার,
তোমা সম সাধুগণ লইয়া সাত্বিক মন,
সংসার সাগরে হন অনায়াসে পার।

রাজর্ষি সাত্বিক যাঁরা সহজেই ভাবে তারা
কোথা হতে আসিতেছে এ সংসার-রঙ্গ ?
গুরু সেবি আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি করে প্রাণে—
চৈতন্য-সাগরে উঠে সংসার-তরঙ্গ !
চতুরা সখীর ন্যায় মনেতে বিচার-বুদ্ধি
উদয় না হ'লে কভু শান্তি নাহি হয়,
কেবল কুসংস্কারে শঙ্কা হয় বন্ধু হেরে,
নিজ মন দর্শনেই উপজয় ভয় !
অবোধের দুঃখ দূর কিছুতে হবার নয়,
তারা যে বিষয়াসক্ত পশুর মতন,
হয়ে আত্মজ্ঞান হারা পাগলের মত তারা
ধন দারা অন্ধকূপে হতেছে মগন !
অজ্ঞান-কুসংস্কার, চিত্ত-মন নাম তার,
পঞ্চ ভূত ময় মনে শত ভূত ভাসে,
চিত্ত গেলে সত্ব হয়, সেই তত্ব জ্ঞান ময়,
অহং-বুদ্ধি ক্ষীণ হ'লে পরা বুদ্ধি আসে।
সবেতেই ব্রহ্ম-বুদ্ধি রাখিলেই চিত্ত শুদ্ধি, (উপশম ১৭সর্গ)
অদ্বৈত জ্ঞানটি তাই অন্তরেতে রাখ,
দেহ আছে যতক্ষণ বাহ্যভাব ততক্ষণ,—
দ্বৈতাদ্বৈত ভাব ধরি দেহ-ধর্ম্মে থাক।

বিষ্ণুভক্তি।

রঘুবীর, ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ সুমতি (উপশম ৪৩সর্গ)
হরি-সাধনায় সিদ্ধি লভিলা যেমতি;

সেও সে পৌরুষ বলে জানিবে নিশ্চয়,
আত্মা নারায়ণ হরি ভিন্ন কভু নয়।
কুসুমে সৌরভে আর তিলে তৈলে যথা,
আত্মা আর নারায়ণে সম্বন্ধও তথা!
যিনি আত্মা তিনি বিষ্ণু তিনি জনার্দ্দন,
বৃক্ষ তরু বিটপী ও পাদপ যেমন।
এক আত্মা, মহা শক্তি দিয়া আপনার,
আপন-প্রহ্লাদ-আত্মা করেন উদ্ধার!
বিচারে পুরুষকারে একাগ্রতা বশে,
প্রহ্লাদ লভিলা ভক্তি, জ্ঞান মুক্তি শেষে।
হরি হর কৃষ্ণ বিষ্ণু ঈশ্বর মহান্,
মূর্খে না করেন কেহ জ্ঞান মুক্তি দান।
আত্মা দিয়া রঘুবর আত্ম পূজা কর,
আত্মা দিয়া আত্মাতেই স্থিতি পদ ধর।
বিরাজ করেন বিষ্ণু নিখিল অন্তরে,
অন্তরস্থ বিষ্ণু ছাড়ি ঘোরে যে বাহিরে,
কেমনে হইবে বল বিষ্ণু সেবা তার?
শুধু বাহ্যভাবে পূজা—অজ্ঞান আঁধার!
হৃদয়ে চৈতন্য যাহা, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব,
আত্মার শরীর সেই সনাতন তত্ত্ব!
শঙ্খ চক্র গদা ধারী গৌণ মূর্ত্তি তাঁর,
মুখ্য ছাড়ি গৌণ ধরা নহে তত্ত্ব-সার।
শঙ্খ চক্র গদা ধারী পূজা করি ধ্যানে,
ক্রমে লোক বহু জন্মে মুক্তি তত্ত্ব জানে।

কঠোর তপস্যা করি যেই লাভ যার,
ধরেছে অভ্যাস-বৃক্ষে সেই ফল তার।
চিত্ত নাশি মুক্তি রূপ স্থিরতা ধারণ,
কিছুতে না হয় বিনা প্রযত্ন আপন।
মোহ নাশি অবিনাশী চৈতন্য উদয়, (উপশম ৪৪সর্গ)
চিত্ত জয় বিনা আর কিছুতেই নয়!
কহি এক উপাখ্যান ইহার প্রমাণ,
অবহিত চিত্তে বৎস, কর অবধান!

কীর-রাজ কটঞ্জ চণ্ডাল।

বেদবিৎ বিপ্র এক বৈরাগ্য অপার,
বসতি কোশল দেশে, গাধি নাম তাঁর।
হরি আরাধিতে তিনি বন বাস করি,
নিমগ্ন আকণ্ঠ জলে অষ্ট মাস ধরি;
বর দান তরে হরি আইলেন যবে,
কর জোড়ে দ্বিজোত্তম কহিলেন তবে,—
মধু লোভে পদ্মে মগ্ন মধুপ যেমন,
সে রূপ জীবের হৃদে নিমগ্ন যে জন,
ত্রিলোক স্বরূপা এক ফুল-কুলেশ্বরী,
যেই বিষ্ণু-সরোবরে ফুটে আহা মরি,
পরাৎপর সারাৎ সার সর্ব্ব মূলাধার,
সেই বিষ্ণু পাদ পদ্মে করি নমস্কার।
হে দেবেশ দেখিবারে মানস আমার,
কি মায়া রচিলে বিভো, আভাসে আত্মার?

তথাস্তু বলিয়া বিষ্ণু হন অন্তর্ধান,—
এক দিন জলে গাধি করিছেন স্নান;
মন্ত্র পড়ি স্নান করে, মন্ত্র ভুলি গিয়া,
দেখিছেন যেন গাধি আছেন মরিয়া;
গৃহেতেই দারা পুত্র বসি চারি ধারে,
আছাড়ি বিছাড়ি সবে কাঁদে হাহাকারে;
সবে ধরি কাঁধে করি শ্মশানেতে যায়,
ভস্মীভূত করে তাঁরে জ্বলন্ত চিতায়।
দেখিছেন গাধি যেন মৃত আত্মা তাঁর
চণ্ডালীর গর্ব্ভে এক হতেছে সঞ্চার।
ভূত-মণ্ডল-প্রদেশে চণ্ডালিনী বাস,
পুত্র প্রসবিল, গর্ব্ভ ধরি দশ মাস!
দেখে দ্বিজ—খেলিছেন যেন তিনি গিয়া,
চণ্ডালের শিশুরূপে কুৎসিত হইয়া।
বড় হ'য়ে মৃগ মারে কুক্কুরের সনে,
কটঞ্জ চণ্ডাল নাম ফেরে বনে বনে।
চণ্ডালী যুবতী এক ভীষণ-দশনা
কৃষ্ণাঙ্গী বিজলী-দৃষ্টি মাংসাশী রসনা,
বিবাহ করিয়া সুখে, প্রমত্ত যৌবন,
ফেরে দোঁহে গিরি গুহা গহন কানন।
বহু দিন দুই জন করিল বিহার,
ক্রমেই যৌবন গত বর্দ্ধিত সংসার।
বহু সন্তানাদি নিয়া থাকে স্থানান্তরে,
মারা গেল দারা পুত্র কিছু দিনান্তরে।

দুঃখে তার বক্ষঃ ফাটে, হইয়া বাহির
নানা দেশে ভ্রমে, সার করি আঁখি নীর,
ক্রমে কীর-দেশে গিয়া উপনীত হয়,
দেখে এক রাজ পুরী বহু সুখ ময়।
রাজার মঙ্গল-হস্তী সেই স্থানে ফেরে,
সহসা চণ্ডালে আসি শুণ্ড দিয়া ধরে।
মৃত ভূপালের ছিল শূন্য সিংহাসন,
তাহাতে করিল হস্তী কটঞ্জে স্থাপন।
পুরবাসী প্রজা বৃন্দে আনন্দ না ধরে,
অভিষেক করি সবে জয় জয় করে।
সকুঙ্কুম কটঞ্জের চরণ অধীর
কর-পদ্মে বিমর্দ্দিত কীর-কামিনীর !
চারি দিকে দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডাজ্ঞা পালন,
রাজ শক্তি বলে ক্রমে কাঁপিল ভুবন !
গবল ভূপতি নামে কটঞ্জ বিখ্যাত,
অষ্ট বর্ষ করিলেন রাজ্য মনোমত। (উপশম ৪৬ সর্গ)
হঠাৎ একদা রাজা উঠি ধীরে ধীরে,
সাজ সজ্জা বিনা একা আইলা বাহিরে।
সেখানে চণ্ডাল গণ করিতেছে গান,
কটঞ্জেরে হেরি হয় উৎকণ্ঠিত প্রাণ !
কহে তারা ওরে কটূ হেথা তোরে দেখি !
এই রাজা তোরে কিছু কর্ম্ম দিয়াছে কি ?
চণ্ডালে চণ্ডালে কথা-বার্ত্তা শুনি তবে,
রাজা যে চণ্ডাল জাতি জানি নিল সবে।

রাজ পরিবার আর পুরবাসী যত
ব্রাহ্মণ অমাত্য ভৃত্য সবে মর্ম্মাহত !
সবে মিলি ঘৃণা করে গবল ভূপালে,
প্রায়শ্চিত্ত করে সবে প্রবেশি অনলে !
মনঃক্লেশে শেষে রাজা জানিয়া বিশেষ,
প্রায়শ্চিত্ত লাগি করে অনলে প্রবেশ !
গবল ভূপাল দেহ অগ্নিসাৎ হয়,
স্নান জলে গাত্র জ্বালা গাধির উদয় !
ক্রমে সুস্থ হয়ে গাধি উঠিলেন তীরে,
কি দেখিলা স্বপ্নে যেন—ভাবিছেন ফিরে !
এ কি হেরিলাম আমি ? ইহা কি স্বপন ?
কিংবা হেন ভ্রমে জীব নিত্য নিমগন ?
সত্য কিংবা মিথ্যা এই ভাবিয়া না পাই,
কখনও সত্য নহে !—কারে বা সুধাই ?
হেন কালে তথা এক অতিথি ব্রাহ্মণ
গাধির আশ্রমে আসি উপস্থিত হন !
সমাদরে গাধি তাঁরে সুখসেবা করে,
পল্লব আসনে কথা কহে পরস্পরে।
অতিথি করিয়া নানা কথা উত্থাপন,
অবশেষে কহিলেন,—শুন ভগবন্,
বহু ভ্রমণের পরে আইলাম ফিরি
সুদূর উত্তরে এক কীরদেশ হেরি !
কিছু দিন থাকি সেথা শুনিলাম কথা,
আছিল চণ্ডাল রাজা অষ্ট বর্ষ তথা !

সেই পাপে সবে করে অনলে প্রবেশ,
সে অনলে পড়ি রাজা করে আয়ুঃশেষ!
অতিথির মুখে শুনি বৃত্তান্ত সকল,
ব্যস্তমন গাধি হন বিস্ময়ে বিহ্বল!

মায়া-বিজ্ঞান।

মনে মনে দ্বিজোত্তম ভাবিলেন সার,
সে ভূত-মণ্ডল গ্রাম সে সব চণ্ডাল ধাম
সত্য কিনা দেখি গিয়া আর এক বার।
জিজ্ঞাসি জিজ্ঞাসি গিয়া ঘুরি ফিরি শেষে,
উপনীত গাধি সেই চণ্ডালের দেশে।
সুধাইয়া সুধাইয়া চণ্ডাল পাড়ায়,
দেখিলেন নিজ স্থান, সবি আছে বিদ্যমান,
সকলি পড়িল মনে, যাইয়া তথায়।
জিজ্ঞাসিলে সকলেই কহে সমস্বরে,
হাঁ হাঁ সে কটঞ্জ বটে ছিল ওই ঘরে।
কটঞ্জ ভীষণকায় থাকিত হেথায়,
সে ত গিয়া কীর-দেশে, রাজা হয় অবশেষে,
অষ্ট বর্ষ কাল রাজ্য করিল তথায়!
সে দেশ ছাড়িয়া গাধি জিজ্ঞাসিয়া যান
কীর-নগরের সেই নৃপতির স্থান।
জিজ্ঞাসিয়া শুনিলেন বৃত্তান্ত সকল,
অষ্ট বর্ষ রাজ্য করে, অগ্নি প্রবেশিয়া মরে,
পাপিষ্ঠ চণ্ডাল জাতি ভূপাল গবল!

শুনিতে শুনিতে সব ধীরে ধীরে ধীরে
গাধির স্মরণ হল কীর-কামিনীরে।
মনে মনে কহে বিপ্র— আশ্চর্য্য সকল,
এই কি সে মম ভ্রান্তি, তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি
এই সেই মম কীর-যুবতী সকল!
সুবাসিত তৈলে অঙ্গ করিত মর্দ্দন,
উত্তাপে চন্দন পাখা করিত ব্যজন!
এই সে মঙ্গল-হস্তী সম্মুখে আমার,
এই সেই রাজধানী, হইতেছে তূর্য্য ধ্বনি,
আমার সে ভৃত্য গণ চিনেছি এবার।
সকলি যে মিথ্যা কিসে বিশ্বাস বা করি?
দেখালেন মায়া কিংবা চক্রধারী হরি?
ভাবিয়া চিন্তিয়া গাধি আরম্ভিলা তবে
কঠোর তপস্যা ফিরে, জিজ্ঞাসিতে শ্রীহরিরে,
গাধি ও কটঞ্জ মাঝে সত্য কেবা ভবে?
প্রসন্ন হইয়া আসি দিলা দরশন
নীরদ-নির্ম্মল-ছবি দেব-নারায়ণ।
বলিলেন কেন বিপ্র ডাকিছ আমায়?
দ্বিজ কহে জনার্দ্দন, স্বপ্নে যাহা দরশন,
পুনঃ কেন দেখি তাহা প্রত্যক্ষ ধরায়?
বিষ্ণু কন, শুন দ্বিজ, বীজে বৃক্ষ যথা,
জন্মিতেছে এ জগৎ চিত্ত মাঝে তথা!
এই যত বস্তু দেখ অনন্ত সৃষ্টির,
দেখা আর চিন্তা করা, কালের হিসাব ধরা,

কেবল চিত্তের কার্য্য, জান এই স্থির।
চিত্তের বাসনা-বলে ক্ষিতিতলে আসা,
চিত্তই তোমায় দিল চণ্ডালের দশা!
অতিথি বলিল যাহা নিকটে তোমার,
সেও হল চিত্তরোগে বাসনার যোগাযোগে,
সৃষ্টি গড়ে চিত্ত, তার অতিথি কি ছার?
বাসনার বশে চিত্ত আবেশে মোহের,
গড়েছে সুন্দরী নারী কীর-নগরের।
আশ্চর্য্য হইবে তুমি, আশ্চর্য্য কি তায়? (উপশম ৪১ সর্গ)
তাল বৃক্ষে কাক বসে, তাতে পক্ক তাল খসে,
সবিস্ময়ে তাল প্রার্থী লাভ করে তায়!
"কাকতালীয়ের" ন্যায় যোজনা মোহের,
এক কালে চণ্ডালত্ব হল অনেকের।
চিত্তে দাগ লাগে যেন পাষাণেরে কাটে,
বারেক যে ছায়া পড়ে, শত জন্ম নাহি নড়ে,
ঠিক এক রূপ ভ্রান্তি বহু জনে ঘটে!
আকাশ পাতাল ঘোরে দেখিছে সুন্দর,
এক যোগে শত শত সুরামত্ত নর!
ঠিক এক রূপ স্বপ্ন বহু জনে হেরে,
বহু বালকের পাশে এক রূপ ভূত আসে,
ঠিক এক রূপ ক্ষেত্রে বহু মৃগ চরে।
ত্রিকাল কল্পনা মাত্র, সেও চিত্ত মলা,
হেমন্তে যে শস্য সেও ভ্রান্তিতে শৃঙ্খলা।
সেই ব্রহ্ম চৈতন্যের আভাস সকল,

সত্যের আভাস আছে, তাতেই জীবের কাছে
বোধ হয় যেন সত্য শৃঙ্খলা কেবল।
নিত্য বিবর্ত্তন তার, সকলি বিকার,
সৎ হ'তে সমুৎপন্ন—এই মাত্র সার!
আদি সৎ যিনি তাঁর বাসনা ত নাই,
আদিতে অমূর্ত্ত সার, শেষেই বিকার তাঁর,
বিবর্ত্তনে বহু মূর্ত্তি দেখিতে যে পাই।
আত্মার বিস্মৃতি এই সৃষ্টির কারণ,
কেন যে বিস্মৃতি হয়, নাহি নিরূপণ!
আত্ম বিস্মৃতিতে হয় ব্রহ্মের বিকার,
অখণ্ড চৈতন্য যাহা নিষ্কম্প আকাশ তাহা,
ক্রমে নিম্নাকাশে হয় স্পন্দন সঞ্চার।
নির্গুণ-আকাশ-নিম্নে সত্ত্বের আকাশ,
স্পন্দনে আশ্চর্য্য সৃষ্টি হতেছে প্রকাশ!
যখন আকাশ পটে অস্তে যান রবি,
মেঘে মেঘে সংযোজন গড়ে কত গিরি বন
হয় হস্তী নদ নদী মানুষের ছবি!
আকাশের গায় মেঘ, যেন যায় দেখা,
রবিকরে গড়িতেছে স্বর্ণ অট্টালিকা!
সেই রূপ ভাব সব জীবচিত্ত ময়,
আকাশে মেঘের মত, ছবি গড়ে কত শত,
মিথ্যা কল্পনাই ক্রমে সত্য করি লয়!
ঘনীভূত মনোবৃত্তি হইয়া সাকার,
শূন্য চৈতন্যেতে করে আকৃতি সঞ্চার!

শত শত অপ্সরারা হিমাচল জলে,
স্নান করে করি রঙ্গ, উলঙ্গ স্ফটিক-অঙ্গ,
পরস্পর-প্রতিবিম্ব পরস্পরে খেলে,
গাত্র-নেত্র-ভঙ্গিমা সে পরস্পরে হেরি,
প্রতিবিম্ব রঙ্গ করে শত মূর্ত্তি ধরি!
সেইরূপ মনে শত প্রতিবিম্ব আসে,
বাসনা কল্পনা কত, ক্রমে হয় ঘনীভূত,
ক্রমে হয় রূপবান্ মূর্ত্তিমান্ শেষে!
প্রতিবিম্ব মনোবৃত্তি ধরিয়া আকার,
সম্মুখে দাঁড়ায় যেন সত্য এ সংসার।
স্নানজলে দ্বিজোত্তম দেখিলে ত মায়া?
চিত্তে তব সেই মত হইল প্রতিবিম্বিত,
আকৃতি প্রকৃতি সহ চণ্ডালের কায়া!
আমা হতে নির্গত এ আভাস আমার,
ইহাই আমার মায়া চিত্তের বিকার!
নিশার স্বপনে চিত্ত কত ভোগ করে,
জাগিয়াও সেই মত সুখ দুঃখ ভোগে কত!
অখণ্ড চৈতন্য মাত্র সুখ দুঃখ হরে।
অখণ্ড চৈতন্য শুদ্ধ সার মাত্র জানি,
সমস্ত অভেদ এক, দেখে তত্ত্বজ্ঞানী।
সুখদুঃখে কভু তাঁর না হয় পতন,
পড়িলেও নাহি ব্যথা, পদ্ম-পত্র জল যথা,
কখনও কিছুতেই লিপ্ত নাহি হন।
কিন্তু সে তোমার চিত্তে সহসা যা আসে,

মুহূর্ত্তে সম্মুখে তব মূর্ত্তি ধরি বসে।
দেখেছ কি মধ্যনাভি কুম্ভকার-চাকে ?
যতই ঘূর্ণিত কর, নাভি যদি চাপি ধর,
দৃঢ় ধারণেই স্থির করা যায় তাকে ;
মায়াচক্র-নাভি ওই চিত্তই তোমার,
দৃঢ় করি ধর যদি ঘুরিবে না আর!
দৃঢ় ধারণেই তব চিত্ত রোধ হবে,
ক্রমে শান্তি স্থিরতাতে, শুদ্ধ জ্ঞান-চেতনাতে,
অটল অচল সম অবস্থিত রবে!
তখনি ভাঙ্গিয়া যাবে ক্ষণিক স্বপন,
হইবে চৈতন্য জ্ঞানে চির জাগরণ।
গিরিকুঞ্জে তপস্থায় দশ বর্ষ থাক,
দ্বিজোত্তম তুমি তবে সকলি জানিতে পাবে,
মায়াচক্রে চিত্ত নাভি দৃঢ় ধরি রাখ।
বুঝিবে এমন বিশ্ব কেমন স্বপন,
অখণ্ড চৈতন্য শুধু জাগ্রত কেমন!
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হরি,
গিরি-কুঞ্জে গাধি বসি ধ্যানে মগ্ন দিবা-নিশি,
স্থিরতা অভ্যাস করে দশ বর্ষ ধরি।
জীবন্মুক্ত হন শেষে অন্তর নির্ম্মল,
জাগ্রত পরমানন্দ চৈতন্য কেবল!

শ্রীরাম কহিলেন,—

মহর্ষে সৃষ্টি ত কিছু নয়, (নির্ব্বাণ, পূর্ব্ব ১ সর্গ)
হরি হর সত্য কিসে হয় ?

নিত্য সত্য মূর্ত্তি যাঁরা, সকলে কি মিথ্যা তাঁরা ?
দূর কর এ মোর সংশয় !

হরি-হরাদি মূর্ত্তি।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন—

বৎস আমি কহিব তোমারে,
সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্থূলের ভিতরে !
মহাজন-গণ কথা সূক্ষ্ম সূত্রে স্থূল গাঁথা,
সূক্ষ্মে সাধু, স্থূলটি ইতরে।
সমুদ্রের তরঙ্গের মত
ব্রহ্মের তরঙ্গ অবিরত !
এক মাত্র অধিকার কেবল চৈতন্য সার
নির্ব্বিকারে বিকার উদিত।
আপনা আপনি তাহা হয়,
কেহই কারণ তার নয় !
শুদ্ধ চৈতন্যের পটে বিষম বিকাশ উঠে,
আদি রস—সত্ত্বের উদয়।
পরব্রহ্মে উঠিছে বিকার,—
অবস্থা বিশেষ মাত্র তাঁর ;
শুদ্ধ নির্ব্বিকার হ'লে অখণ্ড চৈতন্য বলে,
বিকারেই মায়ার সঞ্চার !
পুনঃ তিনি ঈশ্বর হইয়া
খেলিছেন সঙ্কল্প লইয়া,—
সত্ত্ব রজঃ তমঃ আর বিকার বিখ্যাত তাঁর
অবিদ্যা বা প্রকৃতি বলিয়া !

সে অবিদ্যা-প্রকৃতির মাঝে,
মুনি ঋষি দেবতার সাজে
রয়েছেন সিদ্ধ যত শুদ্ধ চৈতন্যেরি মত,
প্রকৃতির সাত্ত্বিক সমাজে।
অবিদ্যার ঊর্দ্ধতম ভাগে,
সকল গুণের র্ব আগে,
হরি-হর-অভিনয় সবি চিদানন্দ ময়,
সুধাময় শুদ্ধ সত্ত্ব জাগে।
হরি হর শুদ্ধ-সত্ত্ব-সার,
ব্রহ্ম সম প্রায় নির্ব্বিকার!
সে পদ পূজেন যাঁরা, প্রায় মুক্ত হন তাঁরা,
পুনর্জন্ম নাহি হয় আর!
গুণময়ী সৃষ্টি যত দিন,
হরি হর আদি তত দিন,
গুণাতীত যাঁরা হন, ব্রহ্মেই মিশায়ে রন,
জ্ঞানরূপে মূরতি বিহীন।
হরি-হর আদি যত দেবগণে ভাবিতেছ
ব্রহ্ম হতে পৃথক্ সকল!
ভিন্ন ভিন্ন ভেদ ভাবি, ভুলেছ অভেদ জ্ঞান,
কুস্বভাব অভ্যাসে কেবল।
জল ও তরঙ্গ কভু ভিন্ন বস্তু নয়,
ইহাই বুঝিয়া কর ভেদ বুদ্ধি জয়!
হরি হর ব্রহ্মে তবে পৃথক্ বোধ না রবে,
দৃষ্টি গুণে ব্রহ্ম তাঁরা হন,

দৃষ্টি দোষে জীব তাঁকে অবিদ্যার মধ্যে দেখে,
ঠিক ব্রহ্ম দেখে জ্ঞানিগণ!
সৎবস্তু চিৎ ব্রহ্ম, অখণ্ড অব্যয়,
যে না বুঝে সেই বলে বহ্ম বস্তু নয়!
শূন্য বা আকাশ বলি, যাঁহার নির্দ্দেশ হয়,
অসৎ অবস্তু তিনি নহে,
সৎ বস্তু তিনি সত্য অচিন্ত্য অব্যক্ত নিত্য,
অনির্ব্বচনীয় তাঁরে কহে।
অসৎ বুদ্ধ নির্ব্বাণ—অবস্তু সে হয়,
আমাদের ব্রহ্ম সৎ-চিদানন্দ ময়!
বীজের মাঝারে কেহ তরু না দেখিতে পায়,
বীজ কিন্তু তরু-শক্তি রাখে,
বীজের মাঝারে তরু আভাসে রয়েছে যথা,
বিশ্ব তথা ব্রহ্মবীজে থাকে!
অখণ্ড চৈতন্য শুধু বিশুদ্ধ আকাশ,
মহাশক্তি মহামায়া তাহ'তে প্রকাশ!
সূর্য্যকান্ত মণি মাঝে অগ্নি গুপ্ত থাকে যথা,
দুগ্ধ মাঝে গুপ্ত যথা ননী,
অখণ্ড চৈতন্য মাঝে রামভদ্র, আছে তথা
মহাশক্তি সৃষ্টি-প্রসবিনী!
তাই সে সম্বন্ধ নিত্য, সৃষ্টি নিত্য নয়,
শক্তি নিত্য, সৃষ্টিতেই ঘটিছে প্রলয়।
স্ফুলিঙ্গ অনল হ'তে, সূর্য্য হ'তে রশ্মি যথা,
ব্রহ্মাকাশ হ'তে বিশ্ব আসে,

সংসারের সুখ সূর্য্য— নিশার স্বপন খেলা
উঠিছে ডুবিছে ব্রহ্মাকাশে !
নিয়া মাত্র সে অখণ্ড চৈতন্য আভাস,
সংসারে চেতন ভাব হতেছে প্রকাশ !
বুঝ বৎস কেবা ব্রহ্ম, কেবা মহাশক্তি তাঁর—
মহামায়া জগৎ-জননী !
কিবা বিশ্ব, বিশ্ববীজ, হরি-হর আদি কেবা—
ধ্যান কর দিবস রজনী !
মৃত্যুঞ্জয় হও বৎস, এই জ্ঞান ধরি,
অভ্যাস ও আলোচনা পুনঃ পুনঃ করি।

চূড়ালা-চরিতামৃত।

বশিষ্ঠ দেব বলিলেন—

লীলাদ্বয় আর সূচী রাক্ষসী বিকট, (নির্ব্বাণ, পূর্ব্ব ৭৭ স)
শুক্র ভার্গবের কথা দ্যাম ব্যালকট,
হেন বহু উপাখ্যান বলিয়াছি আমি,
চূড়ালার মহামুক্তি শুন এবে তুমি।
রঘুবীর চিত্ত স্থির করিয়া কেবল,
শিখিধ্বজ সম থাক আত্মায় অটল।

শ্রীরাম বলিলেন—

শিখিধ্বজ কেবা দেব কহ বিবরিয়া,
এ সংসারে পাইলেন মুক্তি কি করিয়া ?

বশিষ্ঠ দেব বলিলেন—

রঘুকুল চূড়ামণি জিজ্ঞাসিলে তুমি,
সে অপূর্ব্ব উপাখ্যান কহি শুন আমি।

কিসে হয় মোক্ষ লাভ এই অবনীতে,
চূড়ালা চরিতে তুমি পারিবে জানিতে।
বহু দ্বাপরের এক দ্বাপরের শেষে,
উজ্জয়িনী নগরেতে বিন্ধ্যাচল দেশে,
শিখিধ্বজ নামে রাজা ছিলেন প্রবল,
রূপে গুণে নিরূপম সুদীর্ঘ সবল;
সৌভাগ্য সূচক কান্তি ধার্ম্মিক প্রধান,
সাধু সঙ্গে শাস্ত্র পাঠে জীবন কাটান।
শৈশব কালেই তিনি হন পিতৃহীন,
ষোড়শ বর্ষেই হন সম্রাট নবীন।
কিছু দিনে উপস্থিত সম্পূর্ণ যৌবন,
সহজে চঞ্চল চিত ব্যাকুলিত মন!
হইয়াছে বসন্তের কুসুম বিকাশ,
শশিকরে উদ্ভাসিত নিখিল আকাশ!
নাচাইয়া কাননের লতায় পাতায়,
মৃদু মন্দ সমীরণ আনন্দে মাতায়।
চূড়ালার রূপ গুণ করিয়া শ্রবণ,
আনন্দে উঠিল নাচি রাজেন্দ্রের মন।
চিন্তে রাজা, সেই নারী কবে পাব বলি,
হেরিব সে বক্ষঃ শোভা হেম পদ্মকলি!
বনে উপবনে কভু লতাকুঞ্জে গিয়া,
রাজকার্য্য ছাড়ি রাজা থাকেন বসিয়া।
রাজার মানস বুঝি মন্ত্রিগণ তবে,
সুরাষ্ট্র ভূপাল পাশে জানাইল সবে—

চূড়ালা যৌবন যুতা দুহিতা রতন
শিখিধ্বজ রাজে তিনি করুন অর্পণ।
উজ্জয়িনী-পতি শেষে লভিলেন আসি,
লক্ষ্মীসমা নিরুপমা চূড়ালা মহিষী।
রাজকন্যা-রাজরাণী চূড়ালারে লয়ে
আনন্দ লভিলা রাজা চিত্ত বিনিময়ে।
পরমা সুন্দরী রাণী রাজাও সুন্দর,
দিন দিন অনুরাগ বাড়ে পরস্পর!
কভু পুরোমাঝে কভু কমলের বনে
বিহার করেন রাজা চূড়ালার সনে।
কখনো চন্দন-বীথি কদম্বের বন
কুসুম কাননে কভু করেন ভ্রমণ।
সতত একত্র বাস দোঁহে একধর্ম্ম,
পরস্পর প্রীতিকর উভয়ের কর্ম্ম।
যার যত বিদ্যা বুদ্ধি গুণপণা আছে,
সকলই সুবিদিত উভয়ের কাছে।
রূপে গুণে সম দোঁহে মিত্র ভাব তাই,
ভিন্ন দেহ, মন প্রাণ এক বই নাই।
আর্য্য শাস্ত্রে পারদর্শী আচার্য্যের পাশে
চূড়ালা শিখিলা নানা বিদ্যা অনায়াসে।
রাণীর নিকটে রাজা শিখিলা সকল
নৃত্য গীত বাদ্য আদি বিদ্যা নিরমল।
হরগৌরী সম দুটী অভিন্ন অন্তর,
পরস্পরে আলিঙ্গন করে নিরন্তর।

চূড়ালার সাধন।

এ রূপে যৌবন লীলা সম্ভোগে কেবল (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব, ৭৮স)
কাটাইলা বহু দিন দম্পতি যুগল!
প্রগাঢ় প্রণয় ডোরে বাঁধি পরস্পর,
বহু বর্ষ হর্ষ ভোগ করে নিরন্তর,
অনন্তর পুনঃ পুনঃ হ'লে আচরণ,
ছিদ্র পথে কুম্ভজল পলায় যেমন,
দম্পতি-যৌবন তথা হয় বিগলিত,
ক্রমে ক্রমে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশিত!
যোগযুতা সুপণ্ডিতা চূড়ালা তখন
জানিতে পারিলা মনে জরা-আক্রমণ।
কালের স্বভাব রাণী জানি ভালমতে
চিন্তা করে নিশিদিন বাঁচিব কি মতে?
মনে মনে ভাবে রাণী—ভঙ্গুর শরীর,
ইহা নিয়া ঘুরিতেছি হইয়া অস্থির,
ফল পক্ক হইলেই নিপতিত হয়,
দেহ জীর্ণ হইলেই পতন নিশ্চয়,
দিন দিন আয়ুঃক্ষীণ বৃথা ভবে আসা,
অলাবু লতার মত বাড়ে শুধু আশা।
ধনু ছাড়ি শর যথা করে পলায়ন,
দেহ ছাড়ি সুখ শান্তি ছুটিছে তেমন!
এ তুচ্ছ শরীর আর এ জীবন হায়,
এই আছে এই নাই জলবিম্ব প্রায়।

চিরস্থির সুখকর পরম সুন্দর,
কি আছে সংসারে তবে নিত্য-মনোহর ?
ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে সাধুগণ পাশে,
নানা বিদ্যা শিখে রাণী নানা উপদেশে।
অভ্যাসে অভ্যাসে হয় প্রাণ আত্মগত.
ভাবিতে লাগিলা রাণী বসি ক্রমাগত,—
ছাড়ি বা না ছাড়ি আমি শরীরের কর্ম্ম,
দেখিব বিচার করি আপনার ধর্ম্ম।
কে আমি ? সংসার কার ? কিবা এই দেহ ?
কি বা জড় ? রয়েছে কি জড়াতীত কেহ ?
বালকে যেমন করে ভূত দরশন,
সংসার কল্পনা মাত্র দেখি যে এখন।
চির স্থির পরমাত্মা চৈতন্য সুন্দর,
তাঁহারি আভাসে জীব খেলে নিরন্তর।
উষ্ণ জলে পাই যথা অগ্নির আভাস,
সংসারেও দেখি তথা আত্মার প্রকাশ।
এত ভাবি হয় রাণী সাধনে অটল,
অনাবৃত ব্রহ্মজ্ঞান লভিতে কেবল !
সাধুসঙ্গে অভ্যাসেতে করিয়া সাধন
চূড়ালা জানিলা ব্রহ্ম স্বরূপ কেমন !
জানিলা বিশেষ সেই চিৎমাত্র সার,
জন্ম মৃত্যু দাহ হীন স্বরূপ আত্মার।
সমাধিতে দেখে রাণী সবি এক প্রাণ
বিশুদ্ধ চেতন অজ অচ্যুত নির্ব্বাণ !

দেখে রাণী—সুরাসুর নিখিল সংসার
সকলি প্রকাশ মাত্র চিন্ময় আত্মার।
অন্তরের মোহ নাশি রাণী করে ধ্যান,
জানিলা সুন্দর রূপে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান।
ধীরে ধীরে অভ্যাসেতে রাগ ভয় গিয়া,
প্রশান্ত একান্ত স্থির চূড়ালার হিয়া।
রাণীর হৃদয় খানি পাইল প্রকাশ
যেমন নির্ম্মল শান্ত শারদ আকাশ!
কিছুদিন পরে দেবী শান্ত করি প্রাণ, (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ৭৯ স)
ধরিয়া অন্তর দৃষ্টি করে অবস্থান।
পূর্ব্বের সংস্কার হ'তে মুক্তিলাভ করি,
লভিলা বিশ্রাম সেই পরিশ্রান্তা নারী।
অন্তরের আত্মদৃষ্টি ধরিয়া এখন
করিতে লাগিলা সব বাহ্য আচরণ।
অভ্যাস করিয়া যোগ-বিজ্ঞান-রতনে,
পূর্ণানন্দ-স্বরূপের আবির্ভাব মনে!
রাণীর যৌবন তাই ফিরিল আবার,
রূপের ছটায় হ'ল মোহিত সংসার।
দেখিছেন রাজা, স্থির সৌদামিনী যথা,
শান্তি-সরোবর তীরে সুবর্ণের লতা,
সম্পূর্ণ যৌবন-যুতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী,
মহিষী বসিয়া যেন দিক আলো করি!
হাস্যমুখে শিখিধ্বজ কহিলা তখন,—
আবার কোথায় রাণী পাইলে যৌবন?

এমন রূপের ছটা দেখি নাই আর,
পূর্ণশশী করে যেন শোভা বসুধার!
কোমল কমল-মুখে যেন তেজোরাশি,
উন্নত করিয়া বক্ষঃ বসিয়াছে আসি।
প্রিয়ে কি অমৃত-পানে জুড়ালে জীবন?
করেছ কি মন্ত্রসিদ্ধি? কিংবা রসায়ন?
সাদরে কহিলা রাণী—শুন প্রাণেশ্বর,
মন্ত্রসিদ্ধি রসায়ন অকিঞ্চিৎকর!
অভ্যাস করয়ে যারা সে সব কেবল,
বুঝিতে না পারে তারা ব্রহ্ম নিরমল!
"দেহেতেই আমি বোধ" করিয়াছে যারা,
অনাবৃত ব্রহ্মজ্ঞান পায় না ত তারা!
মিলাইয়া মম আত্মা পরমাত্ম সনে
লভেছি পরমানন্দ নির্ব্বিকার মনে।
মনে আর দুঃখলেশ নাই এক বিন্দু,
উথলিছে চারি দিকে অমৃতের সিন্ধু।
তাই নাথ পাইয়াছি অটল যৌবন,
সে নব-নবায়মান্ নিতুই নূতন।
আবাসে আসনে কিংবা উদ্যানেই থাকি,
সততই ব্রহ্মরূপে মন বাঁধি রাখি।
ভয় ক্রোধ লজ্জা মান ঐশ্বর্য্য সম্ভার,
কিছুই দেখে না আর মানস আমার।
আত্মবুদ্ধি শাস্ত্রদৃষ্টি সখী দুটি নিয়া,
নির্ভয়ে সংসার মাঝে বেড়াই ভ্রমিয়া।

সখী দ্বয় সনে সদা   করিয়া বিহার,
কি এক স্বরূপ রূপ   হতেছে আমার।

বশিষ্ঠ দেব বলিলেন—

শুনি শিখিধ্বজ স্থূল   রাজবুদ্ধি ধরি (নির্ব্বাণ, পূর্ব্ব ৮০স)
চূড়ালাকে কহিলেন   উচ্চহাস্য করি,—
একে রাজকন্যা তাহে   মহিষী আমার,
এ সংসারে কিবা আছে   অভাব তোমার?
বুঝেছ যা সেই ভাল,   অবলার মন
কি বলে কখন সব   প্রলাপ বচন!
পরিপক্ক বুদ্ধি যবে   হইবে তোমার,
বুঝিবে রাজত্ব ভার   কিরূপ আমার।
অয়ি সুখ-বিলাসিনি   সদা আমি তাই
তোমা সনে রসালাপে   সময় কাটাই;
শুনে সুখী যে তোমার   সর্ব্ব দুঃখ গত,
বালিকা মুখের বাক্য   অমৃতের মত!
অট্টহাস্যে উঠি গেলা   শাসিবারে প্রজা,
রাজত্ব-মদিরা মত্ত   শিখিধ্বজ রাজা।
ভূপালের মোহবুদ্ধি   রাখিয়া স্মরণ
চূড়ালা দিলেন পুনঃ   আত্মকর্ম্মে মন।
এই রূপে রাজা রাণী   পার্থিব লীলায়,
মহাসুখে দুই জন   জীবন কাটায়।
সদ্‌গুরুর উপদেশে   দৃঢ় করি মন,
নির্জ্জনে করেন রাণী   অপূর্ব্ব সাধন।
করিবারে শিখিধ্বজ   শত্রু পরাজয়,

বিদেশে গেলেন, তাই পাইয়া সময়,
একান্তে নিযুক্ত হয়ে একাকিনী রাণী,
শিরোধার্য্য করি মহা পুরুষের বাণী,
করিতে বিমান পথে গমনাগমন,
দেবতার সম ধ্যান করিলা সাধন।
রোধ করি প্রাণ-বায়ু দেহ-ঊর্দ্ধ দেশে,
দৃঢ় পদ্মাসনে দেবী রহিলেন শেষে।
বহু দিন এই রূপে সাধু সেবা করি,
লভিলেন যোগ-বিদ্যা চূড়ালা সুন্দরী।
প্রাণ ধারণার দৃঢ় অভ্যাসে কেবল (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ৮৩ স)
চূড়ালা আকাশ-বিদ্যা শিখিলা সকল।
বায়ব-বিজ্ঞানে কভু বিমানেতে উঠে,
কভু করে বিচরণ বসুধার পিঠে!
অবোধ অনধিকারী শূদ্র কাছে যথা,
বলিবে না উচ্চতম যজ্ঞক্রিয়া-কথা,
চূড়ালা না কহে তথা শিখিধ্বজ কাছে,—
নিগূঢ় বায়ব বিদ্যা জানা তাঁর আছে।

বন গমন।

বহু সুখে বহু দিন কাটিল রাজার,
ক্রমে ভোগ অবসান হইতেছে তাঁর!
ক্রমে ক্লেশে জর্জ্জরিত শোক তাপ ভয়ে,
রাজ্যের বিপদাপদ জয় পরাজয়ে,
বহু দিনে শ্রান্তি আসি দিল দরশন,
অশান্তি আসিয়া করে দৃঢ় আক্রমণ।

হতেছে আসক্ত চিত্ত   বিরক্ত কেবল,
চারিদিকে দেখিছেন   জঞ্জাল সকল!
বল হীন দৃষ্টি ক্ষীণ,   দিন দিন তাই,
ভাবিছেন কি কর্ত্তব্য,   মনে শান্তি নাই!
সতত নির্জ্জনে রাজা   নানা চিন্তা করে,
ছাড়ি সব রাজকাজ   উপবিষ্ট ঘরে।
মনোমত বন্ধু জনে   নির্জ্জনে সুধায়,
সংসার-ব্যাধির আছে   ঔষধ কোথায়?
বহু দিনে এক দিন   রাজেন্দ্রের কোলে,
মহিষী আনন্দময়ী   প্রেমানন্দে দোলে,
নানা কথা উত্থাপনে   নানা আলাপন,
মধুরে রাণীরে রাজা   কহিছে তখন,—
প্রিয়তমে রাজ্য ভোগ   করি বহু কাল,
এখন হতেছে বোধ   সকলি জঞ্জাল।
আসিছে বিষয়-জাল   মনঃ ক্লেশ নিয়া,
অশান্ত মনের শান্তি   করিব কি দিয়া?
দেখ প্রিয়ে, সর্ব্বত্যাগী   বনবাসী যিনি,
সংসারের লাভালাভে   ক্লিষ্ট নন তিনি।
করিতে না হয় তাঁর   নরহত্যা রণে,
থাক্ কিংবা যাক্ রাজ্য, সদা শান্তি মনে।
নির্জ্জনে যেমন মন   নির্ম্মল শীতল,
বুঝি বা তেমন নয়   শশাঙ্ক মণ্ডল!
চন্দ্রাননে যাব বনে   করিয়াছি মন,
সতী নারী করে পতি   পদানুসরণ।

চূড়ালা কহিলেন—

মহারাজ সব কাজ দেখিতে যে পাই,
যে সময়ে যাহা ভাল সে সময়ে তাই!
বসন্তেই পুষ্প শোভা শরতেই ফল,
গৃহ শোভা যত ক্ষণ ধন জন বল!
জরাজীর্ণ স্থবিরের বনবাস শোভা,
রাজন্ এখনো তব কান্তি মনোলোভা।
যত দিন থাকে শক্তি সুখাসক্তি মনে,
গৃহশোভা সংবর্দ্ধন করি দুই জনে।
অসময়ে ছাড়িলেই প্রজার পালন,
পাপমগ্ন হন রাজা ক্ষুণ্ণ প্রজা গণ।

রাজা কহিলেন—

শুন সতি, আমি তব পূজনীয় পতি,
আমার ইচ্ছায় বাধা দিও না সংপ্রতি।
তুমি কর কোমলাঙ্গি প্রজার পালন,
জানি রাখ—আমি বনে করেছি গমন।
নিশিতে প্রবোধ-বাণী রাণীরে বলিয়া,
কপট নিদ্রায় রাজা রহিলা শুইয়া!
চূড়ালাও রাজক্রোড়ে করিলা শয়ন
নীরবে, কমল কোলে ভ্রমরী যেমন।
গভীর নিশিতে রাজা মুছি আঁখি নীরে,
নিদ্রিতা দয়িতা ক্রোড় ছাড়ি ধীরে ধীরে,
গৃহ মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলা কাতরে,
রাজলক্ষ্মি, দাও আজ বিদায় আমারে!

পরিহরি পুরী রাজা নীরবে তখন
ভীষণ কানন পথে করিলা গমন।
কত দিবা নিশা কত কানন কন্দর,
গত করি উপনীত পর্ব্বত মন্দর।
মন্দর ভূধর হেরি পুলকিত মন,
গিরি তটে শোভা করে বন উপবন।
আছে কত তপস্বীর আশ্রম পড়িয়া,
লতাকুঞ্জ ছাড়ি গেছে সিদ্ধেরা চলিয়া।
এখন তথায় আর কেহ তারা নাই,
তরু লতা ফল ফুল পূর্ণ শুধু তাই।
বাপী তটে সমতল শ্যামল শীতল,
পবিত্রতা পূর্ণ এক স্থান নিরমল,
তথা লতা পাতা পূর্ণ পর্ণ-শালা করি,
রহিলেন শিখিধ্বজ তপঃ জপ ধরি।
বেণুদণ্ড পান-ভাণ্ড করি আহরণ,
অক্ষমালা কমণ্ডলু কন্থা কুশাসন,
মৃগসার চর্ম্ম আর পুষ্পাধার নিয়া
রহিলেন নরবর তপস্যা লাগিয়া।
প্রত্যূষে সন্ধ্যাদি জপ প্রথম প্রহরে,
দ্বিতীয় প্রহরে পুষ্প ফলাদি আহরে,
তৃতীয় প্রহর যায় স্নান আরাধনে,
ফল কন্দ মৃণালাদি কিঞ্চিৎ ভোজনে।
জপ যজ্ঞ ধরি করে রজনী ক্ষেপন,
আর সে রাজত্ব সুখ না হয় স্মরণ।

যথার্থ বৈরাগ্য আসি ধরিয়াছে যারে,
রাজলক্ষ্মী আর তারে আকর্ষিতে নারে।
ভূপাল কি? বৈরাগ্যের সুখ যদি জানে,
দরিদ্রও ইন্দ্রপদ তৃণবৎ মানে।
হেথায় সে অন্তঃপুরে হইয়া জাগ্রত, (*নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ৮৫ প
রাজাকে না দেখি রাণী ভাবে নানা মত।
না পাইয়া নানা দিকে করিয়া সন্ধান,
বুঝিলেন—বনে রাজা করিলা প্রস্থান।
তখনি অমনি দেবী যোগস্থ হইয়া,
বাহিরিলা সূক্ষ্ম দেহে বাতায়ন দিয়া।
নিমেষে আকাশ মার্গ ধরিয়া তখনি,
বায়ু-পথে বায়ু-দেহ ছুটিল অমনি।
অতিক্রমি গিরি বন চড়ি মনোরথে,
হ্রদ নদ ছাড়ি গিয়া মন্দর পর্ব্বতে,
চূড়ালা দেখিলা থাকি গগন-কোটরে,
রাজা বসি বসুধার আঁধার জঠরে।
যোগস্থ হইয়া রাণী আকাশ-প্রাঙ্গনে,
ভবিষ্যৎ কি ঘটিবে, দেখিলা ধেয়ানে,—
দেখিলা যে তাঁহাকেও হইবে আসিতে,
অচিরে মন্দর-দেশে স্বামীরে সেবিতে।
বুঝিয়া ফিরিলা রাণী রাজধানী পানে,
ধরিয়া বায়ুর গতি আসি নিজ স্থানে,
গৃহেতে গবাক্ষ পথে পশিলা চূড়ালা,
শয্যায় শুইলা যেন পূর্ণ শশীকলা।

প্রত্যুষে উঠিয়া রাণী রাজ্যভার নিয়া
শাসিতে লাগিলা রাজ্য অমাত্য লইয়া ;
রাজাও তপস্যা করে মন্দর পর্ব্বতে,
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, বহুদিন গতে,
বাসনার পরিপাক হইল সকল,
রাণীও প্রতীক্ষা করি দেখিছে কেবল।
সূক্ষ্মাকাশে উঠি দেবী নিরীক্ষণ করে,
কত দিনে রাজার সে সত্ত্বগুণ ধরে।
বহু দিনে রাণী জানি সত্ত্ব সমাবেশ,
বায়ব বিজ্ঞানে করে আকাশে প্রবেশ।
যাইতে বিমান-পথে সূক্ষ্মতম বেশে,
কতই হেরিলা দেবী চিন্ময় প্রদেশে।
নন্দন কানন হ'তে সুন্দরী সাকারা,
ছুটিয়া আসিছে সিদ্ধা অভিসারিকারা!
স্বর্গীয় সপ্তম স্তরে সিদ্ধোত্তম গণ
সুপবিত্র গাত্রগন্ধে আমোদে গগন।
প্রিয়তম মেঘ-বক্ষে লগ্ন সৌদামিনী,
নিরখি নিরখি কহে শিখিধ্বজ-রাণী,—
আহো কি আশ্চর্য্য এই মানস আমার
উৎকণ্ঠিত হইতেছে বিরহে রাজার।
বিবেক-প্রবুদ্ধ হয়ে যোগিসিদ্ধ মন,
এখনো প্রকাশে মন্দ স্বভাব আপন!
সংযত হইয়া রাণী কহে আপনারে,
রে মুগ্ধে, কতই আর বুঝাব তোমারে?—

স্বামী সঙ্গে আলিঙ্গন কামনা এখন,
এবে তিনি জরাগ্রস্ত তপস্বী সুজন।
জীর্ণ শীর্ণ অস্থি সার জড় দেহ তাঁর,
বৃথা আলিঙ্গনে আর কি ফল তোমার?
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখিবে এখন,
অপূর্ব্ব চিন্ময় জ্ঞান করি উৎপাদন,
স্বামীর নীরস দেহে জাগাইব সত্য,
নিত্য স্থির আদি রস ব্রহ্মরস-তত্ত্ব।
তোমায় তাহার পাশে মিলাব আবার,
এখন জড়ত্ব পাপে ডুবিও না আর।
অহো কি পরমানন্দ সর্ব্বানন্দ-সার
চিদানন্দ স্বামী-সঙ্গ রাণী চূড়ালার!
ব্যোমপথে বায়ুরথে আনন্দেতে সতী
অনন্ত দিগন্ত ছাড়ি মনোরথ-গতি,
মন্দর পর্ব্বতে আসি হইলা উদয়,
রাজেন্দ্রে দেখিয়া রাণী মানিলা বিস্ময়!—
অঙ্গার-মলিন দেহ রাজার তখন,
পর্ণশালা মাঝে জীর্ণ পত্রের মতন,
পুষ্প হস্তে নেত্র মুদি বসিয়া ভূতলে,
উড়ে রুক্ষ জটাজাল মুকুটের স্থলে!

ঋষিকুমার কুম্ভ।

চমকি চূড়ালা চিন্তি দেখে চিত্তপটে,
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানাভাবে এ দুর্দ্দশা ঘটে!

জীবন-মুক্তের "শ্রী" ভোগ-মোক্ষ-শোভা,
যাতে হয় সে সৌন্দর্য্য বিশ্ব-মনোলোভা,
স্বামীর সুখের তরে করিব তা আমি,
প্রাণের স্বরূপ করি শিখিধ্বজ-স্বামী।
ভাবিয়া চূড়ালা তবে পাতিলেন ছল,
মৃদুমন্দ-হাসি-মুখ প্রভাত কমল,
তাপস-কুমার-বেশ ধরিলা তখন,
অঙ্গ-আভা মনোলোভা কষিত কাঞ্চন।
যজ্ঞসূত্র গলে দোলে পবিত্রতা ঢালা,
করে ধরা কমণ্ডলু রুদ্রাক্ষের মালা,
ভস্মের তিলক শুভ্র ললাটের পটে,
নেত্র-তেজে বোধ হয় ব্রহ্মতেজঃ বটে।
হেন রূপে নৃপতির সম্মুখেতে আসি,
দাঁড়াইলা মুনিপুত্র যেন তেজোরাশি!
দেব-পুত্র ভাবি রাজা সসম্ভ্রমে উঠি,
করিলেন নমস্কার ভূমিতলে লুটি!
প্রতি নমস্কার করি তাপস-কুমার,
সুধাইলা শিখিধ্বজে কুশল তাঁহার।
হে সৌম্য, কে তুমি হেথা? তাপস নিশ্চয়;
হতেছে ত সুখে তব তপস্যা সঞ্চয়?
ভূপাল দিলেন পূর্ব্ব পরিচয় তাঁর,
শুনিয়া বিস্মিত হন তাপস কুমার!
কহিলা ভূপাল—দেব তুমি অন্তর্যামী,
সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, বনবাসী আমি!

চন্দ্র হ'তে আবির্ভূত দেখি যে তোমায়,
দর্শনেই সুধাসিক্ত করিছ আমায়!
কে বা তুমি, কি উদ্দেশে হেথা আগমন?
কহিয়া জুড়াও মোর তাপদগ্ধ মন।

তাপস কুমার বলিলেন,—

রাজন্ শ্রবণ কর, হৃদয়ে ধৈরজ ধর,—
স্নান করে অপ্সরায়া মন্দাকিনী জলে,
মুখরিত কিঙ্কিনী বলয়ের কলধ্বনি,
জাগাইছে প্রতিধ্বনি নিরজন স্থলে!
স্ফটিক-নির্ম্মল যত অপ্সরার কায়া,
সকলের অঙ্গে নাচে সকলের ছায়া।
ঝঙ্কারিল অলঙ্কার বিঘ্ন হ'ল তপস্যার,
তপোবনে নারদের ধ্যানের বিরাম,
দেবর্ষির তেজঃক্ষয়, তাতে মোর জন্ম হয়,
কুম্ভমাঝে ছিনু তাই কুম্ভ মোর নাম।
সরস্বতী মাতা মোর ব্রহ্মলোকে ঘর,
বেদ চতুষ্টয় মোর ক্রীড়া-সহচর!
দেবর্ষির দোষ নাই,— স্ফটিকে দেখিতে পাই
ছায়া দেয় পদ্মরাগ ইন্দ্রনীল মণি,
লাল নীল করে তারে, দূষিত করিতে নারে,
নাহি করে স্ফটিকের নির্ম্মলতা হানি!
সাধুর বাসনা-রঙ্ স্ফটিকের রাগ,
মূর্খের বাসনা-রঙ্ উঠে না সে দাগ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ইচ্ছামতে ভ্রমি আমি নানা পথে

লীলা মাত্র করি আমি, লিপ্ত তাতে নয়,
ভূতল ভ্রমণ করি নিরমল দেহ ধরি,
ধরাতলে পদতল স্পর্শ নাহি হয়।
যে দেহ আমার তুমি দেখিছ এক্ষণে,
এটি যেন ছায়া কায়া সলিল-দর্পণে।
এত শুনি নরপতি কহিলা কুম্ভের প্রতি, (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ৮৭ স)
পতিত কাননে আমি, হে দেব-কুমার,
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান নাই, সাধুসঙ্গ কোথা পাই?
তোমার দর্শনে জন্ম সার্থক আমার!
করি নানা ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি,
তথাপি না শান্তি পাই মনস্তাপে মরি।

ঋষি-কুমার বলিলেন,—

এক দিন নরমণি, আসিলাম আমি শুনি,
জিজ্ঞাসিয়া পিতামহ ব্রহ্মার সদনে,
জ্ঞান ক্রিয়া দুটি সার, কোনটি উত্তম তার?
পিতামহ কহিলেন সহাস্য বদনে,—
বৎস যেই আত্মতত্ত্ব বুঝিতে না পারে,
ক্রিয়াকাণ্ড দিয়া থাকে পুণ্যফল তারে।
পট্টবস্ত্র নাই যার কম্বল সম্বল তার,
সাধারণ মানবের বাসনাই সার,
লভি তারা ক্রিয়াফল চিত্ত করে নিরমল,
তত্ত্বজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডে দৃষ্টি নাই আর।
জড়ীয় বাসনা শূন্য তত্ত্বজ্ঞ যে জন,
কর্ম্মফলে তার আর কিবা প্রয়োজন?

জ্ঞানগন্ধ যদি পাই তারও ত তুলনা নাই,
কিছু নাই নিরমল জ্ঞানের সমান,
রাজন্ বসিয়া হেথা কেন বা রয়েছ বৃথা ?
তত্ত্বজ্ঞের কাছে গেলে জুড়াবে পরাণ।
তত্ত্বজ্ঞের সেবা করি প্রশ্ন কর তাঁয়,
তা'তেই ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইয়া যায়।
শুনি সে অমৃত-বাণী বিগলিত নৃপমণি,
ছল ছল আঁখি জল, কহিলা তখন,—
দেবপুত্র কে বা তুমি ? বহু দিন পরে আমি
শীতল হইনু শুনি তোমার বচন।
বুঝিলাম এত দিন মূর্খতার বশে,
সাধুসঙ্গ ছাড়ি শুধু বনে আছি ব'সে।
কুম্ভ কহিলেন,—
রাজন্ আমার বাক্য, হয় যদি মনে ঐক্য,
পাও যদি বাক্যে মোর অমৃত আভাস,—
ইন্দ্রপদ তুচ্ছ করি, আমার এ বাক্য স্মরি
হয় যদি ঋষিবাক্যে অটল বিশ্বাস,
তোমারি মঙ্গল-তরে শুন তবে তুমি,
অপূর্ব্ব যে উপাখ্যান কহিতেছি আমি।

চিন্তামণি সিদ্ধি।

পূর্ব্বে উজ্জয়িনী দেশে, আছিল পণ্ডিত বেশে (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব, ৮৮ স)
অতীব অধ্যবসায়ী পুরুষ সুন্দর,
শাস্ত্রপাঠে পটু বটে, আত্মদৃষ্টি নাহি ঘটে,
লাভালাভে হেথা সেথা দৃষ্টি নিরন্তর।

গুহ্যশাস্ত্রে এক দিন পড়িলেন তিনি,
লক্ষপতি হয় যেই পায় "চিন্তামণি"।
যদি বহু সাধনায় চিন্তামণি রত্ন পায়
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায়, হয় লক্ষপতি,
তাই চিন্তামণি রত্ন লভিতে করিলা যত্ন,
মহা সাধনায় মন দিলা মহামতি।
ঐকান্তিক দৃঢ়তায় অল্প দিনে তিনি
পূর্ব্ব সুকৃতিতে পান রত্ন চিন্তামণি!
শ্রান্ত নহে মন প্রাণ, তথনো সে ক্রিয়াবান্,
তথাপি করিছে ক্রিয়া, সাধনের তরে,
ভাবিতেছে মনে মনে চিন্তামণি মহাধনে
এত শীঘ্র পায় কিরে হতভাগ্য নরে?
চিন্তামণি দেখি দেখি মনে মনে কয়,—
মণি কি মুখের কথা? এটা মণি নয়!
মণি বোধ হয় না ত এটাও মণির মত,
পরশ করিব না ত,—শুনিয়াছি বটে
পাপী লোকে ছুলে হায়, চিন্তামণি উড়ে যায়,
এত শীঘ্র কপালে কি চিন্তামণি ঘটে?
রামা শ্যামা পাইয়াছে মহা চিন্তামণি,
শুনিলে বিশ্বাস নাহি করে এক প্রাণী!
চিন্তামণি যেই পাব, রাজ রাজেশ্বর হব,
এখনি কি হ'ল তাই? না, এটা স্বপন?
চিন্তামণি লাভ করি,
এর মধ্যে রাজা হ'ল দরিদ্র ব্রাহ্মণ?

দরিদ্রের অতি লোভে চক্ষু-দোষ ঘটে,
মণি কিন্তু নয় এটা, চক্ষুদোষ বটে।
স্বভাবেই জীব গণ সতত সন্দেহ-মন,
মনে করি আন্দোলন ব্রাহ্মণ অমনি
ক্রোধ বিরক্তির ভরে, মণি ঠেলি ফেলে দূরে,
উড়ি গেল সর্ব্ব-সিদ্ধি মহা চিন্তামণি!
সন্দেহ অবজ্ঞা হয় মনে মনে যার,
কাছে আসি উড়ি যায় সর্ব্ব সিদ্ধি তার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া হায় সে ব্রাহ্মণ পুনরায়
উপবিষ্ট সাধনায়, ভাবে মনে-মন,
শত বর্ষ সাধনায়, কেহ চিন্তামণি পায়,
আমি কি তা পাব হায়, দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
দিবা নিশি দ্বিজ বসি রয়েছে জঙ্গলে,
সাধিতেছে চিন্তামণি—জনশ্রুতি বলে।
হৃষ্ট পুষ্ট হুষ্টমন বঞ্চক বালক গণ
শুনিয়া প্রবেশি বন হাসিল হেরিয়া—
নয়ন মুদিত করি তপ জপ ধ্যান ধরি
কাষ্ঠ-পুত্তলিকা বৎ ব্রাহ্মণ বসিয়া।
কুড়াইয়া কাচ খণ্ড ধৌত করি তায়,
ব্রাহ্মণ-সম্মুখে রাখি সকলে পলায়।
মোহ বশে মূর্খ সবে রাঙ নিয়া স্বর্ণ ভাবে,
এই ত মোহের ধর্ম্ম হেরি অহর্নিশ,
শত্রু বোধ হয় মিত্রে, সর্প গড়ে রজ্জু-সূত্রে,
অমৃত দেখায় যেন হলাহল-বিষ।

ব্রাহ্মণ নয়ন মেলি দেখে মন-সুখে,
স্বর্গ হ'তে চিন্তামণি পড়েছে সম্মুখে।
ভাবি চিন্তামণি সত্য, করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য,
উঠিল ব্রাহ্মণ সেই কাচখণ্ড নিয়া,
মনে মনে কহে তবে আর কি ভাবনা ভবে ?
আর বা কি হবে মোর পূর্ব্ব গৃহ দিয়া ?
ঘর বাড়ী-সর্ব্বস্বই করি বিতরণ,
দূর দেশে রাজধানী করিব স্থাপন।
এ রূপ লোভের বশে গেল বিপ্র দূর দেশে,
বিজন প্রান্তরে গিয়া বসি নিরজনে,
কাচ খণ্ড অনিবার তুলি ফেলি বার বার
ঝাড়ি ঝাড়ি দেখে আর ভাবে মনে মনে,—
চিন্তামণি ঝাড়িলেই নানা রত্ন ঝরে,
একটিও পড়িছে না অভাগার তরে !
করে দ্বিজ তাড়াতাড়ি বার বার ঝাড়াঝাড়ি,
ছ'মাস ছ'মাস বসি ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া
বুঝিল সে দ্বিজমণি সেটা নহে চিন্তামণি,
কাচখণ্ড হেরি কান্দে ভূতলে পড়িয়া !
কপালের দোষ দিয়া মূর্খ দ্বিজ হায়,
হইয়া সর্ব্বস্বহীন ভিক্ষা মাগি খায়।
সতত সন্দেহ আর চিত্ত স্থির নহে যার,
ব্রহ্ম লাভে এই রূপে বঞ্চিত সে জন,
মূর্খতা বাড়িবে যত সন্দেহ আসিবে তত,
মূর্খতার রাজ্যে শুধু সন্দেহ সৃজন।

কেশে শোভে নরশির, শৃঙ্গে হেমকুট,
সকল দুঃখের শিরে মূর্খতা-মুকুট!
রাজন্ শ্রবণ কর মম উপদেশ ধর, (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব, ১০স)
বুঝেছ কি, যাহা আমি কহিনু তোমায়?
এ বাক্যের তত্ত্বসারে, পার নাই বুঝিবারে,
পরিষ্কার করি তারে কহি পুনরায়।—
তব চিত্ত-ভিত্তি পরে আঁকিনু যে ছবি,
সেই বাল-ভানু হবে মধ্যাহ্নের রবি।
রাজন্ খুলিয়া কই— ব্রাহ্মণ ঠাকুর ওই
চিন্তামণি সাধনায় বিব্রত যে জন,
চিন্তাকরি মরে বৃথা, শুনে না সাধুর কথা
তুমিই রাজর্ষে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞান কিন্তু শান্তি-ধন গেছে!
বিবাহে প্রস্তুত সব—কন্যা পলায়েছে।
গলিত স্বর্ণের মত তত্ত্বজ্ঞানে বিগলিত
হও নাই, শান্তি তাই নাই তব মনে,
ফিরিছ সুখের লাগি, হতেছ দুঃখের ভাগী,
সর্ব্বত্যাগী হইবারে আসিয়াছ বনে!
কহিতেছ বনবাসী সর্ব্বত্যাগী আমি,
রাজন্ এখনো তাহা হও নাই তুমি!
যেই "সর্ব্বত্যাগ" তরে আসিয়াছ এত দূরে,
সেই "সর্ব্বত্যাগ" মহা রত্ন "চিন্তামণি"
পাইলে যাহার লেশ একান্ত দুঃখের শেষ!
ইন্দ্র-পদ তৃণবৎ তুচ্ছ করি মানি!

ছাড়িলে যাদের তুমি   কৃশ করি দেহ,
তাহারা তোমারে কিন্তু ছাড়ে নাই কেহ!
অহং-বুদ্ধি অবিদ্যায়   এখনো আচ্ছন্ন হায়!
সবি থাকে যতক্ষণ "অহং" নাহি ছাড়ে,
অহং-বুদ্ধি ছুটে যেই   "সর্ব্বত্যাগ" হয় সেই—
ঝুপ করি "চিন্তামণি" স্বর্গ হ'তে পড়ে!
অহং-চিন্তা-বায়ু তব   মন-বনে বহে,
হাতে তব কাচখণ্ড, চিন্তামণি নহে!
এ তপস্যা-কাম্যবনে   দুষ্ট কাম-শিশু গণে
অহং-কাচ রাখিয়াছে তব অগ্র ভাগে,
ওটা নহে নৃপমণি,   "নিষ্কাম সে চিন্তামণি"
ফেলে দিলে সেই মণি, উড়ে গেল আগে!
গৃহে ছিল "চিন্তামণি" মলিনতা ঢাকা,
যখন চূড়ালা ছিল   চিত্তপটে আঁকা!
রাজর্ষে এখনো তুমি   ছাড় নাই মোহ-ভূমি,
দেখিতেছ অহং-কাচ চিন্তার নয়নে,
মায়ার বন্ধন হ'তে   পার নাই মুক্ত হ'তে,
রাজ্য-বাস ছাড়ি বন-বাসের বন্ধনে!
মন্ত্রিসনে রাজ্য-চিন্তা অনেকাংশে ন্যূন,
একাকী অরণ্যে পড়ি চিন্তা চতুর্গুণ!
কোথা সুখ কোথা শান্তি,   কেবল দেখিছ ভ্রান্তি,
স্বেচ্ছাচার-তপস্যার কাঠিন্য কেবল!
বরং রাজ্যে সুখে ছিলে   দিলে তাহা পায়ে ঠেলে,
অঙ্গার করেছে দেহ চিন্তার অনল!

নাই সুখ নাই স্বস্তি নাই শান্তি লেশ,
সংসারের ক্লেশ হ'তে চতুর্গুণ ক্লেশ!
ভেবেছিলে নরমণি, বনে আছে "চিন্তামণি,"
এবে দেখ কিছু নাই কাচখণ্ড বিনে,
বনে মুক্তি কেহ হায় কুড়াইয়া নাহি পায়,
রাজ-ঋষি এবে বসি ভাবি দেখ মনে,—
চিন্তামণি-মুক্তিধন যেই জন চায়,
সাধুসঙ্গ বিনা আর কিছুতে না পায়!
চূড়ালা তোমার রাণী তত্ত্বজ্ঞানী-শিরোমণি, (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব, ৯২ স)
কেন তুমি শুন নাই তার সিদ্ধবাণী?
কাচখণ্ড ভাবি হায় নিশিযোগে ঠেলি পায়,
হারাইলে চূড়ালায় গৃহ-চিন্তামণি!
গৃহ নাই তবু গৃহ আছে তব মনে,
গৃহিণীও তব সনে আসিয়াছে বনে!
কহিছ রাজন্ তুমি, ছাড়িয়াছ রাজ্য ভূমি
গৃহ দারা ধন জন বন্ধু পরিজন,
জান না কি মহোদয়, সে সব তোমার নয়,
"একা আসা একা যাওয়া" প্রসিদ্ধ বচন!
কিছু মাত্র নাই যাতে তব অধিকার,
গ্রহণ বা ত্যাগ করা, কি রূপ তোমার?

শিখিধ্বজের সর্ব্বত্যাগ।

সর্ব্বত্যাগ করিয়াছ, মনে মনে ভাবিতেছ
দেখিছ না কোন্ স্থানে বন্ধন তোমার!

রাজ্য ছাড়ি তপোধন, কহিছ "আমার বন,"
আমার এ কমণ্ডলু, আসন আমার।
দেহও আমার বলি ভাবিছ রাজন্,
বুঝে দেখ "সর্ব্বত্যাগ" হয়েছে কেমন!
শিখিধ্বজ কণ্ঠরুদ্ধ হইলা বিমুগ্ধ স্তব্ধ,
ক্ষুব্ধ মনে দীর্ঘ শ্বাস ফেলি বহু ক্ষণে,
ধীরে ধীরে জোড় করে কহিলা কম্পিত স্বরে,—
দেবপুত্র, ধন্য আমি তোমার দর্শনে!
তব বাক্যে মহাজ্ঞান লভিয়াছি আমি,
সকলি ছাড়িব এবে, এই দেখ তুমি!
শিখিধ্বজ বন মাঝে উঠিয়া অমিত তেজে,
পাতার কুটির খানি ছিন্ন ভিন্ন করে,
তপস্যার দ্রব্য গুলি সুদূরে ছুড়িয়া ফেলি,
সর্ব্বত্যাগী হ'নু আজ—কহে উচ্চ স্বরে!
অবশেষে দীর্ঘশ্বাসে ফেলি দিলা আনি
পত্র পুষ্প ফল জল বেণুদণ্ড খানি।
সর্ব্বদর্শী সূর্য্য যথা দেখিছেন কুম্ভ তথা,
গম্ভীর নীরব, বসি আসনে আপন,
রাজার অবস্থা যত হেরিছেন ক্রমাগত,
সর্ব্বত্যাগ হয় তবু না কহে বচন!
মনে মনে হাসি বলে কি দেখিতে পাই?
ইহার অধিক বুদ্ধি বদ্ধজীবে নাই।
কুম্ভও না কথা কন, রাজাও না ক্ষান্ত হন,
ফেলি ছাড়ি অবশেষে অস্থির অন্তর,

ছুটি ছুটি চারি ধার কাষ্ঠ আনি ভারে ভার

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিলা সত্বর।

ধূ ধূ করি হুতাশন উঠিল আকাশে,

তেজস্বী রাজর্ষী গিয়া দাঁড়াইলা পাশে।

জুড়াতে সকল জ্বালা বক্ষের রুদ্রাক্ষ মালা

কটাক্ষে খুলিয়া নিলা করেতে ভূপাল,

কহে চাহি তার দিকে, শুনরে অক্ষ-মালিকে,

করিয়াছ সুহৃদের কার্য্য বহু কাল!

তোমায় দিয়াছি ক্লেশ ক্ষমা তাই চাই,

এখন বিশ্রাম করি, আর কার্য্য নাই!

দিয়া ক্লেশ অপরের স্বার্থসুখ সাধনের

বাসনা ত যায় নাই এত দিন মোর,

বহু দিন তব সনে ভ্রমিয়াছি তীর্থে বনে,

সখি আর নাই সেই স্বার্থ-নিদ্রা ঘোর!

এখন স্বস্থানে যাও—বলি সেই ক্ষণে,

নিক্ষেপিলা অক্ষমালা দীপ্ত হুতাশনে।

পরে তুলি মৃগচর্ম্ম স্মরিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম,

করে ধরি কহে রাজা—শুন কৃষ্ণসার,

নরপশু আমিও ত, তাই মহা অজ্ঞানতঃ

আনিয়াছি পৃষ্ঠচর্ম্ম কাটিয়া তোমার।

ক্ষমা কর বন্ধু তুমি—বলি নৃপমণি,

ফেলি দিলা অগ্নিকুণ্ডে মৃগচর্ম্ম খানি!

পরে কমণ্ডলু ধরি কহিলা বিনয় করি,

কমণ্ডলু প্রিয়তম, জীবন আমার,

আমার যে কত ইষ্ট সাধিলে সুহৃদ্ শ্রেষ্ঠ,
কভু পারিবনা ঋণ শোধিতে তোমার!
ক্ষম ক্ষম প্রিয়তম, যাও নিজ স্থান,
বলি রাজা করে তারে ব্রাহ্মণেরে দান!
আসনাদি দ্রব্য যত নিয়া নিয়া ক্রমাগত
এই রূপে শিখিধ্বজ অনলে ফেলায়,
পোড়াইলা টানি আনি, পাতার কুটির খানি,
শেষে এক বস্ত্র ছিল, পোড়াইলা তায়!
নগ্ন দেহ দিগম্বর, কহিলা তখন;—
দেখ দেব সর্ব্বত্যাগ হয়েছে এখন!
হেরি কুম্ভ মনে মনে হাসিছেন সংগোপনে,
এত ক্ষণে হস্ত তুলি কহিলা অমনি, (নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ১০সর্গ)
কিছুই ত যায় নাই, এখনও হয় নাই,
এ কেমন সর্ব্বত্যাগ কহ নরমণি?
তোমার বাসনা ক্ষোভ বাড়ে ক্রমান্বয়,
দিতেছ আহুতি তাতে, অগ্নিতে ত নয়।
কুম্ভের বচন শুনি বজ্রাহত নৃপমণি,
দাঁড়াইলা নগ্ন দেহে, স্তম্ভিত হইয়া,
বহু ক্ষণ চিন্তা করি দীর্ঘ শ্বাস পরিহরি
কহিলেন ধীরে ধীরে অঞ্জলি করিয়া—
তব বাক্যে হ'ল জ্ঞান হে দেব তনয়,
এখনি এ দেহ পাত করিব নিশ্চয়!
ওই দীর্ঘ দীর্ঘিকায় এখনি ত্যজিব হায়
শরীর মন্দির এই রাগ বাসনার,

এত বলি রাজা যান তখনি ত্যজিতে প্রাণ,
কুম্ভ উঠি দাঁড়াইলা হস্ত ধরি তাঁর।
কুম্ভ কন, মহাত্মন্ এ কেমন ধর্ম্ম ?
জ্ঞানী হয়ে কেন কর অধমের কর্ম্ম ?
কাষ্ঠ যথা স্রোতে চলে, দেহ চলে শক্তি বলে,
অপরের শক্তিতেই শরীর চালিত,
জড়ের কি দোষ আছে, বৃক্ষে দোষী করা মিছে—
ঝড়ে যদি ফল পড়ে, বায়ুই নিন্দিত!
শরীর চালায় যেই অহং নাম তার,
তার ত্যাগে "সর্ব্বত্যাগ"—ছাড় অহঙ্কার!
আমি আমি—রব তুলি, 'আমার আমার' বলি,
যত ক্ষণ না ছাড়িবে "আমি ও আমার,"
তত ক্ষণ রবে ভ্রান্তি, পাবে না পরমা শান্তি,
নাহি হবে সর্ব্বত্যাগ সাধন তোমার।
মহান্ "পরম আমি" জানিলেই তুমি,
সর্ব্বত্যাগী হবে ছাড়ি, ক্ষুদ্র "আমি আমি"!
বিশ্বত্যাগ যদি হয়, সর্ব্বত্যাগ তবু নয়,
সর্ব্বত্যাগ-তত্ত্ব শুন যাবে তব ক্লেশ,
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা মহামূল্য মুক্তা যথা
সূত্রকে করিতে দেয় অন্তরে প্রবেশ,
সিদ্ধ তবু বিদ্ধ হয় অন্তরে যেমন,
যারে তারে, বিশ্ব ধরে বক্ষেতে আপন,
সেই রূপ ছাড়ে যার "আমি আমি ও আমার"
"সর্ব্বত্যাগ" তার হয় মুকুতার মত,

বক্ষঃস্থল দিয়া তার আসে যায় এ সংসার,
মুকুতার ন্যায় তার নিত্য হাসি ব্রত।
মনেতে আসুক যাক নিখিল সংসার,
জ্ঞানেতে হাসিতে থাক অন্তর তোমার!
ব্রহ্মের অবস্থা এই, সর্ব্বত্যাগ জ্ঞান সেই
লভিলে এখনি সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে,
সর্ব্বত্যাগ-মহাজ্ঞান, বিশ্বের আশ্রয় স্থান,
সর্ব্বত্যাগে "সর্ব্ব" তব করতলে পাবে!
সর্ব্বত্যাগী আকাশ ত সূর্য্যাদির স্থান,
সর্ব্বত্যাগী "আত্মা"ই ত অখিলের প্রাণ!
অনন্ত রসের কূপ সদা সর্ব্বত্যাগ-রূপ
অতুল্য অমৃত রস ব্রহ্ম বিনিঃসৃত,
রাজর্ষে করিয়া পান চরিতার্থ কর প্রাণ
অজর অমর হও আমাদের মত!
থাকি সে অভয় পদে ভয় কি তোমার?
আকাশে আঘাত করে সাধ্য আছে কার?
মূর্খ কহে নিরবধি— অণ্ডে জীব ভাণ্ডে দধি,
গৃহে আমি, পেটিকায় রত্নরাজি আছে,
অণ্ড ভাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড শূন্যেতেই সর্ব্ব কাণ্ড,
শূন্যে থাকা কঠিন ত নহে কারো কাছে।
আকাশ, স্ফটিক, মুক্তা—সর্ব্বত্যাগী তারা,
তাই হৃদে স্থান পায় রবি শশী তারা।
সর্ব্বত্যাগে সর্ব্ব পাই, আর কেন স্বর্গ চাই?
সর্ব্বত্যাগই সর্ব্বরত্ন—মহা চিন্তামণি,

সেই চিন্তামণি হন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
মুনি ঋষি সর্ব্বত্যাগী হন তাই শুনি!
সর্ব্বত্যাগ-তত্ত্ব জানি মহা মুনি গণ
রত্নগিরি সম হন অবিচল মন!
সর্ব্বত্যাগী মুনি কাছে নিখিল সম্পদ আছে,
কিছুই যে নাহি লয় তারি হয় সব,
ধর তাই নরমণি সর্ব্বত্যাগ-চিন্তামণি,
ত্যাগ কর নরনাথ "আমি আমি" রব।
রাজর্ষে উঠিয়া হর্ষে চল এই বার
"আমি ও আমার" রূপ ভবসিন্ধু-পার!
শিখিধ্বজ শান্ত ধীর করজোড়ে নত-শির,
কহিলেন—দেবপুত্র প্রসাদে তোমার,
প্রবুদ্ধ হইনু আমি, সর্ব্ব-মূলাধার তুমি,
চিন্তামণি লাভ আজ হইল আমার!
কি যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছ তুমি,
যথার্থই সর্ব্বত্যাগী হইলাম আমি।
নানা রূপে ভূপতিরে পরীক্ষা করিয়া পরে
উঠিয়া কহিলা কুম্ভ শুন মহীপতে,
সংসারের যাহা ধার্য্য শাস্ত্রীয় লৌকিক কার্য্য
সমস্তই কর এবে উপস্থিত মতে;
সত্ত্বশালী চিত্তে হোক কর্ম্ম-আন্দোলন,
প্রশান্ত সাগরে যথা ধীর আবর্ত্তন।
শুভাশুভ ময় চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় নিত্য,
শুভাশুভ চিন্তা থাকে যত ক্ষণ মনে,

তত ক্ষণ অজ্ঞানতা ; ঘুচিলে অন্তর চিন্তা,
জ্ঞানের প্রকাশ হয় স্থিরতার সনে।
দ্বিত্ববুদ্ধি ভেদজ্ঞান—চিত্ত বলে তায়,
চিত্তের অভাব হ'লে "জ্ঞান" বলা যায়।
সংসারে আবদ্ধ যারা বুঝিতে না পারে তারা,
চিত্তের অভাব হ'লে কি ভাব প্রকাশ!
রাজন্ বুঝিবে তুমি, তাই কহিতেছি আমি,
অপরে শুনিলে মাত্র পাইবে আভাস,—
চিত্তত্যাগ-মত সুখ ইন্দ্রত্বে না পাই,
প্রভাত কমল গন্ধে সে আনন্দ নাই!
যাদের জগতে আশা, রয়েছে ভোগ লালসা,
চায় যারা সততই জড়ীয় উন্নতি,
তাহাদেরি ভয়ঙ্কর, চিত্ত-ত্যাগ সুদুষ্কর!
একেবারে অসম্ভব ভাবে মূঢ়মতি!
খুলিয়াছে যার দিব্য তৃতীয় নয়ন,
সেই জানে চিত্তত্যাগ সুখদ কেমন!

চিত্তত্যাগ।

শিখিধ্বজ কহিলেন—

বুঝিয়াছি আমি এবে সুপ্রবুদ্ধ জ্ঞানী সবে
করেছেন চিত্তত্যাগ নিখিল সংসারে,
দেবপুত্র বুঝি তাই তোমাদের চিত্ত নাই,
মন নাই, তবে কর্ম্ম কর কি প্রকারে?
একেবারে যাহাদের নাই চিত্ত মন,
কি রূপে তাহারা কর্ম্ম করে সম্পাদন?

কুম্ভ কহিলেন,—

রাজর্ষে বলিছ যাহা বুঝিবার কথা তাহা,
পাষাণে অঙ্কুর নাহি জনমে,
সদা যাঁরা ব্রহ্মে যুক্ত, হয়েছেন জীবন্মুক্ত,
তাঁহাদের চিত্ত নাহি করমে।
চিত্তের অর্থই মাত্র "বাসনা",
বাসনাই করে চিত্ত ঘোষণা।
ঘনীভূত বাসনাতে পুনর্জন্ম এ জগতে,
জ্ঞানীর ত সে বাসনা রয় না,
যে রূপ বাসনা ভরে তত্ত্বজ্ঞানী কর্ম্ম করে,
তাতে আর পুনর্জন্ম হয় না।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন প্রকারে
তিনরূপ বাসনাই সংসারে।
যাতে মাখা জ্ঞান তত্ত্ব, সে বাসনা শুদ্ধসত্ত্ব,
তত্ত্বজ্ঞের সত্ত্বগুণ হয় ত ?
জ্ঞানীর বাসনা যত সত্ত্ব নামে অভিহিত,
সে বাসনা বাসনাই নয় ত !
তত্ত্বজ্ঞের চিত্ত তাই রহে না,
রজঃ তমঃ সে অন্তরে বহে না !
রজঃ তমঃ ভূমণ্ডলে দুটিকেই চিত্ত বলে,
'শুদ্ধসত্ত্বে' চিত্ত বলা যায় না,
মোহ মুক্ত যেই চিত্ত, তারে বলে শুদ্ধ সত্ত্ব,
তত্ত্বজ্ঞেরা চিত্ত খুঁজে পায় না।

প্রবুদ্ধেরা সত্ত্ব বই মানে না,
বদ্ধজীব চিত্ত বই জানে না।
পুনঃ পুনঃ জন্মে চিত্ত, পুনঃ না জন্মায় সত্ত্ব,
চিত্তের বন্ধন সদা সংসারে,
সংসারীর চিত্ত হয়, সাধুদের তাহা নয়,
রাজর্ষে তাতেই কহি তোমারে,
সত্ত্বের বন্ধন নাই, জানিও,
সাধুর নিষ্কাম কর্ম্ম মানিও।
চিত্ত ছাড়ি এবে তুমি, পাইয়াছ সত্ত্ব ভূমি,
এবে তব সর্ব্বত্যাগ হয়েছে,
অল্পে অল্পে তপস্যায়, ভববন্ধ ক্ষয় পায়,
বহু জন্ম পরে সিদ্ধি রয়েছে ;
তত্ত্বজ্ঞানে সত্ত্ব জাগে যখনি,
সকল তপস্যা ফল তখনি।
যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নয়, হয় নাই সত্ত্বোদয়,
চিত্ত ত্যাগে অসমর্থ যাহারা,
ক্রিয়া কাণ্ড কর্ম্মফল, তাহাদের সুসম্বল,
ক্রিয়া বিনা কি করিবে তাহারা ?
স্বর্ণথালা নাই ঘরে বলিয়া,
কাংশ্যথালা দিবে কি গো ফেলিয়া ?
কিন্তু আমি কহি সার, চূড়ালা সঙ্গিনী যার
তার আর তপস্যার বাকি কি ?
তোমার চিত্তের লয়, হইয়াছে সত্ত্বোদয়,
সর্ব্বত্যাগে বাকি কিছু আছে কি ?

সত্ত্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে,
তপস্যা-কষায়-পাক্ হয়েছে।
বুদ্ধিমান্ এ জগতে, ঈশ্বরের নিকটেতে,
বলে না কিছুই দিতে তাহারে,
কেবল বিনয় করি, কহে সে চরণ ধরি,
আত্মজ্ঞান দেও হরি আমারে।
পারে যদি আত্মজ্ঞান চাইতে,
কিছুই থাকে না বাকি পাইতে!
চিৎ সে চৈতন্য সার, সহজ স্পন্দন তার
সৃষ্টি নামে প্রকাশিত হয়েছে,
হইলে স্পন্দন শূন্য, তাহাই শুদ্ধ চৈতন্য,
তাঁকেই তুরীয় ব্রহ্ম বলেছে!
রাজর্ষে তোমার আর বাকি কি?
চিৎসত্ত্ব স্পন্দ শূন্য নহে কি?
বাহুহীন স্পন্দ শূন্য, পরশি ব্রহ্ম চৈতন্য,
থাক এবে নরপতি এখানে,
দেবগণ-মনোলোভা, স্বর্গে হবে মহাসভা,
আসিবেন পিতা মম সেখানে,
যাব আমি সেই স্বর্গে এখনি,—
বলি কুম্ভ অন্তর্হিত অমনি!
নিমেশে উঠিলা কুম্ভ পঞ্চম গগন,
ধরিলা রমণী-মূর্ত্তি সম্পূর্ণ যৌবন।
চলিলা গগন-গতি রাজধানী স্মরি,
অলক্ষ্যে প্রবেশে গিয়া, আপনার পুরী।

বসিলা চূড়ালা রাণী সখীদল সনে,
প্রভাত কমল যেন কমলের বনে!
ডাকি রাজ মন্ত্রীদল অমাত্য সকল,
তিন দিন রাজকার্য্য দেখিলা কেবল।
দিলেন সে মহারাণী নানা উপদেশ,
নানা স্থানে নানাভাবে, অশেষ বিশেষ।
আবার চতুর্থ দিনে সূক্ষ্মাণু-শরীর
চূড়ালা গবাক্ষ পথে হইলা বাহির।
মনোরথ গতি নিয়া উঠিলা তখন,
চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ নির্ম্মল গগন।
ক্রমে কুম্ভ-রূপ ধরি উতরিলা আসি,
মন্দর পর্ব্বতে, মুখে মৃদু মন্দ হাসি।
হেরিলেন কুম্ভ—রাজা বসিয়া নিশ্চল,
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে হইয়া অটল!
বাহুহীন তনু ক্ষীণ মৃতকল্প হেরি,
দেখিলেন কুম্ভ মনে বিবেচনা করি,
এখনি এ দেহ ত্যাগ হইলে রাজার,
সপ্তম বিমানে গতি হবে না তাঁহার!
এখনি এ দেহত্যাগ করি নিবারণ,
দেখাইব জীবন্মুক্ত অবস্থা কেমন!
ছাড়ে কুম্ভ সিংহনাদ ভূপালের আগে,
যদি সে বিকট নাদে শিখিধ্বজ জাগে!
বহু চেষ্টাতেও তাঁর সমাধি না গেল,
ভাবে কুম্ভ, বুঝি তাঁর পূর্ণ মুক্তি হ'ল!

হয় হোক তবে আমি তাঁহার সহিতে
এখনি রাখিব দেহ পূর্ণ সমাধিতে।
কিন্তু যদি হেরি পুনঃ হৃদয়ে রাজার,
এখনও সত্ত্ববিন্দু হতেছে সঞ্চার,
তবেই জানিব মুক্তি অসম্পূর্ণ হবে,
তার চেয়ে জীবন্মুক্ত করি আগে ভবে।
ধ্যানস্থ হইয়া কুম্ভ করিলা দর্শন,
সত্ত্বের আভাস মাত্র রয়েছে তখন,
অন্তর প্রবেশি কুম্ভ সেই ভূপালের
স্পন্দন করিয়া দিয়া বাহ্য চৈতন্যের,
নিমেষে ফিরিলা পুনঃ আপন শরীরে,
আসনে বসিয়া করে বেদ গান ধীরে!
ভ্রমর ঝঙ্কার সম শুনি সাম গান
জাগিয়া উঠিল ধীরে নৃপতির প্রাণ!
দেখিলেন রাজা করি নেত্র উন্মীলন,—
মধুস্বরে জুড়াইয়া নিখিল ভুবন
করিছেন কুম্ভ বসি বেদ-মন্ত্রধ্বনি,
জ্বলিছে স্বর্গীয় রূপ, মৃত-সঞ্জীবনী!

কুম্ভের মদনিকারূপ ধারণ।

কুম্ভ সনে ক্রমান্বয় রাজার বন্ধুত্ব হয়,
মিলিলেন সখ্যভাবে আনন্দে দু'জন,
কভু বা কাননে ধীরে, কভু সরোবর তীরে,
করেন পর্ব্বত প্রান্তে দোঁহে বিচরণ।

দুই জনে এক মনে করে এক কাজ,
দুই দেহে এক আত্মা করেন বিরাজ!
গিরিপ্রান্তে দুই জনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে,
একদা কহিলা কুম্ভ নৃপতির পাশে,—
মধুমাসে অতি শুদ্ধ শুক্লা প্রতিপৎ অদ্য
ইন্দ্রপুরে দেব সভা হইবে আকাশে;
ব্রহ্মলোক হ'তে আজ আসিবেন পিতা,
অনুমতি-দেও সখে, যাব আমি তথা।
কুম্ভ তবে এত বলি, ব্যোমপথে যান চলি,
শরতের শুভ্র মেঘ দেখিতে যেমন,
নীলাকাশ ভেদ করি, উঠি কুম্ভ তদুপরি,
পুষ্পমালা হ'তে পুষ্প করেন বর্ষণ।
হেরিছেন শিখিধ্বজ ব্যোম পুষ্প যত,
প্রভাতের মেঘদর্শী ময়ূরের মত!
মৃদুল সমীর ভরে, অলক্ষ্যে প্রবেশ করে,
যেমন বসন্ত-শ্রী কুসুম-কাননে,
অদৃশ্যে তেমন করি, চূড়ালার রূপ ধরি
রাজপুরী প্রবেশিলা কুম্ভ সংগোপনে!
অলক্ষ্যে পশিলা লক্ষ্মী মন্দিরে আসিয়া,
নৃত্য গীতে রাজপুরী উঠিল হাসিয়া।
রাজকার্য্য রাত্রি দিন, করিয়া কয়েক দিন,
যথাকালে নভঃস্থলে অন্তর্হিত হন,
মন্দর পর্ব্বতে আসি, ক্ষীণ করি তেজোরাশি,
শিখিধ্বজ পাশে কুম্ভ করিলা গমন।

বসিলা মলিন মুখে নাহি হাসি রাশি,
হেরিলেন রাজা যেন প্রভাতের শশী!
হেরি হেরি ফিরে ফিরে, ভূপাল জিজ্ঞাসে ধীরে,
কেন এ মলিন মুখ হে দেব-তনয়?
বিষাদের সম্ভাবনা, তোমাতে ত সম্ভবে না!
কথনো মুক্তের মুখ মলিন কি হয়?
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কুম্ভ কন কথা,—
শুন সখে আজ মনে পাইয়াছি ব্যথা!
বিমানের মধ্য স্তরে, মেঘমালা শোভা করে,
জলদ বিদীর্ণ করি আসিতেছি যত,
দেখিনু সম্মুখ দিয়া, মেঘ-স্তর বিদারিয়া,
দুর্ব্বাসা চলিয়া যান অপ্সরার মত!
নীলাম্বরী—গায়ে বেড়া নীল কাদম্বিনী,
অলঙ্কার রূপে অঙ্গে শোভে সৌদামিনী!
হেরিলেই হাসি পায়, নমস্কার করি তাঁয়,
কহিলাম মুনিবর এ কেমন হেরি?
বায়ু ভরে চলি যান, হেরি হয় অনুমান,
অপ্সরী কিন্নরী যায় কিংবা বিদ্যাধরী!
সরোষে দুর্ব্বাসা দিলা অভিশাপ হায়—
হবি তুই পীনস্তনী রমণী নিশায়!
শুনিয়া অবধি তাই, চিন্তার অবধি নাই,
এক দণ্ড স্বস্তি নাই, হয়েছি অধীর,
আসিলেই সন্ধ্যাকাল আসিবে আমার কাল,
এ দেহ নাশিয়া দিবে কায়া কামিনীর!

সারা নিশি হয়ে রব মুনি-মনোহরা
নবীনা যুবতী আমি পীন-পয়োধরা!
শিখিধ্বজ দৃঢ়মতি কহিলা কুম্ভের প্রতি,
যা হবার হোক তাই হে দেব-তনয়,
ইহা ত সামান্য কথা, ইথে কেন মন-ব্যথা?
তত্ত্বজ্ঞের আত্মজ্ঞান যাইবার নয়।
নির্ব্বিকার চিত্ত যার,—সদা আত্মসেবা,
কোথা বা যুবক তার, যুবতী বা কেবা?
ক্রমে সন্ধ্যা এল, বনভূমি হ'ল, আঁধারে আবৃত সব,
কুম্ভ ধীরে ধীরে, কহে নৃপতিরে,—কামিনী কণ্ঠের রব!
শুন নরমণি, হেন অনুমানি, কামিনী হতেছি আমি,
যত সন্ধ্যা হয়, কি হয় কি হয়, ভয় না করিও তুমি।
কেশাগ্র সকল, বাড়িছে কেবল, কে যেন বাঁধিছে বেণী,
একি হ'ল সখে, স্তব্ধ হবে দেখে, বেণীতে মণির শ্রেণী!
কে যেন গলায়, কি যেন দোলায়, এ যেন হীরক হার,
বিশ্বাস না কর, হের সখে হের, ঝকমক্ জ্যোতিঃ তার!
মরি মনস্তাপে, দুর্ব্বাসার শাপে, অলক্ষ্যে সকল হয়,
দেখ সখে চক্ষে, কি উঠিছে বক্ষে, হেমাব্জ কোরকদ্বয়!
একি হরি হরি! সরমে যে মরি, নিতম্ব বাড়িছে যেন,
উরু গুরু ভার, হতেছে আমার, রামরম্ভা মানি হেন!
কি জানিবে অন্যে, আমার চৈতন্যে, নারী নারী অনুমান,
নারি প্রকাশিতে, ভাল যে বাসিতে, চায় যেন মন প্রাণ!
হতেছে কেমন, রমণীর মন, সরমে কহিতে নারি,—
বাসনা মনেতে, অবগুণ্ঠনেতে, ঢাকি মুখ যদি পারি।

ছিছি মরি মরি, কোথা সহচরী, কে দিল পাটের সাড়ী ?
কুন্ত বলি হেন, লুকাইলা যেন, কুঞ্জবনে তাড়াতাড়ি !

রাজা বলিলেন—

কেন কেন সখে, ম্রিয়মান দুখে, এ নহে উচিত কর্ম্ম,
যাহা তাহা হবে, চিত্ত স্থির রবে, আমাদের এই ধর্ম্ম !
অবোধ অধীর, জ্ঞানে নহে স্থির, মোহে অন্ধ হয় যারা,
পুরুষ কি নারী, চিন্তা তাহাদেরি, ভাবি ভাবি হয় সারা !
নাই আমাদের, হেতু বিষাদের, কি হবে এ দেহ দিয়া ?
যুবা কি যুবতী, তুচ্ছ কথা অতি, থাকি পরমাত্মা নিয়া !
এস সখে এস, বন্ধুভাবে ব'স, আত্মার আনন্দে থাকি,
অজর অমর, আত্মার উপর, দুজনে নয়ন রাখি।
তখন দুজনে, মিলিয়া কাননে, আত্মজ্ঞানে নিমগন,
ক্রমে ক্রমে তায়, হয় দুজনায়, এক প্রাণ একমন !
যায় কিছুদিন, জ্ঞানেতে প্রবীণ, কঠিন দুজনে হয়,
বহুদিন পরে, মধুকণ্ঠস্বরে, নিশাযোগে কুন্ত কয়,—
দেখ সখে তুমি, যামিনীতে আমি, যুবতী রমণী হই,
তোমার সঙ্গেতে, সুখে একত্রেতে, নির্জ্জন নিকুঞ্জে রই,
সিদ্ধ মোরা বটে, কথাটা যা রটে, সেটা কিছু ভাল নয়,
বাহ্য অবনীতে, দেখিতে শুনিতে, কেমন কেমন হয় !
সাধুর ভূষণ, সুনীতি পালন, তাইতে তোমায় কই,—
দেখাতে ভুবনে, এস দুই জনে, পরিণয়ে বদ্ধ হই !

রাজা কহিলেন—

ভাল ভাল সখে, তব ভাব দেখে, আমার যে হাসি পায়,
আশ্চর্য্য কি ইথে, জগতে থাকিতে, এ বড় ভাল উপায় !

জীবন্মুক্ত যারা, চিরসুখী তারা,—আমরা অমৃতে থাকি,
দেখাতে বাহিরে, পরিণয়-ডোরে, দোঁহারে বাঁধিয়ে রাখি!
এই পন্থা ধরি, পরামর্শ করি, দোঁহে করি সেই বুদ্ধি,
নানা আয়োজনে, করে দুই জনে, শুভ পরিণয় সিদ্ধি।
সাদর সম্ভাষে, পার্ব্বত্য প্রদেশে, নাচিল পাহাড়ীগণ,
আহারে বিহারে, পশুপক্ষী নরে, পূর্ণ হল গিরিবন।
গায় শুকশারী, নাচে নরনারী, ময়ূর ময়ূরী সনে,
কুম্ভ নিশাগমে, মদনিকা নামে, যশঃস্বিনী হন বনে।
এইরূপে দোঁহে, মনসুখে রহে, নানা রস-আলাপন,
দিনে কুম্ভবেশ, দেন উপদেশ, রাত্রে মদনিকা হন।
পোহালে শর্ব্বরী, সামগান করি, মোহবন্ধ দেন কাটি,
যামিনী-যোগেতে, মোহিনীরূপেতে, সংসার বাঁধেন আঁটি।
হেন সুখে দিন, যায় দিন দিন, একদিন সন্ধ্যামুখে,
ডুবুডুবু রবি, মদনিকা ছবি ঈষৎ ফুটিছে সুখে,
এ হেন সময়, পূর্ণচন্দ্রোদয়, শিখিধ্বজ যান বনে,
পর্ব্বত নিকটে, তটিনীর তটে, সন্ধ্যাজপ সমাপনে।
হেথা মদনিকা, সৌরভ কণিকা, মাখিয়া সকল অঙ্গে,
যূথী জাতি বেলা, মালতীর মালা, গলায় দোলায় রঙ্গে!
বাহিরিলা বালা, পূর্ণশশী কলা, যৌবনে জোয়ার ছুটে,
রতিরসে হেন, টলমল যেন, দাড়িম্ব ফাটিয়া উঠে!
ফুলের প্রাঙ্গন, নদী তট বন, বেড়াইয়া ঘুরি ঘুরি,
শশীকলা বেশে, আইলা নিমেষে, লতাকুঞ্জ মাঝে ফিরি।
সঙ্গে একজন, পুরুষ-রতন, মানসে সৃজন তাঁর,
গলে গলা ধরি, আলিঙ্গন করি, চুম্বে মুখ বারেবার!

কুসুম-শয্যায়, শুয়ে দুজনায়, রহিলা মনের সুখে,
সন্ধ্যাজপ শেষে, শিখিধ্বজ আসে, লতাকুঞ্জ অভিমুখে!
আসি দেখে কুঞ্জে, ঢাকা পুষ্পপুঞ্জে, দুইটি সোণার তনু,
জ্ঞান হয় মনে, শশীকলা সনে, গাঁথা যেন বালভানু!
ছাড়ি ছুঁছগলা, মল্লিকার মালা, ছিঁড়িয়া রয়েছে পড়ি,
আলুথালু বেশ, আলুলিত কেশ, বসন গিয়াছে উড়ি।
দেখি দেখি দেখি, নিরখি নিরখি, শিখিধ্বজ বুদ্ধিহারা,
দাঁড়ায়ে রহিল, নয়নে বহিল, অতুল আনন্দধারা!
ভাবে রাজা মনে, আছে দুইজনে, মনের আনন্দে কত,
সার্থক নয়ন, ধন্য এ জীবন, পূর্ণ মোর মহাব্রত!
জীবন্মুক্তি মাথা, ধন্য মদনিকা, আমি না দাঁড়াব কাছে,
সুখে থাক তুমি, দূরে যাই আমি, সুখনিদ্রা ভাঙ্গে পাছে।
রাজা যান ধীরে, চান ফিরে ফিরে, আনন্দে বিভোর হন,
অন্তরালে গিয়া দূরেতে বসিয়া, ব্রহ্মানন্দে নিমগন!
হেথায় তখনি, চমকিয়া ধনী, দেখিলা তুলিয়া শির,
শিখিধ্বজ আসি মৃদু হাসি হাসি, চলিয়া গেলেন ধীর।
করি ঝটপটি, মদনিকা উঠি, বসন টানিয়া নিলা,
আলুথালু বেশে, আসি রাজপাশে, একপাশে দাঁড়াইলা।
কথা নাহি হায়, অর্দ্ধমৃত প্রায়, হেঁট মুখে অতি ধীরে,
নখে মাটি খোঁটে, শতধারা ছোটে, আনত নয়ননীরে!
হেন হেরি তবে, মৃদুকণ্ঠরবে, রাজা কন মধুভাষ,—
তব কার্য্য হেরি, কিন্তু প্রাণেশ্বরি, আমার বড় উল্লাস!
প্রিয়তম যাহা, মুক্তগণ তাহা পরভোগে করে দান,
নিজভোগ হ'তে, পরভোগে দিতে বড়ই আনন্দ পান!

তাইতে তোমাকে কহি মদনিকে—প্রণয়ী পুরুষ নিয়া,
প্রেমদান করি, সারা বিভাবরী, তুষ্ট কর মোর হিয়া !
ভাসি আঁখি নীরে, মদনিকা ধীরে, কহে আধ আধ স্বর,
নারীর প্রকৃতি, চঞ্চলা যেমতি, জান ত তা প্রাণেশ্বর !
ক্ষম গুণমণি, অবোধ রমণী, অপরাধ নাহি ধর,
নিজধর্ম্ম নাশি, বহু দোষে দোষী, পাপিনীরে ক্ষমা কর।

চূড়ালা মিলন।

রাজা কন সাধ্বি, একি তব বুদ্ধি ? দুঃখনা দেখিতে পাই,
আকাশে সুমুখি অঙ্কুর হয় কি ? এ অন্তরে ক্রোধ নাই।
মদনিকা ভাবে, কি আশ্চর্য্য ভবে, কি প্রশান্ত এ হৃদয় ?
সিদ্ধের লক্ষণ, এই বিলক্ষণ, প্রাণ নিত্যানন্দময় !
পরীক্ষায় আর, কি কাজ আমার, প্রাণেশ হইলা জয়ী !
ভাবি মদনিকা, তরুতলে একা, দাঁড়াইলা প্রেমময়ী।
হেরে রাজা তার, নয়ন-আসার, ক্রমেই শুকায়ে গেল,
প্রভাত কমল, নয়ন যুগল, খঞ্জন নাচিয়া এল।
মদনিকা তথা, যেন চিত্র গাঁথা—দেহকোষ হতে তাঁর,
কিবা অপরূপ, ফুটিতেছে রূপ, মহারাণী চূড়ালার !
চূড়ালা আভাস, ক্রমেই প্রকাশ, মদনিকা দেহ লয়,
চূড়ালার বেশ, চূড়ালার কেশ, চূড়ালা সর্ব্বাঙ্গময় !
সেই হাসি রাশি, ভালবাসাবাসি, ফুটিছে নয়নকোণে,
আপাদ মস্তকে, রতন ঝলকে, চূড়ালা হাসেন মনে !
সৌন্দর্য্যের সার, রূপ চূড়ালার, নিরখে নৃপতি বসি,
আকাশ হইতে যেন আচম্বিতে, চূড়ালা পড়িলা খসি।

প্রণয়-রূপিণী, প্রেমময়ী রাণী, হেরি রাজা প্রেমে ভোর,
বিস্ময়ের ভরে, কহে উচ্চস্বরে—চূড়ালে মহিষি মোর,
একি একি রাণি কহ মধুবাণী, সঙ্গিনী হয়েছ তুমি ?
তোমায় ছাড়িয়া কাননে আসিয়া, মূর্খতা করিনু আমি !
গলে বস্ত্র দিয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে পতি-পাদপদ্ম ধরি,
প্রণমি প্রাণেশে, মধুমাখা ভাষে, কহে রাণী ধীরি ধীরি,—
প্রাণেশ যখন, বিষয়ে মগন, ছিলে বদ্ধ কর্ম্মপাশে,
কি দুঃখে মগন, ছিল মোর মন, না কহি তোমার পাশে !
তা' পরে যখন বনেতে গমন করিলে তখন নাথ,
রাণীরূপ ধরি, রাজ্যরক্ষা করি, কুম্ভরূপে তব সাথ!
এবে গুরু তুমি, তব শিষ্যা আমি, এস দোঁহে লীলা করি,
এক মন প্রাণে, একাত্মা দুজনে, ভ্রমি আত্মজ্ঞান ধরি।
রাণীরে লইয়ে, ব্যাকুল হইয়ে, ভূপাল ধরিলা বুকে,
বিস্ময়ে তখন, কহিলা বচন, মগন স্বর্গীয় সুখে,—
করি কত পুণ্য, আজ আমি ধন্য, ধন্য ধন্য প্রিয়ে তুমি,
ভূতল গগনে, যাবে যেই স্থানে, চিরসঙ্গী তব আমি।
বায়ুবিদ্যা দিয়া, শিখিধ্বজে নিয়া, তখন হইতে রাণী,
ফেরে ত্রিভুবনে, ভূতল গগনে, দুজনে একাত্মা জানি।
আত্মার স্বরূপে, দেবদেবী রূপে, কভু বা মানব বেশে
ভূতল গগন করে বিচরণ, যতেক সিদ্ধের দেশে !
আনন্দ অপার, সুখের পাথার, দ্বৈতে ও অদ্বৈতে মন,
থাকে দুজনায়, আনন্দ লীলায় ; একদা মহিষী কন—
শুন মহারাজ, কহি তবে আজ, এ কথা নূতন ধারা,
কভু কোনো দেশে, আদি মধ্য শেষে, রাজারাণী নহি মোরা।

যোদের অন্তর, সিদ্ধ নিরন্তর,—শুধু করি রাজ্য অন্ত
কি ফল হয়েছে? সবিত রয়েছে, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত।
জীবন্মুক্তে তাই, কিছুই ত নাই,—ত্যাগ বা গ্রহণ করা,
তাই চল নাথ, যাই তব সাথ, সে রাজ্যে ফিরিয়া মোরা!
পুনঃ গুণমণি, তব রাজধানী, ধরুক অপূর্ব্ব শোভা,
নারীরত্নরূপে, শিখিধ্বজভূপে, সেবি করি আত্মসেবা।
নরনারী হব, জীবেরে দেখাব, তাতে কিবা ভয় আর?
হ'লে আত্মদৃষ্টি, সুধাপূর্ণ সৃষ্টি, চূর্ণ শুধু অহঙ্কার।
তব বামে বসি, হইব মহিষী, সিংহ দ্বারে তূর্য্যধ্বনি
জাগাইবে সদ্য, নৃত্যগীতবাদ্য, রণবাদ্যে রাজধানী!
অপ্সরা নাচিবে, গন্ধর্ব্ব গাইবে, সুখের হইবে শেষ,
শত্রুর শাসনে, ছুটিব দুজনে অশ্বেতে কৃতান্তবেশ!
শান্তিস্বরূপিণী, হবে রাজধানী, জগজন-মনোলোভা,
লতাপুষ্পে মরি, ধরিবে সে পুরী, বসন্ত-লক্ষ্মীর শোভা!
হেন বাণী শুনি, কহে নৃপমণি, ঈষৎ হাসিয়া তথা,
সুধাংশুবদনি, জীবন্মুক্তিবাণী, শুনালে সিদ্ধের কথা!
রাজ্যত্যাগ আর, গ্রহণ বা কার? সকলি সমান দেখি,
যেখানে যখন শোভিছে যেমন, তখন তেমন থাকি।
আর ক্ষোভ নাই, চল রাজ্যে যাই বলিয়া আনন্দে অতি
পূর্ণকাম দোঁহে, জীবন্মুক্ত হয়ে চলিলা রাজদম্পতি!
রাজ্যেতে আসিয়া, আনন্দে ভাসিয়া, উৎসাহে মাতিয়া দোঁহে
বহু বর্ষ ধরি, সুশাসন করি, রাজত্ব সম্ভোগে রহে।
শুদ্ধ সত্ত্ব শেষ, যাহা অবশেষ, নিঃশেষ করিয়া আসি,
দোঁহে একত্রেতে ব্রহ্মনির্ব্বাণেতে সমাধি লইলা বসি!

শুন রঘুবীর, চিত্ত কর স্থির, ঘুচাও অজ্ঞান ভ্রম,
গুরু সেবা কর, সাধু সঙ্গ ধর, শিখিধ্বজ ভূপ সম।
ছাড় মোহমদে, তুচ্ছ ইন্দ্রপদে, পদে পদে তুচ্ছ করি,
কর সর্ব্বক্ষণ, স্বরাজ্যপালন, ঋষি বাক্য শিরে ধরি।
বাহ্য রাজ্যপদ, জীবন্মুক্তি পদ,—দুই পদে স্থির হও,
ভোগ-মোক্ষ-ফল, করি করতল, অমৃত-সমাধি লও।

সাকার নিরাকার।

আদি-শ্রোতা শিষ্য-ভরদ্বাজ কহিলেন—(নির্ব্বাণ, পূর্ব্ব, ১২৭ সর্গ)

কহ মোরে হে মুনীন্দ্র— রামচন্দ্র মহাজ্ঞানী,
তব বাক্যে জীবন্মুক্ত হইলা নিশ্চয়,
আমাদের কিবা গতি কিসে দেব মুক্তি পাব,
কিরূপে বা ব্রহ্মপদে পাইব আশ্রয় ?

আদি বক্তা মহামুনি বাল্মীকি বলিলেন,—

প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ, বিশেষে তোমায় বলি,
যতনে যোগবাশিষ্ঠ নিত্য পাঠ কর,
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসেতে, সম্যক বুঝিয়া দেখ,—
বিচার অভ্যাস দুটি সযতনে ধর।
জ্ঞানহীন বদ্ধ জীব, বাসনার দাস যারা,
সংসারের মাঝে ঘোর অন্ধকারে মরে,
চৈতন্য-রূপিণী সেই কেবল মঙ্গলময়ী
অমৃত-লতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে!
বিষয়-বাসনা ময়ী বিষলতা ধরি ধরি,
ভরদ্বাজ বৃথা ভবে থাকিও না আর,

আসা যাওয়া এই দুটি, কেবল কল্পনা মাত্র,
মনে শুধু এই মোহ, তুমি নির্ব্বিকার!
পূর্ব্ব কর্ম্ম ফল গুলি ঐহিকের কর্ম্ম-বলে
যখন বিনষ্ট সব ক্রমে হয়ে আসে,
বিষয়ের বিষলতা তখন শুকায়ে পড়ে,
ইন্দ্রজাল সম উড়ে যায় ব্রহ্মাকাশে!
তব পূর্ব্ব পাপ পুণ্য এখনও যায় নাই,
পুনঃ পুনঃ উপদেশে বুঝিছ না তাই,
তাই বলি ভরদ্বাজ, যতনে সুকর্ম্ম কর,—
গুণময় ব্রহ্মমূর্ত্তি উপাসনা চাই।
হরি হর ব্রহ্মময়, সত্ত্বগুণে দয়াময়,
তত্ত্ব জানি মূর্ত্তি পূজা ভক্তি যোগে করি,
পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল কাটে, আপনিই চিত্ত পটে
ফুটে উঠে শুদ্ধ চিৎ আনন্দ লহরী।
হয় নাই পাপক্ষয়, এখনও বদ্ধ তুমি,
মূর্ত্তব্রহ্ম পূজা করি চিত্ত শুদ্ধি কর,
শেষে সে অমূর্ত্ত ব্রহ্ম নির্গুণ চৈতন্য তত্ত্ব
ক্রমশঃ আয়ত্ত হবে, ঋষিবাক্য ধর।
সাকার ঈশ্বরে পূজি, ইন্দ্রিয় সংযম কর,
সামান্য সমাধি যবে হইবে সঞ্চার,
আপনা-আপনি তবে ক্রমে আত্মদৃষ্টি হবে,
এ বুদ্ধি তামসী নিশি পোহাবে তোমার।
বিবেক বৈরাগ্য সনে, না পাইলে ব্রহ্মতেজঃ,
নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব না হয় উদয়,

তাই সে নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ হইয়া আসি
দুর্ব্বলের তরে হন হরি কৃপাময়।
ঈশ্বরের অনুগ্রহ হ'লেই অভীষ্ট সিদ্ধি,
তাই তাঁর দীক্ষা শিক্ষা উপাসনা লও,
শুধু তোষামোদ করি, তাঁরে নাহি পাওয়া যায়,
সংযম নিয়ম ধরি, ব্রত ধারী হও।
শিব দুর্গা সারাৎসার, লক্ষ্মী নারায়ণ আর,
পুরুষ প্রকৃতি যাঁরা শুদ্ধ সত্ব গুণে,
পুঁছিয়া ফেলিতে কেহ না পারেন এ সংসারে
তব পূর্ব্ব কর্ম্মফল তোষামোদ শুনে!
উপাসনা সনে যদি, সংযম নিয়ম হয়,
পুঁছে যায় পূর্ব্ব কর্ম্ম—ললাট-লিখন,
ক্রমেই ঈশ্বর কৃপা পড়ে আসি শিরে তার,
তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নিমেষে তখন!
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, অচিন্ত্য অব্যক্ত তাহা,
'কপালের লেখা' বলে 'নিয়তি' তাহারে,
না বলিলে এ সকল, সকলে বুঝে না কথা,
সর্ব্ব দিকে সামঞ্জস্য হয় না সংসারে।
বহুজন্ম পুণ্য ফলে তবে তত্ত্বজ্ঞান মিলে,
জীবন্মুক্ত সাধুদের তত্ত্বজ্ঞান স্মরি,
অনুমানে বুঝি বুঝি, আগে কায় মন দিয়া
পুণ্য উপার্জ্জন কর বহু যত্ন করি।
বরষার জলে যথা নিবে যায় দাবানল,
সাধুকর্ম্ম সেই রূপ পুণ্য-জল দিয়া,

নিবায় পাপের অগ্নি জুড়ায় ত্রিতাপ জ্বালা,
ঐকান্তিক শান্তিসুখে পূর্ণ করে হিয়া!
সচ্চিৎ আনন্দ ঘন অখণ্ড চৈতন্য যিনি
মোদের চৈতন্য যাঁর অপষ্ট আভাস,
দিবা নিশি মনে মনে ভাব সে অমূল্য ধনে,
তবে হবে ঈশ্বরের করুণা প্রকাশ।
দেব দ্বিজ গুরু সেবা ভক্তি ভরে করে যেবা,
শাস্ত্রমতে করে যারা সংযম নিয়ম,
তাদেরি উপর হয় ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি,
ব্রহ্মকৃপা নাহি হয় না হ'লে সংযম।
শাস্ত্র-আলোচনা আর সাধু-সঙ্গ, সুবিচার,
এই তিন ধরি ধরি করিয়া প্রয়াণ,
মুক্তি-পথে নিরন্তর হও বৎস অগ্রসর,
মুক্তি-সুধা-সিন্ধু স্নানে এ তিন সোপান।

বিদ্যাধরী উপাখ্যান।

শুন পুনঃ ভরদ্বাজ, আবার বশিষ্ঠ মুনি (নির্ব্বাণ, উত্তর, ৫৮ সর্গ)
কহিলেন রামচন্দ্রে যে সব বচন,
শুনিলে সে তত্ত্বকথা, দিব্য জ্ঞান হবে তব,
আপনা আপনি যাবে ঘুচিয়া বন্ধন!
বশিষ্ঠ দেব বলিলেন—
শুন বৎস মন দিয়া, শুনিয়া জুড়াও হিয়া,
পাষাণ কঠিন কত, দৃঢ় লৌহবৎ,

সেই দৃঢ় পাষাণেও, পরিপূর্ণ পূর্ণ-ব্রহ্ম,
তাই সে পাষাণ মাঝে জন্মায় জগৎ!
সর্ব্ব বিশ্ব সৃষ্টিতেই— প্রতি পরমাণু মাঝে,
পূর্ণব্রহ্ম বিরাজিত অভেদ হইয়া,
পূর্ণব্রহ্ম আর সৃষ্টি, কথাতেই ভিন্ন দুটি,
বস্তুতঃ অভিন্ন ভাবে রয়েছে মিশিয়া।
সূর্য্য-তেজ অগ্নি-তেজ একমাত্র তেজ সেই,
ব্রহ্ম, সৃষ্টি—এক তথা, ভিন্ন ভিন্ন রব,
কাঠুরিয়া কাঠ কাটে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শুনি
এক দুই তিন, কিন্তু এক শব্দ সব।
অজ্ঞান অবোধ যারা বাহ্য সুখে দিশাহারা,
তাহাদেরি ভেদ বুদ্ধি মরণ কারণ,
রামভদ্র এই বিশ্ব আত্ম স্বরূপেই আছে,
জ্ঞান চক্ষু উন্মীলনে কর দরশন।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—

মুনীন্দ্র শুনিনু আমি, আকাশে প্রবেশি তুমি, সঙ্কল্প-আবাসে
শতবর্ষ ধরি দেব, আছিলে সমাধি-মগ্ন, কি ঘটিল শেষে?

বশিষ্ঠদেব বলিলেন—

শুন বৎস আজ সেই, পূর্ব্বের অপূর্ব্ব কথা, কহি সে কাহিনী,
আমার সমাধি ভঙ্গে, শুনিনু মধুর এক নারীকণ্ঠধ্বনি!
নিকটে কামিনী কণ্ঠে, শুনিয়া মধুর স্বর, চাহিলাম ফিরি,
হেরিলাম মম পাশে, বসি জ্যোতির্ম্ময়ী এক স্বর্গ বিদ্যাধরী।
আকাশের মত তার, সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতিমাখা, জড় দেহ নয়,
স্বপ্ন-দৃষ্ট দেহ যথা, সেইরূপ দেহ তার, ব্রহ্ম-ভাব ময়।

স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু থাকে, দর্শন-কারীর নিজ মনেই কেবল,
মন হ'তে ভিন্ন নয়, তবু ভিন্ন বোধ হয়, অনিত্য সকল ;
সেইরূপ বিশ্ব-বস্তু, আত্মার মাঝেই থাকে, আত্মা ভিন্ন নয়,
ভিন্ন তারে ভাবিলেই, পুনঃ পুনঃ দেখি তার উৎপত্তি বিলয় !
স্বপনেই কত জন, ভাবে দেখিতেছি স্বপ্ন ; স্বপ্নে স্বপ্ন যথা,
একটি জগতে থাকি অসংখ্য জগৎ কত, দেখা যায় তথা।
কত যে ফুটেছে চিত্ত, পরব্যোমরূপী সেই, পরব্রহ্ম পটে,
সে অসংখ্য চিত্তমাঝে, অসংখ্য জগৎ-চিত্র ফুটে ফুটে উঠে !
এই যে অনন্ত খেলা, সাগর তরঙ্গ সম, উত্থান পতন,
দিওনা 'তরঙ্গ' নাম, 'সাগর' বলিলে শুধু, অপরিবর্ত্তন !
জিজ্ঞাসি শুনিনু পরে, কহিল কাহিনী মোরে, সেই বিদ্যাধরী,—
পরব্যোম ক্ষুদ্র কোণে, একটি জগৎ আছে, লোকালোক গিরি,
শিখরে অনন্ত শিলা, তাহার উত্তর ভাগে থাকি পূর্ব্ব পাশে,
একটি শিলার মাঝে আমার জগতে আমি স্বামীর সকাশে !

পতি মোর মরি মরি, হয়েছেন ব্রহ্মচারী,
স্থির চিত্তে বসি তিনি সমাধি মগন,
আমি তাঁতে অনুরক্তা বড়ই বিষয়াসক্তা,
তিনি আনিলেন মোরে বিবাহ কারণ !
মানসে কল্পনা করি, খুঁজিলা সুন্দরী নারী,
আমি তাঁর মনোমত হইনু কামিনী,
এ নব যৌবন মোর, তাঁহার তপস্যা ঘোর,
মনাগুনে পুড়ে মরি, আমি একাকিনী!
কঠোর তপস্যা তরে মোরে না বিবাহ করে,
অতি অরসিক তিনি সদা মৌন রন,

আমার জগৎ হায়, নীরস, শুকায়ে যায়,
অনুপায় হ'য়ে করি আকাশ ভ্রমণ!
অনুগ্রহ করি মুনে, আসুন আমার সনে
দেখাব জগৎ মোর কেমন, কোথায়,—
শুনি বিদ্যাধরী সনে চলিলাম ফুল্ল মনে,
লোকালোক-গিরি শৃঙ্গ শোভিছে যথায়!

শুধু শাস্ত্র পাঠ বিফল।

শুভ্রমেঘ-বিমণ্ডিত লোকালোক গিরি শৃঙ্গ
বিদ্যাধরী সনে গিয়া হেরিলাম আমি,
শিলাখণ্ড বিনা আর কিছুই তথায় নাই,
কোথা বা জগৎ তার, কোথা তার স্বামী!
কহিলাম, কহ শুভে, কোথায় জগৎ তব,
কহিয়াছ যাহা তুমি শিলাখণ্ডে আছে?
আমি ত সন্ধান করি কিছুই দেখিতে নারি!
বিদ্যাধরী মধুস্বরে কহে মোর কাছে—
ওই দেখ মুনে তাহা, বলিয়াছি যাহা যাহা
ওই যে অসংখ্য বস্তু মম জগতের,
রবি শশী গ্রহ তারা নদ নদী গিরি বন
ওই যে সম্মুখে তব বিশ্ব আমাদের।
কহিলাম,—বিদ্যাধরি, কিছুই দেখিতে নারি!
দেখি শুধু শিলাখণ্ড, আর কিছু নয়!
বিস্ময়ে সে সুলোচনা, কহিলা আমায় পুনঃ,
সত্য বটে দেখিতে ত পাবে না নিশ্চয়!—

মোদের জগৎ মোরা নিত্য নিত্য দেখি দেখি
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসেই স্পষ্ট হেরি যাহা,
সে অভ্যাস নাই তব, দেখ নাই শোন নাই,
তোমার মানস স্পর্শ করে নাই তাহা!
অভ্যাসের চির জয়, সে অভ্যাসে কি না হয়?
অভ্যাসে না হয় সিদ্ধ হেন কার্য্য নাই;
সে অভ্যাস নাই যার, শাস্ত্রপাঠ বৃথা তার,
সে পাণ্ডিত্যে মূর্খতাই দেখিবারে পাই!
অবোধ অবলা বালা শিলা মধ্যে বিশ্ব হেরি,
দেখিছ না বুদ্ধিমান্ এ বিশ্ব আমার?
অভ্যাস ও অনভ্যাসে কেহ দেখে, কেহ অন্ধ,
ইহা ভিন্ন নাই কিছু কারণ ইহার!
অভ্যাসেই মূর্খ নর, হয় বিজ্ঞ সুধীবর,
অভ্যাসেই গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ করা যায়;
অভ্যাসে হইলে সিদ্ধ দূরলক্ষ্য বাণ-বিদ্ধ,
অভ্যাসে নারকী স্বর্গে অধিকার পায়!
মায়ামোহ ভ্রম যাহা, জ্ঞানের অভ্যাসে তাহা
একেবারে ঘুচে যায় চির দিন তরে,
অভ্যাসের গুণে শুধু নিম্ব লাগে মধু মধু,
অনভ্যাসে কেহ মধু তিক্ত বোধ করে!
সঙ্গ-অভ্যাসেই ভবে শত্রু আসি মিত্র হবে,
অনভ্যাসে আত্মীয় যে অনাত্মীয় হয়,
আকাশ-চৈতন্য যাহা 'জড়' ভাবি লোকে তাহা
অভ্যাসে করিয়া তোলে সুখ দুঃখ ময়!

আকাশই জড় হয়, অমৃতেই মৃত্যু ভয়,
নিরাকারে আকার সে অভ্যাসের ফল ;
শুধু অভ্যাসের বলে মুনি ঋষি শূন্যে চলে,
অধিকার করি বসে আকাশ নির্ম্মল!
পুণ্যও বিলয় পাবে, সিদ্ধিও অসিদ্ধি হবে,
অভ্যাসের ফল কভু নিষ্ফল না হয় ;
নিজ ইষ্ট-সিদ্ধি তরে, অভ্যাস যে নাহি করে,
সে পণ্ডিত শাস্ত্রবাহী বলদ নিশ্চয়!
বন্ধ্যার না পুত্র হয়, অনভ্যাসী সিদ্ধ নয়!
অভ্যাসের কত বল, কর নিরীক্ষণ,—
সংসারে যা ভালবাসি, অভ্যাস করিয়া বসি,
কত কষ্ট ছাড়িতে তা, ছিঁড়িতে বন্ধন!
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে দেখিয়া জ্ঞান বিচারে,
আসক্তি ছাড়িলে কষ্ট অনিষ্ট না হয়,
আত্মজ্ঞান সুবিচার সতত অভ্যাস যার,
'জীবন্মুক্ত' হওয়া তার কঠিন ত নয়!
আঁধার ঘরের হায় সামগ্রী না দেখা যায়,—
পলকে দেখিতে পারি আসিলে আলোক,
সে রূপ অভ্যাস আসি সহজেই ক্লেশ নাশি,
দেখায় অভীষ্ট সিদ্ধি—ভূলোক দ্যুলোক!
কল্পতরু যাচকেরে বাঞ্ছা-ফল দান করে,
সেইরূপ ঠিক কল্প-তরুর সমান,
কেবল অভ্যাস আসি, জগতের দুঃখ নাশি,
সর্ব্ব সিদ্ধি দিয়া তোষে যাচকের প্রাণ!

হ'লে সূর্য্যোদয়-সুখ নিশার আঁধার মুখ
জগতে যেমন হয় তথনি বিলয়,
আত্মজ্ঞান-অভ্যাসেতে ফিরে আর এ জগতে
আঁধার মায়ার মুখ দেখিতে না হয়!
এক কার্য্য বার বার— অভ্যাস নামটি তার,
অভ্যাসই পুরুষার্থ, বন্ধু পিতা মাতা,
অভ্যাস পুরুষকার জীবের সর্ব্বস্ব সার,
অভ্যাসই সর্ব্বসিদ্ধি—সুখ-মোক্ষদাতা!
আপন বিবেক জ্ঞানে ভাল বলি যে যা জানে,
লভিতে কেবল তাহা 'অভ্যাস' উপায়,
থাকিলে সুকৃতি-বীর্য্য, উদিলে অভ্যাস-সূর্য্য,
জগতের শোকদুঃখ—রজনী পলায়।
বুঝিয়া তা মুনিবর, এবে দেখি নিরন্তর, (৩৮ সর্গ)
সমাধি-স্থিরতা যদি অভ্যাস না করি,
ভৌতিক এ জড় বুদ্ধি কিছুতে না হবে শুদ্ধি,
শুদ্ধ সত্ত্বে সূক্ষ্ম দেহ যদি নাহি ধরি।
অজড় আকাশ-দেহ অভ্যাস না হলে কেহ.
রাখিতে না পারে নিজ সঙ্কল্প সুস্থির,
শিলা মধ্যে বিশ্ব সৃষ্টি তাহে না পড়িবে দৃষ্টি,
অভ্যাস না কর যদি আকাশ-শরীর!

আতিবাহিক দেহ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—

শুনি বিদ্যাধরী-বাণী, অন্তরে বিস্ময় মানি
সেই গিরি-গুহা মঝে পদ্মাসনে থাকি,

শুদ্ধ চিৎ ধ্যান ধরি, সমাধি অভ্যাস করি,
লৌকিক সংস্কার যত দূরে ফেলি রাখি !
চিন্ময়ী চিন্তায় মন ক্রমে ক্রমে নিমগন,
সত্য-স্বরূপেতে দৃঢ় অভ্যাসের বলে,
সততই স্বপ্রকাশ প্রাণপূর্ণ 'চিদাকাশ'
চিত্তের-উপরে আসি বসিল কৌশলে !
শুদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান স্মরি, চিদানন্দে স্নান করি,
দেখিলাম পরমার্থ—ঘন তত্ত্ব যাহা,
সেইটিই আত্মা সার, অটল সঙ্কল্প তার
শিলা-খণ্ড মাঝে বিশ্ব গড়িয়াছে আহা !
বিশুদ্ধ 'চেতনাকাশ' শিলারূপে সুপ্রকাশ !
শিলা-ভাব ক্ষণ-স্থায়ী স্বপন যেমন,
স্বপ্নে লোক দেখে হেন, জাগিয়াই আছি যেন,
ঠিক তাই শিলা মধ্যে জগৎ দর্শন !
নিশীথ স্বপনে হেরি যেন মুখ চাপি ধরি
বুক চাপি বসিয়াছে 'মুখ চাপা' ভূত,
স্বপ্নে যদি মৃত্যু ঘটে, যদি না জাগিয়া উঠে,
সত্য হয়ে রয় সেই স্বপন অদ্ভুত !
সে রূপ জগৎ কার্য্য, স্বপ্ন সম কি আশ্চর্য্য !
জগৎ মধ্যেই মৃত্যু হতেছে বলিয়া,
দিব্য জ্ঞান না হওয়ায়, ঠিক সত্য দেখি তায় !
মিথ্যা হয় যদি দেখি জাগ্রত হইয়া।
এক মাত্র ব্রহ্ম বটে, দুটি রূপ তাতে ঘটে,
অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত ব্রহ্ম, শূন্য ও সাকার,

অমূর্ত্ত ব্রহ্মের তটে একটি 'সঙ্কল্প' উঠে,
সেই মূর্ত্ত ব্রহ্ম, ক্রমে স্থূলতা তাঁহার।
আবার আতিবাহিক দেহ নিতে নিতে,
তিনিই অমূর্ত্ত হন পূর্ণ সমাধিতে!
ভৌতিক বা জড় দেহ মানে না ত জ্ঞানী কেহ,
'জড়' নামে কোন বস্তু কোথাও-ত নাই,
দর্পণে যেমন ছায়া, ব্রহ্মে আত্ম-ভ্রান্তি মায়া
ভাসিতেছে, দেখাইছে জড় রূপে তাই!
মরুভূমে দেখে লোক সলিল যেমন,
স্বচ্ছ ব্রহ্মে জড়-দেহ ভাসিছে তেমন!
'বিশুদ্ধ চৈতন্য সার', তাতেই উঠিছে আর
শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রকম্পন—এই দুটি সত্য,
এই দুটি সত্য মানি, মুক্তি পান যোগী জ্ঞানী,
এ দোঁহে যে সুখ আছে, সেই সুখ নিত্য।
রজঃ তমঃ জড়-সুখ অসুখ সকল,—
তাই নিয়া টানাটানি মূর্খের কেবল!
মিথ্যা সে জড়ীয় কান্তি, শিশুর সে ভূত-ভ্রান্তি!
মায়া মত্ত চিত্ত তাহা বুঝিতে না পারে,
সুরামত্ত দেখে নিত্য গাছপালা করে নৃত্য,
লোকজন গিরি-বন সবি যেন ঘোরে!
মায়ামত্ত বিশ্ববাসী সুরামত্ত সম,
ঘুরে মরে এ সংসারে, বুঝে না যে ভ্রম!
ছায়া কায়া বিদ্যাধরী শেষে মোরে সঙ্গে করি,(নির্ব্বাণ-উত্তর৬১ স)
শিলাস্থ ব্রহ্মাণ্ডে এক উপনীত হয়,

সে বিশ্বের ব্রহ্মা তথা যোগে মগ্ন শম্ভু যথা,
তাঁহার সম্মুখে দেবী কহিলা আমায়,—
ইনিই আমার স্বামী, হের তপোধন,
সঙ্কল্পে সৃজিলা মোরে বিবাহ কারণ।
পোষি মোরে এত দিন, নিজে তপস্যায় ক্ষীণ,
আর ত আমায় নাহি করিলা বিবাহ,
সর্ব্বত্যাগী আমি তাই, বৈরাগ্যের সীমা নাই;
হের ওই ধ্যানমগ্ন স্বামী অহরহঃ;
স্বামীর অন্তর লয় হতেছে যখন,
আমার সম্ভোগ-আশা গিয়াছে তখন!
সে ব্রহ্মার সম্মুখেতে, কহে দেবী জোড় হাতে,
উঠ নাথ এসেছেন অতিথি হেথায়,
হও সাধু-সেবা রত, মহাত্মার মহাব্রত,—
শুনি ব্রহ্মা চক্ষু মেলি দেখিলা তাঁহায়।
ধীরে ধীরে অতিথিরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
বসিতে আসন দেন যতন করিয়া,
কহিলেন—মুনিবর হও হেথা অগ্রসর,
আসন গ্রহণে লও অতিথি-সৎকার,
আমি কহিলাম তাঁরে,— কহ দেব সত্য মোরে,
বিবাহ না কর কেন এ নারী তোমার?
সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কহিলা তখন—
সত্যই কহিব মুনে, কর তা শ্রবণ।

বাসনা-কুমারীর ব্রহ্মলাভ।

এক নিত্য সত্য যাহা, চিরানন্দময় তাহা,—
আমার সর্ব্বস্ব ছিল, সেই সত্য সার,
কালক্রমে নিত্যধন, হইলাম বিস্মরণ,
জন্মিল 'বাসনা' চিত্তে—"আমি ও আমার"।
এই সে 'বাসনা' নাম্নী মলিনা কুমারী,
এই ছিল এক দিন পরমা সুন্দরী!
বাসনা-কুমারী ওই, আমি ত পৃথক নই,
তুমিই পৃথক কায়া দেখিছ এখন,
বাসনা-কন্যার তাই, পৃথক জনম নাই,
আমার গৃহিণী নয়, করিনি সৃজন!
নিজ দোষে ভাবাবেশে দুঃখ পান ইঁনি,
নিজেই ভাবেন, আমি 'ব্রহ্মার গৃহিণী!'
এই চিত্তাকাশ মম, এখানে উঠিছে ভ্রম,
ত্যজি তাই চলি যাই ব্রহ্ম-চিদাকাশে,
আজি চিত্তাকাশে মোর ঘটিবে প্রলয় ঘোর,
বাসনা-কুমারী তাই মরিছে হুতাসে!
সে কৃশাঙ্গী মিথ্যা দেহ ছাড়িয়া এবার,
যাবে মিশে ব্রহ্মাকাশে সঙ্গিনী আমার!
নতুবা দাঁড়াতে তার বিন্দু স্থান নাহি আর,
"আমি" যথা যাব মম বাসনা তথায়,
কমল শুকায়ে যায়, সৌরভ কি থাকে তায়?
"আমি" গেলে সে বাসনা দাঁড়াবে কোথায়?

অণুতে অণুতে বিশ্ব অজ্ঞানেই থাকে,
কোটীসূর্য্য তেজে জ্ঞান ভস্ম করে তাকে!
এই যে বাসনা দেবী, মরে লোক যারে সেবি,
মূর্খের নিকটে তার এমনি প্রভাব,—
চিত্ত গড়ে, বিশ্ব গড়ে, পড়ি উঠে, উঠে পড়ে,
মুগ্ধ করে মূঢ় নরে—কুলটা স্বভাব!
কৌশলেতে পাতে বেটী বাতাসেতে ফাঁদ,
মূর্খেরে ধরিয়া দেয় আকাশের চাঁদ!
সেই দেবী আহামরি সত্ত্বময়ী রূপ ধরি
তত্ত্বজ্ঞানী-পাশে গিয়া ব্রহ্মরূপা হন,
ব্রহ্মরূপা সেই দেবী দেখান ব্রহ্মাণ্ড-ছবি,
সঙ্কল্পেতে বিশ্ব হয়ে শিলাখণ্ডে রন!
বায়ুর স্বভাব যথা কম্পন কেবল,
ব্রহ্মের সঙ্কল্প-সৃষ্টি—স্পন্দন সকল!
জ্ঞানধন-আত্মাতেই অভিন্ন জগৎ এই,
সাগরে পৃথক জল সম্ভব ত নয়,
সেই রূপ ব্রহ্মাকাশে, সৃষ্টি ও প্রলয় আসে,
ব্রহ্মাকাশ হ'তে তাহা পৃথক কি হয়?
চির সুখময় ব্রহ্মে উঠিছে স্পন্দন,—
জন্ম মৃত্যুময় স্বপ্ন করিছে সৃজন!
হে সাধো, বিদায় দেও, আপন জগতে যাও,
শান্তিলাভ কর গিয়া সমাধি-আসনে,
আত্ম ধামে আমি যাই আমার "বাসনা" তাই
মিশে যাক ব্রহ্মানন্দ-শান্তিনিকেতনে!

'আমি' ও 'আমার' মিলি যাই অতঃপরে,
স্বদেশে তুরীয় ব্রহ্মে—আপনার ঘরে!

অপূর্ব্ব সাধুসঙ্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি বলিলেন,—(নির্ব্বাণ, উত্তরভাগ ২১৫ সর্গ)

রাজন্ অরিষ্টনেমী,—শুনিলে ত তুমি?
কহিনু যা প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজে আমি?
এই সেই রাম-কথা—বশিষ্ঠ সংবাদ,
যাহা শুনি দূরে যায় সংসার-বিষাদ।
শ্রীরাম-চরিত শুনি নরপতি সবে
চিরানন্দময় হন চির দিন ভবে!
জীবন্মুক্ত হও শুনি তুমিও রাজন্,
ব্রহ্মে থাকি কর এই ব্রহ্মাণ্ড পালন।

রাজা অরিষ্টনেমী কহিলেন,

বশিষ্ঠের উপদেশ শুনি তব মুখে, (২১৬ সর্গ)
আজি মুক্তিলাভ দেব করিলাম সুখে!
এই মহাতত্ত্ব জ্ঞান অমৃত কেবল,
ধন্য আমি ধন্য আমি! জীবন সফল!

অপ্সরা সুরুচিকে ইন্দ্রদূত কহিলেন,

শুনিলে, হে ভদ্রে, শেষে ইহাই বলিয়া
আমায় কহিলা রাজা বিনয় করিয়া,
ইন্দ্রদূত, নমস্কার, সাধু-বন্ধু তুমি,
সাধুরাই চিরবন্ধু জানিলাম আমি!
ফিরে যাও দেবলোকে, আমি হেথা থাকি,
অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্মে সুখে মন রাখি!

শুন শুভে,—শুনি সেই রাজার বচন,
আহ্লাদে বিস্ময়ে আমি হইনু মগন্!
সেই জ্ঞান-তত্ত্ব শুনি কৃতার্থ হইয়া,
বুঝিলাম সুলোচনে বিচার করিয়া,
রোগশোক পাপতাপ জরা মৃত্যু আর,
নাশিতে উপায় এক 'সাধু-সঙ্গ' সার!
ফিরিয়া আইনু এই রাখিয়া রাজায়,
বিস্তারি বশিষ্ঠ-বাক্য কহিনু তোমায়।
বশিষ্ঠের জ্ঞান লভি বাল্মীকির পাশে,
এবে আমি জীবন্মুক্ত, যাই দেব-দেশে!

অপ্সরা সুরুচি কহিলেন,

দেবদূত নমোনমঃ, কি কহিলে তুমি,—
তত্ত্ব শুনি সুরাপানে মত্ত যেন আমি!
তোমা হ'তে পাইলাম জীবন্মুক্ত ভাব,
বুঝিলাম সাধুসঙ্গে কি পুণ্য প্রভাব!
বুঝিলাম মম সম বুদ্ধি শুদ্ধি হীনা
অবলার মুক্তি নাই সাধু-সঙ্গ বিনা!

পুত্র কারুণ্যের প্রতি অগ্নিবেশ্য ঋষি কহিলেন,—

কারুণ্য, শুনিলে বৎস অপ্সরার কথা?
সুরুচি অপ্সরোত্তমা রহিলেন তথা
হিমাচল শিরে, গন্ধমাদন শিখরে,
লভিলা আনন্দ-মুক্তি ব্রহ্মাকাশ পরে।
কারুণ্য, বশিষ্ঠ বাক্য করিলে শ্রবণ?
মুক্তির কারণ কিবা— বুঝিলে এখন?

শুধু জ্ঞান, শুধু কর্ম্ম, মুক্তিপ্রদ নয়,
মুক্তি হয় জ্ঞান কর্ম্ম মিলিলে উভয়!
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত বুঝিলে এখন,
যাহা ইচ্ছা তাহা কর, কে করে বারণ?

ঋষিকুমার কারুণ্য কহিলেন,

জ্ঞানামৃত পানে পিতঃ ধন্য আজ আমি,
জন্মদাতা অমরতা—মুক্তিদাতা তুমি!
তব বাক্য সুধাপানে সর্ব্ব দুঃখ নাশ,
বশিষ্ঠের বাক্যে প্রাণে ধরে না উল্লাস!
দূরে গেল আজ মোর জড়বুদ্ধি যত,
যত দুঃখ হয়ে গেল বন্ধ্যাপুত্র মত!
শ্রীরাম-চরিত শুনি—কহিলা যা তুমি,
রঘুকুলোত্তম সম জীবন্মুক্ত আমি!
সংসারের সাধু-কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম জানি,
সকলি করিব পিতঃ, 'জীবন্মুক্তি' মানি!

অগস্তি মুনি কহিলেন,

হে সুতীক্ষ্ণ দ্বিজোত্তম, লভি তত্ত্ব জ্ঞান,
মনুষ্য অন্তরে যদি রাখে সেই ধ্যান,
তা'হলে সংসার কর্ম্মে বন্ধন না থাকে,
মায়া মোহ শোক তাপ ছাড়ি যায় তাকে!
উৎসাহে সুকর্ম্ম কর ব্রহ্মে রাখি ধ্যান,
সুকর্ম্মই ব্রহ্মকর্ম্ম—আনে ব্রহ্ম জ্ঞান!
কর্ম্মে জ্ঞানে কি সম্বন্ধ বুঝিলে এখন?
সংসারে সুকর্ম্ম কর দিয়া প্রাণ মন!

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন,—

মুনীন্দ্র শুনিয়া তব অমৃত বচন
বশিষ্ঠের মহাবাক্য করিয়া শ্রবণ,
এত দিন পরে আজ বুঝিলাম সার,
"শুদ্ধ চৈতন্যেতে" মগ্ন নিখিল সংসার !
সংসারে সুকর্ম্ম যত সাধুশাস্ত্র মতে,
সকলি করিব আমি মাতি উৎসাহেতে !
সাধু বাক্য প্রাণে ঐক্য হ'লে এক বার,
লঙ্ঘিবারে এ সংসারে সাধ্য আছে কার !
এত দিন 'জীবন্মৃত' ছিলাম যে আমি,
আজি মোরে 'জীবন্মুক্ত' করি দিলে তুমি !
তোমাকেই বার বার করি নমস্কার,
অহো কি অমৃতময় হইল সংসার !
থাকিয়া পরমানন্দে পরমাত্ম ধ্যানে,
সাধিব "সংসার-ধর্ম্ম" দিব্য ব্রহ্মজ্ঞানে !
"অমৃত-সমাধি" শেষে হইবে আমার !
গুরুদেব, গুরুদেব, পদে নমস্কার !

ব্যাসায় বিষ্ণু-রূপায় ব্যাস-রূপায় বিষ্ণবে ।
নমো বৈ ব্রহ্ম-বিধয়ে বশিষ্ঠায় নমোনমঃ ॥

সমাপ্ত ।

সুধাকর-গ্রন্থাবলী।

শ্রীমৎ কুমার নাথ সুধাকরের

অধ্যাত্মভারত—দশম পর্ব্ব।

অমৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীঅমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায়,

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি।

৩০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস।

গুপ্তপ্রেশ

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুধাকর-গ্রন্থাবলীর সমস্ত পুস্তক সর্ব্ব পুস্তকালয়ে

এবং

৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, মুখার্জী এণ্ড কোং

ঠিকানাতেও প্রাপ্তব্য।

অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

 মূল্য ৷৷০ আট আনা

আশীর্ব্বাদ।

নলডাঙ্গা-রাজধানী খ্যাত যার নাম,
যশোর জেলায় সেই নলডাঙ্গা গ্রাম।
তার মাঝে দিব্য পল্লী শ্রীগুঞ্জনগর,
পরিপাটি রাজবাটী শোভিত সুন্দর!
দক্ষিণে 'অভয়-ধাম' অতি সন্নিকটে,
মৃদুগতি 'বেগবতী' তটিনীর তটে।
পলাশ কাঞ্চন কাশ শিমুলের ফুল,
করিছে আকাশ-মাঠ আলোকে আকুল!
শীষ দেয় দধিয়াল রসালের শাখে,
মনোহর সরোবর পথিকেরে ডাকে!
শাখে শাখে পাখী ডাকে ফল ফুল শোভা,
ফুটে ওঠে প্রকৃতির হাস্য মনোলোভা!
মুগ্ধ হয় আসি দগ্ধ লোক সহরের,
নিরখি গোধন ধান্য শ্যাম প্রান্তরের!
আম জাম নারিকেল কাঁটাল গুবাক্
ঘেরিয়া রয়েছে বাড়ী হেরিয়া অবাক্!
সেথা সে 'অভয়-ধামে' ভ্রাতুষ্পুত্র মম,
শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথ কুল-চন্দ্র সম,
পিতার 'বসতি' রক্ষা করে পুত্র সনে,
চির সুখী দীর্ঘজীবী হোক্ দুইজনে;
অন্ন-পূর্ণ গৃহ হোক্, অন্নপূর্ণা দারা,
ধনধান্যে পরিপূর্ণ গোধনেতে ঘেরা।
আমার অমৃত-গ্রন্থ তাই স্নেহ ভরে
অর্পিলাম প্রাণাধিক নগেন্দ্রের করে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ভূমিকা।

বিন্ধ্যাচলে পিতৃদেবে প্রথম সে দেখি,
বহুতীর্থ ঘুরি আসি শ্যাম সরে থাকি।
তপোবন-গিরি তটে শেষে হয় কথা,
লিপিকর আমি তাহা লিখিলাম তথা।
বশিষ্ট-সৌরভকণ করিয়' হরণ,
হরে যথা ফুলগন্ধ মন্দ সমীরণ,
সযতনে পিতৃদেব মাখাইলা তায়,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা ব্রজগোপী গায়।
অধ্যাত্ম ভারত কথা স্বর্গের সোপান,
দশম পর্ব্বেতে শুন অমৃতের গান।

স্বামী বলিলেন—হে চন্দন-পঙ্ক-শোভিতে দেবি, ঐ দেখ গিরি-প্রবাহিনী তটে শ্যামল ছায়ায় কুসুমস্মিত-শোভিনী বন-দেবী কেমন বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। ঐ দেখ পর্ব্বত-প্রান্তে মধুমদ-ঘূর্ণিত-লোচনা শবর-রমণীগণ চম্পক-শাখায় বিনতা হরিৎলতা বন্ধন করিয়া কেমন দুলিতেছে। প্রাভাতিক সৌরী-প্রভা দর্শনে ময়ূর ময়ূরী বৃক্ষ-শাখায় পক্ষ বিস্তার করিয়া কেমন নৃত্য করিতেছে। ঐ দেখ, পুষ্পবর্ষী সুরভিত বনমধ্যে চমর-মৃগগণ কেমন ছুটাছুটি করিতেছে! ঝর্ঝর্ শব্দে গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে! ঐ দেখ, শস্যক্ষেত্রে কৃষক-কামিনীগণ শশীকলা-প্রবাহ-ধৌত কুসুমা-করের ন্যায় মুখমণ্ডল হইতে বিলোল অলক-ভ্রমর উড়াইয়া দিয়া,

শরতের শুভ্র মেঘের ক্রীড়া দর্শন করিতেছে। অয়ি ব্রহ্ম-বিলাসিনি, এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ কি রমণীয় স্থান। ঠিক যেন প্রাণ-স্বরূপ বিশ্বনাথের অমৃতময় শান্তি-মন্দির।

প্রিয়তমা কহিলেন—হে প্রিয়তম, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা দর্শন করিয়া অন্তরে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইতেছে! ভগবানের এই জড়-রাজ্যের রচনা কি অনির্ব্বচনীয়। তোমার নিকট শুনিয়াছি জড়াতীত আকাশ-রাজ্যে দেবগণ বাস করেন। ইতি পূর্ব্বে আমরাও সেই দেবলোকে ছিলাম, মানব-লীলার বাসনায় জড় রাজ্যে আসিয়াছি। এই লীলাভিনয় শেষ করিয়া আবার সেই দেবলোকে প্রস্থান করিব। তোমার নিকট শুনিয়া শুনিয়া সেই আকাশ-লোক ক্রমে আমার মানসপটে উদিত হইতেছে। এই জড়-জগতের জড়-ভাগ ত্যাগ করিতে পারিলে চিন্ময় আকাশে কতই সুন্দর সৃষ্টি প্রকাশ পাইবে, তাহা ভাবিলে মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

স্বামী বলিলেন—

শুন প্রিয়তমে দেখ ভাবি মনে ইহাতে নাইক ভুল,—
কেমন স্মরণ হতেছে এখন—আকাশে ফুটিত ফুল!
বাতাসের পথে বাতাসের রথে ছুটিতাম তব সনে,
শবদ পরশ গন্ধ রূপ রস পশিত আকাশ-মনে।
বিনা জল মাটি তেজঃবায়ু খাঁটি ধরিয়া আকাশ-দেশে,
কত যে ভ্রমণ করেছি দুজন স্মরণ হতেছে শেষে।
দেব-মনোলোভা ভোগমোক্ষশোভা আছিল মোদের তথা,
জীবন্মুক্তভাব, দেবতা-স্বভাব অন্তরে অন্তরে কথা।
সুখময় দেশ, নাই দুঃখলেশ এবে বেশ মনে প'ল,
দর্পণের মাঝে মূর্ত্তি যথা সাজে তেমতি মূরতি ছিল!
স্ফটিক-নির্ম্মল গঠন কেবল সকল আকাশ-বাসী,
আকাশের বেশ আকাশের কেশ আকাশে উঠিত ভাসি,
অটল যৌবন আছিল তখন,—আপন বাসনা-বশে,
দুটি দিন তরে এসেছি সংসারে খেলিতে মাটির রসে!

তোমায় আমায় যাইব তথায় আবার ছুদিন পরে,
সে যে কি সুন্দর দেশ মনোহর ব্যাকুল তাহারি তরে—
আকাশের মাঝে আকাশই সাজে আকাশ-গঠন যত—
চিন্ময় কানন গিরি নদী বন বিহঙ্গ কুরঙ্গ কত!
মানুষেরা তথা চিন্ময় দেবতা করিছে কতই খেলা,
কভু পিতৃলোকে কভু শিবলোকে কভু বা গোলকে লীলা!
কভু কৃষ্ণে লয়ে ব্রজগোপী হয়ে বিমানে করিছে বাস,
ছাড়ি জড়তত্ত্ব প্রেমে উনমত্ত আকাশে চিন্ময় বাস!
মাটিতে যে ক্ষয় সেখানে তা নয় প্রেমের বর্দ্ধন শুধু,
আনন্দ আনন্দ কেবল আনন্দ মধুরে মধুরে মধু!
সকলের মন [illegible] দর্পণ, সক[illegible]
শরীর

[illegible]চারত পরাণ কাড়িয়ে লয়।

পিক-নাদিনী প্রিয়ম্বদা মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ইন্দু-সুন্দর আর্য্যপুত্র, যোগবাশিষ্ঠ অতি দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ, মায়া-মুকুলিত-লোচনা ললনাগণ ইহা কিরূপে বুঝিবে? যদি সহজে আমাকে বুঝাইয়া দেও, তবে নারীকুলও আনন্দে সেই সূক্ষ্ম পরমানন্দ-পথে বিচরণ করিতে পারিবে। তোমার ভোগমোক্ষ-শোভার অর্দ্ধভাগ আমাকে প্রদান কর। বিদুষী ভারত-ললনা অত্রী গার্গী লোপামুদ্রা দেবহুতি যে জ্ঞানে পারদর্শিনী হইয়া বেদের বহুবিধ সূক্ত রচনা করিয়া ছিলেন, আমাকে সে বিষয়

জ্ঞান প্রদান কর। আর ব্রহ্মবিজ্ঞানের শেষভাগে ভোগমোক্ষ-শোভা-শোভিতা জীবন্মুক্তা কুসুম-স্তবক-স্তনী ব্রজগোপীর যে অপূর্ব্ব প্রেমের কথা শুনিয়াছি, তদ্বিষয়েও আমাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান কর।

স্বামী বলিলেন—হে শুভে, জ্ঞান ও প্রেম লাভই মানব-জীবনের সার্থকথা। মানব-সমাজ কতদূর উন্নত হইয়াছে—দেখিতে হইলে, নারীসমাজ কতদূর উন্নত হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে। নারীশক্তিই সমাজের যথার্থ শক্তি; অধিক কি নারীই শক্তি স্বরূপিনী। অবোধগণ তাহা একবারও মনে করে না। তাহারা মনে করে যে, সেই মহাশক্তি কেবল রন্ধন ও গর্ভ-

[illegible] ও নির্ম্মল

[illegible]

ব্রহ্ম-জলদের [illegible]

এবং সুবর্ণ পঙ্কজের ন্যায় চির-অম্লান-শ্রী ধারণ কর।

অয়ি অলি-নয়নে, সাধু-সেবা ও শাস্ত্র-কথার দিনকেই 'দিন' বলিয়া জানিবে; আর সকল দিনই অন্ধকারময়ী ঘোরা রজনী! তাহাতে কেবল পেচকেরই দৃষ্টি খুলিয়া থাকে। মহাতেজা মহাজন গণের মহা বাক্য শুনিয়া যে পরমানন্দ অনুভূত হয়, দেবেন্দ্র-ভবনে পারিজাত-পুষ্পের সৌরভও সে আনন্দ বিতরণ করিতে পারে না, ইহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। সিদ্ধি-দাতা গণপতি সর্ব্বথা তোমাদের সিদ্ধি প্রদান করুন।

যোগবাশিষ্ঠ-প্রবোধ ও ব্রজলীলা রসায়ন

প্রথম প্রবোধ

মোক্ষ লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠ দেব বলিলেন, "বৎস, বিষয়ের বিস্মরণই পরম মঙ্গল ও চরম সুখ। ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র। এই চৈতন্য মাত্র হওয়াই নির্ব্বিকল্প সমাধি। আর নিষ্কাম ভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে পারিলে সবিকল্প সমাধি হয়।"—এই কথা শুনিয়া সাধারণে ভাবেন যে, যদি সকল লোক এখনই সেই পরব্রহ্মে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ও কাঠ পাথরের ন্যায় হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে। তবে জগতের উন্নতি হইবে কি রূপে? বস্তুতঃ সে আশঙ্কা আদৌ নাই। বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মের কথা শুনিয়া তত দূর উচ্চে উঠিতে উঠিতে কাহারও শত বৎসর, কাহারও বা শত জন্ম সময় লাগিবে। আজ তুমি, কাল আমি, এই রূপে কোটী কোটী মানব কালে কালে মোক্ষ পাইবে। এই সুদূর ব্যবধান মধ্যে উঠিবার পথে শত শত অবস্থা ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। ফট্ করিয়া বুঝিয়া চলিয়া যাইব, সেটা বালক বুদ্ধি মাত্র।

মোক্ষ বা অমৃত, জিনিষটা কি, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। এক জন বলিয়াছিল "আ! চরণামৃত কি অমৃত!— খেয়ে দেখি যে জল।" তাই না হয়। সেই অমৃত বুঝিয়া তাহাতে লক্ষ্যমাত্র রাখিয়া, ঐ সুদূর অমৃত-পথের টানে টানে কিছু দূর রজোগুণের আকর্ষণে, কিছুদূর সত্ত্বগুণের আকর্ষণে শত অবস্থায়, শত সহস্র লোকের গতিবিধি হয়। শত শত কার্য্যও ঐ রূপ শত শত অবস্থায় আরম্ভ হয়। মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া সেই সুদূর উচ্চে উঠিতে গেলেই পথিমধ্যে কোথাও কর্ত্তব্যবোধে ক্রোধাদি, কোথাও শান্তি, কোথাও মহত্ব, কোথাও বীর্য্য, কোথাও ব্রহ্মচর্য্য, কোথাও পুরুষত্ব কোথাও জড়কে তুচ্ছবোধ, কোথাও কর্ত্তব্যে সর্ব্বস্ব দান, প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গল ভাবের কার্য্য সকল ক্রমে ক্রমে অবস্থানুসারে আসিতে থাকে। মোক্ষ একমাত্র চিৎ বা চৈতন্য হইলেও ঐ মোক্ষে যাইবার সুদূর-বিস্তৃত সমস্ত পথই এইরূপ নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

নিষ্কাম হইব—এই ক্ষুদ্র কথাটার সাধন করিতে গেলে, পথি-মধ্যে রজঃ গুণের উর্দ্ধভাগে, কর্ত্তব্যে সর্ব্বস্ব দেওয়ার কার্য্য আরম্ভ হয়। কোথাও রজঃ-সত্ত্বমিশ্র গুণের উন্নতি হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলমিশ্রিত উন্নতি আপনিই সাধিত হইয়া পড়ে। কোথাও বা সত্ত্বগুণের চরমে গিয়া তবে নির্ব্বিকল্প বিদেহমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইচ্ছা করিলেই হয় না। মোক্ষের কথাটা মনে বুঝিয়াই তখনি ভাবি "মোক্ষ হইলে জগতের উপায় কি হইবে? আমি মোক্ষে যাব না।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁতীকে বলিয়া-ছিলেন, তুমি বৈকুণ্ঠবাসী হও। তাঁতী বলিল—"বৈকুণ্ঠের হাটে

সুতা সথা কেমন? আমার ছেলে পুলের উপায় কি হবে? আমি বৈকুণ্ঠে যাব না।” আমি মোক্ষ পাইলে জগতের গতি কি হবে? এ ভাবনাও ঐরূপ হাস্যজনক।

ধন পরিবারে বদ্ধ, মত্ত মোহিত চিত্ত সংসার-উন্নতির জন্ত ঐ রূপ অতিশয় ভাবান্বিত হইয়া প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। উন্নতি যে কি, তাহা মায়া-মুগ্ধ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মানব একেবারেই বুঝিতে অক্ষম। স্বার্থ ও অহংকে ধীরে ধীরে শিথিল করাই যে উন্নতির পথ ও চরমে পরম সুখ, তাহাও কামিনী-কাঞ্চন মুগ্ধ সাধারণ লোকের ঠিক থাকে না। মহা-পুরুষেরা তাহা ঠিক রাখেন ও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাঁহারা সেই পথে চলিয়া যাবতীয় জাগতিক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়া দেন। যদি সেই পথে ঈষৎ অগ্রসর হইতে পার, তবেই ধন্য হইবে ও জগতের উন্নতি করিতে পারিবে।

মোক্ষ থাকিবে লক্ষ যোজন দূরে; সেই মোক্ষের হাওয়ার টান আসিয়া রজঃ ও সত্ত্ব গুণের পূর্ণতা সাধন করিয়া ভবসাগরে উন্নতির তুফান তুলিয়া দিবে।

মোক্ষ পাইবে কে? হাজারের মধ্যে কেহ যদি পায়। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য মোক্ষ নহে, মোক্ষকে লক্ষ্য করা যায়। তাহা হইলেই ভূতলে সহস্রবর্ষব্যাপী উন্নতি ও মঙ্গলের তুফান ছুটিবে। তার পরে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি-স্রোত চিরদিন সমান রাখিয়া কেহ কেহ মোক্ষ লাভে সক্ষম হইতে আরম্ভ করিবেন।

ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি একযোগে, ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে সেই “সম্পূর্ণতার” দ্বিতীয় নামই মোক্ষ। উহাই

লক্ষ্য কর। তাহা হইলেই শেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইবে।

আগেই সমাপন হয় না। এক ইংরাজ বলিলেন—বৃদ্ধ চাষা বাঙ্গালায় জমিতে উত্তম চাষ কিসে হয়? আমার ফসল ভাল হইতেছে না কেন? চাষা বলিল—হুজুর, পহেলা চাষ বীজ ফেলিলে ফসল ভাল হয় না। সেই জন্য দোস্‌রা চাষ দিয়া তাহার উপর আবার যদি তেস্‌রা চাষ দিয়া বীজ ফেলা যায় তবেই সর্ব্বোত্তম ফসল হইবে। তখন ঐ ইংরাজ নিজের জমীতে গিয়া চাষাকে বলিলেন—তোম্ শুয়ার, কোন্ চাষ দেতা হ্যায়? কৃষক হাত জোড় করিয়া বলিল, হুজুর পহেলা চাষ দেতা। ইংরাজ বলিলেন তোম্ শুয়ার, কুছ্ জান্তা নেই, আগাড়ি তেস্‌রা চাষ লাগাও, ওহি সব্‌ছে আচ্ছা হ্যায়। ইংরাজের মূর্খতা বুঝিয়া কৃষক অবাক্ হইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

ঐ ইংরাজের ন্যায় কেহ যেন. 'মোক্ষই আচ্ছা হ্যায়" শুনিয়া পহেলাই তেস্‌রা চাষ না দেন যাহাই শ্রেষ্ঠ তাহাই যে শ্রেয়ঃ হইবে এরূপ নহে। দেশ কাল পাত্র দেখিয়া, শ্রেয়ঃ কি, তাহা স্থির করিতে হয়। মোক্ষে লক্ষ্য রাখিলেই ক্রমে ফসল বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই।

গীতায় আছে—এই ধর্ম্মের স্বল্পেই মৃত্যু ভয় নিবারণ করিবে। রজঃ তমঃ একটু খর্ব্ব হইলে সত্ত্বগুণে মোক্ষ সহজেই আরম্ভ করা যাইবে। রজঃ গুণের শেষ করিতে ও সত্ত্বগুণের পূর্ণতা সাধন করিতে, বহুকালে বহুকার্য্য দ্বারা, মানব সমাজের অশেষ উন্নতি সাধন হইবে। পরে ধীরে ধীরে কেহ কেহ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবেন।

মোক্ষকে লক্ষ্য করিলেই, মোক্ষ না পাইলেও, অন্ততঃ ক্ষিতি অপ্ এই দুটি, অর্থাৎ জীবের অন্নজলময় যে জড় দেহ, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এবং তেজঃবায়ু ব্যোমের সূক্ষ্ম অংশে গঠিত যে আকাশ-দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ তাহা পাওয়া যায়। মোক্ষ কি, তাহা ধারণা করা কঠিন; কিন্তু আকাশ-দেহ যে কত সুখময় তাহা ধারণা করা সহজ। আগে এই সুখময় সূক্ষ্ম দেহটা ধারণায় আনিতে পারিলে, শেষে মোক্ষ লাভ করাও সহজ হইবে। "জগৎ মিথ্যা" শুনিয়াই লোক ভয় পায়, আর যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থ পড়িতে চাহেনা। কিন্তু জগৎ সেরূপ ভয়ানক মিথ্যা নহে। ইহা সুখহীন ও প্রাণহীন থাকায়, ইহাকে যথার্থ সুখময় ও প্রাণময় করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। জগতের অনিত্যতাই মিথ্যা। ব্রহ্ম-রঙ্গালয়ের অভিনয়ই জগৎ সংসার। ইহাতে ভয় কি? বরং অতীব আনন্দ। ঘরের টাকা দিয়া লোক মিথ্যা অভিনয় [illegible] যাহারা মিথ্যা অভিনয় করে, তাহাদেরও [illegible] পা যায়। ভাল অভিনয়ে অনেক লাভও [illegible] অভিনয় মাত্র"—এই কথা বিস্মরণ [illegible] হইয়াছে, বাঘে ধরার মত মৃত্যুভয় [illegible] সাবিত্রী সাজিয়া পতি-শোকে রোদন করেন, সেই সময়েই ঠিক জানেন ও স্মরণ রাখেন যে তিনি বস্তুতঃ শ্যামবাবু। সেইরূপ ব্রহ্ম এক সময়েই ব্রহ্ম ও জগৎ। তুমিও এক সময়েই, দিব্যজ্ঞানে স্মরণ রাখিয়া ব্রহ্মচৈতন্য ও মনুষ্যরূপ-খণ্ডচৈতন্য হও। ইহাই বেদান্তের উদ্দেশ্য, ইহাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

তমোগুণের আভা রজোগুণের নিম্ন অর্দ্ধ পর্য্যন্ত যায়।

রজোগুণের আভা সত্ত্বগুণের নিম্নঅর্দ্ধ পর্য্যন্ত যায়। সত্ত্বগুণের আভা গুণাতীতের মধ্যেও কিছুদূর প্রবেশ করে। এই সুদূর-বিস্তৃত শতজন্মব্যাপী পথে নানাবিধ গুণের মিশ্রণে, নানারূপ কার্য্য সাধন হয়। তারপরে সে সকল উত্তীর্ণ হইলে, তবে মোক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

আকাশের মধ্যে মেঘাদির গতিতে ত্রিকোণ বা গোলাকার নানারূপ খণ্ডাকাশ দেখা যায়। সেইরূপ এক শুদ্ধ চৈতন্যের মধ্যেই মানবদৃষ্টির গতিতে, নানারূপ খণ্ডচৈতন্য দৃষ্ট হয়। উহাই নানারূপ দেবলোক, নরলোক ইত্যাদি।

জলরাশির উপরে যেমন জলের রেখায় গড়া, নানারূপ ঘূর্ণপাক দেখা যায়, সেইরূপ এক অখণ্ড চৈতন্যরাশির উপরে, চৈতন্য-রেখায় গড়া, নানা গণ্ডি দৃষ্ট হয়, উহাই কৃষ্ণলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, পিতৃলোক, গোলক, ভূলোক প্রভৃতি। মাটির উপরে যেমন মাটির মানুষ চলিয়া তেমনি আকাশ-গঠিত মানুষ চলিয়া বেড়া ঐ আকাশ-গঠিত দেহকেই আ[illegible] কৃষ্ণ বিষ্ণুর দেহ অতিবাহিক [illegible] দোষে দূষিত হয়, আকাশ [illegible] দোষে আদৌ দূষিত হয় না। এজন্যই "দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা।" এ কথা সত্য ও নির্দ্দোষ। এই জন্যই কৃষ্ণ-লীলাদি সম্পূর্ণ দোষশূন্য।

দন্তহীনতা, কেশ-পক্কতা, দুর্ব্বলতা, কুব্জতা, চর্ম্ম শিথিলতা প্রভৃতি বৃদ্ধকালের লক্ষণ। দেহ গেলে আত্মদর্শীর আকাশ-দেহ বা তেজোময় দেহ মস্তকের দিক হইতে বহির্গত হইয়া

যায়। তখন তাঁহার বার্দ্ধক্যের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। ঐ দেহ পূর্ণতেজঃ পূর্ণউৎসাহ ও পূর্ণশক্তিসম্পন্ন হইয়া পূর্ণ-যৌবন শ্রীতে আকাশপথে, ধূম ও বাষ্পের ন্যায় দিব্য আকৃতি লইয়া উঠিয়া যায়। ঐ আকাশদেহের পরম-সুন্দর স্ফটিক নির্ম্মল শ্রী ধারণ করার পরে জীবের মোক্ষ অন্বেষণ করা সহজ হয়। লম্ফ দিয়া মোক্ষফল পাড়া যায় না। চারা গাছের প্রথম ফলের অঙ্কুর দুই বৎসর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে, পরে ঐ গাছে অধিক মিষ্ট, বড় ও অধিক-পরিমাণ ফল ধরে ; সেইরূপ সমাধি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া না দিলে অর্থাৎ জীবন্মুক্তশ্রী ও ভোগমোক্ষ-শোভা ধারণ করিয়া উহার ভোগ শেষ করিয়া না গেলে, সমাধিসাধন অসম্পূর্ণ থাকে এবং আবার নিম্নস্তরে আসিতে হয়। ব্রজ-গোপীরা এইরূপ নিত্যসিদ্ধা, জীবন্মুক্ত-শ্রীসম্পন্না ও ভোগ-মোক্ষ শোভা-সমন্বিতা। তাঁহাদের আতিবাহিক দেহ অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়। শ্রীবৃন্দাবন এইরূপ—

"জগৎ-সুন্দর, প্রাণ-সুখকর,
যতেক সামগ্রী আছে,
সবার জীবন, দিয়া বৃন্দাবন,
সুগঠিত হইয়াছে।
সুন্দর যতেক, লই পরতেক,
জড়ভাগ ফেলি দিনু,
লাবণ্য লইয়া স্তরে সাজাইয়া
বৃন্দাবন করেছিনু।
বাতাবী ফুলের গন্ধ এক পাত্র,
আনিলাম প্রিয়ে, দেখ এইমাত্র।

'ফটীক জল' পাখীটি সংসারে
রসিক জনেরে আনন্দ বিতরে।
সে পাখীর সুর পাত্রেতে পুরিয়া
রাখিয়াছি হেতা, এই দেখ প্রিয়া।
চৌষট্টি রাগিণী নানা রূপ ধারী
দাঁড়ালেন পাত্র হাতে সারি সারি!
শ্যাম কহে—এঁরা "ভাব" জগমাঝে,
বৃন্দাবনে দেহ লইয়া বিরাজে!
কবিতার রস যতনে মথিয়া,
আনিয়াছে এরা পাত্রেতে পুরিয়া।
ইহাঁদের বাস এই স্থানে হয়,
জগতে এঁদের ছায়া মাত্র পায়!
বৃন্দাবনে জীব করে আগমন,
তবে সব দুঃখ হয়ত মোচন।
নব নব রূপ নিমিখে নিমিখে,
নূতন আস্বাদ চুমুকে চুমুকে!
রঙ্গিণী কহিছে হাসিয়া হাসিয়া,
আমি বর নিব সবার লাগিয়া,
মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া
খেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া।" (কালাচাঁদ-গীতা)

চিন্ময় আকাশে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ ভাবই সহজে ধারণ করা যায়। যাহা দৃঢ় ভাবিবে, তাহা সত্য হইয়া দাঁড়াইবে।

ব্রজভাবের চরমেই শ্রীরাধার তন্ময়ত্ব বা সমাধি। রাধা বলেন, "আমি কৃষ্ণ আমি কৃষ্ণ, সুন্দর সুন্দর!"* বেদান্তের

কথাটাই প্রকারান্তরে সাধারণ লোকদিগকে সহজে বুঝান হইয়াছে মাত্র। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, অসুরবধ, মথুরাগমন প্রভৃতি বর্ণনা যেন জড়জগতের ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সে কেবল লোককে আকর্ষণ করিবার জন্য লীলা-কৌশল মাত্র। নিত্য-বৃন্দাবনের কথা এই যে—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি,
বৃন্দাবন ছাড়ি সখি, এক পা যাবনা আমি।

অর্থাৎ তিনি চিরবর্ত্তমান—নিত্য সত্য। জ্ঞানীর জন্য সূক্ষ্মদিক্ আর অজ্ঞানীর জন্য স্থূলদিক্ সর্ব্বলোকে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আছে। আপন আপন উপযুক্ততা অনুসারেই ভাবগ্রহণ হয়। অবতার-বাদের সহিতও এই মহাবিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। কারণ সকলই পর পর অবস্থা মাত্র। যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি যত্নের সহিত অভ্যাস করিলেই এই সকল ধাঁধা, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সর্ব্বত্র সমস্ত ভাবই রক্ষা করিয়া সর্ব্বাবস্থা বুঝিতে পারিয়া, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া যায়। কিছুই হারায় না বা নষ্ট হয় না, হারায় কেবল মূর্খতা ও মরণ; তখন দুঃখমাত্রেই বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়।

নাচান জননী, যিনি 'আমি'র সাগর,
'আমি'র তরঙ্গমালা বক্ষের উপর।
উঠি পড়ি লক্ষ 'আমি' নাচে মাতৃকোলে,
অন্ধেরা সে নৃত্যকেই জন্মমৃত্যু বলে!

মহা চৈতন্যরূপী সেই একমাত্র "পূর্ণ আমিই" অমৃত-সাগর। তাহার বিন্দুমাত্র কণিকাই লক্ষ লক্ষ জীবরূপে "আমি আমি"

করিয়া বেড়াইতেছে। আমির বাচ্চা আমি! তাহাতেই আমি এত মিষ্ট! এমন মিষ্ট, যে এরূপ মিষ্ট আর নাই! সেই দেব-বাঞ্ছিত "আমি"র মত জিনিস ত্রিজগতে কিছুই নাই। বিধাতাও "আমি"র মতবাঞ্ছনীয় নহেন। কেবল সেই "পূর্ণ-আমিকে" দেখিলেই 'বাচ্চা আমি' মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া পড়ে—"অনলে পতঙ্গ যেমন"। মাতৃক্রোড় কিনা? আত্ম-বিসর্জ্জনের এমন সুখময় স্থান ত্রিজগতে আর নাই। অথণ্ড চৈতন্যরূপ অমৃত-সাগরের বক্ষের উপরে, জীবরূপ অমৃত তুলিয়া তুলিয়া রেখা সৃজন করিয়া গোল গোল বৃত্ত গঠন করিতেছে। ঐ অমৃত-সাগরে মানুষ কীট পতঙ্গাদি কত যে অমৃত-রেখা উঠিতেছে পড়িতেছে তাহার সংখ্যা নাই; পরমানন্দ রূপ "আমি," "আমি" ভিন্ন কাহারও মুখে দ্বিতীয় কথা নাই। যতই "আমি আমি" করে, ততই মধুরতার তুফান ছুটিতে থাকে। জীব "আমি আমি" করিয়া তুচ্ছ জীবনও বিসর্জ্জন দেয়! আবার এক 'আমিতে' আর এক 'আমি' মিশাইতে পারিলেই জীবন সার্থক ও ধন্য বোধ করে। এই 'আমির' মিষ্টতাই বলিয়া দেয় যে "আমি অমর ও অনন্ত সুখের আকর"। এই ব্রহ্মাংশ আমিতে এত মধু যে বাক্যে বলা যায় না। এই 'আমি আমি' রূপ অমৃত-রেখা যখন "মহা আমি" রূপ অমৃত-সাগরে মিশাইয়া যায় তখন কি "কাঠ পাথর" হইয়া যায়? তখন "আমিতে" যত মিষ্ট ছিল, সেই মিষ্টি, কোটী "আমি"র মিষ্টতা পাইয়া কোটীগুণ মিষ্ট হইয়া উঠে। সেই কোটীগুণ মিষ্টতাই, অনন্ত শান্তি ও পরম-পরিতৃপ্তি আনিয়া 'সমাধি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ' নাম ধারণ করে। উহা "কাঠ পাথর" নহে।

জীব যখন সেই "অমৃতময়ী চেতনার" তৃপ্তিময় বক্ষে বিশ্রাম লাভ করে, সেই মাতৃক্রোড়ে প্রাণ জুড়ায়, তখন যাহারা "মরিল মরিল!" "বাবা কোথা গেলিরে" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে, তাহাদের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক মূর্খ ত্রিজগতে আর কে আছে? তাহারা বুঝিতে পারে না যে উহাই 'অমৃত'! উহাই অনন্ত তৃপ্তির মাতৃক্রোড়।

"কণা মাত্র সুখ যার এ বিশ্ব পাইয়া,
অমৃত-সাগরে কেন রয়েছে ডুবিয়া।"—(তারা-মা)

ইতি প্রথম প্রবোধ।

দ্বিতীয় প্রবোধ।

মোক্ষ কি? মায়া বদ্ধ মনের লয়। মন লয় হইলে অবশিষ্ট থাকে "শুদ্ধ চৈতন্য"। সেই শুদ্ধ চৈতন্যের ঈষৎ আভাসই মন। মন গেলে অখণ্ড ব্রহ্ম থাকেন। মোক্ষ পাইতে হইলে এই মনের মলিনতা দূর করিতে হয়, তাহাকেই মনোলয় বলে। কিন্তু এক্ষণে অনেক লোক আগেই তেসরা চাষ দিয়া এক অদ্ভুত মোক্ষ লাভ করিতে চান। তাহাতে জড়তারূপ তমোগুণেরই বৃদ্ধি হয়। একজন বলিয়াছিল—শ্যামচাঁদ, তোমার বিয়ে হবে কবে? শ্যামচাঁদ বলিল—বাবা বলেছে পরশু, মা বলেছে কা'ল। আচ্ছা হাঁরে শ্যামচাঁদ, তুই কি বলিস্? শ্যামচাঁদ বলিল—আমি বলি "এখুনি"।

জগৎ জ্বালায় ঝালা পালা, মোক্ষ পাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়.

শুনিয়া মোক্ষ পাইতে যাই। গুরু বলেন—জন্ম জন্মান্তরে মোক্ষ হবে। বাবা বলেন—আরে, বৃদ্ধকালে হবে, এখন কি? আমি বলি—"এখুনি"।

"এখুনি" যে মোক্ষ তাহা "কাঠ পাথর" বই আর কি হইবে? ঘোর তমঃ। সত্ত্বগুণের বিকাশ ও তত্ত্ব-প্রকাশকেই মনের লয় বলে এবং উহাকেই উন্নতি বলে। চিত্ত লয় হইলে, সত্ত্ব ও তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ মলিনতা গিয়া নির্ম্মলতাই থাকে। মোক্ষের জন্য কর্ম্মযোগে আগে সত্ত্ব ও তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই মোক্ষের পথে মানব সমাজের উন্নতি অনিবার্য্য। যদি কেহ "কাঠ পাথর" হওয়াই সমাধির অর্থ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহার গতি তদ্রূপই হইবে। যার "এখুনি" তার "এখুনি"। যেমন মতি, তেমনি গতি।

ভারতের বেদান্তের মৃতদেহে আর প্রাণ নাই। বেদান্ত যদি জীবন্ত থাকিত, তবে পারত্রিক উন্নতি ও ঐহিকের উন্নতি দুইটী দিকই নিকৃতির ওজন সমান উঠিত।

বেদান্তের চরম কথা কোন্ সাধু না বুঝিয়াছেন? বেদান্তের চূড়ান্ত কথাই "তত্ত্বমসি" 'অহং ব্রহ্ম'।

"আমি ও আমার পিতা এক। আমাকে দেখিলেই পিতাকে দেখা হয়।" (খৃষ্ট)

এইত বেদান্তের চরম জ্ঞান। "অহংব্রহ্ম" কি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয়?

"ঈশ্বর আমার দোস্ত, এক প্রাণমন, এক আত্মা"।—(মহম্মদ)
— "সকল মঙ্গলাকর নির্ব্বাণই আমার স্বরূপ।" (বুদ্ধ)
"জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।" (রামপ্রসাদ)

"যখন আমি আমার মায়ের বুকে মাথা দিয়া থাকি, তখন আর আমার নিজের পৃথক অস্তিত্ববোধ থাকে না।" (নববিধানাচার্য্য)

"আমি কৃষ্ণ সুন্দর সুন্দর।" (গোপীবাক্য)—কি অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব। সকলেই সেই সো'হং সো'হং বলিতেছেন। শ্রীরাধার ও শ্রীগৌরাঙ্গের দশম দশায় আর কিছুই থাকিত না। একেবারেই কাঠপাথর। নাসাগ্রে তুলা ধরিলেও আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইত না—। উভয়েই বলিতেন "আমি কৃষ্ণ! আমি কৃষ্ণ!" এই একীভূত তন্ময়ত্বই ব্রহ্মত্ব। তবে যে শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিলেন "ন্যাড়া, আবার বেদান্ত পড়াইতেছিস্?" বলিয়াই চপেটাঘাত। ইহা ঠিকই হইয়াছে। বেদান্ত শুনিয়া মাত্র যাহারা "কাঠ পাথর" হইয়া বসে, এবং সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে চপেটাঘাত কর—শ্রীগৌরাঙ্গের এই উপদেশ। মহাপ্রভু বলেন—"বেদান্তের ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা বিশেষ"। ইহা ত ঠিক কথা।

বাহিরে দেখ, কৃষ্ণভক্ত উত্তরমুখে, খৃষ্টভক্ত দক্ষিণ মুখে যান। শঙ্কর পূর্ব্বমুখে, বুদ্ধ পশ্চিম-মুখে যান। ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখ, উত্তর দক্ষিণ আর নাই, নির্ম্মল আকাশে সকল দিকই লয় পাইয়াছে।

"অতি উচ্চে উঠলে রথ, যে দিক যাবে সেদিক পথ।" সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিয়োগ করিতে জানে না। কেবলই পরপর যোগ করিয়া সর্ব্ব রক্ষা করে। সমস্ত ধর্ম্মকে আপনার অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছে।—বাহিরের ধর্ম্মে নহে, অন্তরের জ্ঞান তত্ত্বে।

মোক্ষ সকলের জন্য নহে। তবে মোক্ষ, মোক্ষাভাস, মোক্ষ-সেবকের সেবা ইত্যাদি নানাভাবে নানালোক অবস্থান করে

ও উচ্চ সাধুরাই সকলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম রাজ্যের সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডল যাহারা পরীক্ষা করিতে পটু, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন।

মোক্ষের অবস্থাটা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে একটু বলা যায় এই যে, দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইলে "প্রকাশ" বলিয়া যেমন একটী "মহাপ্রকাশ" হয়, সেই প্রকাশটার ন্যায় "প্রকাশই" মোক্ষের অবস্থা। ইহাই সর্ব্ব-প্রকাশ রূপ মোক্ষ, ইহাতেই অমরতা বা অমৃত বর্ত্তমান, উহাই মহাপ্রাণের মহাবিকাশ। যার ইচ্ছা হয় সে ঐ 'মহাপ্রকাশকে' খণ্ডাকারেও দেখিতে পারে, অখণ্ড ভাবেও দেখিতে পারে।

মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন সুখে স্থির হইয়া থাকে, সাধুগণ সমাধিতেও সেইরূপ সুখে নিস্পন্দ হইয়া থাকেন। অত্যধিক সুখেই শিশু স্থির হইয়া যায়। যে একটু হাঁসিতে খেলিতে চায় সে মায়ের বুকেই হাঁসে খেলে। তাহাতে বাধা কি? বাধা এই যে, অত্যধিক সুখ হইলেই বাহিরে নিস্পন্দ কাঠপাথর হইতে হয়। নির্ব্বোধ মানব, হাসিতে খেলিতে পাইব না বলিয়া, যেন ভীত না হয়; চৈতন্য-সমাধিতে সমস্তই থাকে।

সত্ত্বগুণই "প্রকাশ"।—মোক্ষ "অনন্ত প্রকাশ"।

পূর্ণ "আমি"কে লইতে গেলে "ক্ষুদ্র আমি"কে ছাড়িতে হয়। দুগ্ধ হইতে মাখম তুলিয়া কে দুগ্ধের জন্য রোদন করে? দুগ্ধের জল-ভাগ নষ্ট করিলে কষ্ট কি? উহা হইতে মন্থন করিয়া নবনী উঠাও, আর উহা জলে মিশিবে না। তাহাকে ঘৃতে পরিণত করিয়া আরও উত্তাপে বাষ্প করিয়া উড়াইয়া দেও, দিগন্তব্যাপী হইয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বে থাকিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করুক।

এই জগৎটা ইন্দ্রধনুর ন্যায়। ইন্দ্রধনু সূর্য্য-রশ্মির ক্ষণিক প্রতিবিম্ব মাত্র। জগৎটাও ব্রহ্মের ক্ষণিক আভাস মাত্র। সূর্য্যই ইন্দ্রধনু গঠন করেন, ব্রহ্মই জগৎ গঠন করেন। আবার জ্ঞান-চক্ষুতে দেখ, সূর্য্য ধনু গঠন করেন না, মনুষ্য-চক্ষুই ঐরূপ দেখে। ব্রহ্মও জগৎ গঠন করেন না, মনুষ্যই ঐ রূপ দেখে।

"তরঙ্গ" বলিলেই উত্থান পতন। সমুদ্র-বক্ষ বলিলে সত্য কথাও হইবে, তরঙ্গও থাকিবে। কেবল ভয় থাকিবে না। জীব যেন আপনাকে "জীব" না বলে। "তরঙ্গ" বলিলেই পৃথক ক্ষুদ্রত্ব বোধ হয়।

এই সৃষ্টি পৃথক উৎপন্ন হয় নাই, অনুৎপন্ন। তরঙ্গ-উৎপত্তিতে একটা অন্য কারণ আছে, তাহা বায়ু। সৃষ্টি-উৎপত্তিতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কারণ নাই। বায়ুবিহীন তরঙ্গ অসম্ভব। অন্য কারণ না থাকাতে ব্রহ্মে সৃষ্টি অসম্ভব। আদৌ হয় নাই। তবে সৃষ্টি কি? ব্রহ্মআলোকের আচ্ছাদনরূপ অন্ধকারটা অর্থাৎ ভাল করিয়া না দেখিতে পাওয়ার নামই সৃষ্টি। অন্ধকারটা একেবারেই অবস্তু। সৃষ্টিটাও অবস্তু, মিথ্যা।

ব্রহ্ম-আলোকের আচ্ছাদনই সৃষ্টি, কিন্তু আলোকের অভাব নহে। অভাব বলিলে দোষ হয়, কারণ ব্রহ্মের কোথাও অভাব নাই। তাই ভ্রান্তি রূপ আচ্ছাদন বলা হইল, ভ্রান্তিও অবস্তু।

ব্রহ্মে কার্য্য ও কারণ এক হইয়াছে। নতুবা কারণ ছাড়িয়া গিয়া, কার্য্য আর পৃথক হইয়া কোথায় দাঁড়াইবে? আর ত স্থান নাই। যে কারণ সেই কার্য্য,—সুতরাং যে ব্রহ্ম সেই জীব। উহা শুধু জ্ঞান-নেত্রেই দেখা যায়। অজ্ঞানীর নিকট জীব ও ব্রহ্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ, চিরদিন আছে ও চিরদিন থাকিবে।

শুদ্ধ-চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী। তাহার মধ্যেই যে "মনযুক্ত চৈতন্য" তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই সত্য-সঙ্কল্প ঈশ্বর, তাঁহাকে তিন ভাগ করিয়া বলিলে "ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব"হন। তিনি সত্য হইতে জন্মিয়া, মূল সত্যের জোরে, যেরূপে যাহা সঙ্কল্প করেন, সেইরূপেই তাহা করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহাকে সত্য-সঙ্কল্প সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়। সোণার বালা যদি সত্য হয়, তবে তার সোণাই সত্য, বালা সত্য নহে, ক্ষণিক ভ্রান্তি মাত্র। সেইরূপ ব্রহ্মই সত্য, জগৎ সত্য নহে। ব্রহ্মের সত্যতাই জগতের সত্যতা। কাঠের গায়ে খোদা ছবি কাঠের সহিত অভিন্ন, কিন্তু ভিন্ন দেখায়। তেমনি ব্রহ্মের গায়ে খোদা জগৎ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন দেখায় মাত্র। পুতুল গড়িবার আগেই মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পুতুল উদয় হয়; তেমনি ব্রহ্মাকাশে বা চিদাকাশে স্থূল দেহ বিহীন সূক্ষ্ম "সঙ্কল্প জগৎ' উদয় হয়।

ব্রহ্মা আর জন্মান না। চিরদিনই ব্রহ্মেস্থিত। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা কারণ ও কার্য্য, একই। বায়ু না থাকিলে জল ও তরঙ্গ একই।

ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের অন্য শরীর নাই। সঙ্কল্প-মনই তাঁহার শরীর। মনের মধ্যে স্বপ্ন বা চিন্তার ন্যায় জগৎ উৎপন্ন বোধ হয়।

আত্মজ্ঞান হইলে বরফ আচ্ছন্ন শ্বেতবর্ণ বনের ন্যায়, মনোরাজ্য একাকার হইয়া যায়।

নাম ব্যতীত শূন্যের অন্য আকার নাই। নাম ব্যতীত মনেরও আকার নাই, মন সঙ্কল্প মাত্র। সেই সঙ্কল্পযুক্ত চৈতন্যই ব্রহ্মা।

কেবল চলিত-ব্যবহার ভাবেই "জগৎ" বলা যায়। ঐ জগৎকেই পরমার্থভাবে "ব্রহ্ম" বলা যায়। সৃষ্টি বাস্তবিকই অনুৎপন্ন। মন ছাড়া "জগৎ" কোথায়? মনটী সঙ্কল্প মাত্র, জগৎ তাই।

সেই অখণ্ড চৈতন্যের নাম বা উপাধি মিথ্যা, কেবল মিত্র কার্য্যের জন্য চৈতন্য, ব্রহ্ম, পুরুষ ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়।

সূর্য্য হইতে অভিন্ন কিরণের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-দেবতারা লোকের নিকট প্রকাশ পান। তাই ব্রহ্মা-বিষ্ণুও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ব্যোম চিন্তায় ব্যোম ও জগৎ চিন্তায় জগৎরূপ ধারণ করেন।

যিনি নটের ন্যায় বাহিরে কামক্রোধাদির অভিনয় করিয়াও, অন্তরে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও স্থির থাকেন, তাঁহাকেই "জীব-ন্মুক্ত" বলে। সোণার বালায় সোণাই আছে, তরঙ্গে শুধু জলই আছে জগতে শুধু ব্রহ্মই আছেন। বায়ুতে কম্পন, আকাশে শূন্যতা, আলোকে তেজঃ অভিন্ন ভাবে আছে; ব্রহ্মেও সৃষ্টি তেমনি অভিন্ন ভাবেই আছে। মাটির হাঁস মাটিই; হাঁস নামটা মিথ্যা। শুধু ব্যবহারিক সত্য। তেমনি জগৎটা ব্রহ্মই, জগৎ নাম মিথ্যা, শুধু ব্যবহারিক সত্য। এ সব নামতঃ ভিন্ন, বস্তুতঃ এক। শাদা কাপড়ে শ্বেতবর্ণটার ন্যায় ব্রহ্মেই জগৎটা অভিন্ন ভাবে আছে। জগৎ নাই—তার মানে, ব্রহ্ম ছাড়া স্বতন্ত্র জগৎ নাই।

দর্শনকারী দর্শনের বস্তু ও দর্শন—এই তিনটীতেই যিনি সমভাবে আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। একটা থামের গায়ে খোদা ছবি আছে, খোদার পূর্ব্বেও ঐ থামে ঐ ছবির সম্ভাবনা ছিল, সেই জন্যই শেষে ছবি বাহির হইল। সেইরূপ ব্রহ্মেও এই জগতের 'সম্ভাবনা' থাকাতেই ব্রহ্মকে একেবারে 'শূন্য' বা 'কিছুই না' বলা যায় না। আকাশেও অনেক সম্ভাবনা আছে। এ সব দৃষ্টান্ত মাত্র। কতকটা প্রবোধের জন্য বলা হয় মাত্র। নতুবা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দৃষ্টান্ত নাই। কেননা জগৎই ব্রহ্ম, জগৎ উৎপন্ন

হয় নাই। জীবের নিকটই উহা একটা মিথ্যা ভ্রান্তিরূপে রহিয়াছে মাত্র; আত্মদর্শীর নিকটে উহা একেবারেই নাই। বালক একটু আঁধার দেখিলেই ভূত দেখে, জ্ঞানিরা তাহা কিরূপে দেখিবেন? সেই ভূতের কথা ঐ বালককেই জিজ্ঞাসা কর। তেমনি 'কোথায় জগৎ দেখিল?' তাহা মূর্খদের নিকটেই জিজ্ঞাসা করিবে।

হাঁড়ি কলসী সমস্ত মাটিবই কিছুই নহে। জগৎও তেমনি ব্রহ্মবই কিছুই নহে। ব্রহ্ম এই জগতের কারণও নহেন। তিনিই স্বয়ং জগৎ। জগৎ ত উৎপন্ন হয় নাই। আঁধারের ন্যায় জগৎ অবস্তু। অবোধেরাই বলে—ব্রহ্মই জগতের কারণ।

চিদাত্মা মনরূপ ধারণ করিয়া জগৎ দেখেন। যেখানে পূর্ণ আলোক, সেখানে আঁধার থাকা অসম্ভব। যেখানে পূর্ণ ব্রহ্ম সেখানে জগৎ নাই।

তাজা মানুষ স্বপ্নে যেন দেখে—আমি মরিতেছি। ব্রহ্মও সেইরূপ যেন স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া ভাবেন আমি মানুষ হইয়াছি, মরিতেছি! কিন্তু ব্রহ্ম কেন সঙ্কুচিত হন? আত্মদর্শী দেখেন আদৌ সঙ্কুচিত হন নাই। অবোধেরা দেখে, যেন সঙ্কুচিত হইয়াছেন।

দর্পণের মধ্যস্থ ছায়া-পর্ব্বত যেমন দর্পণের বাহিরে যাইতে হইলেই মরিয়া যায়, আর থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মাভাস জীবও জগৎদর্পণের বাহিরে যাইতে হইলেই যেন মরিতেছে বোধ করে। দর্পণের মধ্যে পড়িয়া পর্ব্বতের মৃত্যুভয়, আর চিত্তদর্পণে পড়িয়া চিৎ-ব্রহ্মের মৃত্যুভয় যার পর নাই হাস্যজনক ব্যাপার! মিথ্যাটা যখন বস্তুই নয়, তখন তার আবার জন্ম মৃত্যু কোথায়?

ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাণ্ড নামটা কল্পনা মাত্র। আদি সত্য যে বস্তু

তাহা কেবল জ্ঞানেতেই দেখা যায়। তাহার নাম নাই। নাম রূপ কল্পনাই জগৎ। ঐ কল্পনাই দ্বন্দ্ব বাধাইয়া জগৎ-রূপ একটী কোলাহল-ঝগড়া উৎপন্ন করিয়াছে।

অসংখ্য সঙ্কল্পই অসংখ্য জীবরূপ ধারণ করিয়াছে। প্রথম সঙ্কল্প রূপ জীবই ব্রহ্মা। চিত্রকরের চিত্তে কল্পিত ছবির ন্যায় তিনি আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম শরীর ধারী। সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্প, দীপ হইতে দীপ, সেইরূপ ব্রহ্মা হইতে বহু জীবের সৃষ্টি।

সূর্য্যের যে নিকটতম কিরণ, তাহা সূর্য্যই, প্রায়ই একরূপ। সূর্য্যের দূরবর্ত্তী মাটির গায়ে যে কিরণ, সে নানা ভাব যোগে নানা ভঙ্গিময়। তেমনি রজঃ তমঃ যুক্ত জীব নানা দশা প্রাপ্ত, কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্ব-জীব প্রায়ই ব্রহ্ম। তাই হরিহর কৃষ্ণাদি ব্রহ্মই। সূর্য্যের নিকটতম তেজের নিকট গিয়া সে তেজকে সূর্য্য না বলিয়া থাকা যায় না। অনেক গাছ শীতকালে শুকাইয়া গিয়া মূলের মধ্যেই থাকে, বর্ষাকালে বাহিরে একটা ব্যবহারিক অর্থাৎ বাহ্যিক রূপ বাহির করে মাত্র। মানুষও আকাশে আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভাবেই থাকে, যখন জন্মায় তখন বাহিরে মাটির উপর একটা ছায়া-রূপ বাহির করে মাত্র। চিরস্থির অখণ্ড-চৈতন্যের ক্ষণস্থায়ী স্ফূর্ত্তিই যেন আপনা-আপনি 'নাম-রূপ' গ্রহণ করেন। ঐ ক্ষণিক স্ফূর্ত্তীর নামই 'অহংভাবন' বা মন। সমস্ত সৃষ্টিই সেই শুদ্ধ চৈতন্যের বিবর্ত্তন মাত্র। বিবর্ত্তন মানে—যাহা তাহাই আছে অন্যরূপ দেখাইতেছে মাত্র। মায়া বা ভ্রান্তি যোগে অজ্ঞানীর নিকটে শুদ্ধ চৈতন্যে ঐরূপ সৃষ্টি বোধ হইয়া থাকে। মণির জ্যোতির ন্যায়, কর্ম্মটা কর্ত্তার ভাব; জগৎটাও সেইরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ বা ভাব মাত্র।

তৃতীয় প্রবোধ

"চিৎ" যদি সূর্য্য হন, তবে জগৎ তাঁহার দিনমান। দিনমানটা সূর্য্যবই কিছুই নয়, জগৎটা চিৎব্রহ্ম বই কিছুই নয়। চিৎ মধু, জগৎ তাহার মধুরতা। চিৎফুলের সুগন্ধ এই জগৎ। জগতের আকারই চিৎসত্তার আকার। জগৎকে নমস্কার। আকাশে ময়লা নাই, চিদাকাশেও অহংরূপ ময়লা নাই। পাতার গায়ে রেখার মত, অভিন্ন ভাবেই ব্রহ্মের গায়ে জগৎ আছে। জগৎ অসৎ অর্থাৎ নাই। ব্রহ্মস্বরূপেই জগৎ সৎ অর্থাৎ আছে। নির্ব্বোধেরাই জগৎ ও ব্রহ্মপৃথক্ দুইটী জিনিস ভাবিয়া রাখিয়াছে।

ইন্দ্রধনুর অগ্রভাগ যেখানে মাটিতে পড়ে, সেখানে সুবর্ণপাত্র পোঁতা থাকে শুনিয়া এক দরিদ্র সেই দিকে দৌড়িতেছিল; শেষে ধনু আকাশে মিলাইয়া গেল, স্থানটা আর খুঁজিয়া পাইল না। তখন তার যে দশা, সংসার-সুখ-অন্বেষণকারীরও ঠিক সেই দশা। সংসার ইন্দ্রধনু, ঐ সংসারের সুখ আর কিছুই নহে, সেই স্বর্ণপাত্র মাত্র। দর্পণের মধ্যে ও বাহিরে পরিষ্কার রূপে সেই একই পর্ব্বত দেখা যায়। আত্মদর্শীরা পরিষ্কাররূপে জগৎ-দর্পণের মধ্যে ও বাহিরে একই ব্রহ্মমাত্র দেখেন। জগৎ তাঁহাদের সম্মুখে নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়াছে। বড় আর্শীর মধ্যে আপন ছায়া দেখিয়া চড়ুই পক্ষী যেমন উহা ঠোকরাইতে থাকে, জীবও সেই রূপ জগৎ-দর্পণে নিজ ছায়া দেখিয়া, ঠোকাঠুকি করিয়া বেড়াইতেছে। অহো, কি সুন্দর ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে।

জল, বীচি, তরঙ্গ—একই জল। ইহলোক, স্বপ্নলোক, পরলোক—একই লোক, সেই চিদাকাশ মাত্র।

প্রিয়তমার মৃত্যুতে একটা দিন এক বৎসর বলিয়া বোধ হয়, জগতের কাল-ভ্রান্তিও ঐরূপ। অনেকের কাছে প্রতারণাই পরম লাভ! নির্ব্বোধের নিকট জগতের লাভটাও ঐরূপ। জীবন্মুক্তগণ এই জগৎকে "আঁধারের মধ্যে ভোজবাজীর ন্যায় তামাসা" বুঝিয়াই হাস্য করেন; দ্বেষ করেন না।

মরণ একটা মূর্চ্ছা মাত্র। মরণ-মূর্চ্ছার পরেই সাধারণ জীবের আবার সৃষ্টি বোধ উদয় হয়। তার বশে পুনর্জ্জন্ম ঘটে। যাঁহার চিন্ময় বোধ থাকে তিনি সূক্ষ্মলোকে ব্রহ্মক্রোড়ে স্থান পান। অভ্যাস-যোগে ভেদজ্ঞান-রহিত না হইলে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন হয় না। অভ্যাস করিতেই শিখিবে। বিচারে বুঝা যায় বটে, আয়ত্ত হয় না। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দেহ ব্রহ্মের সহিত অভেদ। ঐ দেহ ত্যাগের আবশ্যক নাই। উহাতেই পূর্ণব্রহ্ম মিলিত হন। এইটী বিশেষ বুঝা চাই, তবেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু বুঝা যাইবে।

যখন দেখি, এটা রজ্জু, সর্প নহে, তখন "সর্পটা কোথায় গেল?" বলা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি চিন্ময় দেহ পাইলে "জড় জগৎটা কোথায় গেল?" বলাও অতিশয় হাস্যোদ্দীপক, বাস্তবিক আকাশে ধূলি নাই, কল্পনায় সত্য নাই, জলে তরঙ্গ নাই ব্রহ্মেও জগৎ নাই,—এসব কল্পনা মাত্র।

সুখ দুঃখ দেখি আমি জ্ঞানচক্ষু দিয়ে,—
আমারি সে বন্ধ্যা মায়ের নাতি-পুতের বিয়ে।

মণির জ্যোতির মত ব্রহ্মে ছায়া-জগৎ দেখা যায়। বাসনা ক্ষয় হইলে, স্থূল দেহ মনে আসিলেও, তাহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ থাকিয়া যায়। বাসনার অবসানে সূক্ষ্ম আতিবাহিক চিন্ময় দেহ প্রকাশিত হয়। ক্ষুদ্র জগৎ-জ্ঞান গেলেই বিশাল জ্ঞান প্রকাশ

পায়। তখনই কেবল চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, কৃষ্ণলোক, গোলক, ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক সমস্তই ইচ্ছা করিলে দর্শন করা যায়। নারদ ইচ্ছা মাত্রেই ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেন।

কেবল মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতেই জগৎটা ভ্রম মাত্র। ইহা যে কিঞ্চিৎ বুঝে, সে কিঞ্চিৎ মুক্ত। মূর্খের নিকটেই জগৎ বজ্রের ন্যায় কঠিন। আকাশে কিছুই নাই, তথাপি নীল চাঁদোয়ার মত দেখা যায় কেন? কেবল দৃষ্টিদোষে। জগৎটা কিছুই নহে, তথাপি প্রত্যক্ষ দেখায় কেন? কেবল দৃষ্টি দোষে।

চিৎ-চৈতন্য সর্ব্বভেদী, তাহাই আতিবাহিক সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে, কেহই তাহাকে অবরোধ করিতে বা বাধা দিতে পারে না।

ভূত যেমন মরণ পর্য্যন্ত ঘাড়ে চাপিয়া থাকে, এই জগৎ-ভ্রমও মূঢ়গণের স্কন্ধে সেইরূপ চাপিয়া থাকে। মূঢ়া নারীগণ বালা হার অনন্ত ইত্যাদিই দেখে, স্বর্ণ দেখিতে জানে না। অজ্ঞানীরাও স্ত্রী পুত্র টাকা দেখিতে জানে মাত্র, মূল যে চিৎধাতু ব্রহ্ম, তাহা দেখিতে জানে না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অন্তরের সঙ্কল্প-জগৎ বাহিরে ঘনীভূত ভাবে ঠিক সত্যের মতই দেখা যায়। মূলস্থ অখণ্ড চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই ঐরূপ অন্তরে বাহিরে একরূপ দৃষ্ট হন। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম আছেন, তা ছাড়া আবার একটা জগৎ আছে-এ অসম্ভব কথা জ্ঞানীরা বুঝিতে পারেন না। অগ্নির ভাব উষ্ণতা, ব্রহ্মের ভাব জগৎ, একই জিনিষ অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল। কেহ তাহাকে জগৎ বলিয়া ফাঁদে পড়িয়াছেন, কেহ বা পরমাত্মা বলিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।

নিজ চিৎশক্তিই তপস্থার রূপ ও দেবতার রূপ ধারণ করিয়া কর্ম্মফল দান করেন্।

ভ্রমদর্শীর অভাবে ভ্রম থাকে না। ভ্রমদর্শীই মন। মন গেলে আত্মা বা চৈতন্য থাকে। মন গেলে কেবল ময়লাটা যায়, মনের বিশুদ্ধ অবস্থা থাকে, তাহাই আত্মা বা চৈতন্য। তাহার নামই সত্তা বা সত্ব বা তত্ব। মন গেল বলিয়া সত্ব বা তত্ব যায় না। চিত্ত মানে চিৎ ভাব। ভাবটী গেলে চিৎ থাকে। চিৎ মানে অখণ্ড চৈতন্য।

যেখানে যেমন বাসনা, সেখানে সর্ব্বগামী ব্রহ্মও তদ্রূপ ভাব ধারণ করেন। জলের শীতলতা যেমন কলসীর বাহিরেও আসে, সেইরূপ সিদ্ধেরা বাহ্য জগতেও আসিতে পারেন।

চিৎ-চৈতন্য সমভাবে অটল থাকায়, তাঁহার আভাসরূপ যে সঙ্কল্প বা জগতের নিয়ম, তাহাও সুশৃঙ্খলায় সমভাবেই চলিতেছে। উহার নাম নিয়তি। সুকর্ম্মে সুফল, কুকর্ম্মে কুফল, ইহা নিয়তিরই নিয়ম। নদীর জল কোথাও সমল, কোথাও নির্ম্মল। চৈতন্যও কোথাও সাধনে নির্ম্মল, কোথাও ইন্দ্রিয়-কর্দ্দমে পঙ্কিল। লতার মাঝে মাঝে গাঁট। জীবলতারও মাঝে মাঝে জন্ম মৃত্যুর গাঁট আছে। শুদ্ধ চেতনের তাহা নাই। ভূলোকও আকাশে, ব্রহ্ম লোকও আকাশে। চৈতন্য-বোধ যত বৃদ্ধি হয়, দেহ-বোধ ততই কমিয়া যায়। পূর্ণ চৈতন্যে দেহ মোটেই থাকে না। তাহাই বিদেহ মুক্তি।

মনের নানা বিষয়ে যে আস্থা, তাহাই অচেতন অবস্থা। সূর্য্যোদয়ে হিমের কণা, এই দেখিয়াই আর দেখি না। জ্ঞানোদয়ে যোগীর দেহ, এই আছে, এই গিয়াছে।

আত্মদর্শী দেখেন—যাহা ছিল তাই চিরকাল আছে, কেবল মূর্খই মরিতেছে। আত্মদর্শীর চিরকালই আতিবাহিক বা আকাশ-দেহ। মূর্খেরা চিরদিনই ব:ল, আমরা আধিভৌতিক জড়। এ জগৎ স্বপ্নবৎ—ইহা ঠিক বুঝিলেই দেহটা তুলার মত হাল্‌কা হয়। ঐ বোধ পুনঃ পুনঃ হওয়ায় দেহটা শেষে হাওয়ার মত বোধ হয়। পরে যেই জগৎ-স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, অমনি আতিবাহিক বা আকাশ-রাজ্য খুলিয়া যায়। ডিম ভাঙ্গিলে পাখীর ছানার মত, দেহ ভাঙ্গিয়া আতিবাহিক বাচ্চা আকাশে উড়িতে শেখে।

জ্ঞানের আধিক্য হইলে এই দেহেই আকাশ-দেহ ধরা যায়। সাধারণ লোকের তত্ত্ব নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকে না। জাগিয়া উঠিলে "স্বপ্নবস্তু" যেখানে যায়, আকাশ-দেহ হইলে, এই জড়-দেহও সেই অসত্যে মিশিয়া যায়।

পৃথক বোধই মহা অজ্ঞান। উহাই সংসার। নানা সহকারী কারণেই "পার্থক্য" বোধ হইয়া থাকে। তরঙ্গের সহকারী কারণ বাতাস। ব্রহ্মে, আর একটা সহকারী পৃথক জিনিষ থাকা অসম্ভব, সুতরাং পৃথক জ্ঞান নাই। অভেদ জ্ঞানই ব্রহ্ম।

জগৎ-ভ্রান্তি ব্রহ্মে নাই, জীবেই আছে। সূর্য্যে ইন্দ্রধনু নাই। জীবের চক্ষুতেই আছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র একটী রাত্রি বার বৎসর বোধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কাল নাই, উত্তর দক্ষিণাদি দিকও নাই, অখণ্ড ব্রহ্মে দূরত্বা বা ব্যবধান নাই। ইহাই যোগের লক্ষ্য, উহাতেই মোক্ষ।

স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরী নারী সুনিয়মেই সুখ দান করে। মিথ্যাকে সত্যবোধ করাইয়া জগৎ-সুন্দরী সুনিয়মেই কর্ম্মফল দিয়া থাকে। আকাশের মধ্যে আকাশই নীল চাঁদোয়ার ন্যায় বোধ হয়; ব্রহ্মের

মধ্যে ব্রহ্মই সৃষ্টির মত বোধ হন। ব্রহ্মই সৃষ্টির মূল, ব্রহ্মই সৃষ্টির শেষ। যেমন তেজই আলো, তেমনি ব্রহ্মই জগৎ। ব্রহ্মকে না দেখিলেই জগৎ মিথ্যা; ব্রহ্মকে দেখিলেই জগৎ অতীব সুন্দর মধুর সত্য। কেন না, তখন জগৎ ব্রহ্মময় হইয়াছে।

পুরুষকার ধরিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, ইহা ব্রহ্মার সত্যসঙ্কল্পের দৃঢ় নিয়ম। নিয়তির বশেই ঐ পুরুষকার জাগে। নিয়তি ও পুরুষকার পাকে-প্রকারে এক। অলসেরা না বুঝিয়া, নিয়তির উপর ভার দিয়া শুইয়া থাকিতে চায়; আর শক্তি-মানেরা নিয়তির ফল স্বরূপ পুরুষকারেরই সমাদর করেন।

ব্রহ্মের নানাবিধ শক্তি আছে।—ব্যবহার চক্ষুতে পৃথক দেখায়, জ্ঞানচক্ষুতে সব এক দেখায়। "বহুত্বে একত্ব"।

গাছে ফল ফুল হয়, যায়, আবার হয়; তেমনি সত্যসঙ্কল্প-চিৎস্পন্দন হইতে জগৎ হয়, যায়, আবার হয়। স্পন্দন মানে স্থিরতা ভাঙ্গিয়া ঈষৎ চঞ্চলতা। অস্পন্দন বা স্থির চৈতন্যই ব্রহ্ম। কোনও জীবের সহস্র জন্মে, কাহারও বা এক জন্মেই স্পন্দন-রহিত মুক্তি বা স্থিরতা হইতেছে। সময় না হইলে ইহা বুঝা যায় না।

অসময়ের প্রশ্ন বৃথা। উহার উত্তর বা মীমাংসা বুঝিতে হইলে সুসময়ের ও উপযোগীতার অপেক্ষা করিবে।

একই ব্যক্তিতে শত্রুতা ও মিত্রতা দেখা যায়। তেমনি একই ব্রহ্মে নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্তই বোধ হয় মাত্র, বস্তুতঃ নহে।

তপস্যা দ্বারা বিষকে নির্ব্বিষ ও অগ্নিকেও শীতল করা যায়। ব্রহ্মলাভও তপস্যাতেই হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া সাধুসঙ্গে

তপস্যা করিবে। আপন ইচ্ছামত তপস্যা বৃথা। যে আত্ম বিচারে সমর্থ, আত্মাই তার গুরু। জীবন দিয়াও দ্বিজগণের অর্থাৎ আকাশজ্ঞ গণের সেবা করিবে। ভূতলচন্দ্র দ্বিজগণই চরণ-তলস্পর্শে ভূতল শীতল করেন। সাধুসঙ্গই অমরত্ব বা অমৃত। আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই মৃত্যুর হাত এড়ান যায় না।

যিনি অস্তি নাস্তির মধ্যভাগে থাকেন এবং ঐ উভয় অবস্থাই যাঁর অন্তর্গত, তিনিই ব্রহ্ম। চিৎব্রহ্মের প্রথম সংকল্পই নিয়তি।

দুষ্ট যুবা কটাক্ষ পাতেই দুষ্টা যুবতীকে নাচাইয়া তুলে। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মাও উপাধি-কটাক্ষ দানেই জগৎ-সুন্দরীকে নাচাইয়া তুলেন। শ্রীকৃষ্ণও ঐ কটাক্ষদানে ব্রজসুন্দরীগণকে নাচাইয়া তুলিয়া ছিলেন।

জীব সেই পরমাত্মার অংশ। বস্তুতঃ পরমাত্মার অণু বা অংশ নাই। তিনি অখণ্ড। কেবল বুঝাইবার জন্য একবার অংশ বা অণু বলিয়া লওয়া হয় মাত্র।

শরীর ঘোর তমঃ। উহার প্রকাশ নাই। চৈতন্যই উহাকে প্রকাশ করে। বসন্তশ্রীর মধ্যে ফলপুষ্পের ন্যায়, চিৎব্রহ্ম মধ্যে মনোহর সৃষ্টির বাহ্যভাব প্রকাশ পায়।

পুত্রের অভাবে পিতৃত্ব নাই। দ্বিত্বের অভাবে একত্ব নাই। স্বর্ণ হইতে বলয় ভিন্ন নহে, অদ্বৈত হইতে দ্বৈত ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম দ্বৈত ও অদ্বৈতের অতীত।

সর্ব্ব স্বরূপ চিৎব্রহ্ম জীবের নিকট যেরূপ ব্যবহার পান সেইরূপই হইয়া থাকেন। আত্মদর্শীরা এই জড় জগৎকে "পরমার্থ-পিণ্ড" বলিয়া থাকেন। অখণ্ড ব্রহ্মই ত্রিগুণরূপে দৃষ্ট হন,

নিজে কিন্তু ত্রিগুণ হন না। জীব যদি না থাকিত, তিনিও ত্রিগুণরূপে দেখা দিতেন না।

জলের মধ্যে চন্দ্র নাই, তবে যে দেখা যায়? জলে ঐরূপই দেখায়। ব্রহ্মে সৃষ্টি নাই, তবে যে সৃষ্টি দেখা যায়? জীব চক্ষুই ঐরূপ দেখে। স্বপ্ন দেখাটা সত্য। স্বপ্নের ব্যাপারটা মিথ্যা। ব্রহ্মের স্বভাব সত্য, ঐ স্বভাবের ব্যাপারটা এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু পূর্ণ আত্মদর্শী ব্রহ্মভিন্ন স্বভাবাদি দেখিতে পান না।

কোটী কোটী মায়ের স্নেহ একীভূত হইয়া অখণ্ড চৈতন্যের মধ্যেই আছে। সেই বোধের নাম আত্মবোধ।

মাটির সর্প দেখিয়া বালক আগে ভয় করে, শেষে তাই নিয়া খেলা করে, মহানন্দ! সেইরূপ মায়ার জগৎ দেখিয়া প্রথমে অল্পজ্ঞানীরা ভীত হয়, শেষে "সর্ব্বংব্রহ্ম" দেখিয়া, উহা নিয়া রাতদিন খেলা করে—মহানন্দ।

একই ব্রহ্ম, ভাবযুক্ত ও ভাবমুক্ত। ভাবমুক্ত ব্রহ্মই বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভাবযুক্ত ব্রহ্ম সহজে বুঝা যায়। ভাবমুক্তে দুঃখের গন্ধও নাই। ভাবযুক্তে দুঃখ সম্পূর্ণ যায় না।

কাঠের গায়ে খোদা সিংহ সিংহই নহে। বালকেরাই উহাকে সিংহ বলে। ব্রহ্মের গায়ে খোদা জগৎ, জগৎই নহে বালকেরাই জগৎ বলে। যাহা সত্য তাহা একই হয়, অসত্যই নানা রূপ ধরে।

দর্পণের মধ্যে আপনিই সব দেখা যায়। পূর্ণ ব্রহ্মেও আপনিই সব দেখা যায়। আপনিই সব অর্থাৎ নিজেই সব।

মন যাহা করে তাই করা হয়। শরীর যাহা করে তাহা কিছুই নয়। মনকে নির্ম্মল কর।

চিত্তই চিদাকাশে থাকিলে মুক্ত দেবতা; জগতে থাকিল জড়জীব। বহুভ্রম জমিয়া জমিয়া তাহাতে জড়দেহ গঠন করে। সর্ব্বদেহ অতিক্রম করিলে ঐ চিত্তই তখন পরব্রহ্ম হয়। মনটী জগতে থাকিলে জড় হয়, ব্রহ্মে থাকিলে অজড় হয়। ব্রহ্ম জড় ও অজড়ের অর্থাৎ দ্বন্দ্বের অতীত।

জলের শীতলতা গাঢ় হইলেই বরফ হয়, তেমনি জীবের বাসনা গাঢ় হইলেই "আমি আমি" উৎপন্ন হয়। বরফও গলিয়া যায়, তেমনি "আমি আমি"ও উড়িয়া যায়।

তামা শোধিত করিয়া স্বর্ণ করা যায়, সাধারণে কেন বিশ্বাস করিবে? চিত্ত শোধিত করিয়া ব্রহ্ম করা যায়,—সাধারণে কেন বিশ্বাস করিবে?

অজ্ঞেরা বলে—ব্রহ্ম হইতে জগৎ হয়। তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, ব্রহ্ম হইতে যাহা হয় তাহা আদৌ হয় নাই। "হইতে" শব্দই হয় না, আর ত স্থান নাই!

ফুল ও সুগন্ধের ন্যায় মন ও কর্ম্ম অভিন্ন। আগেও জানিনা পাছেও জানি না, অথচ কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করি, এই মূঢ়তাই মন। মনই কর্ম্ম। এই মনই, অহঙ্কার, বুদ্ধি, জীব ইত্যাদি নাম ধারণ করে। যার মন বদ্ধ, সে বদ্ধ; যার মন মুক্ত, সে মুক্ত।

নির্ম্মল চিদাকাশকেই দৃষ্টিদোষে ক্রমে চিত্তাকাশ ও জড়াকাশ বলিয়া বোধ হয়! বন্ধন ও মোক্ষ মনের হাতেই আছে। গুটি-পোকা লালা বিস্তার করিয়া বদ্ধ হয়। মন লালসা বিস্তার করিয়া বদ্ধ হয়। আবার আপনই জ্ঞান-প্রজাপতি হইয়া ঘর কাটিয়া উড়িয়া যায়।

প্রথমে মন হইল, পরে জগৎ হইল, পরে জীব হইল, পরে

তার বন্ধন হইল, তার আবার জ্ঞান হইল, আবার স্বর্গ হইল, আবার মোক্ষ হইল—আত্মদর্শীরা বলেন, তাঁহাদের নিকট এইরূপ বাক্য-বিন্যাস, শিশুর নিকট দিদিমায়ের উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়। মৃত্যুভয়টা দিদিমায়ের জুজুর ভয় দেখান মাত্র। দিদিমা-বুড়ি ব্রহ্মকে ধরিয়া যা-খুসি-তাই রচনা করিতে পারেন। যোগ-মায়ারূপিনী দিদিমায়ের সমস্ত উদ্ভট রচনা কেবল জীবশিশুদের জন্যই হইয়া থাকে। দিদিমায়ের এই উপন্যাস শুনিয়া জীবন্মুক্ত-গণ বড়ই আমোদ পান।

এই সৃষ্টিতত্ত্বকে মুক্তগণই উপেক্ষা করেন,কিন্তু আবার সুকৃতি-শালী জীবগণ এই তত্ত্ব শুনিয়া, জানিয়া, অভ্যাস করিয়া তবে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। এই সৃষ্টি তত্ত্বই শাস্ত্র। জীবের পক্ষে ইহা পরম কল্যাণ। কূপের মধ্যে যে সোপানে নামিতে হয়, সেই সোপানেই উঠিতে হয়। সূত্র বিনা বস্ত্র হয় না।—শাস্ত্র না হইলে মুক্তির উপায় হয় না।

এই অমৃত-বিজ্ঞান যতই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা যায়, ততই ব্রহ্ম, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পান! শেষে সূর্য্যের সূর্য্য হন; পরে আঁধারকেই আলোক করিয়া দেন ও দুঃখকেই অমৃত করিয়া দেন।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই তিনকে ত্রিপুটী বলে। তিনে এক একে তিন। এক মাত্র শুদ্ধচৈতন্যই ত্রিপুটীরূপে প্রকাশ পান। চৈতন্য ও জড়, এক পদার্থ নহে। চৈতন্যই পদার্থ; জড় অপদার্থ অবস্তু। ইহা যেন ঠিক থাকে।

ভাঁড়টা দেখিলেই জানি "মাটি"। জগৎটা দেখিলেই জানি "ব্রহ্ম খাটি"।

যে অবস্থাতেই থাক, "চিৎঘন" হইয়া সুখে বিহার কর। দেহের প্রতি বিদ্বেষের কারণ কি? কারণ কেবল তমঃ বা অজ্ঞান।

আত্মদর্শীরা অনেক অনুসন্ধানেও নির্ম্মল আত্মায় মনোরূপ মলা দেখিতে পান নাই।

পর্ব্বতের উপরে লাল টক্ টক্ কুঁচ অর্থাৎ গুঞ্জাফলের রাশি দেখিয়া পার্ব্বতীয় বানরগণ অগ্নিবোধে তাহার নিকট বসিয়া পার্ব্বত্য শীত নিবারণ করে। লাল-টক্ টক্ কামিনী-কাঞ্চনের রাশি দেখিয়া নর-বানরেরা সুখ বোধে, তাহারই কাছে বসিয়া, জাগতিক দুঃখ নিবারণ করে! মিথ্যা হইয়াও কেমন সত্যবৎ কার্য্য হইতেছে! গুঞ্জাফলে যতটুকু শীত ভাঙ্গে, কামিনী-কাঞ্চনেও তত টুকু দুঃখ দূর হয় মাত্র।

ইতি তৃতীয় প্রবোধ।

চতুর্থ প্রবোধ।

ইন্দ্রিয়রোধ করিতে পারিলেই জগৎ ভ্রান্তি বুঝিতে পারা যায়। নতুবা নহে। নির্ব্বোধেরা মনেকরে, ইন্দ্রিয় জয় করা একেবারে অসাধ্য, কাজেই তাহাদের দিব্য জ্ঞান লাভ করাও অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ন্যায় প্রায়-ব্রহ্মভাবাপন্ন কত যে সাধু-আত্মা ব্রহ্মে তন্ময়ত্ব লাভ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত যে লক্ষ লক্ষ সুরনর গন্ধর্ব্বাদি জীব বহুদর্শী হইয়া মোহ জয় করিয়া, জীবন্মুক্ত ভাবে বিচরণ করিতেছেন তাহারও

সংখ্যা করা যায় না। কত সাধু কর্ত্তব্যের অতীত হইয়া সংসারেই রহিয়াছেন তাহারও সীমা নাই। মোহান্ধ জীবগণ তাহার কিছুই দেখিতে বা জানিতে পায় না।

মনই সব, হাড় মাস মনেরই বিকার মাত্র। মোক্ষফলের বৃক্ষ এই শরীর মন-বানরের উৎপাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দুদিনেই শুকাইয়া যায়। আহা এমন ফল ধরিতে দেয় না, পাকিতে দেয় না। মনটাকে শান্ত বা শান্তিময় করিয়াই সাধুরা সুখসম্ভোগের চরম করিয়াছেন। আহা, অবোধের হস্তে সেই মনটা, বালকের হস্তের পুষ্পের ন্যায়, ছিন্ন ভিন্ন হয় মাত্র।

সাধু অসাধু সকলেই লৌকিক ব্যবহার রাখেন। অজ্ঞেরা আসক্ত, জ্ঞানীরা অনাসক্ত। ইহাতেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয়। যদি চিত্ত স্থির করিতে পার, তবেই তুমি সুখী হইবে। মার্জ্জনা দ্বারা মণির জ্যোতির মত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতিঃ ঝক মক্ করিয়া উঠে। তুমি তপস্যা কর। নতুবা দুঃখ যাইবে না।

দিনের চিন্তাই রাত্রে স্বপ্ন হয়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই এ জন্মের সংস্কার হয়। যে ব্যক্তি কথায় সব বুঝে, কাজে অভ্যাস করে না,তাহার জ্ঞানটী, পটে চিত্রিত অগ্নি-শিখার ন্যায় দগ্ধকারী। চিত্রিত বাঘ বাঘই নহে, বালকের খেলার বস্তু; অনভ্যাসীর গ্রন্থে আঁকা ব্রহ্ম, ব্রহ্মই নহেন, বালকের তর্ক-বিতর্করূপ খেলার বস্তু মাত্র।

বোধ যখন স্থির হয় তখন "জাগ্রৎ" দশা। যখন অস্থির, তখন "স্বপ্ন" দশা। যখন আত্মাতে অভিন্নভাবে থাকে তখন "সুষুপ্তি"।

লৌহদণ্ড অগ্নিতে পুড়িয়া অগ্নিদণ্ড হইয়া পড়ে। মন যেরূপ

ভাবনা-বিদ্ধ হয়, সেইরূপ হইয়া পড়ে। শম দম দ্বারা মনের মুক্তি হয়। শম অর্থে "সর্ব্ব-অনর্থ-নিবৃত্তি" অর্থাৎ সাধনের বাধা-বিঘ্ননাশ। দম অর্থে "আনন্দময় ব্রহ্মভাব" অর্থাৎ মনের সম্পূর্ণ দমন বা লয়। নানা-বাদীগণের নানা শাস্ত্র-নিয়ম হইলেও মনই উঁহাদের একমাত্র স্থান। মন স্থির হইলেই দেখিবে- সকলেরই একদিকে গতি।

দিনে আকাশ এক রকম, রাত্রে আকাশ আর এক রকম। এক ব্রহ্মই জ্ঞানের দিনে এক রকম, অজ্ঞানের রাত্রে আর এক রকম।

তরঙ্গ কিছুতেই থামে না। হাওয়া বন্ধ করা চাই। বাসনাও থামে না, মায়ার হাওয়া বন্ধ করা চাই। প্রাণায়ামেও হাওয়া বন্ধ হয়।

মণির জ্যোতিঃ অন্ধকারে ফোটে, আলোকে ফোটে না। তেমনি বাসনার জ্যোতিঃ অজ্ঞান-অন্ধকারেই ফোটে, জ্ঞানা- লোকে ফোটে না। বাসনা, আলেয়ার মত, ভুলাইয়া নিয়া দিগ্ ভ্রান্ত করে। বাসনা-যুবতী অযাচিত ভাবে আসিয়া রূপ দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করে। বাসনা, জলের ফেণার মত পুনঃপুনঃ জন্মায় আর মরে। বাসনার জন্মস্থান অনুসন্ধান করিলেই বাসনা পলায়ন করে। এই ব্যভিচারিণী বাসনার বৃদ্ধকালে, অন্য সঙ্গ অভাবে, সাধু সঙ্গমে একটী পবিত্রা কন্যা জন্মায়। তাহার নাম "মুক্তি-বাসনা"। তখন সেই বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী হয়। এবং ঐ কন্যাই তাহাকে উদ্ধার করে।

জ্ঞান-ভূমি ৭টী। এই সাত অবস্থা পার হইলেই মোক্ষ। (১) যে ভূমিতে ব্রহ্ম-লাভের ইচ্ছা উদয় হয় তাহা "শুভেচ্ছা-ভূমি।"

(২) যে ভূমিতে ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ মনন আরম্ভ হয় তাহা "বিচারণা-ভূমি"। (৩) যে অবস্থায় বাসনা ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয় তাহা "ক্ষীণ-মানসা ভূমি"। (৪) পরে যে অবস্থায় শুদ্ধ আত্মার উদয় হয় তাহা "সত্বাপত্তি ভূমি"। (৫) পরে যে অবস্থায় সমাধিতে আত্মদর্শন হইতে থাকে তাহা "আসক্তি-বিলয় ভূমি"। (৬) পরে যে অবস্থায় "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই বোধ দৃঢ় হয় তাহা 'পদার্থ-ভাবনা" ভূমি। (৭) পরে যে অবস্থায় "দুই" বোধ রহিত হইয়া অভেদে "একবোধ" হয় তাহা তুর্য্যগা বা "ব্রহ্ম-গামিনী" ভূমি। এই সপ্তম ভূমি প্রাপ্ত মহাত্মারাই জীবন্মুক্ত "আত্মারাম"। ষষ্ঠ ভূমিতেও ক্রিয়া থাকে, সপ্তম ভূমিতে মন বা কর্ম্ম থাকে না। তথাপি কোথাও শুদ্ধ সত্বে সদাচার থাকে। সপ্তম ভূমি পার হইলে তবে "বিদেহমুক্তি"।

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত। ইহাদের পঞ্চগুণ যথা,—গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ। ব্যোমের তিন অবস্থা, ব্যোম পরব্যোম, মহাব্যোম। ষট্‌চক্র যথা,—১ম চক্র 'মুলাধার' গুহ্য দেশের পশ্চাতে মেরুদণ্ডের মূলে অবস্থিত। ২য় চক্র 'স্বাধিষ্ঠান' লিঙ্গ পশ্চাতে মেরুদণ্ডের মধ্যে। ৩য় চক্র 'মণিপুর' নাভি-পশ্চাতে মেরুদণ্ডের মধ্যে। ৪র্থ চক্র 'অনাহত' বক্ষ-পশ্চাতে মেরুদণ্ডের মধ্যে। ৫ম চক্র 'বিশুদ্ধাখ্য' কণ্ঠের পশ্চাতে মেরুদণ্ডের মধ্যে। ৬ষ্ঠ চক্র 'আজ্ঞাচক্র' ভ্রূদ্বয়ের সন্ধির পশ্চাতে। এই ছয় চক্রের উপরে 'সহস্রার' বা সহস্রদল পদ্ম, মস্তিষ্কের মধ্যে। এই সমুদায় চক্র বা পদ্মই সূক্ষ্ম বায়ু-স্থান মাত্র। সূক্ষ্ম বায়ুর পথকেই 'নাড়ী' বলে, যেমন ইড়া পিঙ্গলা ইত্যাদি। এই সকল সূক্ষ্ম বায়ু-স্থানে মহাশক্তি অব্যবহারে স্থূল বায়ু চাপা পড়িয়া অকর্ম্মণ্য

হইয়া শুদ্ধ ভাবে আছেন। মূলাধারে কুল-কুণ্ডলিনী-শক্তি নিদ্রিত অবস্থায় আছেন।

ধীরে ধীরে—অতি ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে'মূলাধার' হইতে প্রতিচক্র ক্রমে ক্রমে ভাবনা করিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত ভাবনা করার পরে,আবার 'সহস্রার' হইতে নিম্ন দিকে প্রতি চক্রে ভাবনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিতে হয়! ইহাকেই একটি সহজ প্রাণায়াম বলে। ইহাতে মূলাধারের নিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া ঊর্দ্ধ মুখে চক্রে চক্রে উত্থিত হন, অভ্যাসে অভ্যাসে ক্রমে 'সহস্রার' স্পর্শ করেন। তখন শুদ্ধচৈতন্য অন্তরে প্রকাশিত হন। মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব। স্বাধিষ্ঠানে অপ্ বা জলতত্ত্ব। মণিপুরে তেজঃতত্ত্ব; এই তেজঃতত্ত্বে শক্তি জাগ্রত হইতে থাকিলে সাধনরাজ্যের প্রথমভূমি প্রস্তুত হইতে থাকে। অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, এখানে দ্বিতীয় ভূমি প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধাখ্যে ব্যোমতত্ত্ব, এখানে ক্রমে ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমি প্রস্তুত হয়। অজ্ঞাচক্রে পরব্যোম তত্ত্ব, এখানে ষষ্ঠ ভূমি প্রস্তুত হয়। সহস্রারে মহাব্যোম-তত্ত্ব, এখানে ৭ম ভূমি প্রস্তুত হয়।

নরনারীর রক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ যে প্রাণ স্বরূপ বীর্য ও আর্ত্তব তাহা এক মাসের মধ্যে একবারের অধিক ক্ষয় হইলে গার্হস্থ ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়, এবং এই সাধন পথে উন্নতি লাভ করা যায় না। বরং অনিষ্টও হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিয়া গুরুদেবের নিকট এই প্রাণায়ামাদি সাধন-ক্রিয়া যথা রীতি শিক্ষা করিতে হয়। এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে পারিলে অন্তরে ব্রহ্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তখন ক্রমে বেশ বুঝা যায়,—যেমন মেঘ হইতে বৃষ্টি, তেমনি ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি। যেমন মেঘেই বৃষ্টি,তেমনি ব্রহ্মেই সৃষ্টি।

যেমন মেঘই বৃষ্টি, তেমনি ব্রহ্মই সৃষ্টি। আদি ব্রহ্মে সংসার-শক্তি আছে কি না? অবশ্যই আছে। প্রথমে স্পষ্টই উহা দেখা যায়। শেষে কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায়, উহা নাই। আগে আছে, শেষে নাই। একেবারে নাই, একথা বলা যায় না। যতদূর দেখিবে 'হয় আর যায়' ততদূর ছাড়িয়া গিয়া, তাহার উপরে অবস্থিতি কর।

লোক-চক্ষে সূর্য্য যেমন নিশ্চয়ই অস্তে যান, কিন্তু বাস্তবিক অস্তে যান না, তেমনি লোক-চক্ষে তোমারি নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, কিন্তু বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইবে না। এই ভয়ানক মৃত্যুময় সংসারে অমরতা লাভের জন্য কোন্ নির্ব্বোধ না তপস্যা করিবে?

'এটি শুদ্ধ, এটা অশুদ্ধ, এই না করিলে শুদ্ধ হয় না'—ইত্যাদি কল্পনা-জালে বদ্ধ থাকিয়াই যেন তোমার অমূল্য জীবনের অধিক সময় না যায়। এই বিশুদ্ধ জগৎকে আর বেশী দিন অশুদ্ধ দেখিও না; ইহার প্রতিরেণু জ্যোতির্ম্ময় বিশুদ্ধ সৎ।

আদি সঙ্কল্প রূপ পর্ব্বতের তিনটি চূড়া—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।

ব্রহ্মা এই জগৎ বিস্তার করিয়াছেন, সে কেবল মূল-চৈতন্যের সত্যতার উপরেই নির্ভর করিয়া করিতে পারিয়াছেন, মূল সত্য না থাকিলে পারিতেন না। জগৎ-বিস্তার কার্য্যটি নিজে মিথ্যা, সেই জন্যই এই জাগতিক সর্ব্ব দুঃখই নষ্ট করা যায়। মিথ্যা না হইলে দুঃখ দূর করা যাইত না।

বালক আপনার অঙ্গুলি আপনি কামড়াইয়া কাঁদে, সংসারীরও ঠিক সেই দশা।

যাহাদের একেবারে জ্ঞান নাই তাহারাই ভাবে—পৃথিবী কেবলই মাটি, বৃক্ষ সমস্তই কাঠ, জীবদেহ কেবল হাড়মাস। এই

সকলের মধ্যেই যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ আছে, তাহারা তাহার সন্ধান পায় না।

রজঃ তমঃ দুইটি স্তম্ভের উপরেই এই দুঃখময় প্রকাণ্ড সংসার-মণ্ডপ অবস্থিত। সাধারণ লোক গর্দ্দভের ন্যায় কেবল দুঃখভারই বহন করিতে আসিয়াছে, তুমি কেন তাহা বহিবে? সংসারটাই শূন্য, কিছুই নহে। পরমাত্মা শূন্য নহে, কিছু বস্তু বটে। যাহা বস্তু, তাহার নাশ নাই।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ইহা কেবল মনেরই স্ফূরণ। দুগ্ধ উথলিয়া উঠিয়াই যেমন পড়িয়া যায়, জ্ঞানহীন মনের এই স্ফূরণ বা ফাঁপিয়া উঠাও সেইরূপ। সংসারের ঐ ফাঁপিয়া উঠাকে কখনও বিশ্বাস করিও না।

অঙ্গারের কালিমা অকৃত্রিম। ধৌত করিলে যায় না। মনের কালিমা কৃত্রিম, ধৌত করিলেই যায়। তবে কেন উহা দুইবেলা ধৌত করনা? ঘটী বাটী ধৌত না করিলে চলে কি? সেইরূপ মন ধৌত না করিলে চলে কি? কর্দ্দম মাখা শূকরকে ধিক!

গৃহস্থের মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া ভানিয়া প্রতিদিন কেমন সরু চাউল বাহির করে; তুমি কি সাধন ঢেঁকিতে মায়া মোহ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, সূক্ষ্ম ব্রহ্মকণা বাহির করিতে পার না? গৃহস্থের ঢেঁকি চাই; তোমার কি একটা ঢেঁকিও নাই? ঢেঁকি থাকিলে খাসা চাউল বাহির হইবেই হইবে, চাষ-বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারে; ঠিক তেমনি সাধন থাকিলে, সর্ব্বসুখের খনি ব্রহ্ম বাহির হইয়া পড়িবেনই পড়িবেন—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি।

"আমি এক জন সংসারী" "আমার গৃহ আড়ম্বর সত্য"

"আমার স্ত্রী পুত্র মান সম্ভ্রম সত্য" এরূপ মিথ্যা দুর্ম্মতি পরিত্যাগ করিবে। জলে যেমন লক্ষ লক্ষ বুদ্‌বুদ্ উঠে আর পড়ে, তেমনি আত্মার মধ্যে ঐ সংসার-বুদ্‌বুদ কতই উঠিতেছে পড়িতেছে তাহার সীমা নাই। উহাতে আবার আস্থা কি? সমুদ্র কি বুদ্‌বুদের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে?

এদেশের লোক ব্রহ্মাণ্ডের খবর জানে, কিন্তু একটা দীপ-কাঠি প্রস্তুত করিতে পারে না। সাধুদের দীপকাঠী দেখ—তাঁহারা মন-কাঠীর ডগায় ব্রহ্মাগ্নি বান্ধিয়া রাখিয়াছেন, যখন তখন ফস্ করিয়া জ্বালিতে পারেন। অমনি দেহ-ঘর পূর্ণ আলোকে ধক্ ধক্ করে। তুমি বেদ বেদান্ত পড়িয়া মরিলে, আহা ঘরে একটী দীপকাঠী নাই? দীপ-কাঠী, না হয় চকমকি, একটা চাই। আঁধার ঘরে হাড়ী ডোম বাস করে। তাহারা বলে—পান্তা ভাত ত হাঁড়িতেই আছে, আর আলো দিয়া কি করিব?

ইতি চতুর্থ প্রবোধ।

পঞ্চম প্রবোধ।

"শূন্য আঁধার ঘরে ভূত আছে" ভাবিয়া বালকের ভয় হয়। তেমনি শূন্য শরীরের মধ্যে "আমি আছি" এই ভ্রম হওয়ায় অবোধদিগের "মরিব মরিব" বলিয়া একটা মৃত্যু-ভয় হয়। আদৌ কিছুই নহে। আঁধার ঘরে বাবার সঙ্গে গেলেই যেমন "ভূত নাই" দেখা যায়, তেমনি সাধু-বাবার সঙ্গে গেলেই দেখা

যায়,—শূন্য শরীরে "আমি আমার" বলিয়া কিছুই নাই। আছে কেবল "আঁধার ঘরের ভুত" একটা কুসংস্কার মাত্র।

ব্রহ্ম ছাড়া বিন্দু নাই— দেখেতে পেলে "মোক্ষ" তাই
নির্ম্মল চৈতন্য ব্রহ্মের মাঝে অভিন্ন যে দাগটা আছে,
সে দাগ হ'তেই সৃষ্টি হয়, দাগটী কিন্তু ব্রহ্ম ময়।
তাতেই দাগটী ব্রহ্ম খাটি, হয়নি দাগ বা হয়নি সৃষ্টি।
বেদান্তে এই মোক্ষ কয়, ব্রহ্ম সৃষ্টি—দুটী নয়।
দুটীর মত দেখা যায়— সেটী মায়া যোগমায়ায়।
ব্রহ্ম ছাড়া কি মায়া আছে? মায়া মিথ্যা জ্ঞানীর কাছে।
ব্রহ্ম আচ্ছাদন হ'লে, সেই আঁধারকে মায়া বলে।
মায়ার আঁধার মনে আঁকা, বস্তু নয় সে, আলো ঢাকা।
জ্ঞান-আচ্ছাদন কেন হয়? জ্ঞানী দেখেন—আদৌ নয়।
আচ্ছাদনটা মূর্খে আছে, "সর্ব্বব্রহ্ম" জ্ঞানীর কাছে।
জ্ঞানই ব্রহ্ম সর্ব্বময়, "অজ্ঞান" ব্রহ্মের অভাব নয়।
ব্রহ্মের আবার অভাব কখন? অজ্ঞান—ব্রহ্ম আচ্ছাদন।
আচ্ছাদনটা কিসে করে? মিথ্যা কথা—মূর্খের তরে।
ব্রহ্মে কিসে মূর্খ এল? কথায় বুঝান বিপদ হল।
সমাধি-প্রত্যক্ষ তাই— মূর্খ নামে কেহই নাই।
সাধু দেখেন সমান করি, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুক্কুর করী।

সমাধিতে কাষ্ঠের ন্যায় পড়িয়া থাকার মানে কি? উহার মানে—অমৃত-সুখে দৃষ্টি রাখা। নীল আলো এই জগৎ, শ্বেত আলো ব্রহ্ম। পাশাপাশি থাকিলে শ্বেত আলো ভাল খুলিবে না। মধ্যভাগে সম্পূর্ণ ঢাকা না দিলে শ্বেতালোকের বিশুদ্ধতা

বুঝা যায় না। তাই জগতের দিক্‌টা একেবারে ঢাকা দিয়া পড়িয় থাক। উহাকেই বলে কাঠ-পাথর হওয়া।

বায়ুর স্পন্দনের ন্যায় পরমাত্মায় যে ভ্রান্তি-স্পন্দন হয়, সেইটাই "আমি আমি" করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়।

সংসার ফলের বোঁটাই 'অহং'। ফল পাকিলে অহং-বোঁটা আপনিই খসিয়া যায়।

নিষ্কাম লোক কার্য্য করে কি রূপে?—নিষ্কাম জল নিম্নে ধায় যে রূপে।

গঠনশূন্য গোটা স্বর্ণ কি হবে? উহা সেক্‌রা বাড়ী যাক,— মুর্খ নারীর মনের মত গহনা গড়িয়া দিবে।

গঠন-শূন্য গোটা ব্রহ্ম কি হবে? উহা সাধুর কাছেই থাক। মূর্খ লোকের মনোমত ঠাকুর গড়িয়া দিবে!

ভ্রান্তি কি? তাহার অস্তিত্ব কোথায়?

অখণ্ড ব্রহ্ম আপনাতেই অকারণ যে ক্ষণস্থায়ী জগৎ দর্শন করেন বলিয়া জীবের মনে বোধ হয়, উহার নাম ভ্রান্তি,—মায়া! ব্রহ্মই উহার অস্তিত্ব; উহার নিজের 'নাস্তিত্ব' বই আর কিছুই নাই।

যে মিষ্ট জিনিষই হোক, প্রাপ্ত হইলে আর বেশীক্ষণ উহার তেমন মিষ্টত্ব থাকে না। তাহাই দেখিয়া সাধুরা সংসারের সকল মিষ্টতাই পরিত্যাগ করেন। যাহার মিষ্টতা চিরস্থায়ী, কেবল তাহাই গ্রহণ করেন। 'ত্যাগ' কেবল সুখের জন্যই হইয়া থাকে! "সর্ব্বত্যাগ" শুনিয়া ভীত হইও না—"সর্ব্বত্যাগ" অর্থে "মলত্যাগ" মাত্র!

স্বপ্নমূর্চ্ছাই মৃত্যু। মরীচিকার সুশীতল বারিই জগৎ।

পরমাকাশই চিৎ। উহাই সর্ব্বগত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বাত্মক চৈতন্য। চিৎশক্তিকে চিতি বলে। 'স্বয়ম্ভূ' অনুভবরূপে উদয় হন। তাই জগৎও অনুভবরূপে হইয়াছে। এই জগৎ, স্বপ্নে নারী-সঙ্গের ন্যায় চিত্তামোদকারী। স্বপ্ন-বস্তু মনের মধ্যেই থাকে, অথচ বাহিরের ন্যায় দেখা যায়।—তাই ঐ স্বপ্নের ন্যায় যে জগৎ, তাহাও বাহিরেই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র! বস্তুতঃ জগৎ মৃন্ময় নহে, মনোময়। স্বচ্ছ চৈতন্য অন্তরে বাহিরে সমভাবেই আছেন; তাই অন্তরের ভাব বাহিরেও স্পষ্ট দেখা যায়। স্বচ্ছ চৈতন্যে সঙ্কল্প-প্রভা প্রতিফলিত হইয়া বারংবার প্রতিফলিত হয়। উহাই বারংবার অহংভাবে প্রতিভাত হয় মাত্র।

জীবের চিৎশক্তিই 'তপস্যা ও দেবতা' হইয়া ফলদান করেন; সুতরাং জীবের যে পুরুষকার বা প্রযত্ন, সেটী সেই চিৎ-প্রযত্নই জানিবে। সেইজন্য যে যাহা সযত্নে দৃঢ় ভাবনা করিবে, সে তাহাই পাইবে। ইহাকেই নিয়তির অব্যর্থ নিয়ম বলে।

আমাদের চেতনাংশের চেতনধর্ম্মিণী কুলদেবীকেই ভগবতী বলা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বে তিনিই যোগমায়া, যোগাযোগ করেন। সাধুগণ জড়দেহ ত্যাগ করিয়া এই জীবনেই বিজ্ঞান-দেহ লইয়া থাকেন। তুমিও বিজ্ঞান-দেহ লও। জড়দেহ আর কেন স্বীকার করিতেছ? উহা যে মৃত্যু!

চক্ষু খুলিলেও যিনি আর জড়ত্ব দেখিতে পান না—কেবল সর্ব্বব্রহ্মময় চৈতন্য-খেলাই দেখেন, তাঁহার আবার আসক্তি কিসে ঘটিবে? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা কি?

নব যুবতী যেমন নবানুরাগে নব যুবককে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষণিক সুখ-সম্ভোগে তন্ময়ত্ব লাভ করে, তুমিও তেমনি আত্ম-

চৈতন্য-পুরুষকে নবানুরাগে আলিঙ্গন করিয়া, অনন্ত কাল অম্লান স্থির-যৌবন-সুখ সম্ভোগ কর।

কুম্ভকার যেমন আপনার কল্পনামত কুম্ভ গড়ে, মনও তেমনি আপনার সংকল্পমত শরীর গড়ে। এই মনই বিশুদ্ধ হইয়া "হরি-হরাদি" হয়; কখনও একটু মলিন হইয়া দেব মানব হয়; কখনও অত্যন্ত মলিন হইয়া "আমি কৃমিকীট" এইরূপ ভাবিতে থাকে; আবার এই মন কোথাও বা মোহ দূর করিয়া, জীবন্মুক্ত হইয়া, ভূতল-গগন ভ্রমণ করিতেছে। পরমবস্তু না দেখিলে জগৎরূপ অবস্তু দেখা যায়, পরমবস্তু দেখিলেই অবস্তুর অস্তিত্ব থাকে না।

বীজে বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষে আবার বীজ হয়; সেইরূপ ব্রহ্মেই মিথ্যা মন উৎপন্ন হয়, আবার সেই মিথ্যা মনেই ব্রহ্ম ফলে। ঘটভাব হইয়াই মন ঘট দেখে। ব্রহ্ম-ভাব হইয়াই মন ব্রহ্ম দেখে।

কলার খোলার মত জীবের মধ্যে জীব, তার মধ্যে জীব, তার মধ্যে জীব, তার মধ্যে আরও জীব থাকে। জগতের মধ্যে জগৎ তার মধ্যে জগৎ, তার মধ্যেও জগৎ থাকে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন, তার মধ্যেও স্বপ্ন দর্শন হয়। মনের স্থির ভাবই আধ্যাত্মিক 'জাগ্রৎ' ভাব। মনই 'দৃশ্য বস্তু' হইয়া পড়ে। 'দৃশ্য জগৎ' এই মনেরই রূপান্তর মাত্র। স্ত্রীকে যদি মাতৃভাবে ভাবনা করা যায়, স্ত্রী তখন মাতৃস্থানীয়া হইয়া যান। ব্রহ্ম-সুধা-সমুদ্রে জীব-সুধা-তরঙ্গ যে সতত না দেখিতে পায়, তাহাকেই কেবল জন্ম-মৃত্যু আসিয়া সাদরে আলিঙ্গন করে। ভোগ-মোক্ষশোভাপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানিগণ নিজ শরীরকে রমণীয় উপবন বা বিলাস ভবনের ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। ঐ বিলাস ভবন আত্মজ্ঞান-রূপ সূর্য্যকিরণে সর্ব্বদা আলোকিত থাকে। ঐ বিলাস-ভবন

কখনই তাঁহাদের দুঃখদায়ক হয় না। অবোধের নিকট এই দেহ শোক দুঃখ ও ব্যাধির মন্দির বলিয়াই বোধ হয়। স্বর্গে যেমন দেবরাজ, দেহে তেমনি তত্ত্বরাজ রাজত্ব করেন। দেহ গেলেও যখন সমস্তই থাকে, তখন ঐ দেহরূপ বিলাস ভবনে ভয় কি? তত্ত্ব-রাজ ঐ বিলাস-ভবনে ভুবন-মোহিনী শান্তিদেবীর সহিত প্রেমা-লিঙ্গনে অবস্থিতি করেন। ত্রিলোকসম্পদ-সমস্তই আপনার জানিয়া তিনি দেব-দুর্লভ শ্রী ধারণ করেন। তখন সম্ভোগেও তাঁর শোভা! কালকূট বিষ নীলকণ্ঠের শোভাই বর্দ্ধন করিয়া থাকে। চোরকে চোর জানিয়াই যদি বন্ধুত্ব কর,সে আর তোমার বাড়ী চুরি করিবে না। জগৎকে মিথ্যা জানিয়া উপভোগ কর, তাহাতে কোনই অনিষ্ট ঘটিবে না।

পথিকেরা পথের পার্শ্বে গ্রাম্য উৎসব দেখিতে দেখিতে পরমানন্দে চলিয়া যায়; তত্ত্বদর্শীও সেইরূপ এই জগতের মহোৎ-সব দেখিতে দেখিতে আনন্দ মাত্র লইয়া আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান। সম্রাট কতটুকু সুখ, ক'দিন পান? তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে আত্মার অনন্ত সুখ আর ধরে না।

মন-হস্তী ক্ষ্যাপা। তাহাকে যদি সংযম-বিচার রূপ অঙ্কুশে মারিয়া, বশে রাখিতে না পার, তবে সে তোমাকে মারিবেই মারিবে। তুমি পলাইবে কোথায়? মনের হাত এড়াইবার যো নাই।

অভ্যাসে অভ্যাসে একটু একটু আত্মসুখ অনুভব আরম্ভ হইলেই ক্রমে অধিক সুখভোগ হইতে থাকিবে। তখন মনকে বশ করা আর কঠিন হইবে না। যাঁহারা মন হস্তীকে বশে আনিতে পারেন; তাঁহারাই পুরুষ। ত্রিজগৎ তাঁহাদেরই বন্দনা করে।

মন রূপ মলা মাখা মহা মণি যদি বিবেক-জলে ধৌত করিতে পার, তবে দেখিবে, উহার রূপের ছটা শতশত অয়স্কান্ত মণিকেও লজ্জা দিতেছে।

পাখীর গলায় দড়ি বান্ধিয়া বালক যেমন টানে, মানুষের গলায় বাসনা বান্ধিয়া মৃত্যু তেমনি টানিতেছে! মূর্খেরা ইহা দেখিয়াও দেখে না। অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় জ্ঞানীও অজ্ঞানীর বুদ্ধি কখনও এক হয় না। যিনি সাধন পথের পথিক তাঁহার পক্ষে ব্যস্ততা শোভা পায় না। দীর্ঘকালে কর্ম্ম-ফল পরিপক্ক হয়।

অহঙ্কার তিন প্রকার। "আমিই ব্রহ্ম চৈতন্য" এই ভাবই সর্ব্বোত্তম মুক্তি-দায়ক প্রথম অহঙ্কার। "জগতের কোনও পদার্থ আমি নহি, আমি স্বতন্ত্র" ইহাই শুভ দায়ক দ্বিতীয় অহঙ্কার। "এই দেহই আমি" এই বোধই সর্ব্ব দুঃখ দায়ক তৃতীয় অহঙ্কার। যে ব্যক্তি ঐ তৃতীয় অহঙ্কারকে ছাড়িতে পারেন, তাঁহারই স্থায়ী সুখ দিন দিন বৃদ্ধি হয়। পার্থিব ভোগ-বাসনা কমিতে থাকিলেই পরম সুখ ক্রমে সম্মুখবর্ত্তী হইতে থাকে।

জড়ীয় মনের উত্থানই যথার্থ বিনাশ এবং ঐ মনের পতনই প্রকৃত উত্থান। বিজ্ঞের জড়ীয় মন লয় পায়, অজ্ঞের জড়ীয় মন অলাবু লতার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। শুদ্ধ চৈতন্যের "বিস্মরণকেই" মন বলে। রেসম-পোকার ন্যায় জীব আপনার বাসনা-রচিত গুটির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া মৃতবৎ থাকে ও জগৎ-স্বপ্ন দেখিতে থাকে! সময়ে প্রজাপতির ন্যায়, জ্ঞান রূপ পাখা উঠিলে, মোক্ষাকাশে উড়িয়া যায়।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী যে দর্শন (জ্ঞান) তাহাই শিব স্বরূপ, মোক্ষ স্বরূপ। মূর্খরা কেবল ভোগ ভূমিই দেখিতে পায়, তত্ত্ব-ভূমি দেখিতেই পায় না। ঘৃণিত জাত যেমন এক স্থানের ময়লা মাথায় করিয়া নিয়া অন্য স্থানে রাখে, এবং ময়লার মধ্যেই বসিয়া থাকে, অবোধেরাও সেই রূপ ইন্দ্রিয়-সুখ লইয়া টানাটানি করে, এবং আহার নিদ্রা সম্ভোগই সর্ব্বস্ব জানিয়া, তাহার মধ্যে বসিয়া থাকে। তত্ত্ব ভূমির কথা শুনিলে সে স্থান হইতে "আমার কার্য্য আছে" বলিয়া পলায়ন করে। সাধুরা স্ফটিক গৃহের মধ্যে স্ফটিক-মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করেন।

দুঃখের রাজ্য অতি অল্প দূর বিস্তৃত,বেশী দূর যায়নাই, 'প্রবোধ' না হওয়া পর্য্যন্তই দুঃখ রাজ্যের সীমা। প্রবোধ উদয় হইলে আর দুঃখ দেখা যায় না। মনের রাজত্ব ছাড়িয়াই আত্মার রাজত্ব আরম্ভ। পচা দুঃখের রাজত্ব অঙ্গুলি প্রমাণ,—প্রবোধ পর্য্যন্ত। নির্ম্মল সুখের রাজত্ব লক্ষ যোজন—মোক্ষ পর্য্যন্ত।

ব্রহ্ম-সমুদ্রের যে তরঙ্গ উত্থান, উহাকেই ব্রহ্মের শক্তি বলে। ব্রহ্মও আছেন, শক্তিও আছেন—এরূপ বলা ঠিক নহে। শক্তির পৃথক অস্তিত্ব নাই। ঐ পৃথক বোধই দুঃখের মূল। অর্দ্ধজ্ঞানী ব্যক্তি, সম্যক জ্ঞানী না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা ঠিক ধারণা করিতে পারিবে না। অগ্নি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইলে, প্রথম অগ্নিকে পরবর্ত্তী অগ্নির কারণ বলা হয়, সে কেবল বচন-কৌশল মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ই এক। অল্পজ্ঞানীর চিত্ত মেঘাচ্ছন্ন দিনের ন্যায়, কখনও একটু বুঝিতে পারে, কখনও বা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না; সংসার-ভূত ঘাড়ে চাপিলেই সব ভুলিয়া যায়।

মিথ্যাত্বের নামই মায়া। না দেখিলেই উহার উৎপত্তি,

দেখিতে গেলেই উহার অস্তিত্ব যায়। ঐ মায়ার কথা, লোক বুঝানর জন্যই বলা আবশ্যক, তাহা না হইলে শাস্ত্র হয় না, শাস্ত্র না হইলে মুক্তির উপায় হয় না। এই জন্য "মায়া" বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে হয়। আকাশ-কুসুম শুনিয়াছ, এই জড় জগৎই সেই আকাশ-কুসুম রূপে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

আশা-সাপিনীর গর্ত্তই এই জগৎ, অন্ধ কূপ। ইহাতে আর আস্থা রাখিও না, সূক্ষ্ম জগতে চলিয়া এস। মরীচিকা দেখিয়া তৃষিত ব্যক্তি আনন্দিত হয়, শেষে দেখে, সর্ব্বৈব মিথ্যা, সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, জল নাই! তেমনি স্ত্রী পুত্র দেখিয়া সংসারী মূর্খেরা আহ্লাদে আর বাঁচেনা, শেষে দেখে সর্ব্বৈব মিথ্যা, সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, স্ত্রী পুত্র নাই। ইহাই দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলে এই প্রবোধে এই সংসারই তোমার প্রমোদ-উদ্যান হইবে। এখানেই তুমি চির দিন অমৃত-ক্রীড়া করিতে পারিবে।

বৎসরে বহু চন্দ্র উঠে, বস্তুতঃ একই চন্দ্র নিত্য। বাহ্য চক্ষুকে আর বিশ্বাস করিও না, কাণা চক্ষু কেবলই তোমাকে খানায় ফেলিবে। উপায় গ্রহণ করিলেই সংসার-দুঃখ নির্ম্মূল হইয়া যায়, ঐ উপায় গ্রহণের নাম 'পুরুষকার'।

যে লেখা পড়া জানে না, সে বলে, আমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ। যেমন লেখা পড়া শেখে, অমনি বলে—এখন আমি দেখিতে না দেখিতে পড়িয়া ফেলি, আকার-ইকার যোগ করিতে সময় লাগে না। সেইরূপ সাধু-শিষ্যও বলেন, কি আশ্চর্য্য, গুরু-কৃপায় চক্ষু ফুটিল! আগে মাটি বই কিছুই দেখিতে পাইতাম না; এখন যে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করিতেছি, মুহূর্ত্তও বিলম্ব

হয় না, শাস্ত্র যুক্তি আকার-ইকার আর কিছুই লাগে না। ধন্য ধন্য পুনঃ পুনঃ।

তৈল শূন্য প্রদীপ বলে—নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ! তৈল পূর্ণ প্রদীপ শুনিয়া হাসে। ভাবে, নির্ব্বাণে লাভটা কি? কিন্তু হীরক যেমন নিশার আঁধারে দশগুণ জ্যোতিঃ দেয়, দিনে দেয় না, ব্রহ্ম-মণিও তেমনি সংসারালোকে জ্যোতিঃ দেন না, নির্ব্বাণ-আঁধারে দশগুণ জ্যোতিঃ খুলিয়া দেন! সেই ব্রহ্ম-মণি দেখিলে কে লোভ সংবরণ করিতে পারে? ধন জন পূর্ণ সংসারীও তখন "নির্ব্বাণ চাই, নির্ব্বাণ চাই" বলিয়া ছুটিতে থাকে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ শুনিয়া অন্ধেরা হাসে কতক্ষণ? যত ক্ষণ না ত্রিতাপের নিশীথ আঁধারের মধ্যে নীলকান্ত-মণি ঝক্ মক্ করিয়া উঠে।

বস্তুর সার ভাগই উৎকৃষ্ট ও বাঞ্ছনীয়; জগতের সার ভাগই ব্রহ্ম। আর সব অসার।

একই সত্য। ৫ এর আকারটা মিথ্যা। উহা একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। বস্তুটা "এক"। এককে পাঁচবার লওয়া হইয়াছে। ৫টা মিথ্যা কল্পনা। ৫এর মধ্যে "এক" আছে বলিয়াই ৫ সত্য। এক ছাড়িলে ৫ মিথ্যা। তেমনি এক ব্রহ্মই সত্য, উহার উপরেই সৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র।

অহো, পার্থিব সুখ রূপ বন্ধ্যা-পুত্র গুলি দেখিতে কতই সুন্দর কতই মিষ্ট! মুখ খানি যেন পদ্ম ফুলের ন্যায় টল্ টল্ করিতেছে, ইচ্ছা হয় চুম্বন করি! "পশ্চাতে ঝঞ্ঝনায়তে!" শেষে দেখি সর্ব্বৈব মিথ্যা! কাচের পুতুলের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর! সাধু সাবধান!

যে নব যৌবনের ক্ষণস্থায়ী জড়-বিকাশ এতই সুন্দর, তাহার অজড় নির্ম্মল স্ফটিকস্বচ্ছ স্থায়ী বিকাশ না জানি কতই সুন্দর,

কতই মধুর। এই অম্লান যৌবন-শ্রীর দেশকেই শ্রীবৃন্দাবন বলা যায়।

না বুঝিতে পারায় উদাহরণে অনেক দোষ ঘটে। "জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে"—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"। রামকৃষ্ণ বলেন—একটা সানাই পোঁ ধরে, আর একটা সানাই রং বিরং বাজায়। রং বিরংটা লীলা, পোঁ ধরাটা ব্রহ্ম জ্ঞান।" অজ্ঞান লোকে ভাবে, এ সবই ত অতি ভয়ানক, এরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানে সুখটা কি? বস্তুতঃ ইহা আংশিক উপমা। শুধু ঐ টুকু কথা বলিলে সমাধির অবস্থা প্রকাশ পায় না। জলে জল মিশানতে, চিনি হওয়াতে, পোঁ ধরাতে শুধুই জল, চিনি, পোঁ নহে, উহাতেই সম্পূর্ণ চৈতন্য বিকাশ, পূর্ণানন্দ ও মহাপ্রকাশ আছে। অর্থাৎ শত শত সূর্য্য, শত শত সৌরজগৎ নিয়া, যাহাতে প্রকাশিত, সেই "সর্ব্বপ্রকাশ" সর্ব্বদা উহাতেই স্বপ্রকাশিত রহিয়াছেন। উহাতে চৈতন্যই আছেন, আমাদেরই এই চৈতন্য, তাহাই লক্ষগুণ বৃদ্ধি হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ উহা জলও নহে, চিনিও নহে, পোঁও নহে। গাঁজা আফিং সেবনেও স্থিরতা হয়, তাহাকে জড়তা বলে। ব্রহ্ম জ্ঞান শুধু স্থিরতা নহে, তার সঙ্গে "সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বপ্রকাশ" উদয় হইয়া থাকে। কিছুতেই প্রয়োজন নাই—এরূপ বোধ সত্ত্বেও ইচ্ছামাত্রেই ("অনিচ্ছার ইচ্ছা" নির্ব্বাণের পূর্ব্বে হয়) "সর্ব্ব" জানিতে বা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা হইলে তারপরে গিয়া নির্ব্বাণরূপ "পূর্ণ-স্থিরতার" উদয় হইবে। সর্ব্বজ্ঞতা ও মহাপ্রকাশই নির্ব্বাণে লইয়া যাইবে।

ইতি পঞ্চম প্রবোধ।

ষষ্ঠ প্রবোধ।

খণ্ডচৈতন্য-জীব অখণ্ড-চৈতন্য ব্রহ্মের স্বরূপ অভ্যাস করে, ইহা স্বাভাবিক; না করাই অস্বাভাবিক।

বহু সৃষ্টিতে এক দৃষ্টি—বহুও দেখিতেছেন, এবং তৎকালেই একই জানিতেছেন, এই রূপ ভাবই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। যাঁর দেহের প্রতি মমতা নাই, তার আর মরণ কোথায়? সঙ্কল্প-বীজ বপন না করিলে, কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিবে? জীবন্মুক্তেরা সব লইয়াই বসিয়া থাকেন, ত্যাগ-বুদ্ধি হয় না। সর্ব্বত্যাগী হইলেই সব লইয়া বসিয়া থাকা যায়। তখন জড়ীয় 'অহং' ছাড়িয়া যায়, আত্মারই প্রকাশ হয়।

বাসনা যা'র হৃদয়কে ধান্য-মর্দ্দণের ন্যায় মর্দ্দিত করে, তার মরণই ত উপযুক্ত হইয়াছে! অজ্ঞানের ঘনীভূত আকার এই দেহে যার "আমি-আমি"বোধ হইয়াছে, তার মরণই পরম শোভা! দেহ যাওয়া মরণ নহে, আত্মতত্ত্ব হইতে মন সরিয়া যাওয়াই মরণ! যার মন আত্মতত্ত্ব হইতে সরিয়া যায় না, তার বাঁচিয়া থাকাই পবম শোভা!

যেমন দুর্ব্বল কৃষ্ণকায় মেঘকে সবল শুভ্রকায় মেঘ পরাভূত করে, তেমনি পূর্ব্ব জন্মের কুকর্ম্ম-ফলকে এ জন্মের সুকর্ম্ম-ফল পরাভূত করে। পূর্ব্ব জন্মের সুকর্ম্মও কিছু-না-কিছু থাকে, কিন্তু কুকর্ম্ম ফল এত প্রবল হয় যে উহা ঢাকা দিয়া ফেলে। এ জন্মে যদি অল্প সুকর্ম্মও কর, তবে জানিবে যে, সামান্য পূর্ব্ব-সুকর্ম্ম যোগে, আগুন যেমন তিলে তাল হইয়া উঠে, তেমনি এ জন্মের সুকর্ম্ম-ফল তিলে তাল হইয়া উঠিবে, তখন শুভ্র মেঘ সহসাই শীং নাড়া দিয়া দাঁড়ায়। ঐ সুকর্ম্ম ফল গুণিত হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়া, বর্ত্তমানের ও

অতীতের কুকর্ম্ম ফল নষ্ট করিয়া ফেলিবে ও ভবিষ্যতের কুবাসনার জড় পর্য্যন্ত উৎপাটন করিবে। এ জন্য নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই কতক গুলি সুকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, তখন 'সু' ক্রমাগত 'সু' আনিতে থাকিবে। পূজা, পাঠ, জপ তপ, ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিবে। পিপীলিকাকে আহার দিয়াও, তোমার সুকর্ম্ম-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে।

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট যে সকল কর্ম্ম, তাহাই সুকর্ম্ম। কামিনী কাঞ্চনে প্রবল আসক্তি-জনিত যে কর্ম্ম তাহাই কুকর্ম্ম। ঈশ্বর, ভক্তি, জ্ঞান, সকলে বুঝিতে পারে না, কিন্তু এই সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম সকলেই বুঝিতে পারিবে। এই কর্ম্ম-বুদ্ধিতেই মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিবে। বাতাস যেমন পচা বস্তুর দিক্ দিয়া গেলে দুর্গন্ধই বিস্তার করিতে করিতে যায়, সেই রূপ কুকর্ম্মের বাতাস যে দিক দিয়া যায় সে দিকে কেবল কুকর্ম্মই বিস্তার করিতে করিতে যায়। সুকর্ম্মও যে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, সে হৃদয়ে সুকর্ম্ম বিস্তার করিতে করিতে যায়। কু তে কু আনে, সু তে সু আনে।

পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের সুকর্ম্ম ফল সঞ্চিত হইতে হইতে এমন একটা জমাট বান্ধে যে, সেই সুকর্ম্ম ফলের জোর বাতাসে তোমাকে সুদিক দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইবে, কুদিকে পড়িতেই দিবে না। ঐ সুকর্ম্ম ফলের জোরটাই হইল দৈব। তাই এক সঙ্গের যাত্রীর মধ্যে এক জন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুকর্ম্ম ফলের জোর বাতাসে সাপের মুখে পড়িয়া যায়, আর পাঁচ জন সুকর্ম্মের জোর বাতাসে দৈবাৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

বিপদ দুঃখকে বর্ত্তমানের সুকর্ম্মের দ্বারা খণ্ডন করা যায়, ইহাই ঋষিদের স্থির নিশ্চয়। ব্যাধি, বিপদ ও মনঃক্লেশের সময় সুকর্ম্ম-

রূপ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দান ধ্যান জপ তপ, হোম যাগ, চণ্ডীপাঠ, গীতা-পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিলে কুকর্ম্মফল কেন না বিতাড়িত হইবে? বিশ্বাসের জোরের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল সুকর্ম্মের জোর আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মহামারী উপস্থিত হইলে হরিনাম সংকীর্ত্তনের জোর বাতাসে, তাহার শান্তি হইয়া থাকে। এমন সুকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যার জোর এত অধিক যে জোরবান কোনও নির্দ্দিষ্ট কুকর্ম্ম ফলকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিলে অপমৃত্যু ঘটে না বা সর্প দংশন করে না। কর্ম্মই সব। কর্ম্ম-রূপ ব্রহ্মের পদে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

"ঘুচাও সুকর্ম্ম দিয়া কুকর্ম্মের ফল,
কাঁটা দিয়া কাঁটা খোলা, উপায় কেবল।"

মূলাধার চক্র (গুহ্যদেশ) মাটি তত্ত্ব, পরে স্বাধিষ্ঠান চক্র (লিঙ্গমূল) জলতত্ত্ব—এই দুইটীর সম্বন্ধে মনের চিন্তা থাকিলে, তাহাকে "অধম" বলে, অর্থাৎ 'ম' মানে মণিপুর চক্র, তাহার অধঃ ; মণিপুর (নাভিস্থান) অগ্নি বা তেজঃ তত্ত্ব, ঐ তেজের নিম্নের বিষয়ে ভাবনা থাকিলে "অধম" হয়। ঐ 'ম' বা মণিপুরের মধ্যে থাকিলে, 'মধ্যম' হয়। ঐ তেজ-তত্ত্বের উর্দ্ধে ভাবনা থাকিলে তাহাকে "উত্তম" বলে। উৎ-তম অর্থাৎ উর্দ্ধতম।

তত্ত্বদর্শীর দেহত্যাগের পরে আর জড় দেহ হয় না। পূর্ণতেজের পূর্ণ যৌবন-শ্রী যুক্ত আতিবাহিক দেহ, তেজ-তত্ত্বের উপরে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিতে থাকিবে। ঈশ্বর-ব্রহ্মভাব তখন স্বপ্র-কাশিত হইবেন, ব্রহ্মালোকে সেই দেবলোক অবিরত আলোকিত থাকিবে। সেইখানে কৃষ্ণলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক—সর্ব্ব-লোক সেই আলোকের "মহাপ্রকাশে" প্রকাশিত আছে।

মৃত্যুর পরে মনের যে নিম্নার্দ্ধ, যাহা জড়-সম্বন্ধে জড়িত, তাহা দেহের সহিত বিলয় পায়। আর তত্ত্বজ্ঞানীর মনের যে ঊর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ (সত্ত্ব বা তত্ত্ব) তাহা শুধু তেজ-মরুৎ ব্যোম দ্বারা গঠিত আতিবাহিক দেহ লইয়া পরব্যোমে বিচরণ করে। এই অবস্থাই সাধারণ সাধুদের বাঞ্ছনীয় ও লক্ষ্য। এই রূপ সহস্র সাধুর মধ্যে কেহ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

সয়তানি-বাদীরা বলেন, "সয়তান ঈশ্বরের অনুমতি পায় এবং সেই বলেই সে মহাশক্তি সম্পন্ন হইয়া পাপ-পথে লোককে টানিয়া লইয়া যায়।" কিন্তু ঈশ্বর কেন অনুমতি দেন ?—সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি না করিলে সয়তান-সৃষ্টি আর কোথা হইতে হইবে ? আমারাও দেখি—সয়তান ঈশ্বরের সৃষ্ট ও অনুমতি-প্রাপ্ত সেবক। সে পাপ ও দুঃখই উৎপন্ন করে। এই মহাদুঃখক্লেশই ঈশ্বরের অমৃত ধামে যাইবার সোপান। জীবের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিবার জন্য পাপ-দুঃখ-রূপী মূর্ত্তিমান সয়তান, ঈশ্বরের ইচ্ছা মতেই, স্বর্ণকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া নির্ম্মল করিতেছে। ঈশ্বরের এই সৃজন-লীলার প্রধান অঙ্গই ঐ সয়তান বা আবরণী শক্তি। উহাই মায়া। রক্ত মাংসের শরীরে যে "আমি আমার" বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধিই সয়তান। কুক্কুর-মাংস-চর্ব্বণ-কারিণী চণ্ডালিনীর ন্যায় ঐ বুদ্ধি ব্রহ্মদর্শী সাধু-গণের অস্পৃশ্যা।

বহুত্ব-বোধকে ব্যষ্টি-কল্পনা বলে, আর একত্ব-বোধকে সমষ্টি কল্পনা বলে। সাধারণের ব্যষ্টি কল্পনা, সাধুদের সমষ্টি কল্পনা হয়।

বালকেরা যেমন যুবক যুবতীর প্রেমালাপ বুঝিতে পারে না,

সেইরূপ সংসারী-বালকও এই তত্ত্ব কথার কিছুই বুঝিতে পারে না। যৌবনে বুঝিবে।

যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া অনন্তকে আয়ত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে ধারণ করিতে পৃথিবীর কতটুকু স্থান আছে?

ব্রহ্মাকাশ, তত্বজ্ঞানীর নিকট, লৌহ-পাষাণ অপেক্ষাও অটল ও কঠিন। ভূতল ত পদতলে বাতাসের ন্যায় সরিয়া যায়।

প্রণব মানে ওম্, অ উ ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রণবের অউ লয় করিয়া অর্দ্ধমাত্র মকার মাত্র ভাবনা করিয়া যোগী তুরীয় অবস্থা পান। উহাই বস্তু, উহা নষ্ট হয় না। যাহা উৎপন্ন হয়, আবার নষ্ট হয় তাহা কোনও বস্তু নহে। বুদ্‌বুদ্ বস্তু নহে, জলই বস্তু। নবযৌবনার স্বামি-মিলনে যে শান্তি সুখ, জীবের মন অধ্যাত্ম রাজ্যে গিয়া যথার্থ বস্তু পাইয়া সেইরূপ শান্তি সুখ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল উপদেশ প্রথমে শ্রবণ-মধুর, মধ্যে সৌভাগ্যদায়ক ও অন্তে অনন্ত শান্তিপ্রদ।

এই জগতের ঐহিক সত্ত্বা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। সুতরাং সাংসারিক কথার মধ্যে "জগৎ নাই" এরূপ কথা কখনও বলিবে না। উহা বলা অসঙ্গত। অসময়ে কথার অপব্যবহারেই লোকে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পারমার্থিক আলোচনা করিয়া বিশেষ চিত্তস্থির তার পরে দেখিলে, দেখিতে পাইবে,—এই জগৎ কেবল কল্পনা-পক্ষীর বাসা, ইহাতে আর কিছুই নাই। বাহ্য পুরুষকার দ্বারা প্রথমে ধন সঞ্চয়, পরে সেই ধনে সাধুসেবা পরে তত্ত্ব-বিচার, পরে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। এই আত্মজ্ঞান অভাবেই অবোধেরা কূপস্থ মশকের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। মলিন বস্ত্রে কুঙ্কুমের রঙ ধরেনা, অহঙ্কার চিত্তে আত্ম তত্ত্ব ফোটে না।

অজ্ঞানের বাসাটী ভাঙ্গিয়া দিলে অহঙ্কার-পাখীটী দেহতরু ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া যায়,তাহা আর দেখা যায় না। সমাধিতে দেখা যায় ভগবান্ পরমাত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে জানা যায়, লাভ করা যায়। এই সুখ, এই দুঃখ, এটা আমার, উহা আমার নাই— এ সব মন-চাপল্য সংসারী ব্যক্তিকেই অস্থির করে, জ্ঞানীদের নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। বিষ্ণু মন্ত্রে এই মায়া ভূত তিষ্ঠিতে পারে না। সাধের মাটির পুতুল টুক্ করিয়া ভাঙ্গে, এবং সহজেই বালককে কাঁদায়; তেমনি অবোধ মানবের বাসনার পুত্তলিকাও টুক্ করিয়া ভাঙ্গে এবং কান্দাইয়া যায়। সমানে সমানেই প্রেম হয়। ব্রজ গোপী তন্ময় হইয়া বলেন—আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ, সুন্দর সুন্দর। আত্মদর্শীও বলেন—অমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, অজর, অমর।

সর্ব্বময় চৈতন্য-ব্রহ্মে ক্ষুদ্র ও নীচ "আমিত্ব" রূপ কলঙ্ক দিয়া লোকে যে পাপ করিয়াছে, সেই পাপেরই ফলভোগ করিতেছে। এখন অখণ্ড ব্রহ্ম-সমাধি সাধন করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুক।

জীবন্মুক্ত অন্তঃশীতল ব্যক্তিগণ কেহ বা সংসার-ব্যবহারীই থাকেন, কেহ বা ধ্যানমগ্ন হন, কিন্তু উভয়েই সমান সুখী। চিত্তের অকর্ত্তা-গিরিই উত্তম সমাধি জানিবে। তাহাই কেবলী-ভাব বা মুক্তি। অন্তঃশীতলতা লাভ হইলেই এই জগৎ শীতল বলিয়া বোধ হয়। কর্দ্দমে পুঁতিয়া ফেলিলেও স্বর্ণের কলঙ্ক নাই, আত্মদর্শী পাপপঙ্কে ডুবিয়া থাকিলেও আর দোষলিপ্ত হন না। এটা সর্প নহে, রজ্জু—এই বোধ হইলেই যেমন শান্তিসুখ লাভ হয়, অহং ভাব ছাড়িলেই তৎক্ষণাৎ ঐরূপ শান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

আত্মার কেবল আত্মসত্ত্বা জ্ঞান আছে। আমাদের ক্ষুদ্র অহং জ্ঞান সেই মহাজ্ঞানের ঈষৎ আভাস মাত্র।

এই ঈশ্বরই সব, তাঁর দুটী ভাব। এক সম্পূর্ণ স্থির ভাব, ব্রহ্ম। আর এক সঙ্কল্পই ভাব—সৃষ্টিকর্ত্তা। ঐ সঙ্কল্প গতি। অগতি যে ব্রহ্ম,তাঁর প্রথম গতি হয় বলিয়াই ঈশ্বর অগতির গতি। এই সকল অমৃততত্ত্ব যাঁহাদের নিকট জানা যায়, সেই সকল সাধুগণের সংসর্গই মোক্ষ-সুখের তুল্য বলিয়া জানিবে। সংসারের যত সুখ তাহা আত্মদর্শীর সুখই জানিবে, অন্ধ সংসারীর তাহাতে জন্ম মৃত্যু দুঃখবই কিছুই নাই। একটু দুঃখই যাহাকে মলিন করে, তাহার কি এ সংসার শোভা পায়? সহস্র মৃত্যুতেও যাহাদিগকে মলিন-মুখ করিতে না পারে, সেই সকল সাধুগণই সংসারের আমোদ প্রমোদ ও সুখ সম্ভোগের উপযুক্ত পাত্র। অন্ধেরা যদি কোনও সুখ দেখে, তবে তাহা স্বপ্নে বিদ্যুতের ন্যায় দেখিয়া থাকে। সেই সুখই আবার স্থির সৌদামিনী হইয়া দাসী রূপে আত্মদর্শীর সেবা করিতেছে। চির সন্তোষময়ী পরা বুদ্ধিকেই সমাধি বলে। স্রোত যেমন কখনই জলকে ছাড়ে না, তেমনি আত্মদর্শীর বুদ্ধি তত্ত্ব-বোধকে ক্ষণকালও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এই সংসার-দর্শনই অজ্ঞকে বন্ধন করে, জ্ঞানীকে মুক্তি দেয়। ইহাই অজ্ঞের নিকট মায়া, বিজ্ঞের নিকট মোক্ষ। অজ্ঞের নিকট সর্প, বিজ্ঞের নিকট তৃণ। এ সংসারে অজ্ঞেরা সাবধান হউক,তাহাদের "আঁধার ঘরের সাপ, সকল ঘরেই সাপ।" সংসার-মধ্যেই মোক্ষ আছে।

সংসার-পঙ্ক হইতে উত্থিত, জ্ঞান রূপ প্রস্ফুটিত পঙ্কজকেই মোক্ষ বলে। অহং জ্ঞান তিন প্রকার। ১ম, আমি সূক্ষ্মতম সর্ব্বাতীত আত্মা। ২য়, আমিই সব, আমাভিন্ন কিছুই নাই। ৩য়,

আমিই দেহ। এই ত্রিবিধ অহংজ্ঞান ছাড়িয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই মোক্ষ-পদ বলে। সকল বস্তুর উপাধি ভুলিয়া, যে "সত্ত্বা-সামান্য" বোধ, সেই মহাসত্ত্বাকেই মোক্ষ বলে। সেই মহাসত্ত্বায় এত সুখ যে, যুবক যুবতীর কণ্ঠালিঙ্গনেও তত সুখ বোধ হয় না। সেই সুখে ত্রিলোকের সম্পদ তৃণের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

প্রবুদ্ধ জ্ঞানিগণ সংসার-ব্যবহারে বিরত হন না। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রবুদ্ধ বৃত্রাসুর, অন্তরে শান্ত থাকিয়াই, ইন্দ্রযুদ্ধে রত ছিলেন। জীবন্মুক্ত প্রহ্লাদও নিত্যানন্দ অনুভব করিয়াই, পাতাল-রাজ্যে দৈত্য-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মুক্ত পুরুষ বৃহস্পতি, পত্নীর সন্তোষের জন্য, দেব-কার্য্য করিতেন। ব্রহ্মাও, জীবন্মুক্ত থাকিয়াই, অখিল সৃজন-ব্যাপারে রত রহিয়াছেন। বিষ্ণুও নিজে, মুক্তিস্বরূপ হইয়াই, অখিল পালন করিতেছেন। সদামুক্ত হরও, প্রাণাধিকা গৌরীকে কামুকের ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ং মুক্তি-রূপা পার্ব্বতীও ত্রিলোচনকে কণ্ঠহারের ন্যায় অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। জীবন্মুক্ত নারদও সতত কলহ-কৌতুকের মধ্যেই ভ্রমণ করেন। মহামুক্ত বিশ্বামিত্রও পূজার্চ্চনা ও যাগ যজ্ঞাদি করিতেন। জীবন্মুক্ত সূর্য্যদেবও নিজ কর্ত্তব্যরূপ দিন-প্রকাশে ক্ষান্ত হইতেছেন না। যমও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নিজের ধ্বংস-নীতি ত্যাগ করেন নাই।

দেহেই যে মুক্তিবোধ, তাহা সদেহা মুক্তি। দেহ নাশের পরে যে মুক্তি তাহা বিদেহা মুক্তি। জীবন্মুক্ত গুরুতে যে দৃঢ় বিশ্বাস, সেও একরূপ তৃতীয় মুক্তি; মমতা থাকিতেও তাহা হইয়া থাকে। এই মুক্তিই সাধারণের পক্ষে সহজ।

চিত্তের কার্য্য রোধ করাকেই যোগ বলে। বস্তুর সম্যক

দর্শনকেই জ্ঞান বলে। এই যোগ ও জ্ঞান মিলিত হইয়া চিত্তস্পন্দন রূপ সংসারকে নিবৃত্ত করে। দেহ-বাদীদের বক্ষঃস্থলে যে হৃদয় থাকে, উহা হেয়। জ্ঞানীদের জ্ঞান মাত্রেই যে হৃদয়, উহাই উৎকৃষ্ট। জ্ঞানিগণ ভোগ সকলকেও নমস্কার করেন,কেন না আত্মা ঐ ভাবেই সংসারীকে পালন করেন। দুঃখকে নমস্কার কর, কেন না আত্মাই, দুঃখরূপ ধরিয়া, আপনাকে আপনি সন্তপ্ত করিয়াই, আত্ম অনুসন্ধান করেন মাত্র।

আকাশ-গমনাদি যে শক্তি, তাহা আত্মদর্শীর আপনিই হইয়া থাকে, কারণ তিনি নিষ্কম্প আকাশ-বাসই প্রথম হইতে অভ্যাস করেন। সমতা-প্রাপ্ত যোগীর সম্মুখে হিংস্র জন্তু আসিলে, যোগীর সাম্যভাবের শীতল ছায়া, হিংস্র চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া, উহা শান্ত করিয়া দেয়। বাসনা হীন বিশুদ্ধ চিত্তে যাহাই উদয় হয়, তাহাই ঘটে, কারণ ঐ আত্মার সকল শক্তিই রহিয়াছে। আত্মাকে স্বাভাবিক কর, তবেই উহার সকল শক্তি জাগ্রত হইবে। চিত্তনাশই নিত্যসুখ। যে চিত্তকে সংসারমায়া বিচলিত করিতে পারে না, সেই চিত্তই মৃত। এই মৃত চিত্তই নিত্যসুখের আকর। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চিত্তনাশে তত্ত্বকোষে,বসন্ত-মঞ্জরীর মত, সত্ত্বগুণের নৃত্য আরম্ভ হয়। ইহাকে স্বরূপ চিত্তনাশ বলে। আর অরূপ চিত্তনাশে বাহিরের কিছুই থাকে না। পূর্ব্বাপর না বুঝিয়াই পাগলের ন্যায় যে "আমি আমার" বোধ, উহাই চিত্ত। সকল বস্তুর স্বরূপ না দেখিয়া, বিরূপ দেখাকেই চিত্ত বলে। স্বরূপ-দর্শনকেই চিত্তনাশ বলে। কুসংস্কারই চিত্ত, আর সুসংস্কারই সত্ত্ব বা তত্ত্ব। নৌকারোহী দেখে—বৃক্ষ চলিতেছে, চিত্তারোহী দেখে—জগৎ চলিতেছে। উভয়েই সমান।

ভ্রান্তিটা ঘুচিয়া গেলেই এরূপ মহাতেজের মহাপ্রকাশ আরম্ভ হয় যে উহা সূর্য্য অপেক্ষাও প্রকাশময়। তখন পার্থিব চিত্তটা সেই তেজে ছাই হইয়া যায়। চিত্তরাজ্যে ব্রহ্মাগ্নি ধরিয়া গেলে সেই আগুনে ত্রিভুবন পুড়িয়া ছাই হয়, তখন মুক্তি করতলস্থা হন। জ্ঞানময় উজ্জ্বল চিত্তই তত্ত্ব বা ব্রহ্ম।

ইতি ষষ্ঠ প্রবোধ।

সপ্তম প্রবোধ।

নির্ম্মল সত্ত্বগুণে থাকিলে অন্বয় ব্রহ্মবোধ ও সূক্ষ্ম সত্ত্ববুদ্ধির পরিচালনা, দুইটীই থাকে—উহাই জীবন্মুক্তি। অন্ধকার একটা বস্তু নহে, তথাপি রাত্রিতে তাহার জগদ্ব্যাপী শরীর দেখা যায়, সেইরূপ আমাদের শরীরের মিথ্যা অস্তিত্ব আমাদের সর্ব্বময় হইয়া রহিয়াছে। মূর্খেরা জন্মায়, বালক হয়, যুবা হয়, বৃদ্ধ হয়, মরে, আবার জন্মায়, আবার বৃদ্ধ হয়, আবার মরে, সুখী হয় দুঃখী হয়—কতই যে হয় তাহার ইয়ত্বা নাই। গলায় দড়ী বান্ধা কলসী যেমন কূপের মধ্যে নিয়তই নামে আর উঠে, সেইরূপ গলায় মায়া-দড়ী বান্ধা মূর্খেরা সংসারের অন্ধকূপে দিবা রাত্রি উঠিতেছে, পড়িতেছে মাত্র। অহো জ্ঞানিদিগের যাহা গোষ্পদ তাহাই অবোধের নিকট অপার ভবসিন্ধু হইয়া রহিয়াছে! মূর্খতার কি ভিষণ বৃথা-আড়ম্বর! অন্ধের দৃষ্টি যেমন দুইটী চক্ষু গহ্বরেই বদ্ধ থাকে, অন্য কিছুই দেখিতে পায় না, মূর্খের দৃষ্টিও সেইরূপ উদর-পূরণ ও সন্তান-উৎপাদন—এই দুইটা কোঠরেই বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রমোদার

পয়োধরে মূর্খেরা অমৃত-কুম্ভ দেখিয়া থাকে, সেটা কি ভেল্কী নয়? ত্রিজগৎ ঐরূপ ভেল্কী দেখাইতেছে! ঐ যে তেজ-নাশিনী মোহিনী মূর্ত্তি সকল ঘুরিতেছে, উহারা আর কিছুই নহে, কেবল অজ্ঞানচন্দ্রের আকর্ষণে কাম-সাগরের তরঙ্গ-লীলা। বিম্বের ন্যায় অধর ওষ্ঠ শোভিত মুখখানি কতই সুন্দর! অধর ওষ্ঠ কাটিয়া ফেল, দেখিবে কি ভয়ঙ্কর প্রেত মূর্ত্তি। এই জগৎ-সুন্দরীর গাত্রচর্ম্ম কাটিয়া যাঁহারা উহার ভীষণ বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর উহাকে স্পর্শও করেন না।

অবিদ্যা কোথাও নাই, মানুষের একটা ভ্রম মাত্র। ঐ ধাঁধা ঘুচিলেই, অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র মহা প্রকাশে প্রকাশিত হন। এই সিদ্ধান্ত জ্ঞান লইয়াই হরি হরাদি অবতীর্ণ হন, তাই তাঁহাদের দুঃখের লেশও থাকে না। হর-পার্ব্বতীও যে সিদ্ধান্ত-জ্ঞান সম্বল করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন, তোমরাও সেই সুশীতল সিদ্ধান্ত জ্ঞান অন্তরে দৃঢ় স্থাপন কর। এ সংসার অজ্ঞের দৃষ্টিতেই দুঃখময়, বিজ্ঞের দৃষ্টিতে আনন্দময়। অজ্ঞের ত্রিতাপময় দগ্ধ জগৎ বিজ্ঞের নিকট চিরদিন অমৃতময় হইয়া রহিয়াছে! ইক্ষুরসের অন্তরের মিষ্টতার ন্যায় নিখিল জগতের অন্তরে "আমি আমি" রূপে যিনি মিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, তিনি ব্রহ্ম। যে আত্মবোধে অমরতা বা অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই বোধই ব্রহ্ম। কল্পতরু যেমন যাচকের সহিত নীরবে কথা বলে, নবীন মেঘ যেমন গুরগুর করিয়া চাতকের সহিত বড় আশার কথা বলে, তেমনি সেই ব্রহ্ম, ভগবান্ হইয়া ভক্তের সহিত কত কথাই বলেন! ইহা আর আশ্চর্য্য কি? সাধারণের পক্ষে ক্ষণকাল এই অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ ধরিয়া থাকা যেমন কষ্টকর, বিবেকীর পক্ষে এই সকল সাধু-সঙ্গ

ও সাধু-প্রসঙ্গ ক্ষণকাল ছাড়িয়া থাকাও তেমনি কষ্টকর। সংসারে এই দেহটা সত্যই বটে, তবে যখন আত্মাকে দেখা যায়, তখন এটা মিথ্যা হইয়া যায়। রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখি যেন দিবসেই কার্য্য করিতেছি; সেই দিবস তখন বেশ সত্য বোধ হয়। মনের অভ্যাসে জগৎটাও সেইরূপ সত্য বোধ হইতেছে। পুষ্প যেমন হস্তে রগড়াইলেই আর থাকে না, তেমনি চিৎ-লতায় যে জগৎ-পুষ্প ফোটে, তাহাও জ্ঞানের হস্তে রগড়াইলেই আর থাকে না। এই সপ্তপাত্রী কুসুম-কোমল জগতের উপর আবার আস্থা কি?

আগে চিৎ, পরে তার চেত্য ভাব হয়, পরে চেতন ভাব হয়, পরে মনোভাব বা জীবভাব হয়, পরে পূর্য্যষ্টক বা সূক্ষ্ম দেহ গঠনের উপাদান অর্থাৎ আতিবাহিক দেহ হয়; ঐ আতিবাহিক দেহে মন ক্রমে স্থূল ভাব দেখে. পরে মন, আতিবাহিক সূক্ষ্ম ভাবটাকে একেবারে ভুলিয়া যায়, এইরূপে স্থূলভাবে আসক্ত হইতে হইতে দেহও স্থূল হয় এবং মনও স্থূলবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখনি মৃত্যুময় স্থূল জগতের স্বপ্নময় লীলা-চক্র ঘর্ঘরে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ এই ঘূর্ণিত চক্র, সেই অখণ্ড-চৈতন্য মহাকাশ বই আর কিছুই নহে। অতএব সর্ব্বদা "চিদেক রস" মহা প্রকাশ-রূপে অবস্থান কর।

হে আকাশ চৈতন্যময়, তোমারি বিশ্ব আর কারো নয়।
সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে, চেয়ে আছে স্থির নয়নে।
যে তোমায় অন্তরে নিয়ে, ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে,
সব অভাব তার গেছে ধুয়ে, স্পর্শমণি তোমায় ছুঁয়ে।

এই চিৎ, ভোজবাজীর ন্যায় "হিলি বিলি" শব্দকেও মন্ত্রবৎ বা

বেদ-বাক্যবৎ সত্য করিয়া দেখাইয়া থাকেন। "গুলুগুলু" শব্দ বা "ভিওি ভিওি খিলে মত্ত, পুরু পিচ্ছলি সালঘ" ইত্যাদি অর্থহীন শব্দকেও বেদবাক্য করিয়া তুলেন। আত্মদর্শীরা দেখেন, ঐ সকল অর্থহীন শব্দও যাহা, এ জগৎও তাহা। উহার আগাগোড়া নাই, কোনও অর্থ নাই। আছে কেবল শেষে "বাবা কোথায় গেলিরে?" এই উৎকট বিকট রোদন ধ্বনি অর্থাৎ সেই "ভিওি ভিওি গুলু গুলু" ধ্বনি মাত্র। জ্ঞানীরাই জানেন, ঐ ভিওি ভিওি ধ্বনির অর্থ হইতেছে "চিন্ময় ব্রহ্ম, চিন্ময় ব্রহ্ম"। আর কোনই অর্থ নাই। জগতের সকল কথাই কতক গুলি সংস্কার মাত্র। উহা মনে নিহিত থাকে। বাজের অন্তরে বৃক্ষের শাখা পল্লব যেরূপ নিহিত থাকে, সেইরূপ মনের মধ্যে দেহের যে সূক্ষ্ম ভাব সকল নিহিত থাকে তাহাকেই পুর্য্যষ্টক বলে। উহা আকাশেই আছে। মন বুদ্ধি অহঙ্কার, আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই ৮টীকে পুর্য্যষ্টক বলে। অবোধকে এই সকল উপদেশ দিয়া কি হইবে? স্বপ্নময় পাত্রকে স্বর্ণময়ী কন্যা সম্প্রদানে কি ফল? যে আত্মার স্বরূপ জানে না, সেইত আত্মাতে, আত্মা না দেখিয়া, জগৎ দেখে! জ্ঞানী আর জগৎ দিয়া কি করিবেন? সুমেরু পর্ব্বত আর স্বর্ণ চাহে কি?

কোনও বস্তু প্রথম পাইলে, অত্যন্ত সুখ বোধ হয়; দুদণ্ড পরেই আর তেমন সুখটী বোধ হয় না, কে ইহা না দেখিয়াছে? সাধুরা ইহা দিব্য চক্ষে দেখিয়াই আর কোনও বস্তু কামনা করেন না। ইন্দ্রত্ব দুদিনে পুরাতন হইয়া যায়। নির্ব্বোধেরাই উহাতে আসক্ত হইয়া উহার দাসত্ব করুক।

ব্রহ্মরূপ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় যোগ করিলে, ঐ ইন্দ্রিয়-

সুখেরই অবধি পাওয়া যায় না। তাহাতেই মন মরিয়া যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত দিয়া গোপী চিত্ত দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ তন্ময়ত্ব বা চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। সুখ নিত্য, কখনও তাহার ধ্বংস নাই, কেবল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনিত্য ভাবে যায় আসে, শেষে ব্রহ্মে গিয়া নিজ নিত্যত্ব অনুভব করে। তখনই তাহাকে "আত্মবোধ" বলে। চিরকালই সেই ব্রহ্মসুখ—একই সুখ, এখানে সেখানে। তত্ত্ববোধেই চিত্ত যায়, আত্মবোধেই নিত্য সুখ। যদি সুখ চাও, তবে সুখকে নিত্যত্ব দেও, চিত্ত হইতে উঠাইয়া তত্ত্বে ফেল।

জলের চলৎশক্তি নাই, নিম্নদিক পাইলেই চলে। অখণ্ড চিৎ ধাতুও চলে না, কল্পনা রূপ নিম্ন দিক পাইলেই চলিতে থাকে। ময়ূরের ডিমের রসে যেমন সহস্র চক্ষু যুক্ত সুন্দর পেখম লুক্কায়িত আছে, চিত্ত মাঝেও সেইরূপ কোটী কোটী সুন্দর জগৎ নিহিত রহিয়াছে। ঐ অণ্ড-রস নানা ভাবাপন্নও বটে, এক ভাবাপন্নও বটে। ব্যবহারিক ভাবে নানা, পারমার্থিক ভাবে এক। এ জগৎও সেইরূপ। চাঁদের কিরণ চাঁদেরই আত্ম প্রকাশ; এই জগৎও সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই আত্ম প্রকাশ মাত্র।

কর্ম্মের এমনি প্রভাব যে কল্যকার কুকর্ম্ম অদ্যকার সুকর্ম্মের যোগে সংশোধিত হইয়া সুফল প্রদান করে। স্বপ্নাবস্থায় যে মন ভ্রমণ করে তাহাই সংসার, ঐ মনের যে প্রবোধ তাহাই মুক্তি। দর্পণে মুখের ছায়া পড়িলে, সেই মুখের দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, অমনি দর্পণের স্বচ্ছতার কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। চিৎ দর্পণে অহং দেখিয়া জীব চিৎ স্বচ্ছতার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মরূপে

দেখ, অসত্য অনিত্য কিছুই নাই; জগৎরূপে দেখ, সত্য ও নিত্য কিছুই নাই। চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই দেখিবে—এ জগৎ কেবল "বচন" মাত্র। মুনিদের যে চিত্ত-স্থিরতা তাহাকেই "মৌন" বলে। বাক্য সংযমকে বাঙ্‌ মৌন বলে; জোর করিয়া মুখ চক্ষু রোধ করাকে অক্ষমৌন বলে; কর্ম্ম চেষ্টা ত্যাগকে কাষ্ঠমৌন বলে; আর একটা মনমৌন আছে, সেও কাষ্ঠমৌনের অন্তর্গত। কাষ্ঠতাপসের ঐ তিন রকম মৌনই হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ভাবকেই যথার্থ মৌন বলে। আত্মদর্শন হইলেই উহা ঘটে। উহাতে প্রাণায়ামাদি কোনও যোগ-ক্লেশ নাই; এই জগৎ উহাতে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু স্বপ্ন বা স্বরূপের আভাস মাত্র বলিয়া বোধ হয়। পরমাত্মাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া মধু বর্ষণ করিতে থাকেন—উহাই "আত্মবোধ"। মনের স্পন্দনই প্রাণ, প্রাণের স্পন্দনই মন, রথ ও সারথীর মত পরস্পর স্পন্দিত। ঐ মন প্রাণ স্থির করিলে স্থির চৈতন্য উদয় হন। নিজ কর্ম্মগুণেই এই দেহ ধারণ হইয়া থাকে, সেই জন্য পূর্ব্ব কর্ম্ম হেতু যত দিন দেহ থাকে, তত দিন সন্তোষের সহিত দেহ ধারণ করিবে।

আত্মজ্ঞান হইলে কাম্য বিষয়ের কিছু ক্ষতি হইল, এরূপ বোধ আদৌ হয় না। কারণ তখন পূর্ণকাম হইয়া সর্ব্ব কামনা প্রাপ্তিই বোধ হয়। যাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি ভাল খুলিতেছে না, তাঁহাদের পক্ষে সকাম ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অজ্ঞানীর কেবল বাসনাই সার, তাহারা ক্রিয়া ফল লাভ করুক। বাসনাহীন ব্যক্তির ক্রিয়া নিষ্ফল। চিন্তাকেই চিত্ত বলে, ঐ মায়িক চিন্তা ত্যাগই চিত্তত্যাগ। প্রতিদিন মনের "আমি-তুমি" মল ধৌত করিবে। ঐ "আমি-তুমি" তে আত্মার তৃপ্তি হয় না। মরীচিকাজলে

কখনও কি কলসী পূর্ণ হয়? এই জগৎ তত্ত্ব-দৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপ জানিয়া চলিত ব্যবহার মতে মনুষ্য যদি কার্য্য করে, তবে তাহাতে বিরোধ কি? তুমি ব্যবহার-রত থাকিয়াও তত্ত্ব দৃষ্টিতে লৌহ পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হও। সমুদায় বস্তুর অসদংশ ফেলিয়া দিয়া মনে মনে সদংশই গ্রহণ কর। যদি কেবল সদংশ গ্রহণ করা যায়, তবে প্রতিমা-পূজা ও ব্রহ্ম-পূজায় বিরোধ কি? রামকৃষ্ণ পরমহংস বেদান্তের চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করিয়াও মা-কালীর দুয়ারে পড়িয়া থাকিতেন। সূর্য্য-তেজঃই চন্দ্রের কিরণ—ব্রহ্মতেজ ই কালী, দুর্গা, ভগবতী। একই বস্তু, বিরোধ নাই। ব্রহ্মকে চিৎ বলে, সৃষ্টির নাম স্পন্দবতী চিৎ। মহাপ্রকাশ-ময় নির্ম্মল জ্ঞান লইয়া স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, যথা ইচ্ছা বিহার কর। এক্ষণে তোমার সমাধিদশা ও ব্যবহার-দশা একসঙ্গে চলিতে থাক। চিত্তত্যাগ আর কঠিন কি? একটা ফুল ছিঁড়িয়া ফেলা অপেক্ষাও সহজ। সূর্য্য হইতে কিরণকে অভিন্ন ভাবিলে কিরণই সূর্য্য হইয়া দাঁড়ায়! তুমি ব্রহ্ম হইতে হরি হরাদি অভিন্ন জানিবে। এবং তুমিও "আমিত্ব" মল ধৌত করিয়া মহা আমি, মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা, হইয়া চিরসুখী হও। অলঙ্কার কেবল স্বর্ণের অস্থায়ী সজ্জা; জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের ক্ষণভঙ্গুর সজ্জা মাত্র। কাল-সাগর যিনি গণ্ডূষে পান করেন, সেই আত্মরূপী অগস্ত কে তুমি স্মরণ কর। জীব কিরূপ মূঢ় দেখ, আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাখা আত্মাকে আপনি দেখিতে পাইতেছে না! দেহটী শিমুল বৃক্ষ, কর্ম্ম সকল তুলা, জ্ঞান-বায়ু উঠিলে তুলা সমস্তই উড়িয়া যায়। "আমি-আমার" রূপ-মল ত্যাগ না করিলে তুমি অধঃপাতের অধঃপাতে যাইবে। উহা ছাড়িলেই ঊর্দ্ধের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। জীবের তিনটী রূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম,

পরম। জড় বাদীরাই কেবল স্থূল রূপে থাকে। সাধুরা কেহ সূক্ষ্ম থাকেন, কেহ পরম পদে থাকেন। অবিদ্যা-আঁধার-নিশিতে আত্ম-জ্ঞানই স্বর্ণ প্রদীপ। শাস্ত্র, দেবতা, গুরু ও দ্বিজগণে শ্রদ্ধা রাখ, ঈশ্বর সত্বরই অনুগ্রহ করিবেন। মনের দ্বারা কর্ম্ম কর, কিন্তু ব্রহ্মাকাশেই তোমার বাস, এই বোধ যেন দৃঢ় থাকে। তুমি সংসার-কর্ম্মকেই অকর্ম্ম-ব্রহ্ম-রূপে সাধন কর। আর অকর্ম্ম-ব্রহ্মকেই সংসার-কর্ম্ম-রূপে সাধন কর। ব্রহ্ম হইতে জগৎ এক বিন্দু ও পৃথক্ নহে— এই দৃঢ় বোধেই ত্রিজগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। আত্মদর্শীগণ আকাশকেই অখিল চৈতন্য স্বরূপ জানেন। "অহম্" এর কিছু ত্যাগ করিলে, শাখা কর্ত্তন হয় মাত্র। অহংএর মূল উৎপাটন করিবে। কর্ম্ম ত্যাগকে ত্যাগ বলে না।। আত্ম-দর্শনই "সর্ব্বত্যাগ" জানিবে। উহাই মুক্তি।

ব্রহ্ম-বারিতে অহম্ রূপ তৈল বিন্দু পড়িতে পড়িতেই জগৎ চক্র বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সুখ যেন সাগরের লোনা-জল। মোহ-রাত্রিতে যেন রত্নের মত চক্‌মক্ করে;আর বালক-বুদ্ধি লোক তাহারই লোভে ছুটিতে থাকে। যদি তুমি স্থির নিশ্চয় করিতে পার, যে জগৎ মিথ্যা, শুদ্ধ চৈতন্যই সব, তাহা হইলে তোমার সকলই সত্য হইবে এবং সকলই থাকিবে, কেবল দুঃখই সমূলে উৎপাটিত হইবে।

অজ্ঞান হইতে জগৎ, কি জগৎ হইতে অজ্ঞান উৎপত্তি, ইহা বিচার করিও না; জানিবে, অজ্ঞান ও জগৎ একমাত্র অবস্তু, দুই নহে। তত্ত্বদর্শী আপনাকে ক্ষুদ্র "আমি" বলিয়া এক পৃথক জীব বোধ করেন না, তাহাতেই তাঁহার সকল সুখের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

শাস্ত্রজ্ঞের সহিত সদালাপে এই অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ নষ্ট হয়। পরে তত্ত্ব বিচারে কতক নষ্ট হয়, অবশিষ্ট আত্ম সাক্ষাৎকারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোকের অবিদ্যা নষ্ট করিতে আর কতক্ষণ লাগে? পার্থিব অহং ভাবকেই জগৎ বলিয়া জানিবে। বুঝিতে পারিলেই উহা দূর করা কঠিন নহে।

স্বপ্ন-ঘোড়ায় স্বপ্ন-পুরুষই চড়ে, জাগ্রত পুরুষ চড়ে না। তেমনি স্বপ্ন-জগতে স্বপ্ন পুরুষই আছে, জাগ্রত-পুরুষ নাই। কেবল তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই প্রাণ ধারণ করিবে, কেবল প্রাণ-ধারণের জন্যই আহার করিবে। যদি বন্ধ্যার পুত্র-পৌত্রের স্কন্ধে চড়িয়া নাচিতে চাও, তবে এই জগতের সুখের উপর আস্থা স্থাপন কর।

আম্রবৃক্ষ বসন্তের পল্লব ধারণ করিলে তাহার নাম হয় "সহকার"। ভোগাবসানে তত্ত্ব-রসে পূর্ণ হইলে তখন জীবের নাম হয় আত্মা। বাতাস পাতাকে দোলায়, পাতায় বদ্ধ হয় কি? তেমনি নিষ্কামী জ্ঞানিগণ কর্ম্মকে চালান, কর্ম্মে বদ্ধ হন কি?

শুক্রই জীবের সারভাগ। আনন্দময় ব্রহ্মের কণিকারূপে শুক্র অবতীর্ণ হন। ঐ শুক্রের মধ্যেই "আমি-আমার" বোধ থাকে। গর্ভস্থ জীবের সর্ব্বাঙ্গে সেই আমি-আমার ছড়াইয়া পড়ে। "আমি-আমার" বোধে মত্ত গ্রাম্য লোকের সংসর্গে তোমার সুখ শান্তি ঘটিবে না। লোনা জলে তৃষ্ণা দূর হয় না। সাধু সংসর্গ অন্বেষণ কর। শাণ দিলে যেমন অস্ত্রের ধার হয়, তেমনি সাধু সংসর্গে আত্মজ্ঞান ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে। পথটী দেখিয়া চলিলেই হুঁচট্ লাগে না তত্ত্ব বিচার লইয়া সংসারে চলিলেই আর ভয় থাকে না। চক্ষু মুদিয়া যে লাফাইয়া বেড়ায়

সেই সাধের কাণা যখন খানায় পড়ে, তখন নরলোক দেবলোক সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন। অবোধের মরণ পরম শোভা। আমি সুখী—এই বোধই সুখ, আমি দুঃখী—এই চিন্তাই দুঃখ। সুখ দুঃখ বলিয়া কোনও জিনিষ নাই।

তিনটী অবস্থা—প্রথম, আত্ম-ক্রিয়ার অবস্থা, বা অভ্যাস। দ্বিতীয়, ক্রিয়ার পরাবস্থা, বা সমাধি। তৃতীয়, ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থা বা জীবন্মুক্তি-ভাব। ক্রিয়া বা অভ্যাস কালে জগৎ দেখা যায়। পরাবস্থায় সমাধিতে আত্মাই দেখা যায়। পরাবস্থার পরাবস্থায় অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গে জীবন্মুক্তি অবস্থায়, বাহ্যবস্তু দেখা যায়, কিন্তু সমস্তই আত্মময় বলিয়া বোধ হয়। সাধুরা এই অবস্থাতেই থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানীর যে বাসনা দেখিতে পাও, সে বাসনা-সূত্র দগ্ধ বস্ত্রের সূত্র গুলির ন্যায় জানিবে।

ইতি সপ্তম প্রবোধ।

অষ্টম প্রবোধ।

সাধু সংসর্গ হইলে মূর্খতাই পাণ্ডিত্য রূপে পরিণত হয়। এমনি আত্মজ্ঞান হইলে সকল বাসনাই গিয়া মুক্তিরূপে পরিণত হয়। সংসার-কল্পনা দূর করিতে হইলে, প্রতিকল্পনা যে 'বিচার' তাহা ধরিতে হয়। ঐ সকল কল্পনা-প্রতিকল্পনার শেষ হইলেই মুক্তি। মনটা বাসনা-শূন্য হইলে যেরূপ সুখ পায়, শত শত উপদেশেও তাহা পাওয়া যায় না। তাই সমাধি অভ্যাস কর। প্রথমে তত্ত্ব বিচার শ্রবণ, পরে মনন, পরে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিতে শিখিবে।

জগতের কারণ স্থির করিতে হইলে বুঝিবে যে, জলে দ্রবত্ব যে কারণে হয়, নির্ম্মল ব্রহ্মেও জগৎ সেই কারণেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ জলেও কিছু নূতন হয় নাই, ব্রহ্মেও কিছু নূতন হয় নাই। চিদাকাশে যে জগৎ ভ্রান্তি, সেটা জ্ঞানীর নিকট স্ফটিকের মধ্যে স্ফটিক রেখার মত বোধ হয়। "জড় বস্তু" যদি চৈতন্য-ভাবাপন্ন না হইত, তবে আমাদের চৈতন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। সমজাতীয় না হইলে ধরিয়া রাখা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানে ইন্দ্রিয় সকলও ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নিজের আত্মাকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে। যে এই আত্ম-রূপী হরিকে ধরিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট জন্ম ও মৃত্যু, বিষ ও অগ্নি, শিরিষ ফুলের ন্যায় শীতল ও কোমল হইয়াছে। যখন দেখিবে, পার্থিব ভোগে রুচি নাই, আত্মতত্ত্ব ভোগে রুচি জন্মিতেছে, তখনই জানিবে, অজ্ঞান জ্বর এইবার ছাড়িয়া যাইবে। স্বাভাবিক ভাব হারাইয়াই জীব এত অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে। স্বাভাবিক ভাব যেখানে, শান্তি সুখ সেইখানেই আছে। বাসনা-হীন জ্ঞানিগণ দূরবর্ত্তী কোনও ব্রহ্মলোকে যান না। এই জগৎই তাঁহাদের ব্রহ্মলোক হইয়া দাঁড়ায়। মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া করিয়া আকাশ হইয়া যায়, জীবও তেমনি বাসনা ছাড়িয়া ছাড়িয়া শুদ্ধচৈতন্য হইয়া যায়। এ সংসারে ইন্দ্রত্ব সুখও পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহা ক্ষণিক স্বপ্নপ্রায়—ইহা জানিতে পারিলে, আর কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ঐ কীটবৎ ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিতে যাইবে?

আত্মার যে ক্ষণিক জগৎরূপ তাহা জীবের দৃষ্টি-দোষেই দেখা যায় মাত্র। অহং-ভূত আদৌ নাই, তথাপি অজ্ঞান-রূপী বালক উহা সত্য সত্যই দেখিয়া থাকে। অন্ধের কাছেই অন্ধকার

সতত-সত্য। অহংকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিলে, উহা যদি একটু থাকেও, তথাপি উহা শরতের মেঘের ন্যায় নিষ্ফল জানিবে।

জলে জল মিশিয়া যায়, গন্ধে গন্ধ মিশিয়া যায়, চেতনে চেতন মিশিয়া যায়, জড় মিশিবে না। সেইজন্য জগৎ যদি জড় অর্থাৎ চেতন বিরুদ্ধ হইত তবে মানব-চৈতন্যে উহা মিশিত না। মনকে আকাশ-চৈতন্যরূপে জানিলেই তখন ঐ মন ব্রহ্ম চৈতন্যে মিশিবে। সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বপ্রকাশ হইলে মহাপ্রকাশ হইবে, তাহাই আত্মা। বদ্ধ-দৃষ্টিতে শুধুই জগৎ প্রকাশ, মুক্ত-দৃষ্টিতে শুধুই চৈতন্য-প্রকাশ।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে সমস্ত সাধুগণ প্রবেশ করিয়াছেন, জানিবে। ক্ষণস্থায়ী এই জগৎ-স্বপ্ন কেন দেখা যায়? কারণ—ক্ষণস্থায়ী তুমি দেখিতেছ বলিয়া। গভীর শান্তি-রূপ যে ব্রহ্ম, তাহা দেখা যাইতেছে না, সেই জন্যই অশান্তি-রূপ যে "জীব-ভাব" তাহাই দেখা যাইতেছে।

দেহ মিথ্যা—তবে "ক চ ট ত প" এই সব শব্দ বা কথা কোথা হইতে হয়? শব্দ বা বর্ণ-উচ্চারণ কেহই করে না। শব্দ যদি শব্দ হইত, তবে স্বপ্নে যত কথা বলি, তাহা পার্শ্বস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় না কেন? জগতের সকল শব্দই বোধমাত্র জানিবে। উহা আকাশই। অনেক নির্ব্বোধের নিকট পাষাণও গান করে। সাধারণে বলে, বাঁশ চিরিলে ঐ বাঁশ "পটাশ" করে। ঐ 'পটাশ' আকাশ বই আর কিছুই নহে।

পৃথিবীর স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ভাব একই ভাব। একমাত্র ব্রহ্ম ভাবের উপরে উভয়ের স্থিতি। আতিবাহিক ভাবে খেচরী-

-বিদ্যা শিখিলে আকাশ বিহার করা যায়, সিদ্ধদের সঙ্গে কথা বলা যায়। আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ লাভের অভ্যাস না করিলে চক্ষুর অগোচর অন্যান্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা যায় না। কল্পিত অগ্নি-শিখা কল্পনা-কারীর গাত্রে লাগিলে তাহার কষ্ট হয় না, খুব আমোদ বোধ হয়, সেইরূপ স্বর্গে নরকে বা জগতে থাকিলেও তত্বদর্শীর ক্লেশ হয় না, আনন্দই হয়। এই সংসার যুবতী কটাক্ষের ন্যায় মোহপ্রদ, ক্ষণিক ও পরিণামে সর্ব্বনাশকারী। এই কটাক্ষে কে আস্থা স্থাপন করিবে? চিত্রকরা ফুলের উপর ভ্রমর কেন বসিবে? শরীর দৃষ্টি যতটুকু, ততটুকুই মৃত্যুভয়, আত্মদৃষ্টি সবটুকুই অমৃতময়! বিষয় ভোগ করিতে করিতে জড়বুদ্ধি দৃঢ় হইয়া যায়, এবং জীবগণ চিন্ময় মহাসুখের এত অধিক দূরে গিয়া পড়ে যে, তাহারা তখন অন্ধতাকেই চক্ষু বলিয়া বুঝিয়া থাকে। জড় হইতে চৈতন্য হয়, কিংবা চৈতন্য হইতে জড় হয়, যাহাই বুঝিয়া থাক, তাহাতেই চৈতন্য ব্যতীত উত্তম প্রার্থনীয় আর কি আছে বল? আর চৈতন্য যদি না থাকে তবে আমাদের চেতনা কোথা হইতে হইল? পুনঃ পুনঃ শুদ্ধচৈতন্যের ধ্যান অভ্যাসেই দিব্যজ্ঞানকে আয়ত্ব করা যায়। পিতা মাতা তোমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতে পারেন নাই, ধ্যান ও অভ্যাসে সেই পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। যদি কোনও মহাপুরুষ তোমাদিগকে উপদেশ দিতে আসেন, তবে জানিবে, সেই পুরুষ তোমাদেরই নির্ম্মল আত্মা; উপদেশক রূপে সম্মুখে আসিয়াছেন।

দেশ হইতে দেশান্তরে স্মৃতি-শক্তি যায়। ঐ যে বিদ্যুতের ন্যায় লোক লোকান্তর গত মুহূর্ত্ত-স্মৃতি, উহাতেই লক্ষ্য কর, উহাই চিদাকাশের খেলা। উহা বুঝিতে ও ধরিতে পারিলেই

তুমি গগন-বিহারী হইয়া, লোক লোকান্তর দর্শন করিতে পারিবে। পরে ক্রমে প্রত্যক্ষ করিবে যে, তুমিই, চিৎ-স্বরূপ হইতে বিচলিত না হইয়াই, অখিল কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ।

সাধনকালে যোগ-নিদ্রায় আমি যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি তাহার ২।১টী বলিতেছি। যশোর জেলার অন্তর্গত নড়-ডাঙ্গার একাংশকে গুঞ্জনগর বলে; ঐ গুঞ্জনগরে আমাদের বাড়ীর একটু দূরে একটী জঙ্গলময় স্থান আছে। তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী। সেখানে ক্ষুদ্রনদী "বেগবতীর" তীরে অতি প্রাচীন-কালের একটি মন্দিরে গুঞ্জনাথ-শিব প্রতিষ্ঠিত। তথায় প্রাচীন কালের গড়খাৎ-বেষ্টন-মধ্যে ভগ্ন অট্টালিকা ও পুরাতন সরোবরের চিহ্ন আছে। লোকে বলে বর্দ্ধমানের মহারাজ কোন সময়ে ঐ স্থানে কিছুকাল গুপ্তভাবে ছিলেন। ঐ মন্দিরের সম্মুখে, নদীর দুই ধারে শ্মশান-ভূমি। গুঞ্জনাথ জাগ্রত শিব বলিয়া বিখ্যাত। আমি যখন সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছি,তখন একদিন যোগ-নিদ্রাবস্থায় প্রত্যক্ষ করিলাম,—গুঞ্জনাথের মন্দিরে গিয়াছি। রাত্রি অনেক হইয়াছে। নিবিড় আঁধারে সেই জঙ্গলময় শ্মশান-ভূমি ভীষণ হইয়াছে। দিব্যালোকে যেন মন্দির ধক্ ধক্ করিতেছে। আমার স্বর্গগত পিতা জটাজুট সমন্বিত আতিবাহিক যোগীবেশে দুয়ারে দণ্ডায়মান; দেখিবা মাত্রেই চিনিতে পারিলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ মাত্র করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গিয়াই দেখি ৭।৮টি দেবীমূর্ত্তি স্বর্গীয় জ্যোতিতে মন্দির আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন। এত দূর স্থির, যেন প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তি। রূপের ছটায় দিক্ উজ্জল

হইয়াছে। আমি অনিমেষ নয়নে দেখিতেছি—একি প্রস্তর মূর্ত্তি? না জীবন্ত? নয়নে পলক আছে কি না দেখি? একাগ্র চিত্তে একটী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। বহু বিলম্বে দেখিলাম তাঁহার চক্ষে একবার মাত্র পলক পড়িয়াছে। দেখিয়াই "মা গো" বলিয়া তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইলাম। তিনি একেবারে আমাকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আমি বলিলাম মা, তুমি কে? এখানে কিরূপে কোথা হ'তে এলে? দেবী বলিলেন,—বাছা, আমরা বৃন্দাবন-বাসিনী, আকাশ পথে ভ্রমণ করিয়া দেব স্থান সকল দর্শন করি। এই মন্দিরের পবিত্র জ্যোতিঃ ধরিয়া সূক্ষ্মাকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া দেবী আমাকে ক্রোড়ে ধরিয়াই মন্দিরের বাহিরে আসিয়া একখানি চৌকীর উপর বসিলেন। আমি অনেক কথা জিজ্ঞাসার পরে বলিলাম, মা কাহারা কথা বলিতেছে, বোধ হয় লোক আসিতেছে, তাহারা তোমাদিগকে দেখিলে আর তোমরা দিব্যধামে যাইতে পারিবে না। শুনিয়াছি, লোকে দেখিলে দেবতারা পাষাণ হইয়া থাকেন। আপনারা শীঘ্র মন্দির মধ্যে লুকাইয়া থাকুন। আপনারা সর্ব্ব সাধারণকেই দেখা দিবেন কি? দেবী বলিলেন, বাছা, সেজন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই। লোক আসুক, উহারা অদ্য দেখিয়া কল্য বলিবে যে, রাত্রিতে এই এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কল্যই ও কথা ভুলিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে কতকগুলি লোক "একি, একি?" বলিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট সকল বিষয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এবং তখনই "আমরা গ্রাম হইতে ঢাকঢোল ও লোকজন ডাকিয়া আনি" বলিয়াই গ্রাম মুখে ছুটিল।

আমি বলিলাম—মা, বৃন্দাবন কিরূপ? আমি দেখিতে পাইব কি? তখন দেবী আমাকে ক্রোড়ে ধরিয়াই তাঁহার বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন; আমি দেখিলাম, চৌকিখানি সহ আমরা উচ্চ হইতে উচ্চতর গগনে উঠিতেছি। কতদেশ, কত মেঘ-মণ্ডল, কত আকাশ অতিক্রম করিয়া বিদ্যুৎ গতিতে কোথায় যে চলিয়া যাইতেছি, তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না। বাঁশীতে মধুর স্বর লহরী ক্রমাগত উঠিতেছে। একস্থানে গিয়া দেবী বলিলেন, বাছা, ঐ দেখ চির-অম্লান শ্রীবৃন্দাবন। বহুদূর হইতে আমি দেখিলাম,—প্রশস্ত যমুনাতট, শ্যামল প্রান্তর ও বনভূমি, যেন অমৃতধারা উছলিয়া পড়িতেছে। একি ইন্দ্রলোক, কি চন্দ্রলোক, কি বৃন্দাবন? দেবী বলিলেন, এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। তুমি আর নিকটে যাইতে পারিবে না। এখান হইতেই দেখ। আমি যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যাহোক, ক্রমে বাঁশীস্বর উঠিল, আর আমরা নামিতে লাগিলাম। বহুবিলম্বে আসিয়া জগন্নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দেবী অন্তর্হিত হইলেন। আমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেবী বলিয়াছিলেন, লোক আসুক, ভয় কি? তাহারা ভাবিবে, স্বপ্ন দেখিয়াছি। অহো! সে আমারই কথা! আমিই পরে ভাবিয়াছিলাম, একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র!

অন্য এক সময়ে আমি দুরারোগ্য ব্যাধিতে, অনেক চিকিৎসার পরে, হতাশ হইয়া,বাবাবৈদ্যনাথের ধামে 'হত্যা' দিতে গিয়াছিলাম সেইখানে বাসাতে শয়ন করিয়া বেলা ২টার সময় স্বপ্ন দেখিলাম—এক ব্রাহ্মণ বলিতেছেন "তুমি বাড়ী যাও, তোমার ব্যাধি আরাম হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "না, ব্যাধি সারে নাই, আমি যাব

না।” তিনি বলিলেন, “মন্দিরে যাও, সেই স্থানে এই দ্রব্য এই পরিমাণে লইয়া খাও ও গায়ে মাখ। আরাম হইবে।” শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ভাবিলাম শুনিয়াছি পাণ্ডারা চাতুরি করিয়া কাণের কাছে কি বলে, তাই কি? দেখিলাম তাহা নহে। প্রাচীরের কপাট বন্ধ আছে। কেহ কোথাও নাই। আমি দেখিলাম, আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু সেই দিনই আমাকে যে রাজযোগ নামক ইংরাজি পুস্তক খানি পড়িতে দিয়াছিলেন, সেই খানি পড়িতে পড়িতেই নিদ্রা গিয়াছি এবং সেখানি হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছে। নিদ্রাও খুব গাঢ় হইয়াছে। তখন উঠিয়া মন্দিরে গিয়া দেখি, সে স্থানে সে দ্রব্য নাই। নীরবে এদিক ওদিক দেখিতেছি, এমন সময়ে মন্দির পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্রাহ্মণ-কন্যা আমাকে বলিলেন, বাবা কি চাও? আমি সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন, এই লও। আমি দেখিলাম, আমার যে পরিমাণ আবশ্যক, ঠিক তাই তিনি তুলিয়া রাখিয়াছেন। সমস্তই আমাকে দিলেন। আদেশ মত ব্যবহার করিয়া বাটী আসিলাম। কিন্তু ব্যাধি কিছুমাত্র আরাম হয় নাই। বাটীতে আসিয়া সেই দিনই রাত্রে ভয়ানক কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইলাম। আমার পূর্ব্ব ব্যারাম এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে আর বাঁচিব না, ইহাই স্থির হইল। কেবল আমার মা বলিলেন, বাবা ভয় নাই, অবশ্যই আরাম হইবে। কয়েক দিনের মধ্যে সেই জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই বহুদিনের অসাধ্য ব্যাধি বিদূরিত হইল। আধ্যাত্মিক ধ্যান অভ্যাসে প্রথম প্রথম এইরূপ দেব দর্শন আরম্ভ হয়। ক্রমে দেবলোক আরম্ভ হইয়া থাকে।

আমার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে এক ডেপুটী বাবুর ভগ্নীকে বিবাহ করি। ঐ বিবাহে পাত্রীর মাতার মত ছিল না। ডেপুটি বাবু ও এক রাজা ও তদীয় কার্য্যাধ্যক্ষের সহায়তায় ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়। ডেপুটি বাবু কর্ম্মস্থানে যাইবেন বলিয়া রাত্রিতে গঙ্গা পার জন্য নৌকা রাখেন। ঐ মাতার অগোচরে বিবাহ দিবার জন্য পাত্র ও একটি ভদ্রলোক ও এক বিশিষ্টা নারীকে নিযুক্ত রাখেন। তিনি পার হইয়া গেলে ঐ নৌকা আসিয়া আমাদিগকে পার করিয়া দিবে আদেশ ছিল। বহু বিলম্বে নৌকা আসিলে দেখা গেল বিবাহের বিরোধী আর এক ভ্রাতা সেই নৌকায় আসিয়াছেন। তিনি অন্ধকারে আমাকে মাত্র দেখিয়া ধরিয়া নিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। এই সঙ্কটকালে এক ধবলিত সৌধ অঙ্গে দেখা গেল, উজ্জ্বল অক্ষরে "মা ভৈঃ!" স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। বহু চেষ্টায় লুকাইয়া আসিয়া ঘাটে মিলিত হই ও জলের উপর মা ভৈঃ! শব্দ শুনি। পার হইয়া ট্রেনে উঠিয়া যশোর জেলার ঝিনিদা মহাকুমায় উপস্থিত হই। পাত্রীর মাতা আর এক রাজার সহায্যে ঝিনিদায় গিয়া বিষম বিরোধ আরম্ভ করেন, পরে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে যান। সেই মা ভৈঃ ধ্বনি আমার পথের সম্বল হইয়া আছে।

আকাশ তিন প্রকার। শুদ্ধ চৈতন্যই চিদাকাশ। আতিবাহিক সূক্ষ্ম রাজ্যই তত্ত্বাকাশ। পার্থিব আকাশই জড়াকাশ। তত্ত্বাকাশে দেবলোকে চিত্ত ধাবিত হইলেই, তখন সেই শুদ্ধ চৈতন্যই কৃষ্ণ বিষ্ণু-হরিহরাদি রূপে দৃষ্ট হন। তুমি জড়াকাশ তুচ্ছ করিয়া আতিবাহিক তত্ত্বাকাশে স্থিতি লাভ কর। সে অবস্থা হইতে সহজেই চিদাকাশ দেখিতে পাইবে। জড়াকাশ থাকিতে চিদা-

কাশ প্রকাশিত হয় না। চিদাকাশই মোক্ষ-মুক্তি-নির্ব্বাণ-ব্রহ্ম। অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজমহিষী, রাজপুত্র ও রাজ্য লইয়া রাজা গলায় ঝুলাইয়া রাখেন না; ব্রহ্ম-সমাধি প্রাপ্ত জীবন্মুক্তগণও অনন্ত সৃষ্টি গলায় বান্ধিয়া রাখেন না, দৃষ্টি করিলেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ঝক্ মক্ করিয়া উঠে। শক্তিতেই সমস্ত চলে, সাধুগণ আনন্দে সমাধিস্থ থাকেন। অবোধেরা ভাবে, ব্রহ্মে গে'ল সমস্তই গেল, তাই তারা সমস্তই গলায় ঝুলাইয়া, আঁটিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

যাদুকরের আণ্ডা উড়াইয়া দিবার ন্যায় তত্ত্বদর্শীগণ এই ব্রহ্মাণ্ডটি ফুৎকারে উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের লৌহ শিলার ন্যায় অটল কঠিন চিদাকাশ কাহারও উড়াইয়া দিবার সাধ্য নাই। "বস্তুতো'স্তিখম্" বস্তুতঃ খ অর্থাৎ আকাশই আছে। এই শাস্ত্র, ব্যঞ্জনে লবণের ন্যায়, ভক্তি শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকে মধুময় করিয়া তুলে। বস্তুতঃ এই বিজ্ঞান-ঘন জগৎ ক্ষণভঙ্গুর নহে। এই জগৎই সেই নিশ্ছিদ্র নিবিড় বজ্রসার অটল কঠিন আকাশ। ইহা ব্রহ্ম-ঘন, চিৎঘন, পরমাত্ম-ঘন, অটল বস্তু। ইহা জানিলেই সেই অপার সুখময়ী মুক্তি লাভ হয়। চিত্র করা যুদ্ধ ব্যাপারে যেমন যুদ্ধ হইতেছে, অথচ চিরস্থির অবস্থাই রহিয়াছে, তেমনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সর্ব্বকর্ম্ম করিতেছেন, লোকে দেখিতেছে, কিন্তু নিজে আত্মদর্শনে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মপদে চিরস্থিরই রহিয়াছেন। সংসারীরাই জগতে লিপ্ত হইতেছে। অঙ্গ ঢাকা সংসার-সুন্দরীর হাব্‌ভাবে মুগ্ধ হইয়া সংসারীর বংশ আজীবন মায়া-উপদংশে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতেছে! আহা, ইহাদের কি মা-বাপ নাই? সাধুরাই ইহাদের মা-বাপ! স্বেচ্ছাচারী সংসারী-

বালক, মা-বাপের কাছে যা, নতুবা তোদের দুঃখের পরিসীমা নাই।

ব্রহ্মসেবী ব্রাহ্মণ বা দ্বিজগণের সেবা কর এবং এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা কর, সুখের সীমা থাকিবে না।

সমাধি অভ্যাসে নির্ম্মল ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবে না। তখন তুমি সেই ব্রহ্ম-দর্শনের অনুবীক্ষণ চক্ষে দিয়া ব্যবহারিক যাগ-যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড সম্পন্ন কর, গৃহ অট্টালিকা মণিকাঞ্চনে শোভিত কর, বিলাসিনী প্রমোদাগণকে প্রমোদ-উদ্যানে নৃত্য করিতে দেও, বেণু বীণা মৃদঙ্গের বাদ্য আরম্ভ হউক, কোথাও বীর রসের অভিনয় হউক, কোথাও করুণ রসের অভিনয় হউক, পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া সকলে কুসুমক্রীড়ায় মত্ত হউক। তুমি সেই আত্মদর্শনরূপ অনুবীক্ষণ চক্ষে দিয়া সুস্থ স্থির ও শান্তিময় হইয়া অনাবৃত ব্রহ্মরূপ স্ফটিক-ক্ষেত্রে চিরদিন এই আনন্দলীলা দর্শন কর।

অরসিকা বালা নবযৌবনে সুরসিকা হইয়া, স্বামী সঙ্গে যেমন প্রতি মুহূর্ত্তেই নবানুরাগ অনুভব করে, এক বারও পুরাতন বোধ করে না, তুমিও তেমনি, এই সংসার-শৈশব অতীত করিয়া স্থিরযৌবন রূপ নিত্য রসময় ব্রহ্মে মিলিত হও এবং প্রতি মুহূর্ত্তে স্থির যৌবনের নিত্যরস ও নিত্য সুখ অনুভব কর—সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।

"সিদ্ধিঃসাধ্যে শতামস্ত প্রসাদাত্তস্য ধূর্জ্জটেঃ।
জাহ্নবী-ফেণ লেখেব জন্মূর্দ্ধনি শশিনঃ কলা।

ইতি অষ্টম প্রবোধ।

যোগ-বাশিষ্ঠ-সার সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীব্রজলীলা রসায়ন।

প্রথম রসায়ন।

যাঁহারা কেবল উত্থান-পতন দেখেন, তাঁহারা বলেন "সাবধান, সাবধান, তরঙ্গ দেখিও না, স্থির সমুদ্র-বারি দেখ"। তাঁহারা স্থির শান্ত সমুদ্র দেখিতে চান এবং উহাই জড়াইয়া ধরেন, বড় ভয়, পাছে আবার তরঙ্গের উত্থান-পতন দেখিতে হয়! ভয়ে মরেন, তরঙ্গ যেন বাঘ, যমের দুয়ারে লইয়া যাইবে। আর যাঁহারা স্থির ব্রহ্মে অভ্যস্থ, তাঁহারা জীব-তরঙ্গ দেখিয়া আনন্দে মত্ত হন। নিরাকারের কি সুন্দর সাকার মূর্ত্তি! ঐ তরঙ্গকে তাঁহারা ক্ষণিক বা মিথ্যা বলেন না,—যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম। বাঘে ধরার ভয় একেবারেই নাই। বরং তরঙ্গ-রঙ্গে ব্রহ্মের সার্থকতা ও স্ফূর্ত্তিই তাঁহারা দেখিতে পান। যাহাদের "জুজুর ভয়" ভাঙ্গে নাই, তাহারা "পালাও, পালাও" বলিবে। তাহারা যে এতকাল অখণ্ডব্রহ্ম জানিত না, সবে দুদিন মাত্র বেদান্ত পাঠ করিয়াছে।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ" নিরাকার বিভুর এই যে দেহ ধারণ, এই অবতার বাদ, এই খানেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও লীলা, জুজুর ভয় একেবারে দূর হইয়া যাওয়ার পরে।

বেদান্ত বিজ্ঞানে ও প্রেম বিজ্ঞানে বিরোধ নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে। বরং পরস্পর পরস্পরকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দ পর্য্যন্ত দার্শনিক তত্ত্ব উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তবে দশম স্কন্ধের গোপী-প্রেমের ধারণা করিতে পারা যায়, নতুবা দোষ দর্শন হইবেই হইবে। বেদান্তের বিকৃত ব্যাখ্যাই মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ।

খণ্ডপ্রাণে "পূর্ণপ্রাণের" কথা স্মরণ হইয়া "পূর্ণতার" দিকে ক্ষুদ্র খণ্ডের যে একাগ্র প্রবল বেগ হয়, তাহাকেই যোগ, ভক্তি, প্রেম, ইত্যাদি বলা যায়। "পূর্ণ প্রাণের" দিকে না ছুটিয়া প্রাণের ক্ষুদ্রাংশ থাকিতে পারে না। খণ্ডচেতন সকল, কেহ বড় কেহ ছোট ভাবে, "পূর্ণের" নিকটস্থ হইয়া নিখিল খণ্ডচৈতন্য সকলকে "আয়, আয়" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, প্রেমের অমৃত-সাগরের উপর নাচিতে নাচিতে, "পূর্ণ চৈতন্যের" দিকে ছুটিতেছে! ভয় নাই, ভাবনা নাই, ক্ষয় জানে না, কেবলই বৃদ্ধি, কেবলই মঙ্গল, কেবলই সৌন্দর্য্য ও আনন্দ!—ইহা যে জন্মে জানিতে পারা যায়, সেই "মানব জনম দুর্ল্ভ জনম, এমন জনম আর হবে না।"

ইতি প্রথম রসায়ন।

দ্বিতীয় রসায়ন।

আলোক আচ্ছাদনই আঁধার। না আলোক, না আঁধার, ইহাই ঊষা। হরিহরাদি দেবস্বরূপের অবস্থাও ঐ ঊষার অবস্থা। দিন বলি, কি রাত বলি? ব্রহ্ম বলি, কি দেবতা বলি—সন্ধিস্থল।

আঁধার হইতে সূর্য্যালোক যেমন ক্রমে ফুটিয়া পড়ে, লীলাভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ব্রহ্মভাবে ফুটিয়া উঠেন।

যে একটী সূক্ষ্মতম রেখার দ্বারা—সত্ত্বগুণের শেষ ও গুণাতীতের আরম্ভ, এই দুই অবস্থার মধ্যস্থান নির্দ্দেশ করা যায়, সেই চিহ্নরেখার উপরেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু-হরিহরাদির স্থিতি। উঁহাকে সত্ত্বগুণের পার বলিয়া গুণাতীত বলা যায়।

জ্ঞান-মুক্তি প্রেমভক্তি একই তার মূল,
একই গাছে শ্বেত রক্ত কৃষ্ণকেলী ফুল!

মেশালেই হয় মেশামিশি—সত্ত্বগুণের শেষাশেষি।

সেই সন্ধিরেখার অবস্থাটীই চৈতন্যযুক্ত ও মতলবযুক্ত বলিয়া ব্যক্তিত্ব ভাব লইয়া বুদ্ধিমান্ মহাপুরুষ হন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশাদি পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও ঐরূপ অবস্থাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমি দুইটী,—একটী বড় আমি, একটী ছোট আমি; বড় আমির নাম চিৎ বা জ্ঞান-পুরুষ; ছোট আমির নাম চিদাভাস বা প্রকৃতি। বড় আমির ইচ্ছামতে, বড় আমির ছায়ার ন্যায় ছোট আমি খেলা করে।

"নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলে খেলা যথা বালক বেলা,
শ্রীকৃষ্ণ তেমনি, ছায়া-স্বরূপিণী, ব্রজবালা সনে করেন খেলা।"

(ভাগবত)

তবে পাপপুণ্য, ভাল মন্দ নাই কি? তা আছে। অন্ধ ছোট আমির পাপপুণ্য আছে; বড় আমিকে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, তারই কেবল পাপপুণ্য থাকে না। বড় আমি ছোট আমিকে দিয়া যে, কখনও চুরি করান ও তাহাকে জেলে দেন, দেখা যায়, সেটি কেবল শিক্ষা ও উন্নতির জন্য। তিনি দুঃখের খেলা খেলান;

দুঃখকেই তাঁহার নিত্যানন্দধামে যাইবার রাজপথ করিয়া দিয়াছেন। দুঃখে দুঃখে লোক ক্রমে বড় আমির মুখের দিকে চাহে, নতুবা খেলার দিকেই তাহার দৃষ্টি থাকে। দুঃখের কলটা টিপ্‌লেই ছোট আমি তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। বড় আমি, ছোট আমিকে দুঃখ দিয়া দিয়া বৈরাগ্যের "রাজপথ" দেখান, সেই পথেই শান্তি-নিকেতন। "দুঃখের ফল ইষ্ট,—নিম্বের ফল মিষ্ট।" দুঃখে দুঃখে ছোট চৈতন্য বড় হয়—পোড়ায় পোড়ায় স্বর্ণ কেবল নির্ম্মল হয়, ভাল হয়। অভিনয়ে যত রস আছে, তাহার মধ্যে করুণ-রসই উৎকৃষ্ট। যাত্রা-অভিনয়ে অভিমন্যু বধে, উত্তরা অভিমন্যুর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া যখন রোদন করেন, তখন পাষাণও বিদীর্ণ হয়! মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে বুকে লইয়া যখন মহারাণী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন, তখনকার অভিনয় দর্শনে বিধাতাও রোদন করেন! এরূপ পরম সুন্দর অভিনয়ত এ সংসারে প্রতিদিনই অভিনিত হইতেছে! উত্তরা ও শৈব্যার ভূতল-পতন দেখিয়া ও হৃদয় বিদারক করুণ-গীত শুনিয়া সজললোচন, দর্শকেরা উচ্চৈঃস্বরে "আর একবার, আর একবার!" বলিয়া পুনর্ব্বার ঐভাব অভিনয় করিতে অনুরোধ করেন, কেননা ঐ দৃশ্য বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। সেইরূপ পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া, মাতৃক্রোড়ে মৃত শিশুর ও সতীর বক্ষে মৃত পতির পার্থিব অভিনয় দেখিয়া, ব্রহ্মাকাশে দেবতারা "আর একবার!" আর একবার!" বলিয়া উঠিতেছেন—বড় মিষ্ট লাগিয়াছে! তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন—এটা চিদাভাস খেলা, অভিনয় মাত্র। মধুবাবু শৈব্যারাণী সাজিয়া যদি স্মরণ রাখিতে পারেন যে "আমি মধুবাবু" তবে যত পারেন কাঁদুন, তাহাতে বাধা কি? কিন্তু মায়ারূপ মদের ঝোঁকে মধুবাবু

যদি সত্যই ভাবেন যে"আমি সত্য-সত্যই শৈব্যারাণী," তবে তখন দুঃখের বজ্রাঘাতে হৃদয় ফাটিয়া যায়! মধুবাবুর "মধুবাবু" ঠিক রাখিতে পারিলেই মুক্তি—পরমানন্দ। "আত্ম বিস্মৃতি" হইলে যেন সর্ব্বনাশ হইতেছে, বোধ হয় মাত্র। বস্তুতঃ সর্ব্বনাশাদি কিছুই নহে—সর্ব্বই রক্ষা!

ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন দেবগণ অভিনয় করিতে হইলে, সখ করিয়া করেন মাত্র। যেমন বুদ্ধ গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন। দুঃখই ব্রহ্মধামের রাজপথ। দুঃখই উত্থানের সোপান। দুঃখের অভিনয়ই মুক্তির হেতু।

এক খানি উজ্জ্বল থালার মত জল-মধ্যস্থ সূর্য্যের ন্যায়,যোগ-মায়ার মধ্যস্থ ব্রহ্ম, কৃষ্ণ-বিষ্ণু-রূপে সহজে দৃষ্ট হন। জলের মধ্যস্থ সূর্য্যের প্রতিবিম্বটি দেখা মৎস্তের পক্ষে সহজ, কিন্তু মৎস্য ডাঙ্গায় উঠিলে, মৃতপ্রায় হইয়া, তবে আকাশের অনাবৃত সূর্য্যকে দেখিতে পায়, আর অধিক ক্ষণ বাঁচেনা। মনুষ্যও জীয়ন্তে-মরা হইয়া সমাধিস্থ হইলে তবে সেই অনাবৃত অখণ্ড ব্রহ্ম দেখিতে পারে, কিন্তু আর অধিক দিন দেহ ধারণ করে না। তাই জলস্থ সূর্য্যের ন্যায় যোগমায়া- মধ্যস্থ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুরূপে, জীবের উদ্ধারের সহজ উপায় হইয়া রহিয়াছেন। জলে একটু ঘোর রঙ্ দিয়া সূর্য্য গ্রহণ দেখিলে চক্ষুতে আঘাত লাগেনা, কিন্তু অবোধ বালক উহা অগ্রাহ্য করিয়া সূর্য্যগ্রহণ কালে সাক্ষাৎ-সূর্য্যে বারংবার দৃষ্টিপাত করে, তাহাতে চক্ষু এমন ঝলসিয়া যায় যে,সে আর কখনও সূর্য্যের দিকে চাহেনা। সেইরূপ জ্ঞানীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া "কেন আমি দেখিব না?" বলিয়া, বালকের ন্যায়, ব্রহ্মের দিকে যখন-তখন কি চাইতে আছে? ব্রহ্ম এবং দেবতা, সবই সেই এক

অখণ্ড-চৈতন্য। সুখের সহিত যে যতদূর দৃষ্টি দিতে পারে সে তত দূরই দেখিতে পায়।

ইতি দ্বিতীয় রসায়ন।

তৃতীয় রসায়ন।

শ্রীব্রজলীলায়, চিন্ময় ব্রহ্মাকাশে-পরব্যোমে সেই নিত্যসিদ্ধা গোপীদের শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ অপূর্ব্ব ব্যাপার। জড়াতীত চিন্ময় দেশে সকলেরই চিন্ময়-দেহ, কেহ দোষ জানে না, 'গুণই' সব, ব্রহ্মময়ী ত্রিগুণা প্রকৃতিতে গুণ ভিন্ন আর কি আছে? নিজ স্বার্থে অন্ধ মানুষ নিজ স্বার্থের হিসাবে, ঐ গুণের মধ্যে আবার একটা 'দোষ' কল্পনা করিয়াছে। আমার টাকার বাক্‌সে তুমি হাত দিলে তোমার মহা দোষ হইল! কিন্তু চিন্ময় দেশে সকল বাক্‌সই খোলা, অথচ প্রতি বাক্‌সই দিব্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ! সে দেশে ক্ষয় জানেনা, বৃদ্ধিই সব,—'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে!' কেহ মৃত্যু জানে না,—অমৃতই সব।

স্থির যৌবন, তেজে আঁটা,—রসের চোটে দাড়িম ফাটা!

নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ,—চিন্ময়-শ্রীবৃন্দাবন!

তুমি ব্রহ্ম ও কৃষ্ণ-বিষ্ণুর কথা শুনিয়া যেন কিছু গোলযোগ ভাবিও না। একটী নির্ব্বোধ লোক মেঠাইকরের দোকানে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওহে মেঠাই-কর, তুমি অত রকম মেঠাই করিতেছ কেন? দুইএক রকম করাই ভাল। মেঠাইকর বলিল—কেন? লোকটী বলিল, ইহাতে

জলযোগের বড় গোলযোগ লাগে, কোন্‌টী খাই ঠিক করিতে পারিতেছি না!

তুমিও যেন হরিহরাদির কথা শুনিয়া ঐরূপ "গোলযোগ" ভাবিও না। বস্তুতঃ হরিহরাদিও সেই ব্রহ্ম। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যাস দেব "অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্ম" ব্যাখ্যা করিয়া গিয়া পরে ব্রহ্মের যুগল-ভাবের মহাসত্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু সেই বীজে জলসেচন করিয়া সেই অমৃত-লতিকায় পত্র পুষ্প ফল ধরাইয়াছেন। সেই অনন্ত-ব্যাপিণী মধুবর্ষী লতিকার মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম প্রেমামৃতময় হইয়া রহিয়াছেন। ঐ অমৃত লতার সম্বন্ধ-জ্যোতিতে নির্গুণ-ব্রহ্ম-বৃক্ষটী তরুণ তমালের ন্যায় স্থির যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়াছেন, এবং ঐ স্থির যৌবনা লতাকে আলিঙ্গন করিয়া অনাদি অনন্ত কাল নৃত্য করিতেছেন। শুনিতে পাই শ্রীবৃন্দাবনের মাধবী-কুঞ্জে লতারই প্রাধান্য হইয়াছে। তা হবে, আশ্চর্য্য কি!

ইতি তৃতীয় রসায়ন।

চতুর্থ রসায়ন।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা এইরূপ—ডিম্বের অণ্ডলালের মধ্যে যে জীব জন্মায়, সে অণ্ডলালের মধ্যস্থ সারভাগ। সেইরূপ অনন্তশুদ্ধ-চৈতন্যের মধ্যে যে নিত্যপুরুষ নিত্যই আছেন, তিনি সেই চৈতন্যের মধ্যস্থ সারভাগ। তিনিই কৃষ্ণ বা বিষ্ণু নামে

অভিহিত। সেই পুরুষই সারাৎসার; "অনন্ত চৈতন্তটী" তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ অনন্ত তেজের বেষ্টন মাত্র। অনন্ত চৈতন্তটী পুরুষ নহেন, ঐ অনন্তচৈতন্তরূপ অখণ্ড-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে যে সুকৌশলী মহা-মতলবী এক চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি আছেন, তিনিই পুরুষ। তিনিই কেন্দ্র, সেই "কেন্দ্রের" অস্তিত্বই "অনন্তের" অস্তিত্ব। ঐ কেন্দ্র, মাধ্যা-কর্ষণের ন্যায় "অনন্তকে" নিয়মিত করিয়াছে। "অনন্তচৈতন্য" আর কিছুই নহে, ঐ কেন্দ্ররূপী মতলবী পুরুষের একাংশের একটী গুণ বিশেষ। চিত্তের স্থিরতা সাধন হইলে অর্থাৎ "শুদ্ধ চৈতন্য" সাধন হইলে, নিষ্কম্প জলে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই পুরুষ অন্তরে প্রকাশিত হন।

একটী প্রদীপ তার গৃহময় ভাতি,
একটী সূর্য্যের কিবা, জগন্ময় জ্যোতিঃ।
একটু অগ্নির স্ফূর্ত্তি—বিশ্বদাহী ধর্ম্ম,
কৃষ্ণমূর্ত্তির জ্যোতিঃ মাত্র সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম।
ধরা যায়না পূর্ণব্রহ্ম,—সর্ব্বব্যাপীর সীমা নেই,
যে দিক্ চাই সে দিক কৃষ্ণ,—"সর্ব্বব্যাপীর" সহজ এই!

"এ ভবে কুবুদ্ধি যারা এক ব্রহ্মে ভাবে তারা,
জানেনা অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য এ ভবে!
জীব যদি নাহি রয়, এক ব্রহ্ম তবে হয়,
কিছুতে হ'বার নয়,—কিছু যদি রবে!"

মাটীর ঠাকুরও ব্রহ্ম খাঁটি,
আলোর অভাবেই ব্রহ্ম মাটি!

যিনি ব্রহ্মদর্শী তিনি তেজস্বী; তাঁহার অসীম তেজে জগৎ সংসার ভস্মীভূত হয়। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ভীত ও স্তম্ভিত হয়

আর যিনি প্রেমিক ভক্ত, তিনি শীতল মধুর ভাবে ঢলঢল, তৃণ হইতেও নীচ, দীন-স্বভাব, বিনয়ের খনি, মধুবর্ষী প্রেমচক্ষু, হরি-প্রেমে বিগলিত, নির্জ্জন কাননে বসন্ত-কুসুমের ন্যায় ফুটিয়া থাকেন। কে ভাল? সাধারণ লোকের মনে ইহাই উদয় হয়। কিন্তু মানুষের স্বভাবানুসারে কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ হন, কেহ বা প্রেমে বিগলিত হন, কেহ বা উভয় ভাবে ভাবিত হইয়া দুগ্ধালক্তের ন্যায় অপূর্ব্ব জীবন্মুক্ত ভাব ধারণ করেন। সকলই ত সুন্দর! ইহা ভাল কি উহা ভাল,—এরূপ বিচার চলে না। কাঁচা গোল্লা ভাল, কি রসগোল্লা ভাল, কে বলিবে? যাঁহার যাহাতে রুচি বোধ হয়, তিনি তাহাই ভাল বলেন। বস্তুতঃ উভয়ই সেই এক,—সেই ছানা আর চিনি, চিনি আর ছানা।

যাঁহারা বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুশীলন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীরূপ-গোস্বামীর দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ অমৃতময় গ্রন্থ সকল আলোচনা করিবেন। শ্রীশ্রীভাগবত সন্দর্ভও দার্শনিক তত্ত্বে ও রূপ-সনাতনের সুধাময় উপদেশে পূর্ণ রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের খিল সূক্তে আছে—"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোস্তুতে" সকলেই সেই এক। "তিনিই ভক্তগণের ভগবান, জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম এবং যোগীগণের পরমাত্মা"। (শ্রীমদ্ভাগবত)

বৈষ্ণবগণের দার্শনিক গ্রন্থ আনন্দ-মীমাংসায় আছে—জ্ঞান-তত্ত্বটী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-তত্ত্বের এক অংশ মাত্র। ব্রহ্মবাদিগণ এই "জ্ঞান-ব্রহ্ম" পর্য্যন্ত গিয়াই পরিতুষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁহারা আরও অধিক অন্তর-প্রবিষ্ট হন, তাঁহারাই যথার্থ ভক্তির রাজ্য দর্শন করেন। ব্রহ্মবাদিগণের চিন্মাত্র-জ্ঞানের উপরেও যে অপূর্ব্ব "বিগ্রহ-তত্ত্ব" বিরাজ করিতেছে তাহা সুদুর্লভ। বৈষ্ণব

দর্শন-শাস্ত্রে ভক্তির বিভাগ বৈজ্ঞানিক ভাবে স্থাপিত। সমুদায় পরাশক্তির আশ্রয়-স্বরূপ, আনন্দ-ঘন 'শ্রীমূর্ত্তি' কেবল ভক্তির মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে ভক্তি সাধারণের মধ্যে দেখা যায়, তাহা যথার্থ ভক্তি নহে। উহার নাম উন্মাদিনী ভক্তি, অর্থাৎ স্বার্থ লাভের জন্যই কেবল পাগলের ন্যায় ব্যাকুলতা ও কাতরতা প্রকাশ মাত্র। উহা বড়ই ক্ষণস্থায়ী।

জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ বৈষ্ণবগণের অপূর্ব্ব দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে,ব্রহ্মতত্ত্বের বহু উপরে গিয়া ভগবত্তত্ত্বের মধুরতা অনুভব করা যায়। মোক্ষ হইতে উদয় হইয়া, আনন্দলীলা পর্য্যন্ত গিয়া, ভক্তিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, ঐ ভক্তি শেষে ঘনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। গোপীপ্রেম তখনও অনেক দূরে। গোপীপ্রেমের সেই অবস্থা সাধারণে অব্যক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভগবত্তত্ত্ব আরও সূক্ষ্ম। ব্রহ্মজ্ঞানে কেবল স্থূল একটি চিন্মাত্র-জ্ঞান উদয় হয়! কিন্তু ভক্তি ভিন্ন উহার অমৃতময় নিত্য-স্ফুরণ হয় না।

শ্রুতি বলেন "রসো বৈ সঃ" তিনি রসিকচূড়ামণি। নিত্য বৃন্দাবনের নির্জ্জন কাননে যে আনন্দময়ী নিত্যলীলা হইতেছে তাহা আর কিছুই নহে, কেবল সেই পরম শক্তিমান্‌কে লইয়া 'পরাশক্তি-সকলের' চিরদিন রসক্রীড়া মাত্র। ইহাকেই রাস-লীলা, মহারাস বা রাস-রস-রসায়ন বলে। ব্রহ্মজ্ঞান ঐ পরা-শক্তি সকলকে ত্যাগ করিয়াছে; প্রেম-বিজ্ঞান ঐ পরাশক্তি-সকলকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত চির আলিঙ্গনে নিবদ্ধ করিয়াছে। উভয়ই অতুলনীয়,—এ বলে, আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ, উভয়ের তারতম্য ত সহজেই বুঝা যাইতেছে। বিরোধ কিছুই

নাই। যাহার যেমন স্বভাব, তিনি সেইরূপ একটীকে বা দুইটীকে আলিঙ্গন করিয়া অমৃত-সুখে সুখী হন। জ্ঞান মাত্র সাধনে ব্রহ্ম, যোগ মাত্র সাধনে পরমাত্মা, আর ভক্তি মাত্র সাধনে "লীলা রসময় হরি" সাধকের হৃদয়ে উদয় হন। কেহ বা ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান তিনের মধ্যেই অমৃত পান করেন।

ইতি চতুর্থ রসায়ন।

পঞ্চম রসায়ন।

শ্রুতি বলেন,—"আনন্দামৃতং যদ্বিভাতি" তিনি আনন্দ ও অমৃত। "রসো বৈ সঃ" তিনি রস স্বরূপ। তাই বৈষ্ণবেরা বলেন তিনি রসিক-শেখর, রসচূড়ামণি—সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। শ্রুতি বলেন "বয়ং শ্রুতয়ঃ ভগবন্তমেবাচিন্ত্য স্বানুবন্ধিশক্ত্যা বুদ্ধ্যাদিমন্ত মক্ষয়ামহে" আমরা সেই ব্রহ্ম-ভগবানকে অচিন্ত্যরূপ শক্তি দ্বারা বুদ্ধিমান মনোবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্ দেখিতে পাই। তাঁহার দেহ চিদানন্দময় ও অব্যয়। তাঁহার দেহকে "নিত্য বিগ্রহ" বলা হয়। দেহ বলিলে অনিত্য দেহই বুঝায়।

এই শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাকে "রাস-রস-রসায়ন" বা "কন্দর্পদর্প-চূর্ণ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নিত্য রসের অনন্ত ফুরায়া খুলিয়া দেয়। কামরূপ মহাশত্রুর গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। জাগতিক জড়ীয় কাম সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া বা নির্ম্মল করিয়া, "নিত্য নির্ম্মল অপ্রাকৃত কাম" রূপে যিনি দউয় হন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। সেই অপূর্ব্ব কাম উদয়েই কামের

সার্থকতা এবং সেই সঙ্গেই জীব-জীবনের সফলতা হইয়াছে, নতুবা বেদান্তের নানাবিধ বিকৃত ব্যাখ্যায় এই সোণার সৃষ্টি একেবারে বৃথা হইয়া যাইত।

এই "অরূপ রূপবান্" ব্রহ্ম অক্ষয় অমৃতময় স্থির-যৌবন-ভাব ধারণ করিয়া, নিত্য কাল আছেন। অনলে পতঙ্গের ন্যায়, সেই রূপবান্ নিত্যনবীন পুরুষে ভক্তের প্রাণ ছুটিয়া পড়ে ও তন্ময় হইয়া ব্রহ্ম-সমাধিই লাভ করে।

প্রথমে পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ সেই রূপবান্ ব্রহ্মের বিবরণ শুনিয়া তাহাতে অনুরাগ সঞ্চার হয়। তার পরে চিত্রদর্শন অর্থাৎ সেই অরূপব্রহ্মের একটী রূপবান্ ছবি দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা হয়, তার পরে প্রাপ্তি বা মিলন হয়। তারপরে বিরহ। পরে বিরহ ও মিলন, আবার বিরহ, আবার মিলন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হয়। শুধু শ্রীরাধার নহে,—উচ্চাধিকারী মাত্রেরই অল্পাধিক এইরূপ হইয়া থাকে। কেন এরূপ হয়? তাহার কারণ, বিরহটা "প্রেমের" নূতনত্ব, সজীবত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিবার যন্ত্র বিশেষ। নিত্য-নব-নবায়মান্ অর্থাৎ নিত্যই নূতন করিবার জন্য, বিরহ অব্যর্থ উপায়। বিরহের ন্যায় অমৃত উৎপাদন-কারী যন্ত্র আর নাই। বিরহ অমৃতের ঝরণা। সত্ত্ব-গুণের ছায়া, নিগুর্ণ ব্রহ্মে পড়িবা মাত্রে অমনি সেখানে দুই-জ্ঞান হয়। দুই কোথা হইতে আসে? এক ও এক, একেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র—আমি ও তুমি। তৎক্ষণেই পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ ঘুরে ঘুরে আসে আর যায়, আসে আর যায়। শেষে সেই "অরূপের রূপে" তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া সেই অরূপেই সমাধি প্রাপ্ত হয়। গোপীদের এই দশম দশা।

কৃষ্ণ-প্রেম-লীলায় বা শ্রীবৃন্দাবনে জড়বস্তু আদৌ নাই, ইহা প্রত্যক্ষীভূত ও শাস্ত্রসম্মত;—ইহা যেন গোড়া হইতে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উত্তমরূপ স্মরণ থাকে। ইহা ব্রজলীলার ভিত্তিমূল। ইহা স্থির না থাকাতে জড়-বুদ্ধি মানব কৃষ্ণলীলায় জড়ীয় দোষ দর্শন করে। এই পৃথিবীর কামবিলাস ও সুখসম্ভোগ যদি জড়ভাগ-শূন্য হয়, তবে যেরূপ নির্ম্মল হয়, কৃষ্ণলীলাও সেই-রূপ নির্ম্মল—আতিবাহিক। অসুরাদি বধ শ্রীকৃষ্ণের রজঃলীলার কাণ্ড। সেও তাঁহার অনন্ত ভাবের একাংশের একটা ক্ষুদ্র ভাব মাত্র। গোপী-সম্বন্ধটি সুনির্ম্মল বিশুদ্ধ সত্বগুণের শেষভাগ বলিয়াই ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ। ঐ শুদ্ধসত্ব চৈতন্য উচ্চাধিকারী ভক্তের হৃদয়ের অমূল্যধন। সকলে ততদূর উচ্চে উঠিতে পারে না, তাই নিম্নস্তরে পড়িয়া যায়। সেই মলা-মিশ্রিত-সোণার মত জীব ত্রিতাপ-অগ্নিতে ফুটিতে ফুটিতে নির্ম্মল হইয়া, আবার কৃষ্ণপ্রেম সংস্পর্শে, কষিত-কাঞ্চনরূপে, ঝকমক্ করিয়া উঠিতে থাকে।

বিরহের বোধ প্রবল হইলে পরে মিলন বোধ হয়। এইরূপ বিরহ ও মিলন বোধ অল্পাধিক ভাবে পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে, কতক্ষণ? পূর্ণতা না হয় যতক্ষণ।

বিরহ-মিলন মাখামাখি হয়ে যে দুধে-আল্‌তা মত একটা প্রেমের রঙ্ ধরে, সেইটী গোপীভাব।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবালাগণ জার-বুদ্ধিতে মিলিতা হন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সেই মধুরভাব এইরূপ। জার-বুদ্ধিতে মিলিতা ব্রজাঙ্গনাদের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা জড়ীয় গুণ-ময় দেহ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ব্রজরস অর্থাৎ আদিরস বা

রসের সর্ব্বোচ্চ প্রথম অবস্থাই সত্ত্বগুণ। ভাগবতের জার শব্দেও এই আদিরস সম্বন্ধ। অর্থাৎ আদিরসে বা আদি সত্ত্বগুণে, উপভোগ্য যে উপপতি অর্থাৎ আর একটি পতি তাহাতে জড়-সম্বন্ধ না থাকায়, দোষ-সম্বন্ধ শূন্য হইয়াছে। পার্থিব "কামই" জড়-সম্বন্ধ শূন্য হইলে আতিবাহিক বা চিন্ময় হয়, সুতরাং দোষের অতীত হইয়া পড়ে। জড়সম্বন্ধ যুক্ত মত্ত মোহিত মন সে অবস্থা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না।

ধর্ম্ম যেমন দুইটী—ব্যবহারিক ও দার্শনিক, মানুষও তেমনি এক জনের মধ্যে দুই জন—জড় যুক্ত মন আর জড়মুক্ত মন। সেইরূপ পতিও দুইটী—গৃহপতি আর জগৎ-পতি। দেহের পতি আর আত্মার পতি। দুইটী পতিই দরকার; আছেও সকলের। গৃহপতি-প্রত্যক্ষ, আত্মার পতি অপ্রত্যক্ষ—লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ান, পাছে পাছে ফেরেন, তাই "উপপতি"র ন্যায় বলা হইয়াছে। আদি রস যেমন দোষ যুক্ত নহে—জড়মুক্ত বলিয়া পারমার্থিক, পুণ্যময় ও মুক্তিদায়ক, সেইরূপ ঐ "জার" শব্দও পবিত্র, পারমার্থিক পুণ্যময় ও মুক্তিদায়ক। বর্ণনার সময় যদি একটু পার্থিব ভাবযুক্ত দেখা যায়, তবে তাহা বুঝিবার ত্রুটি বা কবির বর্ণনার স্বাধীন অধিকারের অন্তর্গত বা মন আকর্ষণের কৌশল মাত্র। ব্রণ-সন্ধানী মক্ষিকার ন্যায় অবোধেরা তাহা না বুঝিয়া জড়ীয় দোষই অনুসন্ধান করে; হায়, মুর্খের মরণ অনিবার্য্য। বালকেরা গায়ে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া মরিবে—এই ভয়ে কি গৃহে প্রদীপ জ্বালিবে না?

ব্রজ গোপীরা নিজ নিজ পতি বর্ত্তমানেই এই জগৎ-পতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ইহা চিন্ময় ভাব! পতিগণ ক্রোধ

করিবেন কেন? জড়ের সম্বন্ধ চিরদিন দোষাবহ। ভাগবতে বর্ণিত আছে—"ব্রজগোপীর ভাব পার্থিব কামগন্ধ-শূন্য"। তবেই বুঝিতে হইবে কৃষ্ণপ্রেমে জড় সম্বন্ধ একেবারে নাই।

শাস্ত্রে আছে, "এই লীলা শ্রবণ করিলে হৃদ্‌রোগ কাম বিনষ্ট হইয়া যায়।" শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন "একি বিপরীত কথা, পরদার করিয়া কাম বিজয় হইবে? তাহা যেন কেহ মনে না করেন, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ কামের অধীন হইয়া রাস লীলা করেন নাই। কামের মূলোৎপাটন করিবার জন্যই রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। নির্ম্মল কন্দর্প-কথাচ্ছলে সংসারের নিবৃত্তি-মার্গই অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা জড়ীয় প্রবৃত্তি-মার্গ নহে।"

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ, অর্থাৎ অনিত্য কামের সংহারকারী নিত্য কাম"। তাঁহার পার্থিব মূর্ত্তি নাই। হাড় মাস মাটি কোনও কালে হিন্দুর উপাস্য নহে। এই আতিবাহিক সূক্ষ্ম চিন্ময় দেশ আগে বুঝিতে হইবে,—সব আমাদের মত, কেবল জড়ভাবটা গত। তাই বুঝে বুঝে বুঝ, জড়ত্বটা ঘুচে, জ্ঞান যখন জাগে—"শ্রীবৃন্দাবন" তারই একটু আগে।

ইতি পঞ্চম রসায়ন।

ষষ্ঠ রসায়ন।

বহিরঙ্গ পণ্ডিত গণের নিমিত্ত আছে কেবল "শ্রীনাম সাধন"। "বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন, অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন"। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণ তত্ত্বরসে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁহারা অনেকে বহুদিন অদ্বৈত-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে পরে ব্রজভাব মনে ধারণা করিতে সক্ষম হন।

কেহ বলেন,—সংসার-রূপ ঘরে ছারপোকা মশার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না। উপায় কি? প্রেমিক ভক্ত বলেন—ভক্তির কম্বল বিছাইয়া প্রেমের মশারি খাটাইয়া শয়ন কর, দুঃখ দূর হইবে; বেদান্তবাদী বলেন—ও সব কাঁচা কথা, পাকা কথা শুন, ঘর খানিতে একবারে আগুন লাগাইয়া দেও, সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। এটী ঠিক পাকা কথাই বটে। এখন তুমি দেখ, কাঁচা কথায় তোমার কাজ হবে, কি পাকা কথায় তোমার কাজ হবে? কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে চলিবে, কি ব্রহ্ম-সমাধি লইবে? যাহা পার, তাহাই কর। উভয়েতেই দুঃখ যায়।

"প্রেমেতে শোভিত বৃক্ষ ফলে ও ফুলে,
বেদান্ত মেরেছে তায় শিকড় তুলে।"

বস্তুতঃ ঘর পোড়াইয়া বেদান্ত নিত্য ঘর বান্ধিয়াছে, শিকড় তুলিয়া বৃক্ষ মারিয়া নিত্য বৃক্ষই স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তাহা কি সকলে ধারণা করিতে পারে? প্রেমেতে মৃত্যুকে তুচ্ছ বোধ করাইয়া দেয়। হৃদয়ে যখন ভগবদ্ প্রেম উথলিয়া উঠে, তখন মৃত্যুকে তৃণবৎ জ্ঞান হয়। জীবপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া জীব সর্ব্ব-ত্যাগী হয়, দেখা যায়। ঈশ্বর-প্রেমে যে কি হয়, তাহা আর

বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। প্রেমিকই জানেন যে, প্রেমের জন্য মৃত্যু কত মিষ্ট। ঈশ্বর-প্রেমিক ঈশ্বরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া, যে কিরূপ কৃতার্থ হন ও কিরূপ অমৃতের আস্বাদ পাইয়া অমরত্ব লাভ করেন, তাহা ক্ষুদ্র সংসারী কীট কিরূপে ধারণা করিবে? সংসারীর এক বিন্দু প্রাণ সে "অমৃতসিন্ধুকে" ধারণা করিতে পারে না। বড় যদি বুঝে, তবে যাগ যজ্ঞ দান তীর্থাদি ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্য উপার্জ্জন মাত্র করে; কিন্তু চিন্ময় ঈশ্বর-প্রেমের মধুরতার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না। পরাপ্রকৃতি-শ্রীরাধা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে বিগলিত হইয়া বিরহ-কালে বলেন,—

"নবীন বল্লরী গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস,
নহি শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি, ছার তনু করিব বিনাশ!

বস্তুতঃ এই ছার দেহ ঈশ্বর-প্রেমের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিলে, জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা কোথায়? তাঁর নামেই এই দেহ ক্ষয় করিতে আসা, আর ত কোনও আশা নাই। তুমিও বল, শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি, ছার তনু করিব বিনাশ!

শ্রীবৃন্দাকে দেবী পৌর্ণমাসী বলিলেন,—

হরিরেষ ন চেদব তরিষ্যন্মথুরায়াং, মধুরাক্ষি রাধিকাচ।
অভবিষ্যদ্বিয়ং বৃথা সৃষ্টি র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষ স্তদাত্র॥

"হে মধুরাক্ষি বৃন্দে, এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ না হইতেন তবে এই সমুদায় সৃষ্টি বৃথা হইয়া যাইত। বিশেষতঃ এই অবনীমণ্ডলে "কাম" একবারে বৃথা হইয়া যাইতেন।" কেন না, বেদান্ত-জ্ঞানে নিখিল জগতে অগ্নি লাগাইয়া

উহা ভস্মসাৎ করিত এবং পরম সুন্দর পঞ্চম পুরুষার্থ যে নিত্য সত্য 'কাম' বা চিন্ময় প্রেম, তাহারও একেবারে মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিত।

বস্তুতঃ যে অবস্থায় যাঁহার যেমন অধিকার, তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহার যাহাতে আত্ম তৃপ্তি হয়, তাঁহার তাহাই করা ভিন্ন উপায় নাই। ব্রহ্ম-সাধনের সমুদায় পথই অমৃত সোপান জানিবে। যে দিক দিয়া সুবিধা বিবেচনা করিবে, সেই দিক দিয়াই উঠিতে পারিবে।

তুমি বেদান্ত-জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপরে জীবন্মুক্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতে নিত্যকাল নৃত্য কর—এই আমার নিত্য ইচ্ছা।

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি, পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে,
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব, ধিষণা যদ্বেদ ন শুকঃ।
যন্ন কাপি কৃপাময়ে নচ নিজে, প্যুদ্‌ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নোজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্তনি, সুখংখেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥

যে পথে হলেন ভ্রান্ত মুনীশ্বরগণ,
পুরাকালে ধরাতলে অজ্ঞাত যে ধন,
শুকদেব যে বিষয়ে ছিলা জ্ঞানহীন,
কৃষ্ণ যাহা দেন নাই ভক্তে এত দিন,
সে উজ্জল মহারসে হইয়া মগন,
করিতেছে সুখে ক্রীড়া গৌর-ভক্তগণ!

মুনীশ্বরগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-পথে ভ্রান্ত হইয়াছেন,—বলা হইয়াছে, কারণ শুকদেবাদি মহর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণ ব্রহ্মভাবই শেষ-পুরুষার্থ স্থির করিয়াছেন। ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে

যে কৃষ্ণ-প্রেম অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন, শুকদেবাদি তাহা বিকশিত করেন নাই, বরং নির্গুণ ব্রহ্মত্বের পেষণে সে অঙ্কুর নিষ্পেষিতই করিয়াছেন। জগতের প্রেম-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই প্রেমাঙ্কুর বর্দ্ধিত করিয়া পত্র-পুষ্পফলে পূর্ণ করিয়া বিকশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, যে নিত্য-প্রেম নির্জ্জন নিকুঞ্জ কানন মধ্যে সংগোপনে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বিশ্বপ্লাবন-কারী "প্রেম" লইয়া মহাপ্রভু জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়াছেন। সনাতন ও জীবগোস্বামীর দার্শনিক গ্রন্থ-সকলে এই বিশ্বপ্রেম-তত্ত্ব জীবের জন্য পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি ষষ্ঠ রসায়ন।

সপ্তম রসায়ন।

কৃষ্ণলীলা লইয়া নানা সম্প্রদায় নানা ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়—উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী, এবং অল্পাধিকারী। "শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম" ইহা জানা আবশ্যক। অল্পাধিকারী ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে "নন্দের বেটা" বলিয়া বিশেষ ধারণা করিয়া রাখেন, সুতরাং কালীয়দমন, অঘাসুর-বকাসুর বধ, কংস ধ্বংস প্রভৃতি আশ্চর্য্য কাণ্ড শুনিলে বেশ বুঝিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্ম-তত্ত্ব বা তিনি যে পরমাত্মা, তাহা প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। মধ্যম-অধিকারী ভক্তগণ চিন্ময় দেশ ও সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ বুঝিতে পারিয়া সেই চিন্ময় দেশ

শ্রীবৃন্দাবনে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। পূর্ণব্রহ্মের তত্ত্ব অনেক শুনিয়া, অনেক বুঝিলেও, আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তাঁহারা "অবতার তত্ত্ব" অশেষ ও বিশেষ রূপে আলোচনা করেন; অবতার তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিলে পরে "নন্দের বেটাতে" আর তাঁহাদের আপত্তি থাকে না। -উত্তমাধিকারীগণ, পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা কিরূপ, তাহা সাধন করিয়া জানিয়া, সেই শুদ্ধ চৈতন্ত হইতে দেখিতে পান—চিন্ময় দেশে পরমাত্মার লীলাতত্ত্ব কি সুন্দর! সেই চিন্ময় দেশ হইতে এই জগৎ পর্য্যন্ত দৃষ্টি দিয়া তাঁহারা দেখেন যে, জগতের সবই আছে, কেবল ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, চির অম্লান ব্রহ্মে জগৎ পরিপূর্ণ। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, মৃণ্ময় বৃন্দাবন, ও ব্রহ্ম-ময় বৃন্দাবন সমস্তই এক হইয়া রহিয়াছে। তখন "নন্দের বেটা"তে আপত্তি করা দূরে থাক, আর কোনও বেটাতেই কোনও আপত্তি আসে না। "সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ"। সেই পূর্ণব্রহ্মই জীবকে সহজে আকৃষ্ট করিবার জন্ত 'নন্দের বেটা' হইয়া অবতীর্ণ হন। তোমার গুরুদেবও সেই পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ।

জল যেমন বাষ্প হইয়া মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠে, নন্দের বেটাও তেমনি মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর সমক্ষে মাটি ছাড়িয়া আকাশ-বিহারী হইয়া পরব্যোমে পরমাত্মা হইয়া যান।

এই তিন রূপ অধিকারীই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা দিয়া থাকেন। কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ তামসিক, কেহবা মিশ্র ভালবাসা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। অতএব সকলের কথা ও ব্যবহার একরূপ হইবে কি প্রকারে? কেহ কংস-ধ্বংস লইয়া থাকেন, কেহ বিরহ লইয়া থাকেন, কেহবা শ্রীরাধ-কৃষ্ণের স্থির

যৌবনের চির-প্রস্ফুটিত যুগল-মিলন ভিন্ন আর কিছু ভাল-বাসেন না। কেহবা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মতত্ত্ব আলোচনাই ভাল-বাসেন।

বস্তুতঃ শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণে যে ভালবাসা, তাহাই অপার্থিব প্রেম। এই প্রেমতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, এবং ব্রজ মণ্ডল উহার একখানি মানচিত্র। মানচিত্র দেখিয়া দেখিয়া ছেলেরা যেমন ভূতত্ত্ব শেখে, তেমনি ব্রজলীলা দেখিয়া দেখিয়া ভক্ত-সাধকেরা এই অপার্থিব প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই অপার্থিব ভালবাসাই জীবের পরম ও চরম পরিণতি। ইহাই 'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ' শেষ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ হয়। ভালবাসা চিরকালই পক্ষপাতী, প্রেম চিরকালই কাণা। সকল দিকে সমান রাখিতে গেলে প্রেম শুকাইয়া যায়। প্রেমে এক দিকেরই গোঁড়া হইয়া পড়িতে হয়। 'গোঁড়ামি' মানেই "একদৃষ্টি" পক্ষপাতীত্ব। "এক বুদ্ধি বিশিষ্যতে"।

ভালবাসা কত মিষ্ট তাহা সকলেই জানে। কেহ মাতা পিতাকে, কেহ পুত্র কন্যাকে, কেহ পত্নী বা বন্ধুকে কেহবা স্বদেশ স্বজনকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। যদি তেমন ভালবাসা থাকে তবে মোক্ষ আর কে চায়? "আমার এই জিনিষটীর মত এত সুন্দর ও এত মিষ্ট জিনিষ আর কিছুই নাই" এই ভাবই ভালবাসার স্বরূপ! বিচারকে বহুপশ্চাতে ফেলিয়া দিয়া ভালবাসা ছুটিতে থাকে। ভালবাসা রাজার ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যে গিয়া নৃত্য করে,—মধ্যাহ্নের সূর্য্য-তাপকেও শীতল বোধকরে এবং সর্পকেও ভূষণ স্বরূপ ভাবিয়া থাকে। ভালবাসাকেই রস বা রাগ বা অনুরাগ বা রঞ্জন কহে। মঞ্জিষ্ঠার বর্ণলাল। মঞ্জিষ্ঠার

রক্তরাগে রঞ্জিত হইলে শ্বেতবস্ত্র রক্ত রাগ ধারণ করে। বস্ত্র ঠিকই থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় আর মলিন হয় না। এইজন্য শ্রীরাধার প্রেমের রাগ মঞ্জিষ্ঠারাগ ব'লিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের ঐ মঞ্জিষ্ঠা রাগে আর দুঃখ-মলিনতা থাকে না। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের রসতত্ত্ব বিচারে উহার এইরূপ উদাহরণ আছে। ললিতা বলিতেছেন,—সখীগণ, শ্রীমতীর রাগ কি প্রকার তাহা দেখ; জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নকালে প্রখর পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া শ্রীমতী কেমন ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র মলিনতা নাই, যেন সুকোমল পদ্ম ফুলের উপর পাদপদ্ম রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে মত্ত আছেন। ইহাই মঞ্জিষ্ঠা রাগ।

যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে ভয়ঙ্কর কষ্টের বিষয়ও সুখের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-কমল গোস্বামীর পদ-গানে আছে,—

"বঁধুর সরস দরশ লালসে, যাইতাম যবে নিকুঞ্জ নিবাসে,
চরণে বেড়িত, বিষধর কত, হইত নূপুর জ্ঞান গো—
এখন, বিনে সে ত্রিভঙ্গ, আমার এ অঙ্গ-ভূষণে ভুজঙ্গ জ্ঞান গো?

নববিধানাচার্য্য বলেন,—

"আমার স্ত্রী বা পুত্রের ন্যায় মনোহর স্ত্রীপুত্র আর কাহারও নাই" ভালবাসার এই কথা। এই মিথ্যা কথা বলিয়া ভাল-বাসা চরম সুখ প্রদান করে। ইহা মিথ্যা, কিন্তু স্বাভাবিক; সকলেই ইহাতে সুখী, তবে আর দোষ কোথায়? দোষের মধ্যে এই যে, এই সুখ স্থায়ী হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালবাসা তাহা এইরূপ।—ইহাই ভালবাসার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

প্রথম শিক্ষার পাঠশালা। 'স্ত্রীকে ভাল বাসি, স্ত্রী চলিয়া গেলেন, মাকে ভালবাসি, মাও চলিয়া গেলেন। বন্ধুও চলিয়া গেলেন, গেলেন কোথায়? ভালবাসা যে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইতে চায়। এই ভা'বাসা যেখান হইতে আসিয়া ছিল, সেইখানেই আবার চলিয়া গেল। সাধুরা সেই স্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সমুদায় ভালবাসার বেগবতী নদী হু-হু শব্দে গিয়া সেই ভালব'সার মহা-সমুদ্র পূর্ণব্রহ্মে মিলিত হইতেছে। আ' কি? এইত প্রেম-রত্নের খনি! এই যে প্রেম-রত্নের রত্নাকর। পরমাত্মা যখন এই ভালবাসার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রেম বিলাইতে থাকেন, তখন সেই প্রেমলীলাকেই শ্রীকৃষ্ণলীলা বলা হয়। আজীবন যদি বলা যায় যে "পরমাত্মা-শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুল্য আর রূপ নাই, রূপে গুণে তাঁর তুল্য আর কেহই নাই" তবে সেটি আর মিথ্যা কথা হইবে না, যত পার এই কথা বাড়াইয়া বল, কিছুতেই মিথ্যা হইবে না। যত অত্যুক্তি করিবে, সমস্তই সত্য হইবে। সেই জন্য এই যে মহাপ্রেম, ইহা কেবল পরমাত্মা ঈশ্বরেরই প্রাপ্য, অন্যে ইহা পাই'ার যোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা দেও, তবেই সেই কৃষ্ণপ্রেমের কণা মাত্র আসিয়া ত্রিজগৎকে মধুর হইতে মধুর করিয়া তুলিবে। "সর্ব্বং কৃষ্ণ ময়ং জগৎ"।

যাহার যতদূর জ্ঞান বুদ্ধি, তাহার অধিক সে কিরূপে বুঝিবে? সেই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন।"

শ্রীকৃষ্ণে যতদিন "ভগবান্" বোধ থাকে ততদিন ভক্তি বর্দ্ধিত করিবে। সেই প্রভু-ভগবান্-বোধ, ক্রমে অভ্যাস ও মেশামিশির গুণে, শেষে ভুবন-মোহন অখিল-রসসুন্দর মূর্ত্তি বোধে

পরিণত হয়. তিনি 'সত্য শিব সুন্দর'। তাঁহার সত্য ও মঙ্গলভাব ভগবদ্‌ভাবের ও ভক্তির অন্তর্গত; আর সেই অনন্তসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তিই সুন্দর প্রেমের অন্তর্গত। এইটিই গোপীভাব। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে (১০ম, ৩২অ, ২শ্লো)—

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরীঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধরঃস্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ॥"

"ভগবান্ গোপীগণ-মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন,—সুপ্রসন্ন হাসি-মাখা মুখ, গলে বনমালা, পরিধান পীতাম্বর,যেন জগতের মোহকারী কামদেবও সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন!

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং॥"

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণু-কর নব-কিশোর নটবর,
নরলীলা হয় অনুরূপ!
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।
যোগ মায়া-চিৎশক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে,
এইরূপ যে রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকাশ কৈল নিত্যলীলা হইতে।"

(চরিতামৃত)

ব্রহ্ম নিরূপণই বেদান্তের উদ্দেশ্য। উহা শান্তভাব। তৎপরে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস শ্রীমৎভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। স্থিরযৌবন ও নবানুরাগদ্বারাই গোপীগণ "মধুর ভজন" করিয়া থাকেন। বেদ-বেদান্ত বিচার লইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গোপীগণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। শ্রী-রাসমণ্ডলে কেবল সরল প্রাণের সরল কথাই রাসরসের তুফান তুলিয়াছে। তবেই দেখ, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে "অকপট প্রাণ উদ্‌ঘাটনই" পরমানন্দ ও চরম সুখ! ইহাই বস্ত্র হরণের তাৎপর্য্য, অর্থাৎ "একেবারে উলঙ্গ হওয়া"! ঐ দেখ এখানে পূর্ণব্রহ্মের বক্ষে অনাবৃত জীব লুটাইয়া পড়িয়াছে! গোপীভাব, গোপীনাম ও গোপীকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা শিক্ষা করিতে হয়। যাঁহাদের "শক্তিসঞ্চারের" ক্ষমতা আছে তাঁহাদেরই নিকটে শিক্ষা করা উচিত। গোপীভাবে সেবা-শিক্ষা করিতে করিতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সেবার অধিকার পাইয়া, তবে রাসমণ্ডলের নিকটস্থ হওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমলাভের প্রার্থনায় কাত্যায়নী পূজা, শিবপূজা প্রভৃতি সমস্ত পূজাই গোপীগণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণপূজা নাই, আছে কেবল কৃষ্ণসেবা। এই সেবা-শিক্ষাই প্রেম-শিক্ষার মূল। "পূজা ছেড়ে সেবা,— করতে পারে কেবা?"

ব্রজ-বনিতার প্রেম "মহাভাব" নাম,
সে প্রেমের অর্থ নহে সংসারের "কাম॥"
কি পবিত্র সুনির্ম্মল দেবারাধ্য মহাবল,
কেবল নিঃস্বার্থ বল পূর্ণানন্দ ধাম,
মোক্ষফল বিনিন্দিত সুখ অবিরাম।

কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজগোপী কৃষ্ণ-বিলাসিনী,
অন্তরঙ্গা শক্তি কৃষ্ণ—আনন্দদায়িনী !
কৃষ্ণের প্রীতির তরে নিত্য বেশ ভূষা করে,
কৃষ্ণ সেবা তরে মাত্র যত সিমন্তিনী
সাজায় আপন অঙ্গ দিবস যামিনী।
"শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এই শ্রীঅঙ্গ আমার,"—
এই ভাবি নিজ দেহে যত্ন বাড়ে যার,
তারে হেরি দরদরে কৃষ্ণের নয়ন ঝরে,
উথলিয়া উঠে বিশ্ব—প্রেম-পারাবার !
বাড়িছে বিলাস-সিন্ধু ব্রজ গোপীকার !
ব্রজবালা-রূপ গুণ দরশন করি,
প্রীতি-পারাবার মাঝে মগ্ন হন হরি।
শ্রীকৃষ্ণ হলেন সুখী, গোপীগণ তাই দেখি,
ভাসে সুখ-সিন্ধু মাঝে নৃত্য করি করি,
"অমৃতের" সরে শত কুল কুলেশ্বরী !
সদা সাম্যভাবে, থাকিলে নীরবে, পুরুষ প্রকৃতি দ্বয়,
তাই "সাম্যরস" সদা যার বশ, ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদয়।
সে সাম্যের বশ, নহে ব্রজরস, অলস নহে সে ভবে,
ক্ষান্ত নাহি হয়, বাড়ে ক্রমান্বয় "জয় রসময়" রবে।
ইন্দ্রিয় সকল, সম্ভোগে কেবল, হতেছে দুর্ব্বল যবে,
ক্রমান্বয়ে ক্ষয়, বর্দ্ধিত না হয়, কাম নাম তার ভবে।
নহে সে স্বপথ, সে সব বিপথ, সংযত করিলে তায়,
নিত্যভক্ত সঙ্গে, নিত্য রসরঙ্গে, ইন্দ্রিয় তুরঙ্গ ধায় !

হয় না। দুর্ব্বল, বঞ্চিত কেবল, অনন্ত সে বল তার,
পদতলে পড়ি, যায় গড়াগড়ি, মৃত্যুময় এ সংসার !
শ্রীগৌরাঙ্গ গীতা।

অষ্টম রসায়ন।

নিরাকারে ডুবে পুনঃ "অনিচ্ছার ইচ্ছা" আসে,
অরূপ-সাগরে রূপ আবার আপনি ভাসে।
বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণে সেবিবে যখন,
অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা তখন।

বলছেন অনেক আধুনিক, সভ্য দেশের দার্শনিক,
"নরের পূর্ণতা" আর কিছু নয়— নারীর নিঃস্বার্থ প্রেমের হৃদয়।"

এ সব মূর্ত্তি কেবল নামে, মূর্ত্তি চিদানন্দ ধামে,
সে সব মূর্ত্তির রূপের ছটা, দেখ্‌লে মানুষ বাঁচ্‌বে কটা ?
দেখ্‌লে রে সে রূপের কণা, যোগেশ্বরের জ্ঞান থাকেনা।
অরূপের রূপ ঘরে ঘরে যেমন ঘর তার তেমন ধরে।
চিরস্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধু পারে,—
"স্থির-যৌবনেরে" আর "স্থির-যৌবনারে"।
প্রকৃতি পুরুষ দুটি পূর্ণ রসে উঠি ফুটি
দুই অর্দ্ধ এক হয়ে নির্গুণ সমাধি হবে;
নির্গুণ সমাধি শেষে আবার বিভিন্ন দুটি—

"নব দম্পতির" ভাব ভাবুক দেখিছে ভবে ।

নন্দের নন্দন চতুর কান্ মিলব আসিয়া হৃদয় জান্ ।
যাহার যেমত পীরিতি গাঢ়া, তাহারে তেমতি করিবে বাঢ়া ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভাব এই ভাবে প্রকাশিত হয়,—

পদগান ।

কুটস্থ চৈতন্য ব্রহ্ম তোমরা বল যাঁরে,
প্রাণনাথ বলি মোরা মন প্রাণ সঁপেছি তাঁরে ।
তোমরা চাও জগতের নাশ, আমরা চাই তার সুবিকাশ,
মরিতে হয় অভিলাষ, প্রাণনাথ যদি মারে ।
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,—
শুনিয়া এসেছি মোরা নিতে কৃষ্ণের পদরজঃ,
ত্রিবিধ দুঃখের মাঝে, বসায়ে হৃদয় রাজে,
সাজায়ে নিকুঞ্জ সাজে, দাসী হয়ে সেবি তাঁরে ।
মোদের, নাম কৃষ্ণ দাস-দাসী নিত্য বৃন্দাবন-বাসী,
রাধা-কৃষ্ণ ভাল বাসি, দিব এ নাম সন্ন্যাসীরে ।

(২)

পদগান ।

ব্রজ রস সেই, যে রস হতে, সকল রসের উদয় হয় ।
নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হলেন, প্রেম বিলালেন রসময় ।
সে রসের আর নাই তুলনা, সে রস, কেবল জানে ব্রজাঙ্গনা ;
সত্বগুণের শুদ্ধ সরস, আদি সত্য সেই আদিরস
অনাদি কাল সুধার কলস ঢাল্‌ছে ধুয়ে মরণ ভয় ॥
জলটী জমিলে তুষার হয় অসার সংসার মাঝে,
আদি রসটী জমিলে, মূরতি হয়, মদনমোহন ব্রজে ;

সে যে, শ্রীদিয়া গঠিত, শ্রীকর সেবিত, শ্রীধর শ্রীরসময়॥

সেই রূপের সাগরে, সিনান করিয়ে

আমার রূপ কি হল?

আমার বর্ণ কাঁচা সোণা অনন্তযৌবনা,

আমার মরণ মরিয়ে গেল!

সে যে অরূপের রূপ, জগতে অরূপ,

ব্রহ্মরূপ তারে কয়॥

শিরে শিখীপাখা, ত্রিভঙ্গিম বাঁকা,

কৃষ্ণ রূপ বলে কেউ,

সে ত রূপের এক কণা দেখ্‌লেই যায় জানা,

সে তাঁর রূপ সাগরের একটা ঢেউ,

সে যে অমিয় দর্শন, নিতুই নূতন,

রসের বর্দ্ধন সদাই হয়॥

নবীন মেঘের শোভা দেখেছি নয়নে,

শত কাদম্বিনী শোভা প্রাণ-নাথের চরণে।

চূড়াতে ময়ূর পাখা, পাখা কে তায় বলে?—

পাখা নয় সে রাকা-শশী, কোটীচন্দ্র ঝলমলে!

কে বলে রে গুঞ্জা মালা দোলে নাথের গলে,—

সে যে, আমাদেরই মন প্রাণ, গাঁথা কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে!

সে যে অব্যক্ত বচনাতীত অনন্ত সৌন্দর্য্যময়॥

সে যে বনমালা গুঞ্জামালা, তা বলিলেও হয়,

এমনি শোভা মনলোভা, জীবচিত্ত করে জয়,

মালার শোভা, কি দেখেছ, এ ভূতলে?—

সকল শোভার গর্ব্ব খর্ব্বকারী, দেখগে মালা কৃষ্ণের গলে,

গেঁথেছে মালা সূত্র দিয়ে,—সকল, কর্ম্ম সূত্রের শেষে গিয়ে,
জীবের আশা, প্রাণ নাশা ভালবাসার সূত্র দিয়ে;
ধন মান-মন প্রাণ সকল আশা বিসর্জ্জিয়ে,
তার, একটী একটী মালার শোভায়, বিশ্বমালা ফেলছে ধুয়ে!
পাপ তাপ আর কোথায় লাগে?—সেই বৈজয়ন্তী মালার আগে?
পূর্ণ রসময়, তাতেই তন্ময়, হলেই জীবন সফল হয়।

সখি! যাহারা জগতে পুরুষ-মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারাও বস্তুতঃ নারী-প্রকৃতি। কেননা যে দুর্ব্বল, সে পূর্ণ-বল ব্যক্তির স্কন্ধে হাত দিয়া বা গলা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় বা চলিতে থাকে। বলহীন ব্যক্তি, যাঁহার গলা ধরিয়া বা হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে বা চলিতে পারে, সেই সবল ব্যক্তি ঐ দুর্ব্বলের কেমন আশ্রয়, কেমন সহায়, কেমন রক্ষক ও বল স্বরূপ, এবং কতদূর প্রিয়তম, বল দেখি? এইরূপ যিনি পূর্ণবল, তিনিইত পুরুষ, তিনি সব রক্ষা করিতে পারেন। আর যে জন তাঁহার আশ্রয়ে থাকে সেই আশ্রিতাই "প্রকৃতি" অর্থাৎ নির্ভরশীলা, দুর্ব্বলা। সেই পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত এই দুর্ব্বলার আর চলিবার শক্তি নাই।

স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গতি নাই। সেইরূপ সেই জীবন-দাতা ভিন্ন জীবের আর গতি নাই। এই ঈশ্বরই পুরুষ এবং জীবই প্রকৃতি। যাহারা ঈশ্বরের "সর্ব্বময়-কর্ত্তৃত্ব" উপেক্ষা করিয়া কেবল নিজের অহংই দেখিতে পায়, সেই নাস্তিক-কর্ত্তারাই কেবল মূর্খতা বশতঃ আপনাকে "পুরুষ" বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। অর্থাৎ "আমিই বাড়ীর কর্ত্তা" এই তাহারা ভাবিয়া থাকে। কিন্তু আমরা কেন সেরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান রাখিব? ঈশ্বরই বিশ্বপতি, জীবের পতি। জগৎ স্বামী, জীবেরও স্বামী, আমারও স্বামী, তোমারও

স্বামী। তিনি যথার্থ স্বামী, আমারাই বাস্তবিক নারী-প্রকৃতি, তিনি আমাদের পূর্ণ আশ্রয়, আর আমরা তাঁহারই সম্পূর্ণ আশ্রিতা। এরূপ ত্রিতাপ-নাশী সম্বন্ধ ত্রিজগতে আর নাই।

তাই বলি প্রিয় সখি, আমাদের সেই প্রাণপতি জগৎ-পতিকে না দেখিয়া আমরা আর কত কাল জীবিত থাকিতে পারি? সংসারের এতাধিক রোগশোক ভোগ করিয়াও তুমি কি তাঁহার বিরহ অনুভব করিতে পারিতেছ না? তুমি বলিবে—বিরহ কি আগে হয়? আগে মিলন, তাহা হইল কবে? কিন্তু মিলন ছিল। আজ যে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে, সে যে শুধু দুঃখ-ভোগেই হইয়াছে, তাহা নহে। দুঃখের বালি দিয়া মনটাকে মাজিয়া মাজিয়া এখন পূর্ব্ব-স্মৃতি ঝক্ মক্ করিয়া উঠিয়াছে! এখন বেশ বুঝিতেছি—এ বিশ্বেরপতি কই? আমাদের পতি কই? আবার বেশ দেখিতেছি—ঐ যে তিনি, ঐ যেন সরিয়া যাইতেছেন, ঐ লুকাইতেছেন। আমরা তাই "হা নাথ, হা নাথ" বলিয়া বিশ্বনাথকে ডাকিতেছি। পূর্ব্বে কোনও কালে মিলন ছিল, তাইত স্মরণ হইতেছে, নতুবা কিসের স্মরণ হইবে? যাহাদের বেশি বেশি স্মরণ হইতেছে, তাঁহারাই এটা বেশ বুঝিতে পারিবেন। তুমিও বোধ হয় এখন একটু বুঝিতে পারিতেছ।

জীবে জীবে সখীভাব। যাহাদের মনে বিশ্বপতির স্মৃতি অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারাই পরস্পর 'মর্ম্মসখী'। মর্ম্ম-সখীর কাছেই মর্ম্ম খুলিয়া বলা যায়। পতি কি বস্তু, তাহা কেবল সতী জানে। তুমি আমার মর্ম্ম-সখী, তোমাকেই আমার বিরহ কথা বলি, তাতেই প্রাণ শীতল হয়। কেন না তাঁর কথা বলিতে গেলেই যেন তাঁর সঙ্গ হয়। তাঁর কথা বলিতে

বলিতেই তাঁর গুণ স্মরণ হয়, গুণ স্মরণেই রূপ স্মরণ হয়, ক্রমে যেন সংস্পর্শ বোধ হয়। তার পরেই তন্ময় হইয়া যাই।

মর্ম্ম-সখি, আমার মর্ম্ম-কথাটা শুন,—

"কৃষ্ণ স্থির যৌবন, আমার, নবীন দেহ নবীন মন!
পরে কি তা বুঝ্‌তে পারে? মর্ম্ম-সখি, বলি শোন।
"আমরা কৃষ্ণ বিলাসিনী,—
নিন্দি মোক্ষে, উচ্চ বক্ষে, ধরেছি নীলকান্ত-মণি।
দোলাইয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে, পৃষ্ঠের অঞ্চল কোণে,
নাচিতাম কৃষ্ণ সনে কৃষ্ণ-আদরিণী।"

সখি, যখন, প্রথম নব অনুরাগে, হৃদে কৃষ্ণ প্রেম জাগে,
আমি, বিচারিলাম, আগে পাছের কাজে।
প্রেম করিলে কৃষ্ণ সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে॥
আমি, আঙ্গিনাতে ঢেলে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহে করিতাম;—
আইলে আঁধার রাতি, আঙ্গিনাতে কাঁটা পাতি,
গতাগতি তাহে করিতাম;
তার মোহন বাঁশি শুন্‌তাম্ যত, ছুট্‌তাম রে পাগলের মত,
পন্থ বিপন্থ নাহি জানি,
চলিতে চরণে কত, বিষধর জড়ায়ে যেত,
যেতাম, অঙ্গের ভূষণ তারে মানি;
ছুট্‌তাম বঁধুর বাঁশীর টানে, কে চাইত সে পথ পানে?
যেতাম, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে।
সখি, জন্মিলে মরিতে হবে; ভুজঙ্গের আর ভয় কি তবে?

কি করিবে জাতি কুল লাজে ॥
সখি, কৃষ্ণ প্রেম হৃদে যার, মরণে গৌরব তার,
ভয় কিরে বজ্র যদি বাজে ?
সে বজ্র দেখিবে আসি, কৃষ্ণ গেছেন প্রাণ নাশি,
মৃত দেহ পড়িয়ে রয়েছে ॥
"সখি, আমার, গর্ব্বশালে মত্ত হাতি, থাকৃত বান্ধা দিবারাতি,
ক্ষিপ্ত হল প্রেমের অঙ্কুশে ;
দম্ভের শিকল কাটি, কোন্ দিকে গেল ছুটি,
পলাইয়া গেল কোন্ দেশে !
ধৈর্য্য-শীল-হেমাগার, গুরু-গৌরব-সিংহদ্বার,
ধরম কপাট ছিল তায়,
বংশীরব-বজ্রাঘাতে, ভেঙ্গে প'ল অকস্মাতে,
সমভূম করিল আমায় !
কালিয়া-কুটিল বাণে, কুলশীল কোন্ খানে,
ডুবিল, উঠিল ব্রজ-বাস ;—
অবশেষে প্রাণ বাকি, তাও বুঝি যায় সখি !
কহত জগদানন্দ দাস।

(কীর্ত্তন-ভাঙ্গা-ঝাঁপতাল)

আহা কি সুন্দর সখি, কৃষ্ণ রস-সাগর।
তাড়িত জড়িত যেন নাচে নব জলধর ॥
(এই জগৎ-রসের নাট্যশালে নাচে নব নটবর)
আমি যতই তাহারে দেখি, প্রাণে হয় সে মাখামাখি,
এই, পাষাণে কে দিছে আঁকি সেই, অরূপের রূপ মনোহর!

(কোটী কন্দর্প জিনিয়ে রূপ কাম গর্ব্ব-খর্ব্বকর)
আমি জ্ঞানহীনা কুরূপিনী, সে যে সুরসিক চূড়ামণি,
তাঁর দৃষ্টি মোর পানে, তাও কি সম্ভবপর?
(পরশিতে এলে বলি,—কি কর কি কর কর?
সে যে, সুধাকরের সুধাসিন্ধু, চিদাকাশে শরদিন্দু,
মরু ভূমে চারু শোভা, অমারাত্রে সুধাকর॥

পদ গান।

হরি তুমি আছ এই আনন্দ, আর আনন্দ কিছু নাই।
তুমি আছ এই ভরসা, ঐ ভরসায় বেঁচে যাই।
তুমি, আমার পক্ষে "সর্ব্বরক্ষে," আর মুক্তি মোক্ষে কাজ নাই।
তুমি বেঁচে থেক, মনে রেখ, আমি, শত জন্ম মরে যাই।
দুঃখ নামে দয়া তব এসেছে বুঝেছি তাই!
তুমি সুধাকরের সুধাসিন্ধু প্রেমানন্দে নাচি গাই!

সখী বলিতেছেন,—

"প্রেম-কারিগর মোরা যত সখীগণ,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পারি পীরিতি-রতন।
অন্তর হাফর, মান—অঙ্গারের খনি,
বিরহ-নিশ্বাস দিয়ে ভিজাই আগুনি।
প্রেম-কারিগর মোরা ব্রজের যত সখী,
কৃষ্ণ প্রেম ভেঙ্গে গড়ি গড়ে ভেঙ্গে দেখি।

সেই প্রেম থাকে যদি জীব কেন ভাব ?
সোণাতে সোহাগা দিয়ে মিশাইয়ে দিব।
"রাধা-কৃষ্ণ প্রাণ মোর নয়নেরি তারা,
রাই বিনা কৃষ্ণ যেন লাগে আন্ধিয়ারা।
ব্যোম তাড়িতের জ্যোতিঃ, পরব্যোমে থানা,—
কানু মরকত মণি, রাই কাঁচা সোণা!
সুবর্ণ প্রতিমা রাই কানু ইন্দীবর,
বিনোদিনী বিজুরি, বিনোদ জলধর।"
"মাধবেরি শিরে চূড়া, রাইয়ের মাথায় বেণী,
নিলগিরি বেড়ি যেন উঠিছে সাপিণী।
বিনোদিয়ার বিনোদচূড়া বিনোদিনীর বেণী,
চূড়া করে ঝলমল বেণী ধরে ফণী।"
"বেণী চূড়া হেরা হেরি ফেরা ফিরি বাহু—
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাস করে রাহু!
বনমালা-রত্নহারে তাড়িতের খেলা,
সখীগণের করতালি কোটী চাঁদের মেলা!"
"হিরণ-কিরণ আধ বরণ, আধ নিলমণি জ্যোতি,
আধপর বন-মালা-বিরাজিত, আধপর গজমতি!
আধশিরে শোভে ময়ুর শিখণ্ড, আধশিরে দোলে বেণী,
কনক কমল, করে ঝলমল, ফণী উগারয়ে মণি।
রাই সে রসের সিন্ধু অনন্ত পাথার,
চির রসময় কানু দিতেছে সাঁতার।"
প্রকৃতি-সাগর-বক্ষে ব্রহ্মের তপন!—
তুলিলেন প্রতিচ্ছবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।

প্রেম সমাধি—যুগল মিলন।

(বেহাগ)

সখি, আজ রজনী কেমন! প্রকৃতি পুরুষ, সুন্দর-সুন্দরী পরস্পরে ধরি করে আলিঙ্গন।

প্রিয় সনে প্রিয়া দেখিতে যেরূপ, প্রকৃতিপুরুষ রয়েছে সেরূপ, প্রেম-যোগে ঐ দেখ বিশ্বরূপ, বিশ্ব প্রেমে কিবা ঈশ্বর মগন।

নব দম্পতির প্রেমে গড়া কায়া—প্রকৃতির আর পুরুষেরি ছায়া; জীবে জীবে প্রেম অনিত্য সে মায়া, প্রকৃতি পুরুষে নিত্য সত্যধন।

চিন্ময় পুরুষে হেরিতে হেরিতে, নিত্য কৃষ্ণ-ধনে পায়রে দেখিতে, নিত্য রাধারূপ দেখে প্রকৃতিতে প্রতিচ্ছবি নিতে জানে যেই জন।

চিন্ময়-পুরুষ-প্রকৃতির প্রেম, নিত্য সত্য চির নিকষিত হেম, মানবের মায়া, চিন্ময়ের ছায়া—চিন্ময় আলিঙ্গন, চিন্ময় চুম্বন।

মুখে মুখে মুখে, বুকে বুকে বুকে, সুপ্রকৃতি রাধা আছে কতসুখে, দেখ সখি আজ দেখাই তোমাকে, নীরব নিকুঞ্জে যুগল মিলন।

কৃষ্ণবক্ষে রাই অচেতন প্রায়, অলসে অবশে উলঙ্গ ঘুমায়, প্রকৃতির অংশ সখীবংশ আয়, সুধাকর করে চামর ব্যজন!

ঐ ক্রমবিকাশ—(বেহাগ)

"দেখ সখি, দোঁহে ঘুমাইল। অলস অবশ অঙ্গ টলমল, অরুণ নয়ন দুটী অমনি মুদিল।

উরসে উরস বদনে বদন, প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ পরশন, সুখ নিদ্রাবশে, দোঁহে অচেতন, কাঁচলি কিঙ্কিনী খসিয়া পড়িল।

নাগর মৃণাল বাহু উপাধানে, শির রাখি রাই আছেন শয়ানে, হাসি খানি তবু রয়েছে বয়ানে, নাসার নিশ্বাসে বেসর দুলিল।

ঐ ঐ সখি, কর নিরীক্ষণ, শ্যাম অঙ্গে রাই দিয়েছে চরণ,
মরি কিবা শোভা হয়েছে এখন, হেমলতা যেন তমালে বেড়িল।
ধীরে কথা কও সকল সজনি, পাছে জাগে রাই কমলিনী ধনী,
জাগিলে চরণ ঘুচাবে এখনি,—চল সবে নিশি অধিক হইল।
সব সখীগণ করিল গমন, নিজ নিজ কুঞ্জে করিল শয়ন,
নিস্তব্ধ নিবিড় নিকুঞ্জ ভুবন, দ্বারে "জগবন্ধু" কোটাল রহিল।"

কুঞ্জভঙ্গ।

"অকরুণ পুনঃ বাল অরুণ উদিত, মুদিত কুমুদ-বন্দন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরি, পদমিনীকো সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনী ভোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী, জিত দামিনী কামিনী-কুল-লাজে।
কুহুকত হতশোক কোক, জাগত অব সবহুঁ লোক,
শুক শারিকো পিক কাকলী, নিধুবন ভরু ওয়াজে,
বরজ-কুলজ জলজ-বয়নী, ঘুমল বিমল কমল-নয়নী,
কৃত লালিস, ভুজ বালিস, আলিস নাহি ত্যজে!"

ঐ সেই নিষ্ঠুর তরুণ অরুণ আবার উঠিল! কুমুদ ম্লান হইল, ঐ ভ্রমর চমকিত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া পদ্মিনীর নিকট গেল! সজনিরে, বুঝি রজনী প্রভাত হইল, পাখী ডাকিতেছে, রাত্রি শেষ দেখিয়া লজ্জায় কামিনীগণ অঙ্গে বস্ত্র দিতে গিয়া সৌদামিনীকে পরাজয় করিতেছে। কোকিল ডাকিতেছে লোক জাগিতেছে, শুক শারী প্রভৃতি পাখীর গানে নিধুবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সারানিশি উপাস্য দেবের সেবা করিয়া ব্রজকুলের বিমল-কমল-নেত্রা পদ্মমুখী-গণ কেবল এখন একটু নিদ্রা গিয়েছে! তাহারা লালসা পরিতৃপ্ত

করিয়া কৃষ্ণসবার পরে রাত্রি শেষ দেখিয়া ভুজ-বালিসে মাথা দিয়াই কেবল এইমাত্র শুইয়াছে! আহা এখনও আলস্য ত্যাগ করে নাই। হায় হায় অমনি প্রভাত-সূর্য্য আবার আসিয়া উদয় হইল! ছি ছি সূর্য্য কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর!

কল্পতরু যেমন যাচকের প্রাণে প্রাণে কথা বলে, নবীন মেঘ যেমন চাতকের প্রাণে প্রাণে কথা বলে, ভ্রমর যেমন নলিনীর সহিত কথা বলে, সেইরূপ সেই প্রাণ-সর্ব্বস্ব দেবতা ভক্তের চিন্ময় বিমল অন্তরে বলিলেন,—সখি দিনমান হইল, সংসার-ধর্ম্ম এখন আরম্ভ হোক্, আমিত আর এখন থাকিতে পারি না, এখন যাই তোমরা যেন আমায় ভুলিও না। কিছু মনে করিও না।

তখন গোপীগণ বলিতেছেন,—

"যাও যাও হে প্রাণসখা, আর, মন রাখা কাজ নাই!
তুমি যাও হে গোচারণে, আমরা গৃহ কাজে যাই।
এ মিনতি প্রাণপতি পুনঃ যেন দেখা পাই।"

তবে একটা কথা শুনে যাও,—আমরাত তোমার অদর্শনে থাকিতে পারি না, একটা কাজ করিও,

"হরি, বাজায়ো মোহন বাঁশী, মোহন যমুনার মাঠে,
আমরা, শুনবো বাঁশী কালশশী, বসিয়ে যমুনার ঘাটে।"

তবে এখন আমরা আসি,—

"প্রাণ-মাধব, বিদায় পায়ে তোর,—
তোহারি প্রেম স্মরি পুনঃ চলি আয়ব
সমাপিয়া গৃহ ধর্ম্ম ঘোর।"

বিদায়! বিদায়!

ইতি অষ্টম রসায়ন। শ্রীশ্রীব্রজলীলা সার সমাপ্ত।

অতিরিক্ত পত্র।

কবিতা-কুঞ্জ-লতা।

(সুধাকরের প্রথম বয়সের রচনা।)

বাবা বৈদ্যনাথ।

রতন মণি কাঞ্চন হয় বিতরণ
শুনি যথা রাজদ্বারে দীন দুঃখী গণ
পড়ে মরে জ্ঞানশূন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ উদর জ্বালায়,
তেমতি আতুর অন্ধ মহাপাপী যত
খঞ্জ পঙ্গু বোবা শূল কুষ্ঠ-রোগ'ক্রান্ত
ছুটেছে আকাশ পানে তুলি দুই হাত,
শত কণ্ঠে গায় "জয় বাবা বৈদ্যনাথ!"
বাবার মন্দির চূড়া পরশে গগন,
হেরি পায় প্রাণ আশা মৃতকল্প জন!
দলে দলে মন্দিরের পাদদেশে পড়ি
অনাথ আতুর অন্ধ যায় গড়াগড়ি।
ফুল জল বিল্বদল লইয়া মাথায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ পূজা দিতে যায়,
মন্দিরের অভ্যন্তরে গভীর আঁধার
ঘৃতের প্রদীপ মাত্র আলোক তাহার,
তার মাঝে শত কণ্ঠে করে মন্ত্র পাঠ,
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি রুদ্ধ হয় বাট;
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু পুষ্প গঙ্গাজল
রতন কাঞ্চন আর লক্ষ বিল্বদল

অবিশ্রান্ত ঢালিতেছে বাবার মাথায়,
পড়ে মরে ধায় লোক কে কারে সুধায়?
বাবার মন্দির পাশে মৃত্তিকায় পড়ি,
অবিশ্রান্ত কতলোক যায় গড়াগড়ি।
ছাড়িয়া জীবন আশা ব্যাধির জ্বালায়
"বাবা বৈদ্যনাথ" বলি গড়াগড়ি যায়।
অনাহারে কত নারী কত বর মাগি
পাথরে ভাঙ্গিছে মাথা পতি পুত্র লাগি।
অন্ন জল পরিহরি এক পক্ষ আছে,
বাবার চরণামৃত দিবসান্তে যাচে।
এরূপ সহস্র লোক ধর্ণা দেয় আসি,
দেখ আসি বৈদ্যনাথে যত অবিশ্বাসী,—
অন্ধ দেখে খঞ্জ হাঁটে ঊর্দ্ধ করি হাত
বোবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে "বাবা বৈদ্যনাথ।"
একনিষ্ঠ মন করি কুষ্ঠরোগী যত,
মুক্তি পায় বৈদ্যনাথে ডাকি অবিরত।
ধন্য দেব! অবতীর্ণ বৈদ্যনাথ পুরে,
করিয়াছ কর্ণপাত পাপীর চিৎকারে।
বরঞ্চ মরণ শ্রেয়ঃ পীড়ার যাতনা
আর ত সহেনা বলি উদ্ধার কামনা
করিতেছে যারা দেব তোমার চরণে,
দয়ার ঠাকুর তুমি শুনিতেছ কাণে।
মহেশ শঙ্কর শিব দয়াময় তুমি,
নামশুনি দিবানিশি ডাকিতেছি আমি।

মহাপাপী দীন আমি নাই কোনো হাত,
এসেছি তোমার দ্বারে বাবা বৈদ্যনাথ।

স্নান-স্তোত্র।

বহ্নি সূর্য্যে বিভু-শক্তি দীপ্তিময়ী যেমতি
ব্রহ্মতেজঃ বারিকণা হৃদে ধরে তেমতি।
পানে স্নানে স্পর্শে প্রাণ সুশীতল করে রে,
শোক তাপ শ্রান্তি ক্লান্তি মলিনতা হরে রে।
ঈশ্বরের মহাশক্তি এই জলে নিহিতা,
জয় দেব, জয় দেব! জয় জল-দেবতা।
ব্রহ্মশক্তি ভাব-মূর্ত্তি নিরাকার সাকারে,
জ্বলিতেছে ব্রহ্ম-ভাব জলরাশি-আকারে।
কি যে জ্বলে এই জলে মেঘে যেন দামিনী,
অরূপ-রূপ-মাধুরি মন প্রাণ-মোহিনী।
ঈশ্বরের মহাশক্তি এই জলে নিহিতা,
জয় দেব, জয় দেব! জয় জল-দেবতা।
দগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ কারী বারি ব্রহ্ম-বরণা,
প্রাণেশের পাদ পদ্ম বিগলিত করুণা,
সাগর-সলিল-রূপে ধরাতলে বহিছে,
পান করি স্নান করি জীব-প্রাণ বাঁচিছে।
ঈশ্বরের মহাশক্তি এই জলে নিহিতা,
জয় দেব, জয় দেব! জয় জল-দেবতা।
মলিনতা বিনাশিনী পবিত্রতা-দায়িনী
স্রোতস্বিনী-পূতবারি শোক তাপ-হারিণী।

নানা রূপে শত ধারা ধরাতলে বাহিত,
তা না হ'লে ক্ষিতিতলে এ প্রাণ কি বাঁচিত ?
ঈশ্বরের মহাশক্তি এই জলে নিহিতা,
জয় দেব, জয় দেব ! জয় জল-দেবতা।
স্নিগ্ধ জলে স্নান করি দেহ প্রাণ জুড়াল,
মলিনতা দুর্ব্বলতা সব দূর হইল।
প্রফুল্লিত হল চিত নব বল শরীরে,
এই মোর হৃদয়েশ এই জলে বিহরে।
ঈশ্বর-চেতন-শক্তি এই জলে-নিহিতা,
জয় দেব, জয় দেব ! জয় জল-দেবতা।
হৃদয়েশ জীবিতেশ, দেখা দিয়ে যেও না,
প্রেমনীরে রূপ হেরে আঁখি আর ফেরে না।
এত ভাল বাস যদি কর এই করুণা,
শ্রীমুখের জ্যোতি নাথ আবরিয়া রেখ না।
জীবন স্বরূপ তুমি, পিতা মাতা বিধাতা,
জয় দেব, জয় দেব ! জয় জল-দেবতা।

ভালবাসা।

প্রাণের গভীর কূপে লুকায়িত চুপে চুপে,
সঞ্জীবনী সুধারূপে কে গো তুমি বল না ?
সংসার-মুকুট-মণি, প্রেমে ভরা মুখ খানি,
ভুবন মোহিনী ধনি সুর-লোক-ললনা ?
"ভালবাসা" মোর নাম বৈজয়ন্ত পুরে ধাম,
জীবের জীবনারাম স্বরগের নমুনা,

ধরাতলে নিপতিত জীব প্রাণে প্রবাহিত
ভবেশের পাদপদ্ম বিগলিত করুণা।

কল্পনা।

আয় লো কল্পনে যাই, আমার সঙ্গিনী নাই,
তোর সাথে শূন্য পথে বেড়াইব ঘুরে,
আকাশ কুসুম রাশি আমি বড় ভালবাসি,
তুই লো মালিনী ভাল মালা গাঁথিবারে।
মন্দার কুসুম গুলি আঁচল ভরিয়া তুলি
সিঞ্চি মন্দাকিনী বারি, ত্রিদিব-কামিনি,
কবিতা-সূতায় গাঁথি আমায় সাজাও সতি,
অনঙ্গে সাজায় যথা অনঙ্গ মোহিনী।

বসন্তের প্রারম্ভে মেঘোদয়।

আজ এ মাঘের শেষে এ বিদেশে ভাবি ব'সে
এই যে শীতের অন্ত হয় হয় হয় না,
বসন্ত আসিবে ব'লে প্রাণান্ত প্রভাত কালে,
ঝির্‌ঝির্‌ সমীরণ বয় বয় বয় না!
পল্লব মুকুল ফুল অলিকুল সমাকুল,
কি যে কথা মনোমাঝে আসে যায় রয় না,
থেকে থেকে প্রাণাকুল কাজ কর্ম্মে হয় ভুল;
কুলবধূ কি যে কথা কয় কয় কয় না!
যাই যাই নিরজনে প্রাণ যেন সদা টানে
গুরুজন দরশনে ভয় ভয় যায় না,

চমকিয়া শুনি কানে কোকিল কোকিলা সনে
কুঞ্জবনে কুহু কুহু গায় গায় গায় না,—
এ বড় বিপদ ভারি বুঝেও বুঝিতে নারি,
যে কাজেতে হাত দেই হয় হয় হয় না,
ইচ্ছা করে নিরজনে ভাবি বসি একমনে—
কি যে ভাবি—মন যেন বুঝেও তা বুঝে না।
বাসন্তি, বসন্ত এল, নাব'লে কি করি বল ?
কা'ল যে নিশির শেষে কাদম্বিনী ঘটা লো,
গুরু গুরু গরজন মৃদু মন্দ বরষণ,
তার মাঝে সে যে ভাই সৌদামিনী ছটা লো।
নিরখি আকুল প্রাণ প্রাণে যেন হানে বাণ ;
—নয়ন উদাস করি চারিদিকে চাই লো,
কি যে দেখে আঁখি দুটি প্রাণ করে ছুটা ছুটি,
অসময়—সে সময় কার কাছে যাই লো ?
হাসিয়া বাসন্তি বলে— এই হয় এই কালে,
বসন্তের যেই ভাব সেই ভাব এই লো ;
আসিছেন ঋতুরাজ ভবে তাঁর এই কাজ।
তোমার আমার আর কাজ কর্ম্ম নাই লো।
বসন্ত আসিবে মাত্র শুনি মোর দহে গাত্র,
তাই সেই প্রিয় পাত্রে নেত্রে নেত্রে রাখি লো,
নিয়ত নির্জ্জনে থাকি, মুদিত করিয়া আঁখি,
সেই মুখশশী সখি হৃদয়েতে দেখি লো।

পুসি।

শিশুকালে পুসি তোরে আনিয়ে আদর ক'রে,
রত্নসম যত্নে ধরে কোলে ক'রে রেখেছি,
চারি বর্ষ সুখে দুখে রেখেছিনু চ'খে চ'খে,
হারাইয়ে আজ তোকে শোকে মুগ্ধ হয়েছি!
কেন গেলি সঙ্গী ছাড়ি বেড়াতে ফিরিঙ্গী বাড়ি?
নির্দ্দোষে পথের পাশে, কে মারিল গুলি রে,
ননীর পুতলি ছিলি, বজ্রাঘাতে প্রাণ দিলি!
দেখিলে নিতাম তোরে বক্ষ'পরে তুলি রে।
পাতিয়ে গীতার পাতা, যতনে শোয়ায়ে তথা,
তুলসী পাতার পরে মাথা তোর তুলে রে।
দিতাম অধর পরে গঙ্গাজল ধীরে ধীরে,
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি কর্ণ মূলে রে।
কত দিন পুসি তোরে সযতনে কোলে ক'রে
জপমালা নিয়া করে কৃষ্ণ-মন্ত্র জপেছি,
আবাল বনিতা মিলি "হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি
এ বাড়ীর পশু পক্ষী কৃষ্ণ-পদে সঁপেছি।
পশু পক্ষী কীট চয় যে নামে উদ্ধার হয়,
মৃত-সঞ্জীবনী নাম দিবানিশি শুনেছ,
মনে আর ক্ষোভ নাই, নিশ্চয় জেনেছি তাই—
রাধা-কৃষ্ণ পাদ পদ্মে সুখস্থান পেয়েছ!
তোর প্রেমে হয়ে ভোরা পালক পালিকা মোরা
কৃষ্ণ নাম দিয়া দিয়া পশু পক্ষী সেবিব,
পুসি, বড় সাধ মনে— অচিরে মোরা দুজনে
চিদানন্দ বৃন্দাবনে তোর সনে মিলিব

বাল্য কবিতা।

পাখী।

থাকি থাকি পাখী নাচে শাখীর শাখায়,
অপরূপ রূপ ওই পাখীর পাখায়।
ডাকি ডাকি কত পাখী উড়িয়া বেড়ায়,
খুটে খায় নাচে গায়, যথা তথা যায়।
ছোট ছোট পাখী দু'ট আগ ডালে নাচে,
এই ভয় মনে হয় পড়ি যায় পাছে;
ফুড়ুৎ করিয়া ওই উড়ে গেল ভাই,
মনে হয় সাথে যাই পাখা মোর নাই।
ঝাঁকে ঝাঁকে শাদা বক বিমানের কোলে—
সুগন্ধি ফুলের মালা আকাশেতে দোলে!
ধূমল জলদ কোলে চাতকের ডাক,
কিচি-মিচি কত পাখী ডাকে লাখে লাখ,
উড়ে পড়ে ঘুরে ফিরে আগে পাছে ধায়,
কহ শিশু ডাকি ডাকি কি বলে তোমায়?
বলিছে বালক গণে আর বালিকায়—
"নবীন মেঘের কোলে আয় আয় আয়।"
শাদা নীল পীত কাল লোহিতের ছটা,
বাগানে বকুল ডালে নাচে পাখী ক'টা,
হেরিয়া মারিতে ঢিল কে পারে এখন?
কি পাষাণ মন তার, কি পাষাণ মন!

ফুল।

কুসুম কাননে ফুটিল ফুল, ছুটে অলিকুল হ'য়ে আকুল!
ডগমগ ফুলে গাছের আগা, ফুল ভরে দোলে মালতী ডগা!
মলয় পবন নাচায় শাখা, গুণ গুণ অলি দোলায় পাখা।

করিছে আকুল বক বকুল, কোনটা মুকুল কোনটা ফুল!
ছুটিল সৌরভ বাগান ভরা, ফুলে ফুলে মালা পরিল ধরা।
শাদা নীল পীত লোহিত কত, ফুটেছেরে ফুল মনের মত।
বাসে আসে অলি মলয় বায়, খেলিতে বালক তুলিতে ধায়
কেহ যায় নিতে পূজার ফুল, কেহ বা সাজায় খোপার চুল'
তোল ভাই ফুল ভরিয়া ডালা, পরিব গলায় গাঁথিয়া মালা!
গোলাপ ফুলের হাসির মত, হাস্‌রে বালক বালিকা যত

চাঁদ।

শরৎ-পূর্ণিমা তিথি নিশীথ সময়,
হাসি মাখা শশী ওই আকাশে উদয়।
চারি ধারে হীরা চুণি, তারা শত শত,
তার মাঝে চাঁদ খানি মহামণি মত!
করেছে ভুবন আলো কিরণ মালায়,
চকোর চকোরী হেরি সুখে গান গায়।
ডাকিছেন শশী বসি গগনের গায়,—
"বালক বালিকা নেচে আয় আয় আয়।"
চল ভাই ছাদে যাই তারা-হারে ঘেরা
হেরি শশী রূপ-রাশি সারা নিশি মোরা।
নাম ধরি সুধাকর বসুধা উপর,
বরষিছ সুধারাশি তুমি শশধর।
নিয়মিত নিজ কাজে অবহেলা নাই,
ধরাতল সুশীতল কর তুমি তাই।
তাইতে জগৎ হাসে হেরিলে তোমায়,
তুমিও হাসিছ এত হেরিয়া ধরায়।

নাই যার অবহেলা আপনার কাজে,
চাঁদমুখে হাসি খুসি তারি এত সাজে ;
যে শিশু না লেখাপড়া করে নিয়মিত,
পড়ার সময় থাকে পেচকের মত।

কমল।

সরোবরে শোভা করে বিকচ কমল,
বায়ুভরে ঢল্ ঢল্— জল থল্ থল্।
শত দলে শতদল ধরিয়াছে শোভা,
মলয়-মরাল-শিশু— অলি-মনোলোভা।
এত বড় ফুল কেহ দেখেছ কি আর ?
কুসুম-কাননে শিশু খুঁজে পাওয়া ভার।
কভুকি কমল-বনে গিয়াছ তোমরা ?
বড় বড় বিলে গিয়া দেখেছি আমরা ;—
বিলময় বিলময় কমলের পাতা,
শীতল সলিল-শিরে শত শত ছাতা।
যে দিকে চাহিবে বিলে নাহি তার কুল,
দেশময় দেশ ময় খই-ফোটা ফুল।
উলটি পালটি খেলে শীতল বাতাস,
মাতায়ে কমল বন উড়ায় সুবাস।
সে যে কি সৌরভ শিশু কহিতে না পারি,
সাধ করে বাড়ী ছেড়ে সেথা বাস করি।
অলি-মালা গুণ্ গুণ্ করে ঘুরে ফিরে,
মধু খায় ঘিরে ধরি অলি-মালিনীরে।
কমল যোগায় মধু মধুকর গণে,
বালক বালিকা চল কমলের বনে।

মা।

বেলা প'ল ছুটি হ'ল বাড়ী চল ভাই,
আগে গিয়া যার যার মার কাছে যাই।
পড়িতে আসার বেলা মোরে নিয়া কোলে,
কাপড় পরায়ে মুখ মুছায়ে আঁচলে,
দিলেন মাথার চুল করিয়া সমান,
বই গুলি হাতে দিয়া ধরিয়া বয়ান,
বলিলেন মা আমার বুকে করি নিয়ে,—
এস বাবা পড়ে এস পাঠশালে গিয়ে।
সেই যে এসেছি আমি পড়িবারে ভাই,
সেই হ'তে আমি মোর মাকে দেখি নাই।
এতক্ষণ মা মা বলি ডাকি নাই আর,
পথ পানে চেয়ে আছে জননী আমার।
ছুটি হ'ল ছুটে যাব জননীর কোলে,
বদন ভরিয়া গিয়া ডাকি মা মা ব'লে।
খাবার আনিয়া ছুটি যা দিবেন হাতে,
খাইব মধুর মত মহা আমোদেতে।
মার কথা মনে গাঁথা রাখিব আমার,
দুবেলা নমিব আমি চরণে তাঁহার।
আমাদের মাঝে যার মা নাই ভাই,
তাহার সমান দুঃখী আর বুঝি নাই!

ভাই বো'ন।

যার নাই ছোট ভাই, তার মত দুঃখী নাই।
ছোট বোন বাড়ী থাকে, দাদা দাদা বলি ডাকে!

বড় দাদা বড় দিদি, কাহারও থাকে যদি
তারে মত সুখী নাই! ভাই বোন আমি চাই!
কত ভাল বাসা বাসি, রাত দিন হাসি খুসি।
সবে মিলে এক ঠাঁই, খাই দাই নাচি গাই।
ভাই বো'ন কাঁদে যদি, সাথে সাথে আমি কাঁদি
এক ঠাঁই ধুলা-খেলা, পড়া শুনা দুই বেলা।
ভাই বো'নে মায়া ধরা, কখনো করিনা মোরা।
যার কাছে যে যা পাই, ভাগ করি সবে খাই।

গুরুমহাশয়।

করেছেন মাতা পিতা লালন পালন,
দেখিলে কুপথে যেতে করেন শাসন।
আবার দেখিলে ভাল ধরিয়া অধর,
ডাকিয়া কোলের কাছে করেন আদর।
শৈশবে কুপথে মন গেলে একবার,
মার ধর শত বার, সারিবে না আর।
তাই ভাই শিশুকালে যত গুরুজন
যতনে আদর দেন করেন শাসন।
মাতা পিতা মহাগুরু সতত সদয়,
আছেন আর এক গুরু গুরু মহাশয়।
জনক জননী ভাল বাসেন যেমন,
গুরু মহাশয় ভাল বাসেন তেমন।
কুকথা কহিলে কিছু করিলে কুকাজ,
বারেক দেখিলে তিনি, পাই বড় লাজ;
তাড়না করেন মোরে যদি এক বার,
সে কাজে কখনো আমি নাহি যাই আর।

আমারি ভালর তরে করেন শাসন,
অবোধ বালক মোরা না জানি কারণ।
তাঁর কথা মনে গাঁথা রাখিয়া সদাই
দিন দিন ভাল হব আমরা সবাই।

সহপাঠী।

সহপাঠী যত জন, এক পড়া এক মন।
পাশে পাশে গায় গায়, বসি কত সুখ তায়।
ভাই ভাই মোরা সবে মিলি মিশি খেলি হবে,
হাতে হাতে ধরা ধরি, করি যাই সারি সারি,
কেহ দাদা কেহ ভাই,— এর চেয়ে সুখ নাই।
সে দিন যদুর গায়, হাত তুলিয়াছি হায়।
বলিয়াছি কটু কথা, মনেতে দিয়াছি ব্যথা!
কহিল সে হাতে ধরে— কেন দাদা মার মোরে?
যদুর মধুর কথা, রবে মোর মনে গাঁথা।
সহ-পাঠী কারো গায়, হাত তোলা ভাল নয়।

ছুটী হ'ল, বাড়ী যাই।

আমাদের ছুটী হ'ল বাড়ী চল ভাই,
দলে দলে সবে মিলে পথে চলে যাই।
রাখাল গোপাল পথে করে গোল মাল,
যাদব মাধব ধীরে যায় চিরকাল।
যদু মধু দুটী ছেলে ছুটা ছুটী করে,
রাম শ্যাম ধীরে ধীরে চলিয়াছে ঘরে।
শিশির মিহির ওই দেখ বাড়ী যায়,
এক মনে কারো পানে ফিরিয়া না চায়।

ললিত মোহিত যেন পথ করি আলো,
সুশীল সুবোধ ছেলে বাড়ী চ'লে গেল।
নরেন ধীরেন দেখ যায় ধীরে ধীরে,
দেবেন দৌড়ায় আর চায় ফিরে ফিরে।
সহ-পাঠী গণে ধরি গালি দেয় হরি
পড়া-শুনা করে নাত করে মারামারি।
আমরা ওদের সাথে যাব নাত ভাই,
ও আমোদে আমাদের কিছু কাজ নাই।
রোদ নাই ধীরে যাই, পড়িয়াছে বেলা,
বাড়ী গিয়ে কিছু খেয়ে তবে করি খেলা।
বই হাতে ধীরে ধীরে পায় পায় পায়,
সকল সুশীল শিশু বাড়ী চ'লে যায়।

পিপীলিকা।

নিশি ভোর, ঘোর ঘোর, কুহেলিকা আঁধারে,
সারি সারি শ্রমকারী পিপীলিকা বিহরে;
দেখ কত শত শত, এক সারি চলেছে
"একতায়" কি যে হয় ঠিক তারা বুঝেছে!
পিপীলিকা কোনো পোকা, একা যদি ধরেছে,
যত গুলি সবে মিলি তাঁরে ধরে টেনেছে!
এক কালে ঘরে তুলে যে আহার রাখিবে,
অন্য কালে সবে মিলে তাহে দিন যাপিবে।
"অলসতা" কেমন তা পিপীলিকা জানে না,
শিশু গণ দিয়া মন পিপীলিকা দেখনা।

ভিখারী।

ফিরিছে ভিখারী দুয়ারে দুয়ারে, বালক বালিকা দেখ গো উহারে।
আহা জানু বেড়া ছেড়া কাপড়েতে, কুটি কুটি করা কাপড় গায়েতে!
হাতে শুধু ঘটী এনেছে একটি, কিছুই চাহে না চা'ল চায় দু'টি।
অনাহারে তার শুকায়েছে মুখ, জানে না, তোমরা পেয়েছ কি সুখ।
তেল নাই মাথা ভূতের মতন, কদাকার কায়া দেখিতে কেমন।
কথা কয় ঠিক পাগলের মত, কত জনে তাকে গালি দেয় কত!
কর জোড়ে কহে,করি বড় আশা,"বাবা দুটি চা'ল,একটি পয়সা?"
বালক বালিকা নিদয় হ'ও না, কটু কথা কভু উহাকে ব'ল না।
দেখে রেখ চিনে,মনে রেখ আর, ক'জন ভিখারী পাড়ায় তোমার।
শুধাইও দেখা যখনি পেয়েছ, 'এখন তোমরা কেমন রয়েছ?'

ভোর বেলা।

ঘোর ঘোর ভোর বেলা দোর খুলে দেও,
গায়েতে কাপড় দিয়া বাহিরেতে যাও।
ঝির ঝির করি বয় কেমন বাতাস,
দেখিতে দেখিতে হ'ল ফরসা আকাশ।
কাননে কাননে কত পাখী করে গান,
দুলিতেছে ফুল ভরে ফুলের বাগান!
জাতি যূথি জুই যত মল্লিকার কাছে,
সমীর সৌরভ যাচে ফুল বন নাচে!
গুণ্ গুণ্ রবে অলি তুলিতেছে তান,
ফুল কুল মধুকরে মধু করে দান।
লাল মুখে মেঘমালা হাসিছে কেবল,
আকাশে ফুটিল ভানু, সলিলে কমল।

শাখী শাখে শিখী নাচে করি দরশন
রবির নবীন ছটা আঁখি বিনোদন!
গাছ পালা মাঠ ঘাট, জীব কুল যত
দেখায় সকাল বেলা সব হরষিত,
গো মেষ মহিষ গাধা পিপীলিকাগণ,
দেখ ভাই নিজ কাজে করিছে গমন।
মানুষ ঘুমায়ে যদি থাকে হেন কালে,
গাধার অধম তারে বলিব সকলে!

পোষাক।

অমন ক'রে, পোষাক প'রে, গরব ক'রে যেও না,
পাতার রেখা, শিখীর শিখা, পাখীর পাখা দেখ না?
হীরক দলে, মাণিক ফলে সোণার জলে মাখান,
রাজার চেয়ে, মাছির গায়ে, পোষাক দিয়ে, সাজান।
নাইক ঢাকা, পাখীর পাখা, ধুলায় মাখা রয়েছে,
হীরক পাঁতি, তাইতে গাঁথি, জগৎ পাতি রেখেছে!
মণির মালা, আপনি ঢালা, বালক বালা দেখ,
অবোধ যারা, পোষাক পরা, কেমন ধারা শেখ!
ফুলিয়ে বুক তুলিয়ে মুখ, অমন সুখ, ক'র না,
পোষাক প'রে গরব করে, মানুষ তারে ব'ল না।

কি করিব, কি করিব না।

লিখিব পড়িব বালক কালে, শেষেতে সুখেতে থাকিব ব'লে!
আপনার বই আপন কাছে, যতনে রাখিব হারায় পাছে।
মাতার পিতার গুরুর কথা, রাখিব আমার মনেতে গাঁথা।
ফরসা কাপড় বেড়াব প'রে, মলিন বসনে অসুখ করে।
সুশীল সুবোধ দুইটী ভাই, তাদের মতন হইতে চাই।
কাঁদিব না আর খাবার ব'লে, সবাই বলিবে আদুরে ছেলে।

রোদে হিমে জলে যাবনা পথে, খেলিতে খারাপ ছেলের সাথে।
পরের মনেতে লাগিবে ব্যথা, কখনো ক'ব না এমন কথা।
ঢাকিব না আর করিয়া দোষ, কহিব না মিছা করিয়া রোষ।
কাগজ কলম পরের ছুরি, হইব না চোর করিয়া চুরি।

ঈশ্বর।

ভুবন গগন মাঝে আছে এক জন,
দেখিতে না পায় তারে মানব নয়ন।
যে জন গড়িয়া দেহ মায়ের উদরে,
যতনে দশ মাস দশ দিন পরে,
দেখালেন আমাদের জগৎ সংসার,
দেখা নাহি যায় শিশু—কি নাম তাঁহার?

রবি শশী দিবা নিশি উঠিছে আকাশে,
অনিল সলিল বহে যাঁহার আদেশে,
নাসায় নিশ্বাস-বায়ু বহে রাতি দিন,
বিমানে বিহঙ্গ চলে, জলে চলে মীন,
ফুল ফুটে তারা উঠে আদেশে যাঁহার,
দেখা নাহি যায় শিশু, কি নাম তাঁহার?

মাটী ফাটি মাঠে উঠি মাঠময় ধান,
আমাদের তোমাদের দেয় প্রাণ দান,
শরীরে শোণিত বহে—যাঁহার আদেশে,
চ'খে দেখে কাণে শোনে, মুখে কথা আসে,
ঘুমালে নিশ্বাস বহে সুনিয়মে যাঁর,
দেখা নাহি যায় শিশু—কি নাম তাঁহার?

দেখা নাহি যায় কেন, জানি না তা আমি,
ঈশ্বর তাঁহার নাম মনে রেখ তুমি।

স্তোত্র।

নমোনমঃ নারায়ণ করুণা আধার
বারংবার নমস্কার চরণে তোমার।
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগন্ময়,
অচ্যুত সচ্চিদানন্দ অনন্ত অব্যয়।
অখণ্ড মণ্ডলাকার অখিল কারণ
দীন মোরা জ্ঞানহারা লয়েছি শরণ।
আমরা অবোধ সব মোদের মাধব,
কাণে শোন আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠরব।
সেই নাম শিক্ষা দেও, দেও জনার্দ্দন,
যে নামেতে দিবানিশি মত্ত পঞ্চানন।
এই কর হৃষীকেশ চরাচর পিতা,
দিবা নিশি পড়ি যেন ভগবদ্‌গীতা।
এক মনে এক ভাবে এক সুর তুলি,
গাব তব নাম গান সব কথা ভুলি।
শুনে যারে কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর,
আমাদের হরি নাম মধুর মধুর।
হরি হরি বলি দেও করতালি ভাই,
হরি বিনা আমাদের আর গতি নাই।
তাঁর গলে নানা ফুলে মালা গাঁথি দিব,
শ্রীতক চরণে পড়ি পদ ধুলি নিব।

কোথা হরি এস হরি কাঙ্গালের হরি,
জগতে দেখাব মোরা হরি নাম করি।
হরি পিতা হরি মাতা হরি সব ধন,
আমাদের হরি নাম অমূল্য রতন।
শুনে যারে কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর,
আমাদের হরি নাম মধুর মধুর!
হরিবোল হরিবোল সবে মিলে বলি,
করিলে অভয় নাম ভয় যাবে চলি।
ভক্ত জনে এই খানে হরি নাম গায়,
শুনে যারে পাপী তাপী আয় আয় আয়।
সংসারে কর্ত্তব্য কাজ করিয়া সবাই,
চিরদিন যেন মোরা হরি নাম গাই।
ইউরোপ আমেরিকা, দেখে যারে আয়,
আবার ভারতবাসী হরি নাম গায়।
শুনে যারে কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর,
আমাদের হরি নাম মধুর মধুর!

দেও হে দেখা, রাখাল সখা, কাঙ্গাল সকলে,
ভরসা রাখি, কমল-আঁখি, চরণ-কমলে।
আমরা অতি, ছিন্নমতি, ভজন জানি না,
আপন গুণে, বালক গণে, দেওহে করুণা।
চরণ ধরি, দয়াল হরি, পাপের বাসনা,
হয়না যেন, হয় হে যেন চরণ ভাবনা।
এ সংসারে, তোমার তরে, কর্‌ব সাধনা,
হয় না যেন, বিমল প্রাণে, ভোগের কামনা!

দেওহে শুদ্ধি, জ্ঞান বুদ্ধি, বালক সকলে,
ত্রাসে মরি হে কাণ্ডারি, তরাও অকুলে।
অবোধ মোরা বুদ্ধি হারা রাঙ্গা চরণে
লইনু শরণ, বংশীবদন, জীবন মরণে।
শান্ত কর, দুঃখ হর, মাধব-মুরারি,
কাঙ্গাল-সখা, দেওহে দেখা, আমরা তোমারি।
বারেক এস, ভাল বেস, যেমন সে কালে,
বাসলে ভাল, আপন বলে, ব্রজ-রাখালে।
এই মিনতি, হে শ্রীপতি, তোমার চরণে—
দেখব তোমায়, দীন-দয়াময়, জীবন মরণে।

প্রহেলিকা।

(১)

বন হতে, শীকার কোরে, স্নান করান চাই,
লেজটি কেটে পেটটি চিরে খাবার পুরে খাই।
(উত্তর—পানের খিলি

(২)

তিল ফুল জিনি নাশা রাম রম্ভা উরু,
মাথায় পড়েছে টাক কেশ হীন ভুরু।
হাত দিয়ে ঢেকে রাখে সাত হাত নাক,
ঢাকতে ন পারে দাঁত, হয়েছে অবাক্।
কোল্‌কেতায় না পাই খুঁজে এই বেটাকে,
কহ ত সুবোধ শিশু এই বেটা কে? (হস্তী)

শুক্রাচার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য।

সর্ব্বাগ্রে প্রাণরক্ষা করা আবশ্যক, পরে অন্য কাজ।—

প্রাণোহি ভগবান্ ঈশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ,
প্রাণেন ধার্য্যতে লোক সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।

প্রাণই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, প্রাণই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া আছেন। সমস্ত জগৎ প্রাণময়।

শ্বাসই প্রাণ; শুক্রক্ষয় করিলে এই প্রাণ সুদীর্ঘ ও সুস্থির হইবে না। 'শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ' শুক্রধাতুই প্রাণ, শুক্রক্ষয়ে ওজঃ বা জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়, শিরঃপীড়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ক্ষয়রোগ ও হৃদ্‌পিণ্ডের পতন অজানিত ভাবে আরম্ভ হয়। শুক্রধাতু রক্ষা করিলে বীরত্ব মহত্ত্ব সাহস ও সত্ত্বগুণ জন্মে। পালোয়ানেরা শুক্র রক্ষা করেন।

চৈতন্য-সমুদ্রে শ্বাস-বায়ুর হিল্লোলে বাসনা বা চিন্তা-তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। "নাচিছে নয়ন তাল-বেতালে, নাচায়ে কামনা-কামিনী দলে!" তাই শ্বাস ও নয়ন স্থির করিতে অভ্যাস করাই ব্রহ্মচর্য্য, ইহার জন্যই সংযম-নিয়ম।

তমোগুণের মধ্যে, চিত্তরোধ করিলে কাঠ পাথর হইতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যে সত্ত্বগুণে মনঃস্থির করিলে ব্রহ্মভাব পাওয়া যায়। সর্ব্ব-ব্যাধি ও শোকতাপ-দুঃখ নির্ম্মূল করিতে ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইহাই ধর্ম্মের ভিত্তিমূল।

ব্রহ্মচর্য্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যই অধিক সেব্য, অন্য দ্রব্যের স্বল্প ব্যবহার ভাল। ঘৃতাতপ ও আমলক ভোজন, ঘৃতদীপের ঘ্রাণ গ্রহণ, ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ু সেবন, রাত্রিকালে লঘু ভোজন,

মাসের মধ্যে দুই দিন বা একদিন শুক্র ক্ষয়, একাকী কম্বলে শয়ন, সহধর্ম্মিণীকে সযত্নে ধর্ম্মশিক্ষাদান ও বস্ত্রালঙ্কার দানে সন্তোষ বিধান, ধাতুক্ষয় মাত্রেই স্নান বা সপ্তবার মস্তক ধৌত করণ, স্নিগ্ধ তৈল মর্দ্দন, বলকারক দ্রব্যভোজন, উষ্ণদুগ্ধে গব্য ঘৃত দিয়া পান, চা-পান, অভাবে গরম জলে শর্করা দিয়া পান—এইগুলি গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যের অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম।

আমেরিকার এক বুদ্ধিমান গ্রন্থকার এই 'শুক্রসংযমের' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার পুত্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। পুত্রগণকে এই শুক্রসংযমের উপকারিতা শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার অবশ্য-কর্ত্তব্য। না দিলে "পিতা শত্রুঃ মাতা বৈরী" হইয়া থাকেন। রাজা হংসধ্বজ শুক্রক্ষয়কারী পুত্র সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শুক্রক্ষয়েই পাণ্ডু রাজার পতন হয়। স্বেচ্ছাচারী শুক্রক্ষয়কারী মানব পশুর অধম। তাই ধর্ম্মের প্রারম্ভেই সংযম। সংযম হীন যে ধর্ম্ম সাধন, তাহা "অবলার রোদন" মাত্র।

দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র সমস্ত রেখেছি সাথে,
পড়িয়া মরেছি ঘুরে বেদবেদান্তের হাতে।
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত করেছি মীমাংসা কত,
সংসার পরশে পুনঃ হয়েছি পাগল মত!
ছিল সে শাস্ত্রের জ্ঞান ভক্তির নয়ন-নীর,
ছিল না সে ব্রহ্মচর্য্য—"শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির"!
বেদান্ত চিত্রিত ফুলে ভ্রমর গুঞ্জর শুধু,
শ্বাস স্থিরে দৃষ্টিস্থিরে মন স্থিরে পায় মধু!

———

অতিরিক্ত পত্র।

আমাদের গুরুমতী বা ফুণু।

(তমালিনী দেবী রচিত)

ফুণু-মা মানুষ নয় স্বর্গের দেবী সে হয়,
তার গুণ এ জিহ্বায় কি বা আমি কহিব ?
সত্ত্বময়ী ছিল কত ! সদা চিত্ত উপরত
সে রূপ বৈরাগ্য ব্রত আর কার দেখিব ?
সাধারণে সবে কয়— সে ত মা মানুষ নয়,
ফকীরের স্ত্রীর-রূপে কোন্ দেবী এসেছে ?
আহা কোন্ সুকৃতিতে, এত ধন্য "সামন্তীতে"
আস্তিকে নাস্তিকে মিলে তার যশঃ গেয়েছে !
দোষ করি অতিশয় প্রকাশিয়া ক্ষমা চায়,
তার মত সদাশয় আর কেহ আছে কি ?
অত্যন্ত দুষ্টুর শেষ— তবু কেন "বেশ বেশ" ?
দস্যু রত্নাকর মোর হয়েছিল বাল্মীকি !
তুচ্ছ করি দেহ ধামে, চীর মাত্র পরিধানে
সামান্য আহার পানে কোনরূপে বেঁচেছে,
অমন বালিকাকালে, কে তারে মানুষ বলে
কি গুণে বা সেই স্থলে দেবী নাম কিনেছে !
পিতৃহীনা মাতৃহীনা বাছা মোর উদাসীনা
অল্প বয়সে নানা মনঃক্লেশ পাইল,
পাষাণ বাপের বেটী পুড়ে সোণা হ'ল খাঁটি,
সংসারের আঁটা আঁটি—ধার নাহি ধারিল !
দেখি তার দীন বেশ, তবু গো ছিলাম বেশ,
হৃদয়ের দুঃখলেশ তাতে আর ছিল না, ;
সোহাগে বকেছি কত ! সে মোর ভাইঝি হত,
মুখপানে চেয়ে রত সাড়া মোরে দিত না।

উজ্জ্বল তারার মত বড় বড় চোখ দুটি,
গম্ভীর মুখের ভাবে সাত্ত্বিকতা জাগিত,
জ্ঞানময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী তেজোময়ী শান্তিময়ী—
যে ভাবে যে নাম বল সবি তারে সাজিত!
নীচাশয় কোনো লোকে কভু বা বলিত তাকে,—
"কালো মেয়ে খ্যাঁদানাকে এত জাঁক কিসে লো?
গরিব বাপের বেটী, বেড়াবি সংসারে খাটি,
থাকিবি হইয়া মাটি, তোর কেন এত লো?
মালাপরা মাথা নেড়া, আচার বিচার করা,
শুচি-বাই ড্যাক্‌পড়া, হরিনাম করা লো?
ছুঁড়ী নয় পাকাবুড়ী ধরেছে বগুনা-বেড়ী!
সেজেছে ভেকের নেড়ী, লাজে ম'রে যাই লো!
'ভাচা-বাড়ী' দিলে ধান দুই শলি পরিমাণ
আতপ চাউল তায় কত কটি হবে লো?
তুষ কুড়া বা'র ক'রে দাঁড়াবে সতের শেরে,
কেমনে শ্বশুর তোরে এ ভাত যোগাবে লো?
ঘৃত দুগ্ধ ঘুঁটে কাঠ, পৃথক সকল ঠাট্,
কোথা থেকে এত নাট? কারে দেখে শিখিলি?
পিসী ত উষ্‌ণ-খেকো, তারই ভাইঝি যে গো?
দেখে হেসে মরি মা গো, জ্ঞান নাহি করিলি?
পিসীর সুধারা কত বড়ী-মুড়ী-গুড় রত,
ঠিক আমাদের মত উঁচু কথা কয় না,
হড়র্ বড়র্ করে, কেমন মানায় তারে!
সদা মালা ঝুলি ধ'রে তোর মত রয় না!"

এই ভাবে তার প্রতি শিখাইতে রীতি নীতি,
জিহ্বাতে কোনো বা সতী সরস্বতী বসা'ত,
তখন উদাস প্রাণে চাহিত আকাশ পানে—
মরমের ব্যথা বুঝি বিধাতারে জানাত ?
জ্ঞান নাই বুঝিব কি, মর্ত্ত্যের মানুষ সে কি ?
ভোগ-বিলাসের বাকি আছে কি গো তাহাতে ?
তাই কি রে তার প্রাণ খুঁজিবে আহার পান ?
স্বার্থ-চিন্তা সদাধ্যান করিবে কি জগতে ?
তার সেই মহা প্রাণ কারে যে করিত ধ্যান,—
কেবা সেই বলবান্ যাঁর বশে ফিরিত ?
কেন সেই ছোট মেয়ে, ঠাকুরের ঘরে যেয়ে,
আকুল ব্যাকুল হয়ে, ভূমে পড়ি কাঁদিত ?—
অগাধ জলের মীন ডাঙ্গায় উঠিয়ে ক্ষীণ—
সেই রূপ দিন দিন ধড়-ফড় করেছে !
সংসার তাপেতে মরি না পেয়ে শান্তির বারি,
ভব-লীলা সাঙ্গ করি, আহা প্রাণে বেঁচেছে !

নিভাননী দেবী।

(তমালিনী রচিত)

নিভাননি স্বর্গফুল ! তুলনায় নাহি তুল,—
এ মর জগতে তব নাহিক তুলনা,
শাপ-ভ্রষ্ট এসেছিলে দিন কত ফুটে ছিলে,
হাসিলে ছলিলে শেষে করিলে ছলনা।

কোথায় গিয়াছ তুমি, খুঁজিয়া না পাই আমি,
সোণার প্রদীপ আজ নির্ব্বাণ হয়েছে,
বহিয়াছে দুঃখ ঝড় ডাকে মেঘ কড়্ কড়্
এ ভব সংসার-ঘর আঁধার করেছে!
সোণার পিঞ্জরে ছিলে কত পোষ মেনেছিলে,
তবে কেন উড়ে গেলে অনন্ত আকাশে?
নবীন বয়েস্ কাঁচা ভাঙ্গিলে সোণার খাঁচা?
ক'দিন রহিলে বাছা এ ভব-প্রবাসে?
ছিলে বড় সুপণ্ডিতা, অন্তরেতে জ্ঞান যুতা,
ছাড়িলে ভবের সত্ত্বা সত্বর সত্বর,
আসিয়ে ভবের মেলা পাতিয়ে সংসার খেলা,
না পাইতে দুঃখজ্বালা হইলে অন্তর!
খুকীরে তোমার তরে, কেন নাহি যাই ম'রে?
আবার সংসার ঘরে কোন প্রয়োজন?
আবারো এখন প্রাণ করিছে আহার পান?
মুখে মাত্র শোক ভান্ ধূর্ত্তের মতন!
ভাবি তাই নিরবধি এই কি জননী হৃদি?
কি দিয়ে করিল বিধি এমন নির্দ্দয়?
জগতে এমন কেহ দেখেছে কি মাতৃস্নেহ?
এই ত অমৃতে ঠিক গরল উদয়!
করুণা-আধার-ভূত স্নেহ বারি-রসে প্লুত
সতত সন্তান-গত মায়ের অন্তর,
বিধাতার শ্রম পণ্ড একি গো পাষাণ খণ্ড?
বিদ্ভুত এ কি কুকাণ্ড গড়েছে ঈশ্বর?

মনোমলে লিপ্ত গা, এই কি নিভার মা ?
কেমনে এমন রা প্রচারিত হয়েছে ?
ছি ছি গো বলিতে ঘৃণা, রূপে গুণে লক্ষ্মী সমা,
কেমনে সে অনুপমা, মা, মা, বলি ডেকেছে ?
নিভা রে আয় গো ফিরে, দেখে যা মাথার কিরে !
আছি গো জীয়ন্তে ম'রে, শোকে দেহ জেরেছে,
বিনা এক-আত্মা-প্রাণ কে শোনে এ শোক-গান,
অনুভূতি-অশ্রু জল কয় জনে ফেলেছে ?
পতি-ভক্তি-জ্ঞানে ভারী 'ছিল তোর দেহ-তরী,
দিন কত পা'ল তুলি সুবাতাসে চলিল,
মাঝি বড় হাবা ছেলে চড়াতে বাধিয়ে দিলে !
সোণার তরণী খানি চুর-মার হইল !
তরীর বিপদ দেখি, মাঝিও দিল রে ফাঁকি !
অসময়ে তার খোঁজ কিছু নাহি করিল !
নেয়ে পানে চেয় চেয়ে তরী খানি রয়ে রয়ে
কালের অতল জলে ধীরে ধীরে ডুবিল !
ঘুচাব দুঃখের বা, সাজাব নূতন না,—
মাঝি বুঝি মনে মনে এই আশা করেছে !
শোন্ গো অবোধ নেয়ে, কোথা পাবি হেন মেয়ে ?
পতি-নিন্দা শুনি যার দেহ-মন কেঁপেছে !
টাকা কড়ি সোণা দানা, সদাই করিত 'না, না—'
লজ্জায় নমিত মুখ ভয়ে ভয়ে রয়েছে,
পতি-নিন্দা করে কেহ, ত্রাসে কাঁপিত দেহ,
কতই উপমা দিয়ে পতি গুণ গেয়েছে !

এমন বা কে করিল ?— কি করিয়ে কি হইল !

নিভা রে, মরিলি তুই, আমারেও মারিলি,

জীবনের সুপ্রভাত ফুটেছিলি পারিজাত,

হয়নি মধ্যাহ্ন তাপ,এখনই ঝরিলি ?

বাড়ীর সরেস শোভা তুই গো আমার নিভা !

নিবেছে সকল প্রভা, আঁধার এখন !

আর যে ক'দিন বাঁচি জীবন্মৃত হয়ে আছি !

টিপি-টিপি-মিটি-মিটি প্রদীপ যেমন !

তোমারে ছেড়ে কি ক'রে,— সদাই মরমে ম'রে,—

তোমার সে ছোট মেয়ে বাঁচিবে 'কনক' রে ?

দয়াময় নাম ধ'রে ডেকেছিলে তুমি যাঁরে,

তিনিই রাখুন তারে—ভবের রক্ষক রে !

হাতে হাতে সঁপে মোরে দিয়ে গেলে সকাতরে,

রাখিতে নারিনু তব অন্তিম বচন রে,

জন্মদাতা পিতা তার, তা হ'তে কে আপনার ?

জোরের জিনিষ যার লইল সে জন রে !

নানা মতে শিক্ষা পেয়ে হয়েছিলে জ্ঞানী মেয়ে,

এবে ভাল শিখাইয়ে গেলে বা কোথায় রে,

হায় রে অন্ধের মত খুঁজিতেছি অবিরত,

আর কি হবে না দেখা তোমায় আমায় রে !

বসরা-গোলাপ মত মুখের সৌন্দর্য্য কত ?

আনত বদন খানি,—কত শোভা অধরে ?

করিতে যে অভিমান, ধেয়ে যেয়ে চুমিতাম,

সযতনে রাখিতাম হৃদয়ের উপরে !

নিভা রে আমার মেয়ে, কোথায় রয়েছ যেয়ে ?
কে আছে আমার চেয়ে, করিবে যতন রে ?
তবে কি আনন্দে ভেসে রয়েছ পিতার পাশে ?
যে দেশে দেবতাদের শান্তি-নিকেতন রে ?
স্বপথে স্বস্থানে গেছ, স্বধামে স্বপদে আছ,
পার্থিব মাতার কথা কিছু মনে রাখিও,
জননী-জঠরে ছিলে, এ ভারতে এসেছিলে !
"জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি" জানিও।
কিন্তু রে হ'তেছে সাধ, ধর মাতৃ আশীর্ব্বাদ,—
হরিপদ-কমলের জ্ঞান-মধু খ'ইও,
যেন সে স্মৃতির পটে, বিস্মৃত নাহিক ঘটে,
যেন হেন জীব-ঘটে আর নাহি আসিও !
আর তোরে না ডাকিব, আর তোরে না ভাবিব,
সংসারে জড়ের মত ক'টা দিন কাটাব !
যবে গো চৈতন্য হবে, চৈতন্য-ময়ী মা তবে,
অপরূপ রূপ তব হেরে প্রাণ জুড়াব !
এস মোর "পুটু, নরু" করিগে সংসার সুরু,
আমার যে হরি-গুরু কিছু নাই আর রে !
তোমাদের মা, মা, বুলি, শুনিলে সকলি ভুলি,
অপার অতল মাতৃ স্নেহ-পারাবার রে !

তমালিনী (বা গোপালী) বিরচিত
মাতৃস্মৃতি গীত।

যোগমায়া এসেছিলেন হরিভক্তি বিতরণে,
তাই, দেখাইলেন নিজশক্তি, পবিত্র, ত্রিবেণী সঙ্গমে।
মা নয় গো তুই মহামায়া, আচ্ছাদিয়ে নিজ কায়,
শিখাইতে ভক্তি দয়া, এই অকৃতি অধম সন্তানে।
পুরাইতে মনস্কাম, বরদা সুন্দরী নাম,
শিখাইলে রাধাশ্যাম—যুগল মন্ত্র উপাসনে।
সদা, অনিত্য সংসারে ভোর, কন্যা যোগ্য নই মা তোর,
তাই, কই মা করি করযোড়, রেখ বরদা অভয় চরণে।
শক্তিরূপা হয়ে এলি, কেন শক্তি দিতে ভুলে গেলি?
আমায় নিঃশক্তি কেন করিলি ভজিতে তোর শ্রীচরণে?
পতি বিয়োগ, মাতৃ বিয়োগ, ম'লাম ম'লাম কি ভবরোগ,
ঘুচিয়ে দে মা এ কর্ম্ম ভোগ, নইলে যোগ হব কেমনে?
সবে কয় মা শিবের উক্তি, ব্রহ্ম জ্ঞানেও মহামুক্তি,
আমার যে তা নাইমা শক্তি, কালোভাল লেগেছে মনে।
দেখিস যেন রাখিস স্মরণ, পাই যেন মা গুরুর চরণ,
গোপালীর তোর এই নিবেদন, প্রয়োজন নাই অন্যধনে।
আমার এ নব কলি, দিলাম তোমায় পুষ্পাঞ্জলি,
খেপা মেয়ে তোর গোপালী, কাল কাটায় আনন্দ মনে।

গোপালের দর্শন প্রার্থনা। [তমালিনী-রচিত]

কোথা মোর প্রাণধন নন্দের নন্দন,
দয়া করি এ দাসীরে দেও দরশন।
পাপিনী তাপিনী আমি অনাথা রমণী,
জগতের নাথ কৃষ্ণ দেখা দেও তুমি।
তোমার ত্রিভঙ্গ ঠাম কেমন সুন্দর,
ধারণা করিতে নারে অবলা অন্তর;
আকুল ব্যাকুল হই তোমারে হেরিতে,
এস বাপ, দিন গত, খুঁজিতে খুঁজিতে!
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, যশোদার কানু,
দাঁড়া দেখি বাঁকা হয়ে, বাজা দেখি বেণু!
দোলায়ে ময়ূর পাখা চূড়ার উপর,
কত যে তরালে বাপ আমি হ'নু চোর!
চরণে চরণ থুয়ে, বামেতে হেলিয়ে,
দাঁড়াও কদম তলে আমার হৃদয়ে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে, বনমালা গলে,
রতন নূপুর বাজে শ্রীচরণ তলে।
নাচ আসি কালশশী, সমুখে আমার,
বামনের আশা যেন চাঁদ ধরিবার।
জানিরে অন্তর মোর হিংসা বিষে জরা,
কেমনে দাঁড়াবি সেথা ওরে মনোচোরা।
কিন্তু বাপ বৃন্দাবনে কালিন্দী মাঝার
কালকূট বিষধরে করেছ উদ্ধার!

ধন্য ধন্য নাগজন্ম সার্থক তাহার,
কি গুণে পাইল রাঙ্গা চরণ তোমার।
ভরসায় ডাকি তাই আয়রে গোপাল,
মনে হয় তুই মোর দুধের ছাওয়াল।
ধ'রে আনি বেন্ধে আনি যথা ইচ্ছা, ক'রি,
বুকের মাঝারে রেখে চাঁদ-মুখ হেরি!
হাতে নাহি পাই তোরে, বড় ক্ষোভ হয়,
আশায় হতাশ হয়ে শেষে হয় ভয়।
ভব-ভয় ঘুচাইতে আর কারে ডাকি?
কোলে আয়, কালরূপে আলো ক'রে রাখি।

শ্রীবৃন্দাবন গমন প্রার্থনা।

তমালিনী-রচিত।

বড় আশা মনে, যাব বৃন্দাবনে, সঙ্গী না পাইনু কেহ,
বৃন্দাবনেশ্বরি, চাহ কৃপা করি চরণ নিকটে লহ।
ঘর দ্বার পুত্র প্রতি, সতত আসক্ত মতি,
কি মতে কাটিব মায়া-পাশ?
যদি মোরে দয়া কর, বন্ধন ছেদন কর,
বিষয়-বাসনা কর নাশ!
অনিত্য সংসার-মদে ডুবিতেছি পদে পদে,
বিপদে পড়িয়া তোমায় ডাকি,
ব্যাকুলিত বড় প্রাণী, দয়া কর রাধারাণী,
তব পদে যেন মতি রাখি!
ভেঙ্গেচে কপাল বিধি মিলাইতে তোমা-নিধি,
না বুঝিয়া পাঁকে ডুবে মরি,

অহো কি দুর্দ্দৈব মোর, কন্যা পুত্রে হৈনু ভোর
তোমা লাগি যতন না করি!
কবে বৃন্দাবনে যাব, সে পুরি দর্শন পাব,
ভাগ্যের উদয় কবে হবে!
কুঞ্জ মাঝে রত্নাসনে হেরিব সে তোমা ধনে,
যুগল চরণে মতি রবে!
শুষ্ক দেহ মরুভূমে কৃষ্ণপ্রেম প্রস্রবণে,
সিক্ত যদি করিবারে পার,
তবে সে জানিব আমি করুণাময়ী গো তুমি,
রাধে রসময়ী নাম ধর।
ভাগ্যবন্ত মহাজনে, নির্জ্জনে বহু সাধনে,
হৃদয়ে স্থাপিলা কৃষ্ণ রাধা,
আমি অন্ধ, জ্ঞান নাই, রতন খুঁজিতে যাই,
উলটি লাগিল মনে ধাঁধা!
যোগমায়া পৌর্ণমাসী, মোরে কৃপা কর আসি,
দেখাও রাধা কৃষ্ণ-নিলমণি,
বৃন্দাবনে কি যাবি লয়ে, তুইগো পাষাণীর মেয়ে,
সেই ভয়ে ভীতা তমালিনী।

জন্মস্থান দর্শন।

তমালিনী-রচিত।

দেখিনু আবার নলডাঙ্গা রাজধানী,
দেখিনু আবার সুখময় জন্মভূমি!
না দেখাত ভাল ছিল, দেখে একি কাল হ'ল?
নীরস নয়নে পুনঃ বারিধারা ঝরিল!
শোকের সাগরে ফিরে ঝড়বায়ু বহিল!
সেই ত তটিনী কূলে, সেই তরু ঝাউমূলে,
সেই "বাবা গুরুনাথে" হেরে প্রাণ কাঁদিল!
এ শ্মশান-শিব কাছে, বাবা দাদা মোর আছে,
তবে কেন মাতা মোর ত্রিবেণীতে রহিল?
জানি তুমি বিশ্বনাথ, সকলি তোমার হাত,
সম্ভব বা অসম্ভব সকলি ত তোমাতে,
তবু হই দিশাহারা, শোকে প্রাণ মাতোয়ারা
তুমি ত আনন্দে ভোরা আছ নিশি-দিবাতে;
ঢুলু ঢুলু দু'নয়ন, সদা প্রেমে নিমগন,
ববম্ ববম্ বম্—বাজাইয়া রঙ্গে,
হয়েছ পাগল ভোলা, হরিপ্রেমে হরিবোলা,
সিদ্ধদেহ প্রেতগুলা ফেরে তব সঙ্গে!
তাই বলি বড় খেদ— সাজাইলে নর-প্রেত,
মায়া-পিশাচীরে মোর সঙ্গে দিলে গাঁথিয়া,
এ ভব-শ্মশানে ফিরি, নাহি ভজি হর হরি,
পিশাচীর কড়মড়ি দেখি ভাল বাসিয়া!

শুন, দেব তাই বলি, আপনার বোল বলি,
উচ্ছ্বাস-কবিতা-কলি দিব গলে গাঁথিয়া,
নাহি ভাল মন্দ জ্ঞান, চন্দন বিষ্ঠা সমান
শুনেছি তোমার, তাই আছি আশা করিয়া!
কি বুঝিব আমি নারী, এতে কি যে কারিগিরি?
অবোধেরে এই লীলা কৌশলেতে দেখালে!
গুপ্তনাথে আছে পিতা, সুরধুনী তীরে মাতা,
শিবগঙ্গা-একত্রতা এই তত্ত্বে বুঝালে!
খুলিয়া স্মৃতির পট নলডাঙ্গা-ঘাট পথ,
হেরি যবে নেত্রে আমি ব্যাকুলিত প্রাণে রে,
সেই বেগবতী-কূলে, সেই বাগানের ফুলে,
সেই তরুরাজি-দলে, কত সুধা ঢালে রে!
সেই সঙ্গিনীর দলে, সেই মন প্রাণ খুলে,
কহিয়াছি কত কথা, মনে পড়ে যখনে
কেমন হইয়া যাই, যেন কূল নাহি পাই,
ভাবের আবেশে ঝরে ধারা দুই নয়নে!
যেই খানে স্নেহ নীড়ে পালিতেন ধীরে ধীরে
পরম যতনে মোরে জননী আমার রে,
রাখিতেন সদা কোলে স্তন দানে কুতূহলে,
ছুটিত হৃদয়ে তাঁর প্রবাহ সুধার রে!
না হেরি কন্যার মুখ, তিলেকে ফাটিত বুক,
খুঁজিয়া ধরিয়া মোরে কোলে তুলে লইয়া,
বলিতেন মা-জননী, যেন মণিহারা ফণী,
এত ক্ষণ উমাগিনি কোথা ছিলি ভুলিয়া?

খেতে নাহি চাহিতাম, ক্ষুধা পেলে কাঁদিতাম,
অভিমানে মার পানে ছল ছলে চাহিয়া,
অমনি খাবার আনি, খাওয়াইয়ে মা জননী
দিতেন অঞ্চলে করি মুখ খানি মু'ছিয়া !
কখনো শৈশব বেলা, করি নাই ধূলা খেলা,
রাঁধা-বাড়ী ভাত-ঢালা মৃণ্ময় বাসনে,
সতত পোষাক-পরা দাদাদের হাত-ধরা,
জ্ঞান আলোচনা করা শিখিতাম যতনে !
রামায়ণ ভাগবত, মুখস্থ মহাভারত,
সংস্কৃত মেঘদূত দাদা মোরে পড়া'ত,
সহপাঠী যত জনা কেহ নয় মোর সমা,
দ্বিতীয় এ রমা বাই, লোকে মোরে কহিত !
লেখাপড়া জানা মেয়ে, হবে কি সাহেবে বিয়ে ?
প্রতিবেশী যত মেয়ে, হেসে মাকে সুধা'ত,
কিংবা জজ্ মাজিষ্ট্রেটে, উকিল সে হাইকোর্টে
এ মেয়ে পছন্দ বটে,—কা'কে দেবে, বল ত' ?
সেই ত সোহাগে মেয়ে, দিলেন উকিলে বিয়ে,
সেই বড়দাদা নিয়ে বড় আশা করিয়ে,—
দিন দুই গেল ভাল, ছেলেপুলে দুটী হ'ল,
সেই লীলা সাঙ্গ হ'ল,—সব গেল ফুরায়ে !
থাক্ সে দুঃখের কথা, হৃদয়েতে গুরু ব্যথা,
আশ্রয়-বিহীনা লতা পড়িল রে লুটায়ে !
আর ত এখানে নয়,— বিধি তুই নিরদয়,
কি আশায় ধরাধামে রাখিলি রে বাঁচায়ে ?

বৃথা এই দেহ ভার, কেন বা বহি রে আর ?
এ ছার দেহের তরে পাই এত যাতনা,
যেই জন এ নয়নে পরাইল জ্ঞানাঞ্জনে,
কেন সেই মহাজনে ভবে সদা ভাবি না ?
কি ভীষণ এ সংসার, এ নির্ম্মম অত্যাচার,
যত স্মরি তত জ্বলি, তবু কেন বুঝি না ?
অখণ্ড-মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত যেই চরাচরে,
সেই প্রেম-পারাবারে কেন ডুবে থাকি না ?
লুকায় মনের ভ্রান্তি আহা সে উজ্জ্বল-কান্তি
গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি মনে পড়ে যখনে,
সুধা-ধারা প্রাণে বয়, চিত্ত হয় শান্তিময়,
আত্মা পরমাত্মা যোগ হয় বুঝি তখনে !
আবার সংসারে ফিরি মহা কোলাহল করি,
কা কস্য পরিদেবনা,—বলি সদা মানবে,
যে গেছে সে গেছে চলি, কেন প্রাণ ঢালাঢালি ?
যতনেতে যাও ভুলি, মনে করি কি হবে ?
হিংসাদ্বেষ রাগে রত কেবল ভূতের মত
থাই থাই শব্দে ফিরি ভূমণ্ডল মাঝারে,
কভু হাসি কভু কাঁদি, কভু বা কোমর বাঁধি,
এ কি রঙ্গ ? এত ব্যঙ্গ কেন প্রভু আমারে ?
গিয়াছেন মাতা পিতা, কে দেয় শিক্ষা-সমতা,
কে বুঝে ব্যথীর ব্যথা, কয় জন আছে গো ?
এবে সেই নলডাঙ্গা, লাগে যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
আর সবে দেখে রাঙ্গা, আমি নাহি দেখি গো !

আছে সেই বড়দাদা, এখনও নামজাদা,
কিন্তু সে অন্তরে সাদা আর তাঁর নাই গো,
গেছে সে সুখের দিন, তাঁরও বুকে ক্ষত-চিন,
শোকের কালিমা ঢালা, দেখিতে যে পাই গো!—
ভূতলে অতুল খ্যাতি, গিয়াছে সে ভগ্নীপতি,
নাই সে স্নেহের ভাই চিকিৎসক যিনি গো,
নাই সে দেহের আভা, গিয়াছে 'বিজলী-প্রভা'
প্রাণ-সমা কন্যা তাঁর, জীবন্মৃত তিনি গো!
ঈশ্বরের একত্রতা, ভাই-ভগ্নী বিভিন্নতা
কভু নয়,—তারে গাঁথা আছি থাকি যেখানে,
যে দিকেতে পড়ে টান, ব্যথা হয় সেই স্থান,
অমনি সকলে আসি হাত দেয় সেখানে!
যে যা করি আড়-যুড়া, সে ত লয়ে টাকাকড়ি,
সে ভাসা বিষের হাঁড়ি ভাঙ্গি যদি যতনে,
থাকিবে না সে জ্বলন, দোখাব রে মূঢ় মন,
এক বৃন্তে দুলি সবে সোহাগের পবনে!
বিশ্বনাথ তুমি ভোলা, বল কিসে যায় ভোলা?
এ গূঢ় অন্তর জ্বালা কত দিনে ঘুচাব?
কত দিনে নিত্যধামে বসিব পতির বামে,
যুগল চরণে তব যুগলেতে লোটাব!
সেই জপ সেই ধ্যান, সেই মোর বুদ্ধি জ্ঞান,
আর কিছু আশুতোষ নাহি আমি চাহি গো,
যে পায়ে ঠেলেছ মোরে, সে পদ ধরিতে জোরে
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর শক্তি যেন পাই গো।

সুধাকর গ্রন্থাবলী, সপ্তম ভাগ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

অসাধারণ প্রেম-প্রতিভা

উপন্যাস।

"এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ,—
তবে কেন এত আশা, ভালবাসা কি কারণ?"

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
আনন্দাশ্রম—বৰ্দ্ধমান।

কলিকাতা—২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত।

৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত-প্রেস ডিপজিটরি হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সুধাকর গ্রন্থাবলীর সমস্ত পুস্তক

প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকারের উপরি উক্ত ঠিকানায় এবং ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস
ডিপজিটরি ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ। ১৩২১।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

পরে এক দিন রাত্রিকালে তিন ভ্রাতা মাতৃ-সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ-কথা বলিতেছেন, গুরু-মা কন্যাস্বরূপা সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে তিনি স্বহস্তে পুরি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সেই পুত্রকন্যাগণকে সম্মুখে বসাইয়া ভোজন করাইলেন।

আহারান্তে সত্য-মা বলিলেন, হরি, সুধাংশুর বিবাহের কি হ'ল?

শান্তি বলিলেন,—তাইত মা, সুধাংশুর যে ছবি ও হাতের হীরকাঙ্গুরী রাখা হয়েছিল, তা কি মেয়ের বাবাকে দেখান হয়েছে?

গুরু-মা বলিলেন,—হঁা তা হয়েছে। কিন্তু সুধাংশুর মত হচ্চে না। কত মেয়ে দেখালাম,—সুন্দরী, শান্ত-স্বভাব, লেখা পড়া জানে, তা সুধাংশুর মত না হ'লে কি ক'রে হবে?

আমি বলি,—বাবা, তুমি এই বিবাহ কর, আমার এখানে থাক, আমি পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সুখে থাকি।

দেবেন্দ্র।—ভাই সুধাংশু, সেইত ভাল, এখানেই থাক, বেশ হবে, আমরা বড় সুখী হব।

হরিদাস।—ভাই, তা যদি হয়, তবে আমরা সর্ব্বদা একত্রে থাক্‌তে পারব। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। ভাই তোমাকে এই বিবাহই করতে হবে। কেন করবে না? আমরা এখানেই তোমার বিবাহ দেব।

সুধাংশু।—ভাই গুরু-মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলে আমিও সুখী হই। তোমাদের কাছে থাকতে আমার বড় ইচ্ছা। কিন্তু দেখ, সেই রাজপুত্রের কথা তোমাকে বলেছি, তাঁর সঙ্গে

আমি বাল্যকাল হ'তে একত্রে থাকি, তাঁকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি আমার বিবাহের চেষ্টা করছেন। তিনি যে পাত্রীর কথা বলেছেন, সে পাত্রী যদি না হয়, তবে আমি গুরু-মায়ের কাছেই থাকব, এই বিবাহই করব।

গুরু-মা বলিলেন,—বাবা, তিনি রাজপুত্র, তিনি তোমাকে এত ভালবাসেন, তিনি যা করবেন, সেইটি ভাল হবে। আহা, সেই বিবাহই যেন হয়! তুমি শেষে বৌমাকে নিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে এসে থেক, তা হ'লেই আমরা সুখী হব।

শান্তি।—আহা তাই হোক, তাই হোক।

সত্য-মা।—তা হলেও আমরা বড় সুখী হব।

দেবেন্দ্র, হরিদাস ও সুধাংশু মাতৃচরণ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া ভগবৎ-কথা আলোচনা করিতে করিতে তিন ভ্রাতা একত্রে শয়ন করিতে গেলেন।

গুরু-মা, শান্তি-মা ও সত্য-মা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আহা, সুধাংশুর সেই বিবাহ হয় ত ভাল হয়; সে শুনেছি রাজ-কন্যার ন্যায় কন্যা, তাতে রাজা বিবাহ দেবেন, সে ত ভালই হবে। তবে সে বিবাহ হ'লে সুধাংশু আর এখন এখানে আসবে না। শেষে যদি বৌমাকে আনে, তবে আমরা দেখতে পাব।

এই বলিতে বলিতে তাঁহারা বিশ্রাম-কক্ষে গমন করিলেন ও ভগবানের নাম করিতে করিতে শয়ন করিলেন।

পর দিন সুধাংশু প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, গুরুমায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃ দ্বয় ও ভগিনী দ্বয়ের সহিত সম্ভাষণ করিয়া স্বগৃহে গমন জন্য যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় কথা।

আদর্শ বন্ধুত্ব।

এক রাজপুত্র ছিলেন, আর এক মন্ত্রীপুত্র ছিলেন। দুই জনে বড় বন্ধুত্ব ছিল। এক দিন দুই বন্ধু অশ্বারোহণে শীকার করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা নব-রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া প্রাচীন রাজ বাটীর নিকটস্থ কমল-সরোবরের ধার দিয়া ক্রমে গ্রাম্য পথে গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়া তাঁহারা এক বিজন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেক ভ্রমণের পরে দুই জনে শ্রান্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং দুই বৃক্ষে দুই অশ্বের বল্গা বন্ধন করিয়া, তটিনীর তটে, নব দূর্ব্বাদলের উপরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

দূর্ব্বাদলের উপরে অর্দ্ধ-শয়নে রাজপুত্র, মন্ত্রী-পুত্রের বক্ষে মস্তক রাখিয়া আরাম লাভ করিতেছেন। তাঁহাদিগের দুইটি সুবর্ণ উষ্ণীশ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-শাখায় বদ্ধ থাকিয়া দুলিতেছে, আর কিরণ ছড়াইতেছে, যেন বৃক্ষের ঘন পত্র রাজি ভেদ করিয়া নবোদিত অরুণ-কিরণ উঁকি দিতেছে। বন্ধুদ্বয়ের কর্ণ-মূলস্থ হীরক-কুণ্ডলের জ্যোতিঃ দুলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, উষ্ণীষের জ্যোতির সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে।

রাজপুত্রের কষিত কাঞ্চন কান্তি শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপরে অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। একে প্রভাকরের ন্যায় মুখ মণ্ডলের প্রভা, তাহাতে মণি মুক্তা বিজড়িত পরিচ্ছদের

শোভা; হস্তে সুবর্ণ বেত্র, পদ্ম-পলাশ নেত্র; অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে হীরক-অঙ্গুরী ঝক্‌মক্‌ করিতেছে! যেন নন্দন-কুসুম তুলিয়া, মন্দাকিনী কূলে বসিয়া, বাসব-পুত্র জয়ন্ত, সখার সঙ্গে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

মন্ত্রী-পুত্রও প্রিয়তম রাজপুত্রের মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া অর্দ্ধ-শয়নে আছেন, বীরোচিত পরিচ্ছদে তদীয় বরাঙ্গ সুশোভিত; নয়নদ্বয় নির্ভয় ও সদাশয়, যেন কাহাকেও আলিঙ্গন করিবে-করিবে, এই রূপ বাসনা করিতেছে। সেই নেত্রদ্বয় কখনও বৃক্ষে প্রস্ফুটিত রাশি রাশি পলাশ-কুসুমের দিকে ধাবিত হইতেছে, কখনও তপোবন সদৃশ সেই কাননে ময়ূর ময়ূরীর মুখ-চুম্বন দর্শন করিতে যাইতেছে। উভয়েই দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছেন। উভয়ের সমুজ্জ্বল সজ্জা কিরণ বিনিময় করিতেছে; উভয়ের এক রূপ মন,—মনে মনে মন বিনিময় হইতেছে, যেন এক স্ফটিক-পাত্রের নির্ম্মল বারিধারা আর এক স্ফটিক-পাত্রে পতিত হইতেছে।

এক্ষণে রাজপুত্র ও মন্ত্রী-পুত্রের পরিচয় আবশ্যক।

যশোর-নগরে এক সময়ে রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের রাজধানী ছিল। সেই রাজ বাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই স্থানের পুরাতন ঐশ্বর্য্যের ও প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্বর্গীয় রাজা সুরেন্দ্র-নারায়ণের বংশে রাজকুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যান, ও যশোর-নগর হইতে দুরে গিয়া "রাজ নগর" নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণের এক জ্ঞাতি, রাজা বীরসিংহ রায়

তখন যশোর-নগরের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে বাস করিতেন। তিনি ভূপেন্দ্র-নারায়ণের চিরশত্রু। উভয়ের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য নিয়ত বাদ-বিসম্বাদ, ভূসম্পত্তি ও রাজস্বের জন্য সতত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পারিবারিক বাক্‌বিতণ্ডার জন্য সর্ব্বক্ষণ দ্বেষ-হিংসা উপস্থিত হইত। কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণের পূর্ব্ব বাসস্থলী পরিত্যাগ ও স্থানান্তরে নব রাজধানী স্থাপনের ইহাই কারণ।

যশোর-নগরে এক বহুদর্শী সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি স্বর্গীয় রাজা সুরেন্দ্র-নারায়ণের মন্ত্রীত্ব করিতেন। তাঁহারই একটি বংশধর সুধাংশু-শেখর ভূপেন্দ্র-নারায়ণের বাল্য সখা। উভয়েই সম বয়স্ক এবং পরস্পরে অনুরক্ত। এই জন্য সুধাংশু-শেখর, রাজকুমারের সহিত রাজনগর রাজধানীতে আসিয়া, রাজ প্রাসাদের অনতিদূরে আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন ও "আনন্দ-গৃহ" নামে একটি সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। সুধাংশুর পিতা মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃবধূগণ পূর্ব্ব বাসস্থলীতেই বাস করেন, কিন্তু সুধাংশু রাজভবনে কুমারের সহিত একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইনিই শালিখার সুধাংশু, শালিখা হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক্ষণে বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

ঐ যে তটিনীর তটে নবদুর্ব্বাদলের উপরে দুই বন্ধু অর্দ্ধ-শয়নে আছেন, তাঁহারা অন্য কেহ নহেন,—কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণ আর সুধাংশু।

দুই বন্ধুতে কথা হইতেছে,—

ভূপেন্দ্র বলিলেন, ভাই লোক-জন সব কোন্ দিকে চলে গেল? এস আমরা একটু বিশ্রাম করি। এখানে জন-প্রাণী

নাই। কেমন নির্ম্মল আকাশ, কেমন মৃদু বাতাস! প্রকৃতির কেমন সুন্দর শোভা, দেখেছ? প্রাণ যেন কেড়ে নিচ্ছে! চারিদিকে কত পলাশ কাঞ্চন ফুটেছে, দেখেছ? বন-দেবী যেন সকল মুখে লাল রঙ্ মেখে চারি দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্‌ছেন! এই প্রকৃতিই পরমেশ্বরের প্রিয়তমা, তাই এত সুন্দরী!

সুধাংশু বলিলেন—ভাই, ঈশ্বরের সৃষ্টি বড়ই অপূর্ব্ব! আমাদের দৃষ্টি যতই পরিষ্কার হয়, ততই তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আমর দেখ্‌তে পাই। মুনি ঋষি গণ এই প্রাকৃতিক শোভাতে মুগ্ধ হয়েই, তপোবনে বাস করতেন। এই প্রকৃতিই বাস্তবিক জগতের জননী।

ভূপেন্দ্র।—"গুপ্ত প্রকাশ" নামে যোগ সম্বন্ধীয় এক খানি বই আমার লাইব্রারিতে আছে, তা তুমি পড়েছ? আজ তোমায় দেব, দেখবে কি সুন্দর! আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের সব অপূর্ব্ব সাধন-কৌশলের বর্ণনা তাতে আছে। কা'ল থেকে দুজনে ঐ বই খানি রীতিমত পড়ব, অনেক শিখবার বিষয় আছে।

সুধাংশু।—রাজকুমার, তা পড়েছি। তাতে লিখেছে, স্বামী স্ত্রীতে যদি সাধন করে, তবে এক জনের মৃত্যুর পরে আর এক জন তাকে দেখতে পায়। সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার!

ভূপেন্দ্র।—সে সত্যই; আমিও এক খানি পুস্তকে পড়েছি, দুই বন্ধু ছিলেন, তাঁদের এক জন দূর দেশে থাকতেন। তাঁরা নিয়ম করেছিলেন যে, ঠিক এক সময়ে দুই জনে ব'সে পরস্পরকে ধ্যান করবেন। তাঁরা বহু দিন ঐ রূপ অভ্যাস ক'রে, শেষে পরস্পরের দেখা পেতেন, কথা বার্ত্তাও বলতেন।

সুধাংশু।—হাঁ, আমিও সেটি পড়েছি। এস ভাই আমরা সেই রূপ অভ্যাস করি না কেন? বন্ধুত্ব দুর্লভ পদার্থ,

আমরা যদি প্রকৃত বন্ধুত্ব করতে পারি, তবে অবশ্যই সেই স্বর্গীয় সুখে সুখী হব। প্রকৃত ভালবাসাই অমৃত। জলবিন্দু যেমন জলবিন্দুকে টানে, একটি গ্রহ যেমন আর একটি গ্রহকে টানে, তেমনি একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে টানলে তাকে বলে 'ভালবাসা'। পরস্পরের টান্ ব্যতীত যেমন গ্রহমণ্ডল থাকেনা, তেমনি পরস্পরের টান্ না হলে, সংসার থাকে না। এই ভালবাসা দুটি হৃদয়কে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করলেই তাকে বলে 'বন্ধুত্ব'। এ জগতে বন্ধুত্ব বিনা আর সুখের জিনিষ কি আছে ?

ভূপেন্দ্র।—সুধাংশু, সেরূপ বন্ধুত্ব জগতে দেখতে পাওয়া যায় না, যদি হয়, তবে বহু সৌভাগ্যে হয়ে থাকে। বন্ধুত্বে একটি শক্তি উত্থিত হয় ; বন্ধুত্ব বৃদ্ধিতেই ঐ শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাতেই সুখ শান্তি বর্দ্ধিত হয় ; সেই জন্য যার বহু বন্ধু আছে, তার শক্তির সীমা নাই, তার সুখেরও সীমা নাই। আমার ইচ্ছা হয়, আমার যেন অন্ততঃ একশত-একজন প্রকৃত বন্ধু থাকে। আত্মার সম্বন্ধ থাক্‌লেই আত্মীয়তা, সেইটিই যথার্থ বন্ধুত্ব ; নতুবা জগতের সকল সম্বন্ধই কুটুম্বিতা, কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ, তিন দিনের জন্য। এরূপ 'আত্মার আত্মীয়' যার না থাকে, তার সমস্ত সম্বন্ধই বৃথা। আহা, এই অনিত্য সংসারে বন্ধুত্বই নিত্য সুখ। সেই পুস্তকে আমি পড়েছি, যথারীতি প্রতিজ্ঞা করে সে রূপ বন্ধুত্ব করতে হয়। লিখিত প্রতিজ্ঞা চাই। কি রূপ লিখতে হয়, তা আমি জানি।

সুধাংশু।—রাজকুমার, ভালই ত, সেই রূপে বন্ধুত্ব করাই ত যথার্থ প্রেমের লক্ষণ। সংসারে সেরূপ বন্ধু না থাকলে জীবন বৃথা! আচ্ছা, যে রূপ লিখতে হয়, এস আমরা সেই রূপ লিখেই প্রতিজ্ঞা করি।

ভূপেন্দ্র।—আমি সেটি অনেক দিন ভেবেছি, তোমাকে বল্‌তে পারি নাই। তুমি যদি বলো, তবে এখনই কাগজ কলম ব্যাগ হ'তে বা'র কর।

সুধাংশু।—আচ্ছা এই নেও, লেখ দেখি, কি লিখবে।

ভূপেন্দ্র।—যা লিখ্‌তে হবে, আমি লিখছি, দেখ।

এই বলিয়া রাজপুত্র এক খানি প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া সুধাংশুকে বলিলেন, ভাই শোন, আমি পড়ি—

"এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বারা আমি শ্রীভূপেন্দ্র-নারায়ণ রায় এবং আমি শ্রীসুধাংশু-শেখর শর্ম্মা—আমরা উভয়ে আমাদের জন্ম ও ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, এবং সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য—সালের—মাসের—তারিখে আমরা উভয়ে অসাধারণ বন্ধুত্ব-পাশে বদ্ধ হইলাম। এখন হইতে আমরা পরস্পরের প্রতি কপট ও স্বার্থপর হইব না।

আমরা বিচার দ্বারা আমাদের উভয়ের মতামত, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও জীবনের প্রধান প্রধান বিষয় মীমাংসা করিয়া লইব। আমাদের পরস্পরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাহা কিছু জানিতে পাইব, তাহা আপনা হইতেই ইচ্ছা পূর্ব্বক পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিব, এবং উভয়ের সমক্ষে দোষ প্রমাণিত না হইলে, কোনও বিষয়ে আমরা দোষ গ্রহণ করিব না। অজানিত কৃতদোষের জন্য পরস্পর ক্ষমা করিব ও সে বিষয় বিস্মৃত হইব। পরস্পর পরস্পরের যথাসাধ্য উপকার ও সহায়তা করিব, ও পরস্পরের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায় হইব। সংক্ষেপতঃ আমরা উভয়ে এক-প্রাণ হইতে চেষ্টা করিব। আমরা

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিয়া, পরস্পরে বিশ্বস্ত ও অকপট বন্ধু হইয়া জীবন যাপন করিব।

যদি এক জনের দ্বারা এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা-পত্রের কোনও বিষয় অন্যথা করা হয়, তবে অন্য জন তিন মাস পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবহার দেখিবেন; ঐ সময়ের মধ্যে যদি কিছুতেই ঐ দোষের সংশোধন না হয়, তবে সেই সময় হইতে এই প্রতিজ্ঞা-পত্র অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তিন মাসের পরেও, আরার উভয়ে এই প্রতিজ্ঞা-পত্র স্থির রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আবার এই প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রাহ্য ও সুরক্ষিত হইতে পারিবে ইতি।"

সুধাংশু।—বেশ হয়েছে। ভাই তুমি স্বাক্ষর কর, আমিও স্বাক্ষর করি; দুই খানি লিখে একখানি তোমার নিকট রাখ, আর এক খানি আমার কাছে থাক। ভাই, এ যেন হারায় না, যত্নে রেখ।

ভূপেন্দ্র।—তাই ভাল। আমাদের বাল্য কাল হ'তে একত্রে ভোজন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে পাঠ, একত্রে খেলা, তাতেই যথার্থ বন্ধুত্ব হয়েছে। ঈশ্বর এই বন্ধুত্ব রক্ষা করুন। আমাদের অন্তরস্থ এই ভালবাসার নদী যেন কখনও শুষ্ক না হয়।

সুধাংশু।—ভাই তোমাকে আর আমাকে, তোমার মা এক সঙ্গে খেতে দিয়েছেন, তুমি অর্দ্ধেক খেয়েছ, আমি আর অর্দ্ধেক খেয়েছি। আমার মায়ের কাছে শুনেছি, আমরা দুজন একবয়সী। তোমার পিতা আমাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসতেন, সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখতেন। মা বলেছেন, এক জন গণক আমার কোষ্ঠী দেখে বলেছিল যে, তোমার এই

পুত্রটি রাজা হবে। যদি তা না হয়, তবে সন্ন্যাসী হবে। দেখ ভাই, তুমি আর আমি ত এক আত্মাই বটে, এতেই আমার রাজা হওয়া হয়েছে ; শেষে সন্ন্যাসী হতে হয় কি না, দেখি।

ভূপেন্দ্র।—ভাই সন্ন্যাসী হওয়া কি ভাল?

সুধাংশু।—কি জানি, সন্ন্যাসীরা এক আত্মা দর্শন করেন, তাতেই সুখী। প্রেমিকেরা দুটি আত্মা দেখেন, একটি নিজের আর একটি প্রিয়তমের।

ভূপেন্দ্র।—আত্মা আবার দুটি কি প্রকার? আত্মা ত একই।

সুধাংশু।—আমি গত বৎসর কাশীধামে যাই। বরুণার পারে প্রণবাশ্রমে ব্রহ্মচারিণী মাতাজী প্রণব-দেবী থাকেন, তাঁর নিকট দীক্ষিত হই ; তখন শুনেছি, আর একটি আত্মা আছে, সেটি বন্ধুর আত্মা, ইংরাজীতে তাকে বলে "অল্টার্ ইগো" অর্থাৎ আর একটি "আমি," বা আমার "দ্বিতীয় আত্মা"।

ভূপেন্দ্র।—সুধাংশু, তখন তুমি আমাকে না ব'লে কাশীধামে গিয়েছিলে। যা-হোক, শীঘ্রই আমি মাতাজী প্রণব-দেবীর নিকটে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করব।

সুধাংশু।—রাজকুমার, আমারও সেই ইচ্ছা, তুমি কল্যই কাশী ধামে যাত্রা কর। "শুভস্য শীঘ্রং"।

ভূপেন্দ্র।—ভাই, আমাদের লোকজন কাকেও দেখছি না, তুমি একবার চারিদিক দেখে এস, তারা কোথায়? আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি।

"আচ্ছা আমি দেখছি" বলিয়া সুধাংশু বনপথে চলিয়া গেলেন। রাজপুত্র শয়ন করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় কথা।

কুলীন কুমারী ও ভৈরবী চক্র।

সুধাংশু বন মধ্যে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের লোকজন তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়া বনমধ্যস্থ পথের ধারে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আশান্বিত হইলেন এবং সেই স্থানেই তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাজপুত্রের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুধাংশু, তাদের দেখা পেলে?

সুধাংশু।—হাঁ, কোনও চিন্তা নাই। তারা পথের ধারেই আছে, আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

ভূপেন্দ্র।—আচ্ছা, তবে আমরা এখন অনেক ক্ষণ এখানে বিশ্রাম করতে পারব।

সুধাংশু।—হাঁ, তারা সব ঠিক আছে। আমরা এখানেই একটু থাকি।

সুধাংশু রাজপুত্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ভূপেন্দ্র।—আচ্ছা সুধাংশু, তোমার বিবাহের ত অনেক কথা হয়ে আছে, এখন তোমার কি ইচ্ছা? এই বিবাহের জন্য আমাকে কি করতে হবে, বল?

সুধাংশু।—রাজকুমার, সেই কুলীন কুমারীর পাণিগ্রহণ করাই আমার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু আমার ইচ্ছায় কি হয়? সকলই সেই প্রণব-দেবীর ইচ্ছা।

এইস্থানে কুলীনকুমারীর পরিচয় দিতে হইবে। প্রাকৃতিক পূর্ব্ব

বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে রত্নপুর নামে একখানি পল্লীগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। যোগেশ্বর মহাতীর্থ নামে এক সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক পুরুষ ঐ স্থানে বাস করেন। যোগেশ্বর কুলীন ব্রাহ্মণ, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত; এবং বহু ধন-সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন, তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ও প্রকাণ্ড জমীদারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তদীয় সহধর্ম্মিনী বিমলা-দেবী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একটি কন্যা লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রয়েই বাস করিতেন। পুত্রের নাম অভিরাম দেব, বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর। তিনিও সুপুরুষ, শক্তিমান, ন্যায়নিষ্ঠ। কন্যাটির নাম কুমারী, বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর। পাছে কুল-মর্য্যাদার লাঘব হয়, এই ভয়ে, পূর্ব্বকালীয় "কৌলীন্য প্রথার" অনুসরণ করিয়া বিমলা দেবী এত দিন কুমারীর বিবাহ দেন নাই। এখনও "সমান ঘর বর পাওয়া যায় না" বলিয়া তিনি কুমারীর বিবাহ দিতে অসম্মত। বিমলা দেবীর অর্থের অভাব নাই। বহু অর্থ দিলে ভাল ঘর-বর না পাওয়া যায়, এ রূপ নহে। কিন্তু যে রূপ বিশেষত্ব-বিশিষ্ট নৈকষ্য-কুলীনের ঘরে কার্য্য হইয়া আসিতেছে, সেই রূপ ঘর না পাইলে বিবাহ দেওয়া হইবে না, এই রূপ একটি দৃঢ় কুসংস্কার পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচলিত থাকায় এবং সেরূপ ঘর ক্রমে লোপ পাওয়ায় পাত্র পাওয়া কঠিন হইয়াছে।

পরে জন-শ্রুতিতে জানা গিয়াছে যে, বহু কাল পূর্ব্বে বিমলা দেবীর স্বামী কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ব বঙ্গে থাকিতেন, তখন তিনি এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের সহিত তাঁহার শিশু-কন্যার বিবাহ দেন, এবং বিবাহের কিয়ৎকাল পরেই বৃদ্ধ স্বর্গারোহণ করেন। বিমলা

দেবী বহু কাল পরে দেশে আসিয়া সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, কেবল 'ঘর-বর পাওয়া যায় না' বলিয়াই কুমারীর বিবাহে আপত্তি করিয়া থাকেন। অধুনা অনেকেই সেই পূর্ব্ব জনশ্রুতি বিশ্বাস করেন না। কুমারীর বিদ্যাবুদ্ধি ও অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া বহু স্থান হইতে বহু লোক বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়া আসিয়া থাকেন, এবং আত্মীয় স্বজনেও কুমারীর বিবাহ দিবার জন্য বিমলা-দেবীকে অনেক অনুরোধ করেন, স্বয়ং যোগেশ্বর-মহাতীর্থও বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বিমলা দেবী কুমারীর বিবাহ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই হেতু অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, ও নিন্দাবাদও করেন; কিন্তু বিমলা দেবী তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না।

এই মত-ভিন্নতা হেতু এক্ষণে বিমলা দেবী তাঁহাদিগের সুবিস্তীর্ণ বাটীর উত্তরখণ্ডে পুত্র কন্যা লইয়া পৃথক ভাবে বাস করিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত যোগেশ্বর সমস্ত ধন সম্পত্তি ও জমিদারী রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে মতভেদ ও বাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই সমস্ত ধন সম্পত্তি ও কার্য্যভার বিমলা দেবী ও তদীয় পুত্র অভিরাম দেবকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। অভিরাম দেব এক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণ, কৃতবিদ্য ও কার্য্যক্ষম হইয়াছেন। তিনি নিজ ধন-সম্পত্তি ও জমিদারীর তত্ত্বাবধারণের ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিয়াছেন।

আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে কুলীন কুমারীর অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিচয় হইবে না। সে কথাটি এই;—

৺কাশীধামের উত্তরে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে নির্জ্জন প্রান্তরে "প্রণবাশ্রম" নামে একটি আশ্রম-বাটী আছে। ঐ আশ্রম ব্রহ্ম চারিণী-মাতাজী প্রণব-দেবীর মানস-সৃষ্ট। মাতাজী ঐ আশ্রমে তপস্যায় সতত নিরত থাকেন। সেখানে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্য মণ্ডলী ও কাশীধামস্থ বহু সাধু-পুরুষের দ্বারা গঠিত একটি মন্ত্রী-সভা আছে। ঐ মন্ত্রী-সভার নাম "ভৈরবী-চক্র"। এই ভৈরবী-চক্রের কার্য্য প্রণালী যত দূর সম্ভব গোপন রাখা হয়। ঐ চক্রস্থ সকলে "বয়ম্ অজরামরাঃ" আমরা অজর অমর—এই মন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে তান্ত্রিক উপাসকগণের মধ্যে এই ভৈরবী-চক্র প্রচলিত ছিল, উহার মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল! কাল বশে ঐ চক্র-প্রণালী দুষিত হইয়া "হিতে বিপরীত" হইয়া উঠে — শেষে কেবল "পঞ্চ মকার" সাধনের যথেচ্ছাচারিতা ঐ চক্রে অনুষ্ঠিত হইত।

দাক্ষিণাত্যে যোগাদ্যার আশ্রম নামে একটি আশ্রম আছে। দেবী বল্লভাসখী ঐ আশ্রম স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যে আদ্যার আশ্রমে দেবী বল্লভাসখী ও কাশীধামে প্রণবাশ্রমে প্রণব দেবী সেই প্রাচীন ভৈরবী-চক্রের মহান্ উদ্দেশ্য পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন; পরে তাঁহারা কাশ্মীর, বোম্বাই, রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশেও এক একটি শাখা-চক্র স্থাপন করেন।

যোগেশ্বর মহাতীর্থ, দেবী বল্লভাসখীর নিকটে ভৈরবীচক্রে দীক্ষিত হইয়া "মহাতীর্থ" আখ্যা প্রাপ্ত হন। কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের মন্ত্রী শারদানন্দ-স্বামীও দাক্ষিণাত্যের ঐ যোগাদ্যার আশ্রমে দেবী বল্লভাসখীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছেন। পরে

সুধাংশুও ঐ দীক্ষা গ্রহণ করেন। শারদানন্দ যোগেশ্বরের বাল্য বন্ধু। যোগেশ্বর তদীয় জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী কুমারীর পরিণয় জন্য বহু প্রয়াস পাইতেছিলেন; এদিকে সুধাংশুর দীক্ষার পরে তাঁহার উপর শারদানন্দের স্নেহ-দৃষ্টি পতিত হইল, এই হেতু শারদানন্দ কুমারীর সহিত সুধাংশুর পরিণয় সংঘটনের অভিপ্রায়ে কুমারীর ভ্রাতা যোগেশ্বরকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যোগেশ্বরও সম্মত হইয়া ঐ পরিণয় সংঘটন জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কুমারীর জননী বিমলা-দেবী সুধাংশুর কুলপরিচয় ধরিয়া এই কার্য্যে কুল-মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি সুধাংশুর প্রতি যোগেশ্বরের অনুরাগ বুঝিয়া বিদ্বেষ বশতঃ সুধাংশুর নামে একবারে খড়্গহস্ত হইলেন। তিনি সকলের নিকটেই প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কুমারীর বিবাহ দিবেন না; কন্যাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া গৃহেই রাখিবেন, কুলীন কুমারীর পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে, দোষাবহও নহে।

ভূপেন্দ্র-নারায়ণের জ্ঞাতি-শত্রু রাজা বীরসিংহের সহিত বিমলাদেবীর স্বর্গগত স্বামীর বন্ধুত্ব ছিল, এই কারণে বিমলা দেবী বীরসিংহকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, জানাইলেন যে, ভূপেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁহার মন্ত্রী শারদানন্দ উভয়ে কুমারীর সহিত সুধাংশুর পরিণয় জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, ও নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহার প্রতিবিধান জন্য তিনি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

মন্ত্রী শারদানন্দ কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে সুধাংশুর এই

পরিণয় সম্বন্ধে সমুদায় কথাই বলিয়া রাখিয়াছিলেন; ভূপেন্দ্র নারায়ণও সুধাংশুর সহিত এই কুলীন-কুমারীর বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হন। তাই এই নির্জ্জন বন-ভূমির মধ্যে বিরলে বসিয়া তিনি সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সুধাংশু, তোমার বিবাহের জন্য আমাকে কি করতে হবে বল? আমি তাই করব।

ইতোমধ্যে বৃক্ষরাজির পশ্চাদ্ ভাগে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রুত হইল, শাখাস্থ নৃত্যকারী পক্ষিদল কলকল রবে আকাশ পথে উড়িয়া গেল। রাজকুমার একবার পশ্চাদ্ ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন। সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার, কিসের শব্দ?

ভূপেন্দ্র।—কে যেন একটি লোক এদিক দিয়ে গেল।

সুধাংশু।—আমাদেরই লোক এদিক ওদিক আছে, তাদেরই কেউ গিয়েছে।

ভূপেন্দ্র।—ভাই সুধাংশু, মন্ত্রীবর আমাকে বলেছেন যে, যদি তুমি সেই যোগেশ্বরের যোগে, কুলীন কুমারীকে হরণ ক'রে, গোপনে নিয়ে গিয়ে, কাশীধামে প্রণবাশ্রমে ফেল্‌তে পার, তবে এই বিবাহ সহজেই সম্পন্ন হ'তে পারে।

সুধাংশু।—রাজকুমার, আমি মনস্থ করেছি, মন্ত্রীবরের নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণ করব। দেখি তিনি কি বলেন?

পুনর্ব্বার বনমধ্যে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। রাজকুমার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

সুধাংশু।—রাজকুমার, কিসের শব্দ?

ভূপেন্দ্র।—তাইত, প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। এই নির্জ্জন স্থানে কেহ আমাদের কথা শুনছেনা ত? বোধ হচ্ছে বৃক্ষ গুলিরও কাণ আছে, এই গোপন কথা শুনে নিচ্ছে! আমার শত্রু ত পদে পদে।

সুধাংশু।—অন্য কেহ নয়, আমাদেরি লোকজন আসা যাওয়া কচ্ছে।

ভূপেন্দ্র।—না, ঐ যে! কে যেন ওখানে বনের মধ্যে নড়ছে, দেখছি। এই বলিয়া রাজকুমার সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দেখিলেন—একটি ছিন্নবসনা স্ত্রীলোক শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে রে?

সে মুখ উত্তোলন করিয়া উত্তর করিল—আমরা এখানে কাঠ কুড়াতে আঁসি।

কুমার দেখিলেন, একে নির্জ্জন স্থান, প্রায় সন্ধ্যাকাল, তাহাতে স্ত্রীলোকটি যুবতী, জীর্ণ বস্ত্রে অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র আবরিত! দেখিয়াই অমনি তিনি অবনত মস্তকে পশ্চাৎ-পদ হইলেন।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটা কে?

কুমার।—কাঠকুড়ানী কাঠ কুড়াতে এসেছে।

কাঠ-কুড়ানী, একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাজপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ভার মস্তকে লইয়া আপন পথে প্রস্থান করিল।

সুধাংশু।—কুমার, সন্ধ্যা হল, আমরা বহুক্ষণ এখানে বসে আছি, এখন চল যাই।

ভূপেন্দ্র।—তবে আজ ওঠ।

তাঁহারা উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। সুধাংশু গাইতে আরম্ভ করিলেন—

গীত।

ভাল বাসি তোমারে।
দিবানিশি বসি বসি এই শুধু ইচ্ছা করে।
যে পেয়েছে ভালবাসা,
তার মনে কতই আশা,
সার্থক তার ভবে আসা, অমানিশা অন্ধকারে।

তখন দুই জনে অগ্রসর হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে অশ্ববল্গা খুলিয়া দুই অশ্বে আরোহণ করিলেন; এবং যে দিকে, তাঁহাদিগের লোক জন অপেক্ষা করিতেছিল সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। অশ্বদ্বয় বিদ্যুৎ গতিতে ধাবমান হইল, এবং মুহূর্ত্তে নিবিড় বন-পথের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুর্থ কথা।

ভাই ভাই।

কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণ রাজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্ত্রীবর স্বামিজীর সহিত নানাবিধ বৈষয়িক পরামর্শ করিলেন ও সুধাংশুর বিবাহ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। সর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসা ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়া, তিনি তৎপর দিবস প্রত্যূষে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। সুধাংশুও সেই দিন কলিকাতায় তাঁহার একটি বন্ধুর নিকট গমন করিলেন।

কলিকাতায় তালতলার নিকটে একটি ধনকুবের সওদাগরের অট্টালিকা বাটী আছে। সওদাগরের পুত্রাদি না থাকায় তিনি একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। পুত্রের নাম সুরেশচন্দ্র দেব। সুরেশের বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। তৎপরেই সুরেশের পিতা পরলোক গমন করেন, ও অনতিবিলম্বে মাতাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। তখন সুরেশচন্দ্রই সমস্ত ধন সম্পত্তি স্বহস্তে প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি পোষ্যপুত্র বলিয়া প্রথম হইতেই তাঁহার চিত্তে গভীর কালিমা রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। এক্ষণে সুরেশচন্দ্রের অন্তঃকরণ মাতৃস্নেহের জন্য ক্ষুব্ধ ও লালায়িত হইয়া উঠিল।

সুরেশ প্রায় অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হন, এই জন্য তিনি তাঁহার গর্ভধারিণী জননীকে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপবতী ভার্য্যাও তাঁহার চিত্তে শান্তি প্রদান করিতে পারিল না। এক্ষণে তাঁহার

পত্নী সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়াছেন, তথাপি তিনি স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। তিনি নির্জ্জনে থাকিলেই গোপনে কেবল মা, মা, বলিয়া রোদন করেন। পত্নী নানা চেষ্টা ও প্রবোধ দিয়াও তাঁহার চিত্তে শান্তি আনয়ন করিতে পারেন না।

সুধাংশু পাঠ্যাবস্থায় সুরেশচন্দ্রের বাটীতে থাকিতেন। সুধাংশু ও সুরেশ উভয়ে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। মাতৃ স্নেহের অভাব-জনিত শান্তিহীন হৃদয়ের বিষম বেগ কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া, সুরেশচন্দ্র সুধাংশুর নিকটেই প্রাণ উদ্ঘাটন করিয়া সকল দুঃখ প্রকাশ করিতেন। পরে তিনি রাজনগরে সুধাংশুর বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন, ও সুধাংশুর "বিশ্বজননীর" ন্যায় স্নেহময়ী জননীকে মা, মা, বলিয়া ডাকিয়া তপ্ত হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করিতেন। সুধাংশুর জননী সুরেশচন্দ্রকে আপন পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদীয় অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি যে কেবল সুরেশের মা হইয়াছিলেন তাহা নহে, রাজপথের অনাথ বালক বালিকা হইতে প্রাসাদস্থ বালার্কের ন্যায় রাজপুত্র পর্য্যন্ত অনেকে তাঁহাকে মা, মা, বলিয়া প্রাণ জুড়াইয়াছে।

এই রূপে সুরেশচন্দ্রের সহিত সুধাংশুর অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব জন্মায়। সুরেশের জন্য জননীর স্বহস্তে প্রস্তুত বহুবিধ সুমিষ্ট মিষ্টান্ন লইয়া সুধাংশু সুরেশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধাংশুকে পাইয়া সুরেশের আনন্দের সীমা রহিল না। দুই ভ্রাতা একত্রে উপবেশন ও কথোপকথনে, একত্র ভোজন ও শয়নে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাজ-প্রাসাদ সদৃশ ত্রিতল বাটীর উচ্চতম নিভৃত কক্ষে বসিয়া সুরেশ

বলিলেন,—ভাই, মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মা ভাল আছেন ত? তোমাদের সকল ভ্রাতাকে ক্রোড়ের নিকট বসিয়ে মা যখন হাতে হাতে খাবার দেন, তখন আমার কথা স্মরণ করেন ত? এই বলিয়া সুরেশ রুমালে নেত্র আবরণ করিলেন।

সুধাংশু।—ভাই, মা ভাল আছেন। তোমার জন্য কত খাবার পাঠিয়েছেন। মা সর্ব্বদাই তোমার কথা বলেন। ভাই সুরেশ, মুখ তোল, কাঁদ্‌চ কেন? চল কা'লই তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব। তোমাকে নিয়ে যেতেই মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুরেশ।—ভাই সুধাংশু, যার মা নাই তার কি দশা! তা তোমরা বুঝতে পারবে না।

আমি শৈশবেই মা-বাপ ভাই-ভগ্নী সকলকেই হারায়েছি, আমি মা-হারা! তোমার মাকে মা ব'লে অবধি আমার আকুল প্রাণ শান্ত হয়েছে। তোমাকে পেয়ে, ভাই, আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। আমার মা বলা, ভাই বলা সার্থক হয়েছে। তোমাকে আর মাকে পেয়ে, আমি সব দুঃখ ভুলেছি।

সুধাংশু।— ভাই সুরেশ, আমরা যেন চিরদিন এই ভাবে জীবন কাটাতে পারি। ভাই ভাইতে কি মধুর সম্বন্ধ! কিন্তু বড় দুঃখের কথা, সংসারে, জ্ঞাতি-ভাইয়ের ত কথাই নাই, সহোদর ভাই যারা, তারাও, পোড়া কামিনী-কাঞ্চনের হাতে প'ড়ে এক মাতৃগর্ব্ভের সেই অনির্ব্বচনীয় ভালবাসার সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে, পরস্পর বিদ্বেষ-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ভাই, আমরা জ্ঞাতি ভাইও নই, সহোদর ভাইও নই, আমাদের সে আশঙ্কা একবারেই নাই। যথার্থ ভ্রাতৃস্নেহ যা, তার পূর্ণতা

আমাদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। ভাই ব'লে ভাই, বন্ধু ব'লে বন্ধু! এমন আর হ'তে নাই! এই দেব-দুর্লভ নিত্য ধন ভাই-ভাইয়ের ভালবাসা লোকে কেবল মনের দোষেই কলুষিত করে।

সুরেশ চন্দ্র অনেক ক্ষণ নীরবে থাকিয়া আত্ম সংযম করিলেন ও মুখ তুলিয়া বলিলেন—ভাই এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার বিবাহের কি হল?

সুধাংশু।—দেখ ভাই, দেখে শুনেই বিবাহ করা উচিত। আমার মতে, এক মাত্র ভালবাসাই এই শুষ্ক অনিত্য সংসারকে সরস ও সুমিষ্ট করে রেখেছে। প্রেম শূন্য সংসার ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমি! দেখ ভাই, আমার "আমি" কিরূপ মিষ্ট, কেমন সুন্দর! আমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমারি জন্য আমার সব। নির্ম্মল "আমিকে" মুনি-ঋষিগণ "আত্মা" বলেছেন। ঐ আত্মাই অবিনাশী নিত্য সত্য। দেখ ভাই, এক "আমিতে" আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটি কেমন পূর্ণ, কেমন মধুময়! এটি ভিন্ন আর একটি আছে "অল্‌টার্‌ ইগো"— "অ্যানাদার্‌ ছেল্‌ফ্‌" অর্থাৎ আর একটি "আমি"। একটি আমিতে কত মিষ্টি দেখেছ? তার সঙ্গে আর একটি ঐ রূপ "আমি" যুক্ত হলে, কত মিষ্ট, কতই সুন্দর হয়? ঐ "দ্বিতীয় আমি" আমার আত্মার ফটোগ্রাফের ন্যায়, প্রিয়তম ও নিকটতম বন্ধুরূপে প্রকাশ পায়। যোগীর আত্মা যেমন আপন আত্মাতেই আরাম পায়, আত্ম সুখানুভব করে, তেমনি আমাদের আত্ম স্বরূপ বন্ধুত্বের ভালবাসাতেও আত্মা পরমানন্দ উপভোগ করে। এই রূপ বন্ধু আমার অনেক আছেন, স্ত্রীও এই রূপ হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীও যদি আমার "দ্বিতীয় আমি" রূপে প্রকাশ পান, তবেই বিবাহ সার্থক হয়। শাস্ত্রেও বলে "স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিণী"। কেহ কেহ বলেন —স্ত্রী উত্তমার্দ্ধ।

ভাই, তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলেছি, যদি সেই কুলীন কুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে বিবাহ করব, নইলে আর না। আমি অনেক অনুসন্ধানে জেনেছি, সেই পাত্রীই আমার "দ্বিতীয় আমি" হবার উপযুক্তা।

সুরেশ।—তবে সেইটী বিবাহ করলেই ত হয়।

সুধাংশু।—না ভাই, তার অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। ঐ পাত্রী নিখুঁত কুলীনের ঘরের কন্যা, বিশেষ, তারা বড়লোক, যেমন ধন-বল্ তেমনি লোক-বল্ আছে। কন্যার মায়ের একবারে ধমত, একটু নিম্ন ঘরে কন্যা দেবে না। কন্যার মা এ বিবাহের বিষম বিরোধী, একবারে খাঁড়াধরা!

সুরেশ।—তবে তুমি কি স্থির করেছ?

সুধাংশু।—স্থির আর কি করব! হয়ত এই গোলমালে আমার সর্ব্বস্ব যাবে। আমার কপালে অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। দেখ ভাই, আমি সেই কুলীন কুমারীকে দেখি নাই, সত্য, কিন্তু রূপ দেখে কি ফল? রূপ যেমনই হোক না কেন, গুণ থাকাই আবশ্যক। সেই কুলীন কুমারীর গুণের আর ভক্তির কথা শুনে, আমি আশ্চর্য্য বোধ করেছি। তার দুঃখের কথা শুনেও আমি মর্ম্মাহত হয়ে আছি; সেই কন্যার এক ভ্রাতা যোগেশ্বর মহাতীর্থ; তিনি পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক, মহা তেজস্বী পুরুষ; তিনিই চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই কন্যার এক আপন ভ্রাতা আছেন, তাঁর নাম অভিরাম দেব, তিনি মাতৃপক্ষে।

খুব সম্ভব, তিনি এই বিবাহে সর্ব্বস্ব দিয়েও বাধা দেবেন। আমার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হয় নাই, কিন্তু স্বামী শারদানন্দ, যিনি কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের মন্ত্রী, তিনি অনেক দিন হ'তেই এ প্রস্তাব তাঁদের উভয়ের নিকটেই করেছেন। দেখি তাঁরাই বা কি কতদূর করতে পারেন।

সুরেশ।—ভাই তোমার অবস্থা ত এই, আবার আমারও মন-কষ্টের সীমা নাই।

সুধাংশু।—কেন ভাই? রাজার ন্যায় তোমার সম্পত্তি, রাজা বল্লেই হয়; রাজ-সুখেই দিন কাটাচ্ছ, অর্থেরও সীমা নাই, সুখেরও সীমা নাই, তোমার আবার কষ্ট কোথায়?

সুরেশ।—ভাই তা সত্য। সে অর্থে আমার দুঃখ গেল না। অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু আমার কাছে সে যেন বিষবৎ বোধ হচ্ছে! ভাই, জগতের সম্বন্ধ সবই কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ, স্বার্থে আঘাত প'লেই আর সম্বন্ধ থাকে না, সকল সম্বন্ধই স্বার্থময়, আর দুদিনের জন্য। নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ কেবল "মা"! মাতৃস্নেহের সেই নিত্য সত্য সম্বন্ধ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমার ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশে দূর দেশে চলে যাই। ভাই, তোমাদের ভৈরবী-চক্রের নিয়মগুলি আমাকে বল্‌বে? আমি শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যে যোগাত্মার আশ্রমে যাব, গিয়ে দেবী বল্লভাসখীর ভৈরবী-চক্রে দীক্ষিত হব।

সুধাংশু।—ভাই সুরেশ, তোমার দুঃখে আমি সতত দুঃখিত। তোমার অভিলাষ পূর্ণ করতে আমি শীঘ্রই চেষ্টা করব। তুমি দাক্ষিণাত্যে কবে যাবে? সেই সময় কাশীধাম হয়ে যাবে। কাশীধামে প্রণবদেবীর ভৈরবী-চক্রে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তবে

দাক্ষিণাত্যে যেও। কাশীতে রামানন্দ-ভারতীর নিকট গেলেই সব নিয়মাদি জান্‌তে পাবে। আমি পূর্ব্বেই সেখানে পত্র দেব।

সুরেশ।—ভাই সুধাংশু, শৈশব হতেই মা-বাপ হারায়েছি। মন তখন হ'তেই উদাসীন। আমি শীঘ্রই কাশীধামে ভারতী-স্বামীর নিকট সব জান্‌ব। এবার ভৈরবী চক্রে দীক্ষিত হয়ে তবে আর কাজ! আলস্যে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি। দীক্ষিত হওয়ার পরে যোগাম্বার আশ্রমে দেবী বল্লভাসখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। দাক্ষিণাত্য হ'তে ফিরে এসে কাশ্মীর যাব। কাশ্মীর-চক্রের কে কোথায় আছেন, আমাকে সব ব'লে দিও। কাশ্মীর গিয়ে তবে আমি তোমাকে পত্র দেব। তোমার বিবাহের কিরূপ কি হয় না হয়, আমাকে সমস্ত লিখবে। আবশ্যক হ'লেই আমি আসব।

সুধাংশু।—সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। সব খবরই তুমি পাবে। তুমি কাশীধামে গিয়ে দীক্ষিত হ'লে দেখতে পাবে, দেবীর ভৈরবী-চক্রে কি অপূর্ব্ব নৈসর্গিক ব্যাপার হচ্ছে!

সুরেশ।—ভাই রাত্রি হয়েছে, এখন চল, আহারের সময় হয়েছে।

এই বলিয়া দুই বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন, ও পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম কথা।

কুল-পরিচয়।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।"

সুন্দর-বনের উত্তর ভাগে খুলনা-জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান ধূমঘাটের নিকটে জঙ্গলময় স্থানে প্রাচীন যশোর-নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুবিখ্যাতা যশোরেশ্বরী কালী ঐ স্থানে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ঐ যশোর-নগরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশে দেওয়ানি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া অনেকে অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করেন। এই ধনশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় জাতিতে রাজপুত ছিলেন। পরে তিনি রাজা সুরেন্দ্র-নারায়ণ নামে বিখ্যাত হন, এবং যশোর নগরেই বাস করেন।

এই সুরেন্দ্র-নারায়ণের বংশে রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণের জন্ম হয়। এই নরেন্দ্র-নারায়ণের পুত্র কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণই রাজ-নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, কণিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় যাদবেন্দ্র-নারায়ণ ও মাধবেন্দ্র-নারায়ণের উপরে এবং পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব তদীয় মন্ত্রী শারদানন্দ-স্বামীর উপরে জমিদারী পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া নিজে চির কৌমার-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া যান, ও কাশীবাসী

হইয়া জীবন যাপন করেন। ভূপেন্দ্র-নারায়ণের এক অতিবৃদ্ধ জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাজা রণবীর-সিংহ। তিনিও যশোর-নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া রণবীর-নগর স্থাপন করেন ও তথায় বাস করেন। লোকে ঐ স্থানকে বীরনগর বলিত। ভূপেন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণ এই রণবীর সিংহের বহু সম্পত্তি কৌশল ক্রমে নিজ সম্পত্তির অন্তর্গত করিয়া লন। তদবধি তাঁহাদের সেই বিবাদ বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ভূপেন্দ্রের জ্ঞাতি-ভ্রাতা রণবীর সিংহের পুত্র সুধীর-সিংহ চক্ষুরোগে ক্ষীণ-দৃষ্টি হন, সেই জন্য তদীয় একমাত্র পুত্র কুমার বীরসিংহ বাল্যকালেই তাঁহার "অন্ধের যষ্টি" হইয়া ছিলেন। পিতৃভক্ত বীরসিংহ তাঁহার অন্ধ পিতা সুধীর-সিংহকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাল্যকাল হইতেই নিজে জমিদারী কার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতেই অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত। বাল্যকালে বিপুল ঐশ্বর্য্য স্বহস্তে পাইয়া কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণাতে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও শেষে তিনি নিজ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহাত্মার নির্ম্মল চরিত্রই সকলের অনুকরণীয়।

বীরসিংহের বংশোজ্জলকারী কৃতবিদ্য পুত্র কুমার জিতেন্দ্র সিংহ পূর্ব্বকার জ্ঞাতি-বিরোধ তিরোহিত করিয়া জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে পরম আত্মীয়তা সংস্থাপন করেন, ও পিতৃনামে নানা সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া বীরসিংহের নাম আরও সমুজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন।

মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহার অন্তরে সৎ-প্রবৃত্তির বীজ নিহিত থাকে, তিনি কুসঙ্গে ও প্রলোভনে পতিত হইয়াও নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করিতে পারেন,—রাজা বীরসিংহের মহৎ চরিত্রে তাহা ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যশোর-নগরের অনতি দূরে বীর-নগরে রাজা বীরসিংহের রাজধানী। তাহার মধ্যে সদর বাড়ী ও অন্দর বাড়ী আছে,তদ্ভিন্ন বিষ্ণু মহল, দেবী-মহল, ফুলবাগ, মেওয়াবাগ, রামঝিল, সীতাঝিল সকলই সুন্দর ভাবে অবস্থিত।

রাজবাটীর কিয়দ্দূরে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, পঙ্কপূর্ণ হইয়া বৃদ্ধা রসবতীর ন্যায় দন্তহীন আস্যে এক এক বার হাস্য করিতেছে। ঐ দীর্ঘিকার নাম কমল-সরোবর। উহার যৌবনের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে উহা বার্দ্ধক্যের পঙ্ক শৈবালে পরিপূর্ণ। রাজবাটীর সিংহ-দ্বার অতিক্রম করিয়া পুরিমধ্যে প্রবেশ করিলেই দক্ষিণ ভাগে কাছারি বাড়ী ও বাম ভাগে পূজার বাড়ী নেত্র গোচর হয়। এই দুই বাড়ীর মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত পথ গিয়াছে, সেই পথে গমন করিলেই রাজা বীরসিংহের বৈঠক-খানায় উপস্থিত হওয়া যায়। ঐ বৈঠক-খানার দুই পার্শ্বে নাটমন্দির, পশ্চাদ্ দিকে অন্তঃপুর। বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরস্থ সৌধমালার শিখর-দেশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই অন্তঃপুরে রাজমহিষী তদীয় দাস-দাসী ও প্রতিবেশিনী মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করেন।

রাজা বাহাদুরের বহু দাস-দাসীর মধ্যে একটী দাসী নিকটে থাকিয়া দিবারাত্র তাঁহার সেবা করে, তাহার নাম উল্লাসিনী।

কমল-সরোবরের পূর্ব্বধারে একটী ক্ষুদ্র পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী লোক ও অনেকগুলি সামান্য শ্রেণীর লোক ঐ পল্লীতে বাস করে।

পূর্ব্ব কাশীর রাজগণের রক্ষিতা রমণী গণ বংশ পরম্পরায় সেই স্থানে বাস করে বলিয়া ঐ স্থানকে কামিনী-পাড়া বলে। রাজা বীরসিংহের মন্ত্রী অনেক দিন পূর্ব্বে উল্লাসিনীকে ঐ কামিনী-পাড়া হইতে আনিয়া রাজসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। উল্লাসিনী নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী। তাহার কণ্ঠস্বর বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর! তাহার এই শিক্ষা কামিনী-পাড়ার শিক্ষা। রাজ-মহিষী তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। সে এক্ষণে লেখাপড়া শিখিয়াছে, ও রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে। তাহার একটী বিশেষ-গুণ আছে, সেইজন্য রাজ-বাটীতে তাহার সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—যখন যেখানে আবশ্যক হয়, তখন সেই খানে তাহাকে গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সে মধ্যে মধ্যে রাগ করিয়া পলায়ন করে, তখন মন্ত্রীবর ব্যতীত আর কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

কমল-সরোবরের দক্ষিণ ধারে রাজা বাহাদুরের মন্ত্রী ও কার্য্যকারক ভীমপালের বাসা-বাটী। তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তিনি স্থূল-কলেবর, নব-জলধর-বর্ণ, করিবর-কর্ণ, স্থূল ওষ্ঠাধর তাম্বুল-রাগে বিম্বফল বর্ণ, আকর্ণ মুখ-ব্যাদানে দন্ত-পাঁতির রক্ত-রাগ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়; মস্তকে সাঁচ্চা জরীর টুপী, অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত গোঁফ, এক হস্ত পরিমিত দাড়ি, উভয়ে জড়াজড়ি করিতেছে। তাঁহার দেহ খানি যেন

রসাল বৃক্ষের গুঁড়ি, তাহাতে জালার ন্যায় একটী ভুঁড়ি, সর্ব্বদাই হাই তুলিতেছেন, আর অঙ্গুলিতে তুড়ি দিতেছেন ; বাম হস্তে গুড়গুড়ি, দক্ষিণ হস্তে নলটি ধরিয়া দিবা-নিশি টানিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তামাকুর সুবিধা হইতেছে না।

রাজা বীরসিংহ প্রায় চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষ, কিন্তু কৃষকায় হওয়াতে বোধ হয় যেন হেলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছেন ; তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, বর্ণ ঠিক কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়, পদ্মফুলের ন্যায় নয়ন যুগলের অপূর্ব্ব শোভায় তরুণ অরুণ সদৃশ মুখ মণ্ডল সুশোভিত। তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, তদুপরে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের সুশুভ্র তাজ, ও বক্ষঃস্থলে একমুখী রুদ্রাক্ষ-মালা পরিশোভিত। তাঁহার অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে তিনটি পুত্র বর্ত্তমান।

অদ্য রাজা বীরসিংহ সন্ধ্যার পরে বৈঠক-খানার পার্শ্বস্থ বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—আজ কি খবর ? মন্ত্রী বলিলেন—হুজুর কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে, আর চিন্তা নাই।

কমল-সরোবরের ধার দিয়া ভূপেন্দ্র-নারায়ণ ও সুধাংশু যখন অশ্বারোহণে শীকার উদ্দেশে গমন করেন, তখন উল্লাসিনী জল আনিতে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া মন্ত্রীবরকে জানায়। মন্ত্রী তাহাকে বলেন যে, ভূপেন্দ্র-নারায়ণ ও সুধাংশু একত্রে কেথায় যান এবং পরস্পর কি কথা বলেন, তাহা যদি তুমি গোপনে গিয়া জানিয়া আসিতে পার, তবে তোমাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিব। এই হেতু সে ছদ্মবেশে তাঁহাদের অনুসরণ করে। ভূপেন্দ্র-নারায়ণ ও সুধাংশু যেখানে গিয়া

তটিনী-তটে উপবেশন করেন, সেইখানে উল্লাসিনী গোপনে গিয়া উপস্থিত হয়। উল্লাসিনীই সেই কাঠ-কুড়ানী।

উল্লাসিনী ফিরিয়া আসিয়াছে। সে মৃদু-হাস্যাকর্ষণে মন্ত্রীবরকে ডাকিয়া নিয়া, তাহার কাঠ-কুড়ানী-বেশ ধারণ এবং ভূপেন্দ্র ও সুধাংশুর গুপ্ত পরামর্শ শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছে। মন্ত্রী শ্রবণ করতঃ তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া চন্দ্রহার পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজা বাহাদুরের নিকটে সেই সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন।

ষষ্ঠ কথা।

উল্লাসিনী।

রাজা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, মন্ত্রী বলিলেন, হুজুর, রত্নপুর হতে মা পত্র পাঠিয়েছেন। রাজা বলিলেন—কি লিখেছেন পড়। মন্ত্রী পত্রখানি পাঠ করিলেন,

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বীরসিংহ রায় বাহাদুর, স্নেহাস্পদেষু।

শ্রীমন্, আপনার পূর্ব্ব পত্রখানি পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি। এক্ষণে ভূপেন্দ্র-নারায়ণ আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছেন। শুনিলাম, সুধাংশুর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য তিনি একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা হইতে দিব না। ভূপেন্দ্র-নারায়ণের অভিসন্ধি কিরূপ, তাহা আপনি জানিয়া আমাকে লিখিলে আমি আপনার

পরামর্শানুসারে কার্য্য করিব। আপনার পিতার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া, আমি আপনার বিশেষ ভরসা করিতে পারি, সন্দেহ নাই। কল্যাণ ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী বিমলা দেবী।

রাজা বলিলেন—মন্ত্রী, দেবীকে আমার প্রণাম জানিয়ে খুব ভরসা দিয়ে একটা উত্তর লিখে দেও। আর লিখবে, ভূপেন্দ্রকে এবার বিলক্ষণ জব্দ করে দেব, সে জন্য চিন্তা নাই।

এ দিকে উল্লাসিনী অন্তঃপুর-মধ্যস্থ পদ্মপুকুরে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া আসিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সর্ব্বাগ্রে মুকুরে মুখ-মণ্ডল দর্শন করিল, ও অবাক হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল; মুখ খানি ফিরাইয়া আবার একবার দেখিল, পুনর্ব্বার মুখখানি ঘুরাইল। কুন্দ-কুসুমের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি ঈষৎ বিকাশিত করিয়া মৃদু হাস্য করায় অমনি দর্পণে সেই দন্তপাঁতি প্রতিবিম্বিত হইল, দেখিয়া উল্লাসিনী আর একবার ঈষৎ হাস্য করিল। পৃষ্ঠ-প্রলম্বিত সুদীর্ঘ ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি আন্দোলিত করিয়া আবার মুকুরে মুখ দিয়া দাঁড়াইল।

উল্লাসিনী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। যেমন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য তাপে বসন্তের কচি পাতায় সরস চাকচিক্য ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ সারাদিন রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিয়াও তাহার শ্যামবর্ণের সরস চাকচিক্য ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই উজ্জ্বল মুখ-খানিতে দুইটী প্রশস্ত চক্ষু খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। মুখে কথা না থাকিলেও নেত্র-যুগল যেন কথা বলিতেছে। উল্লাসিনী যুবতী, তাহার পীন-ঘন পয়োধর শ্বাস-প্রশ্বাসেই মৃদু মৃদু কম্পিত

হইতেছে। নাতিস্থূল দেহখানি ক্ষীণ কটিদেশের উপর শ্যামলতার ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহার অবয়বে বিশেষ কিছু অপূর্ব্ব রূপের নিদর্শন নাই, তথাপি যেন রূপের ডালিখানি হইতে রূপ রাশি উছলিয়া উঠিতেছে।

সাধুগণ যুবতী-যৌবনের রূপ রাশির মধ্যে ভগবানের অপার মহিমা ও অনন্ত মাধুর্য্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। এই প্রস্ফুটিত পঙ্কজ দেবার্চ্চনা-উদ্দেশে সাধুর জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কি মত্ত মাতঙ্গকে ভুজ-মৃণালে বিজড়িত করিয়া পঙ্কে প্রোথিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—ঈশ্বরের সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য কোনটী তাহা কে বলিবে? ঐ কুসুম-স্তবক সদৃশ পীনোন্নত বক্ষঃস্থলে সাধুগণ অমরতা লাভের জন্য পবিত্রতাই দর্শন করিয়া থাকেন, নতুবা মাতৃস্তবে পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা বলিতেন না—

"জয়-জয়ঃ দেবি চরাচর-সারে,
কুচ যুগঃ শোভিতঃ মুকুতা-হারে!"
"সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্ক গণ-শোভিতে,
প্রফুল্লপদ্ম-পত্রাক্ষীং ঘনপীন-পয়োধরাম্!"

এই শ্বাসকম্পিত-পয়োধরা উল্লাসিনীর উপরে সাধুর দৃষ্টি ও আদর্শ-চরিত্র রাজা বীরসিংহের সাধু-দৃষ্টি কিরূপ ভাবে পতিত হয়, তাহা ক্রমে দেখা যাইবে।

এক্ষণে উল্লাসিনী কেশ বিন্যাস পূর্ব্বক একখানি সূক্ষ্ম গুলবাহার শাটী পরিধান করিয়া রাজা বাহাদুরের নিকটে গিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে বসিল। রাজা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নয়ন অবনত করিলেন।

সপ্তম কথা।

শারদানন্দের সাধন-কুটির।

লোকালয় ছাড়িয়া দূরে স্বামীজীর পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যে তাঁহার সাধন-কুটিরখানি শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে লতা-কুঞ্জ, ও ভ্রমর-গুঞ্জরিত বিবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত; সৌরভে মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। সেই নির্জ্জন কুটিরে একখানি মৃগচর্ম্মের উপরে বসিয়া আছেন স্বামী শারদানন্দ। তাঁহার শ্যামবর্ণ অতিশয় স্থূল শরীরে সুন্দর কেশ, সুন্দর বেশ ও পট্টবসন শোভা পাইতেছে! সুপবিত্র যজ্ঞসূত্র তদীয় স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত এবং সুশুভ্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি নাভিস্থল স্পর্শ করিয়া আন্দোলিত হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়া আছেন সুধাংশু। স্বামীজী অনেক ক্ষণ নীরব আছেন, পরে বলিলেন—

বিমলা দেবীর ধন-বল লোক-বল অসীম। তবে যদি ভৈরবী-চক্রের মধ্যে এই কার্য্য গ্রহণ করা যায়, তা হ'লে একরূপ সম্ভব হয়। তুমি যদি "গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য" অবলম্বন করতে প্রতিজ্ঞা করতে পার, তবে এই চক্রে এরূপ বিবাহ হ'তে পারে। একটি মাত্র পুত্রের কামনা রেখে অটলভাবে তেজঃ-সংযম অভ্যাস করাকেই "গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য" বলে।

সুধাংশু।—দেব, তা অবশ্যই আমি অবলম্বন করব, সে বিষয়ে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আছি। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাজনীতি আলোচনা এই চক্রে নিষিদ্ধ, ও এই চক্র যুদ্ধ-পদ্ধতির বিরোধী, তার কারণ কি?

স্বামীজী।—বৎস, সকল রাজাই ত প্রজা-পীড়ক হ'তে

পারেন। প্রজাশক্তি যতই রাজার আশা পরিত্যাগ করে, আর যতই আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করে, ততই দেশের মঙ্গল। "আত্মপ্রত্যয়" আর "আত্ম-নির্ভর" থাকলেই আত্ম-রক্ষা হয়। যিনিই রাজা হন না কেন, তাতে ক্ষতি কি? আধুনিক রাজনীতি নরহত্যার আশ্চর্য্য অস্ত্রাদি উদ্‌ভাবন করচে, পররাজ্য আক্রমণ করাই এই সকল রাজনীতির উদ্দেশ্য। আর্য্যনীতি তা নয়। আর্য্যনীতি আত্মনির্ভর, আত্মরক্ষা, সংযম ও ত্যাগ শিক্ষা দেয়। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মও যুদ্ধ-পদ্ধতির চির-বিরোধী। এই চক্র আর্য্যনীতির পক্ষপাতী, আধুনিক রাজনীতিকে দুর্নীতি ব'লেই ঘৃণা করে। গীতা বলেছেন— "বলবানে বল আমি—জানিবে কেবল

কামনা-আসক্তি শূন্য মহা ধর্ম্মবল।"

রাজা ত প্রজার সেবক মাত্র, কে না জানে? সুতরাং আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর শিক্ষাই যথেষ্ট। রাজনীতি এই চক্রের লক্ষ্য নয়, অর্থনীতিও এর লক্ষ্য নয়, পরমার্থই এক মাত্র লক্ষ্য।

সুধাংশু।—দেব, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—এ জগৎ মিথ্যা, অনিত্য, ভোজবাজীর ন্যায়, তবে ভালবাসা সত্য ও নিত্য হয় কি রূপে?

স্বামীজী বলিলেন—বৎস, বাজী মিথ্যা হ'লেও বাজীকর যেমন সত্য, তেমনি সৃষ্টি মিথ্যা হলেও সৃষ্টিকর্ত্তা সত্য; মূলে সত্য আছে। তা না থাকলে, সৃষ্টিতে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সুদৃঢ় ভাবে থাকত না। মিথ্যা ভোজবাজীও সুশৃঙ্খলার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। আমাদের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ময় ও মঙ্গল ময়, বুদ্ধ-নির্ব্বাণ আমাদের লক্ষ্য নয়।

জগতের সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভালবাসা। এই ভালবাসাতে জড়-সম্বন্ধ হ'লেই বলে 'মায়া,' সেটি সর্ব্বনাশক, আর প্রাণ-সম্বন্ধ হ'লেই বলে 'প্রেম'। প্রাণ-সম্বন্ধই আত্মার সম্বন্ধ। সেইটি ধরতে পারলেই বিশ্বপ্রেমের ধারণা হয়। বিশ্বপ্রেমেই ভালবাসার সার্থকতা। ভালবাসার সার্থকতাতেই এই অনিত্য অসার জগতের সার্থকতা হয়েছে। ভাগবতে আছে "যদি রাধাকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হ'তেন (অর্থাৎ প্রকৃত ভালবাসা যদি প্রকাশিত না হ'ত) তবে এই জগৎ, বিশেষতঃ "ভালবাসা" একবারে অনর্থক, ও বৃথা হয়ে যেত।" তোমরা এই প্রাণ-তত্ত্বে বিগলিত হ'লেই, তোমাদের ভালবাসা ও সংসার-ধর্ম্ম সার্থক হবে। গুরু-দীক্ষা গ্রহণ করে প্রাণ-তত্ত্বে বিগলিত হওয়া চাই, নতুবা দাম্পত্য প্রণয় ইন্দ্রিয়-সেবাতেই পরিণত হয় মাত্র। তুমি গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করছ ত? এই চক্রস্থ সকলকেই গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করতে হয়।

সুধাংশু।—হাঁ, তা করছি। দেব, বিশ্বপ্রেমের ভাব যতই গ্রহণ করা যায়, ততই প্রাণে এক মহাশক্তি জাগ্রত হয়। এই বিশ্বপ্রেমের ভাব আমি দীক্ষা গ্রহণের পর হতেই অল্প অল্প বুঝতে পেরেছি।

স্বামী।—সুধাংশু, স্বার্থের প্রাণ সংহার না করলে ভালবাসার আকাশ-জোড়া রাজ্য অধিকার করা যায় না। স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরেই ভালবাসার অবিনাশী প্রমোদ-উদ্যান। স্বার্থপর লোক ভালবাসা চায় না। সে স্বার্থ-রূপ অন্ধ কূপের ব্যাঙ্‌ হয়েই থাকতে চায়। বৎস, স্বার্থপরতাই প্রেমের গলায় ছুরি দেয়। স্বার্থই পাশব-প্রবৃত্তি। স্বার্থের নামই দুঃখ, আর স্বার্থ-

ত্যাগই সুখ,—এই কথা বুঝবা-মাত্রই বৈকুণ্ঠের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি সাধ ক'রে স্বার্থ রাখতে চায়, সে কোষ-কার কীটের ন্যায় নিজকৃত কারাগারেই নিজে বন্দী হয়ে থাকে, আর অপনার দুই হাত আপনি বেঁধে চীৎকার করতে থাকে।

সুধাংশু।—দেব, জ্ঞানে প্রেমে কিরূপ সম্বন্ধ?

স্বামী।—সুধাশু, জ্ঞান ও প্রেম একই বস্তু। দুটিকে পৃথক করা যায় না। যিনি প্রেমিক, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই সকলের অপেক্ষা জগতের অধিক মঙ্গল সাধন করেন। এই ভালবাসার শক্তিই বিশ্বজয়ী মহাশক্তি। ভালবাসার "কার্য্যের" কথা আর কি বলব, ভালবাসার "কথাটি" পর্য্যন্ত মানব-মনকে অমৃতের পথে পরিচালিত করে। স্বার্থে মানুষকে অন্ধ ক'রে ফেলে, কি যে ক্ষণস্থায়ী আর কি যে চিরস্থায়ী তা দেখতে দেয় না, মৃত্যু ও অমৃতের প্রভেদ বুঝতে দেয় না। প্রেমেই এই জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করে। প্রেমতত্ত্বই জ্ঞানতত্ত্ব। প্রেম চিন্ময়, ঈশ্বরও চিন্ময়; প্রেম ও সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরকে পেতে হ'লে মনের চিন্ময় ভাব অবলম্বন করতে হয়।

বৎস, মনও যা, অহংও তাই। অহংও যা, স্বার্থও তাই। স্বার্থও যা, ভ্রান্তিও তাই। তাতেই স্বার্থের জগৎকে মায়া, বা ভ্রান্তি বলে। স্বার্থ-ভ্রান্তি শূন্য যে অহং, তাই চিন্ময় আত্মা। তাতেই নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশিত হয়। এই যথার্থ ভালবাসাই ধর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিশেষ। যিনি বিশ্বপ্রেমিক তিনিই অহংত্যাগী, যথার্থ সন্ন্যাসী। বৎস, যত টুকু স্বার্থ ছাড়বে, তত টুকুই ভালবাসা প্রস্ফুটিত হবে। দাম্পত্য-প্রেমে প্রেম-শিক্ষার আরম্ভ, বিশ্ব-প্রেমে সমাধি।

সুধাংশু।—দেব, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন অন্তরে এই প্রেম-তত্ত্ব ধারণা করতে পারি। আমি রত্নপুরে শীঘ্রই যাব, মনে করেছি, আপনি কি বলেন?

স্বামীজী।—হাঁ, তুমি রত্নপুরে যাও। কুমারীর ভ্রাতা যোগেশ্বর মহাতীর্থ এই চক্রস্থ। তাঁর সঙ্গে রত্নপুরে সাক্ষাৎ করবে। গঙ্গা পার হয়েই তাঁর বাড়ী। সেটি "মহাতীর্থের বাড়ী" সকলে বলে। বস্তুতঃ সে বাড়ীটি দুই খণ্ড—ছোট তরফ, আর বড় তরফ। বড় খণ্ডে মহাতীর্থ থাকেন, ছোট খণ্ডে কুমারীর মাতা বিমলা-দেবী ও অভিরাম দেব প্রভৃতি সকলে থাকেন। আমি পূর্ব্বেই মহাতীর্থকে সব ব'লে রেখেছি, এখনও পত্র দেব।

অমরেন্দ্র-নাথ এই চক্রান্তর্গত। সে কোথায়, তার সংবাদ মহাতীর্থের নিকটে পাবে। সে খুব উন্নত, কার্য্যকারী লোক। যোগেশ্বর আর আমি যখন কলকাতায় থাকি, তখন হতেই অমরেন্দ্র যোগেশ্বরের অনুগত হয়। অমরেন্দ্রের বাড়ী কাশীপুর। তার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু অমরেন্দ্র বিবাহ করে নাই। সে অনেক সময় মহাতীর্থের নিকটে থাকে, আর আমাদের চক্রের কার্য্যের জন্য যখন যেখানে যাওয়া আবশ্যক হয়, সেইখানে সে যায়। তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কুমারীর আপন ভ্রাতা অভিরাম-দেব, তিনি আমার কাছে সবই শুনেছেন, তিনি বোধ হয়, এই কার্য্যে প্রাণপণে বাধা দেবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মনোভাব বুঝবে।

সুধাংশু।—দেব, আমি শীঘ্রই মহাতীর্থের সঙ্গে দেখা করব, আর সকলের নিকটেও যাব। কুলীন-কুমারী অভি

ধর্ম্মশীলা, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না, আপনি সবই জানেন, যদি সেই কন্যা অন্যের দোষে ঘোর পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হয়, আর যদি প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তবে তা হ'তে কষ্টের বিষয় কি আছে ? তাকে উদ্ধার ক'রে চক্রে আন্‌তে পারলে কি মহামায়ার আনন্দ বর্দ্ধন হবে না ?

স্বামীজী।—সুধাংশু, যোগেশ্বর মহাতীর্থ আমার পরম বন্ধু। তুমি যা বল্যে, তাঁরও সেই ইচ্ছা। আমাকে তিনি সমস্তই খুলে লিখেছেন। এখন তাঁর বুদ্ধি-বল, আর তোমার বাহু-বল। আমরা সবাই পশ্চাতে আছি। কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণকে আমি ব'লে রাখব, তোমার জন্য লক্ষমুদ্রা রাজকোষে মজুদ রাখেন। তবে আর চিন্তা কি ?

সুধাংশু।—দেব, আপনি যে কার্য্যে ব্রতী হবেন, সে কার্য্য সফল হবে, তার সন্দেহ কি ?

স্বামীজী।—সুধাংশু, ভূপেন্দ্র-নারায়ণের জ্ঞাতিশত্রু রাজা বীরসিংহের কথা সবই জান ত ? তাঁর সঙ্গে বহুদিন হতে বিবাদ হয়ে আসছে। বীরসিংহের অবস্থা এখন ভাল নয়, তবু তাঁর কু-সঙ্গ ও কু-অভিসন্ধি অতি ভয়ানক। বোধ হয় তাঁর সঙ্গে ভূপেন্দ্র নারায়ণের শীঘ্রই একটা যুদ্ধ ঘটনা হবে। তোমার এই কার্য্য জান্‌তে পেলে বীরসিংহ একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি ক'রে কুমারীর মাতৃপক্ষ অবলম্বন করবেন, সন্দেহ নাই ; তা হলেই একটা বিষম বিপ্লব ঘটাবেন, আমি বুঝতে পারছি। এই কার্য্য খুব গোপন রাখবে, কেউ যেন না জান্‌তে পায়। দাস দাসীর নিকটেও এ কথা প্রকাশ করবে না। তারাই রটনা করবার মূল।

এই সময়ে স্বামী শারদানন্দের একটি দশম বর্ষীয়া কন্যা উমাশশী আসিয়া বলিল—বাবা, ভাল ফল বিক্রী করতে এসেছে, মা নিতে বল্যেন।

স্বামীজী।—কই মা উমা? তাকে ডাক দেখি।

উমা।—ওগো, এ দিকে এস গো।

তখন আম জাম পেয়ারা লিচু প্রভৃতি রসাল ফল পূর্ণ ডালি মস্তকে লইয়া ফল-ওয়ালী শারদানন্দের সম্মুখে গিয়া ডালি নামাইল। শারদানন্দ তাহাকে বলিলেন,—একটু ব'স, দেখচি। সুধাংশুকে বলিলেন,—সুধাংশু, তবে তুমি এখন এস।

সুধাংশু।—হাঁ আমি এখন আসি। আমি শীঘ্রই যাত্রা করব।

স্বামীজী।—শোন, এক মাসের মধ্যে যাতে সকলকে নিয়ে কাশী যেতে পার, সেই রূপ বন্দোবস্ত করবে। আমি সেই রূপ করবার জন্য যোগেশ্বরকে পত্র লিখে তোমার নিকট এখনি পাঠিয়ে দিচ্চি। তুমি সেখানে গিয়েই আমাকে সমস্ত লিখবে।

সুধাংশু "এখন আমি আসি" বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

স্বামীজী তখন ফল-ওয়ালীর নিকট নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ক্রয় করিয়া মূল্য দিলেন, ও কন্যা উমাশশীকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন,—উমার সঙ্গে যাও, অন্দরে দিয়ে এস।

উমাশশীর সহিত ফল-ওয়ালী অন্দরাভিমুখে চলিল, যাইতে যাইতে উমাশশীকে বলিল,—উমাশশী, কাশী যাচ্চে কে?

উমা।—সুধাংশুর বিয়ে, কাশীতে হবে, মা বলছিলেন, শোন নাই? শীঘ্র তারা কাশী যাবে।

ফল-ওয়ালী।—হাঁ মা উমা, মেয়ে কোথাকার?

উমা।—মেয়ে রত্নপুরের, মেয়েও কাশী যাবে; সেখানে গিয়ে দেবীর আশ্রমে বিয়ে হবে। তুমি জান না?

ফল-ওয়ালী।—হাঁ হাঁ, জানি, তা চল।

ফল-ওয়ালী উমাশশীর সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিল। ফলগুলি নামাইয়া দিয়া সে গৃহিণীর সঙ্গে অনেক গল্প আরম্ভ করিল, পরে নানা কথা উত্থাপন করিয়া গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিল। একটু পরে সে একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে দেখিয়া বলিল—হাঁ গা, আমি একটু জল খাব, আমায় একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পার?

দাসী একটি ঘটিতে শীতল জল আনিয়া দিল। ফল-ওয়ালী বলিল,—এদিকে একবার এস, আমরা ছোট জা'ত, আমার হাতে জল ঢেলে দেও, আমি খাই।

দাসী ফল-ওয়ালীর হাতে জল ঢালিয়া দিবার জন্য একটু দূরে গেল। ফল-ওয়ালী বলিল,—হাঁ গা, বাবু বলছিলেন, "বিয়ে হবে", কার গা? যত ফল লাগে, আমায় বলবে, আমি দেব।

দাসী।—ওগো, সে এখানে হবে না। স্বর্ণপুরের এক মেয়ের বিয়ে হবে। সে কাশীতে হবে।

ফল-ওয়ালী।—কবে হবে গা?

দাসী।—শুন্‌চি শীঘ্রই হবে। এখন মেয়ে নিয়ে কাশী যেতে পারলেই হয়।

ফল-ওয়ালী জল পান করিয়া আবার গৃহিণীর নিকটে গিয়া বলিল, মা, তবে এখন আসি?

গৃহিণী বলিলেন,—এস, তুমি বেশ মানুষ, এমনি ফল আবার নিয়ে এস; তোমার নাম কি গা?

"আজ্ঞে আমার নাম বিলাসিনী, আবার আসব।"

এই বলিয়া ফল-ওয়ালী ডালি মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল।

সে রাজ-নগর হইতে বহির্গত হইয়াই তাহার ফলের ডালি দূরে নিক্ষেপ করিল; পরে সে বীরসিংহের কথা ভাবিতে ভাবিতে ও মনে মনে হাসিতে হাসিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে যশোরাভিমুখে চলিয়া গেল।

অষ্টম কথা।

পর্ণাশ্রম।

স্বামী শারদানন্দের উপদেশানুসারে সুধাংশু রত্নপুরে গমন করিলেন। সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটি উন্নত-বক্ষ প্রশান্ত যুবক গ্রাম্য পথ দিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, যোগেশ্বর মহাতীর্থের বাড়ী কোন দিকে?

যুবক উত্তরাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন ও বলিলেন—ঐ যে দূরে বড় বাড়ীটি দেখা যাচ্ছে, ঐটি যোগেশ্বর মহাতীর্থের বাড়ী। আপনি কোথা হতে আস্‌চেন?

সুধাংশু।—আমি রাজ-নগর হতে আসছি।

যুবক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজ-নগর হতে? আপনার নাম?

সুধাংশু।—আমার নাম সুধাংশু-শেখর শর্ম্মা। মহাশয়ের নাম?

যুবক সুধাংশুর নাম শুনিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই সুধাংশুর বিষয় সমস্ত শুনিয়াছেন। এক্ষণে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কান্তি ও অপূর্ব্ব মুখশ্রী সন্দর্শনে তাঁহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তিনি একদৃষ্টে সুধাংশুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন; একটু নীরব থাকিয়া পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, অাঁ? আমার নাম? আমার নাম অভিরাম দেব।

এবার সুধাংশু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ওঃ! আপনি মহাতীর্থের ভ্রাতা? আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হল।

অভিরাম।—আপনি কোথা যাবেন?

সুধাংশু।—আমি একটি কার্য্যোপলক্ষে এখানে এসেছি। এক্ষণে মহাতীর্থের সহিত একবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা আছে। তাঁকে দর্শন করেই বাড়ী ফিরে যাব।

সুধাংশু যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহা অভিরামের বুঝিতে বাকি থাকিল না। তিনি উদ্দেশ্য বুঝিয়াই বলিলেন, ভাল, আচ্ছা যান। কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

সুধাংশু।—না, আমি নিজ কার্য্যেই এসেছি। ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে আপনি জানেন কি?

অভিরাম ভূপেন্দ্র-নারায়ণের উপর বিষম বিরক্ত, তাই বলিলেন—

হাঁ, তাঁকে জানি, বেশ জানি। যত কুলোকের সঙ্গে তাঁর অবস্থিতি, লোকের অনিষ্ট চেষ্টাই তাঁর কার্য্য। তাঁর মত লোকের এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত নয়।

সুধাংশু।—সে কি? আপনি বোধ হয় তাঁকে জানেন না! তিনি ত খুব ভাল লোক।

অভিরাম।—হাঁ, হাঁ, সবই জানি, তাঁর গুণের কথা সবই শুনেছি! তা যান, আপনি যান, যেখানে যাচ্ছেন যান।

এই বলিয়া অভিরাম চলিয়া গেলেন্। সুধাংশু অভিরামের বাক্যে মর্ম্মাহত ও ম্রিয়মান হইয়া মহাতীর্থের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাতীর্থকে সংবাদ দেওয়া মাত্রেই তিনি বহির্দ্দেশে আসিলেন ও সুধাংশুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে না দাঁড়াইয়া গঙ্গার ধারে গমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে গঙ্গা-তটে একটি বান্ধাঘাটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহাতীর্থ বৃদ্ধ, স্থূলকান্তি পুরুষ, নবঘন বর্ণ—মুখশ্রীতে যেন যৌবনের তেজোরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে। সুধাংশু যুবা পুরুষ, তথাপি মুখশ্রীতে যেন বাল্যসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা টল-টল করিতেছে।

মহাতীর্থ বলিলেন,—তোমার নাম সুধাংশু? কখন এলে?

সুধাংশু প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমি প্রাতেই এসেছি! স্বামী শারদানন্দ আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

মহাতীর্থ।—এই আমাদের প্রথম দেখা! শারদানন্দের

পত্রে পূর্ব্বেই আমি সব জেনেছি ? আমি মনে করেছিলাম,—তুমি যুবা, এখন দেখছি বালক।

সুধাংশু।—আমিও বোধ করেছিলাম যে আপনি বৃদ্ধ, এখন দেখলাম, যুবা।

মহাতীর্থ।—বিশ্বপ্রেম অমৃতের সাগর ; তাতে ডুবে থাকলে জরা আক্রমণ করতে পারে না। শারদানন্দ কোথায় ?

সুধাংশু।—তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। রাজা বীরসিংহের সঙ্গে সততই বিবাদ চলছে। আমি একাকীই এসেছি। তিনি এই পত্র দিয়েছেন।

মহাতীর্থ পত্রখানি লইয়া খুলিয়া পাঠ করিলেন, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন—এ সব কঠিন প্রতিজ্ঞার কাজ। যদিও তুমি চক্রের অন্তর্গত, কিন্তু গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যের জন্য নূতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক ; তা যদি হয়, তবে এমন কি কার্য্য আছে, যা সিদ্ধ হয় না ?

সুধাংশু।—দেব, গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে আমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। তৎ সম্বন্ধে আপনার নিকটে আরও উপদেশ লওয়া আমার ইচ্ছা।

মহাতীর্থ।—বৎস, সাধারণ লোকে মনে করে, সংযম অভ্যাস করা বড়ই কঠিন। তারা জানে না যে অদ্য যা কঠিন বোধ হচ্ছে, অভ্যাসের গুণে দশ দিন পরেই তা অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে আসবে। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস না করলে তেজঃ ধারণ হয় না। তেজঃ ধারণ না হ'লে ইন্দ্রিয় জয় হয় না। তেজঃই আনন্দময় ব্রহ্মের কণিকারূপে অবতীর্ণ হন।

শোণিতের সারভাগই তেজঃ। রক্তের মধ্যস্থ প্রাণস্বরূপ

পরমাণুগুলি, দুগ্ধ মন্থনে নবনী উত্থানের ন্যায়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে রক্ত হতে পৃথক হয়ে পড়ে, ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, পরে অধঃপাতিত হয়। রক্ত হতে পৃথক হয়ে তেজঃ কণিকা আর হাল্‌কা রক্তে তিষ্ঠিতে পারে না। দুই এক বিন্দু ননী ঈষৎ প্রস্তুত হলেই আর কি দুগ্ধে মিশ্রিত হয়? প্রাণস্বরূপ শোণিতের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার অংশ নষ্ট হলে কার মনে না কষ্ট হয়? ঐ সার-অংশ ধারণ করলেই ক্রমে দেহ মন ও মস্তিষ্কের তেজঃ ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। ঐ ঘনীভূত দৃঢ়তা-প্রাপ্ত তেজকে ওজঃ ধাতু বলে। শুক্রধাতুই প্রাণ, ওজঃ ধাতু মহা প্রাণ।

মদ্য মাংসাদি ব্যবহার ক'রে এই প্রাণবিন্দু ধারণ করা যায় না। এ জন্য যোগের আসনাদি ক্রিয়া ও আহার্য্য বস্তুর গুণাগুণ অবগত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দিষ্ট আহার বিহারই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

তেজঃ ধারণেই প্রেমস্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়, তেজঃক্ষয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় না, হ্রাস হয়। যদি দেশের উন্নতি চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজে এই অমৃতের পথে অগ্রসর হও।

গীতা ও চণ্ডী কণ্ঠস্থ করচ ত?

সুধাংশু।—হাঁ, তা করচি। দেব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ত আছিই, নূতন প্রতিজ্ঞাতেও সম্মত।

মহাতীর্থ।—এই বিবাহে যদি বিপদ ঘটে?

সুধাংশু।—বিপদকে আলিঙ্গন করতেই এসেছি। বিপদ ত মানুষের চিরসঙ্গী!

মহাতীর্থ। ভাল, সঙ্গে এস। এখানে দাঁড়ালে লোকে চিন্‌বে। ঐ যে একটা ছোট কুড়ে ঘর দেখছ, ঐ ঘরের

দুয়ারে গিয়ে আমার নাম কর, আশ্রয় পাবে। আমি এখন যাই।

সুধাংশু, নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আবার কখন দেখা হবে?

"সন্ধ্যার পরে"। এই বলিয়াই মহাতীর্থ রাজপথে চলিয়া গেলেন। সুধাংশু আস্তে ব্যস্তে সেই কুটীরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন—কে আছে?

একটী ব্রহ্মচারিণী দ্বার খুলিয়া দিলেন। সুধাংশু তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন, পরে বলিলেন—মা, যোগেশ্বর মহাতীর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ব্রহ্মচারিণী।—আসুন, আসুন।

সুধাংশু প্রবেশ করিলেন, ভিতরে গিয়া দেখিলেন,—একটি নির্জ্জন আশ্রম। ফুলের সৌরভে ও ধূপের গন্ধে ঘর দ্বার প্রাঙ্গন আমোদিত। কোনও দিকের কোনও শব্দ শুনা যায় না, বাড়ীখানি যেন নিঃস্তব্ধ স্থির ধ্যানস্থ। চারি খানি কুটীর আছে, একটি ব্রহ্মচারিণীর থাকিবার ঘর, একখানি মা যোগ-মায়া ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দির, আর দুইখানি গৃহকর্ম্মাদি ও অতিথি সেবার জন্য রহিয়াছে। ঘর গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোময়-মার্জ্জিত। অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া আছে, তাহাতে মধুমক্ষিকা ও ভ্রমর উড়িতেছে বসিতেছে ও ছুটিতেছে। ফুল গাছের মাঝে মাঝে তুলসী গাছ, তুলসী-তলা সুন্দর মৃত্তিকায় মার্জ্জিত, তুলসী মঞ্জরীর গন্ধে বাড়ীখানি পবিত্র হইতেছে। মধ্যস্থলে একটি বিল্ব বৃক্ষ, সেই বিল্ব মুলে একটী মৃত্তিকার বেদী। গৈরিকবসনা

ব্রহ্মচারিণী সুমধ্যমা কেশবেশ-হীনা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পশ্চিম-দেশীয়া ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনি বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া উত্তম বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, পরিষ্কার বাঙ্গলা কথা বলেন, আবার মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী কথাও বলিয়া থাকেন। ভাগবত খানি তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাঁহার মুখ খানিতে মৃদুহাসি লাগিয়া রহিয়াছে। নির্ভয় অসঙ্কোচ নয়ন যুগল যেন জগতের দুঃখরাশি অগ্রাহ্য করিয়া প্রভাতের পদ্ম ফুলের ন্যায় ফুটিয়া আছে। তিনি মধ্যে মধ্যে মধুর কণ্ঠে গান করিয়া আশ্রমটিকে মধুময় করিয়া রাখেন।

একটি ঘরে অনতি উচ্চ একটি বাঁশের মাচান, তাহার উপরে এক খানি কম্বল বিছান আছে। ব্রহ্মচারিণী সেই ঘরে সুধাংশুকে বিশ্রাম লাভ করিতে বলিলেন।

সুধাংশু গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া সেই কুটীরে বসিয়া আহ্নিকাদি সমাপন করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি এই আশ্রমেই বাস করেন?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, বাবা, মহাতীর্থ আমার গুরুদেব। আমি তাঁর কন্যা রূপে এই "পর্ণাশ্রমে" থাকি। আমার গুরু-দত্ত নাম দেবীদাসী। সর্ব্বদাই আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত কর্‌তে হয়। তোমাকে দেখে আজ বড়ই সুখী হ'লাম। তুমি যে জন্য এসেছ সে বিষয় বাবা আমাকে সব বলেছেন। তুমি বিশ্রাম কর, আহারের পরে সে কথা হবে।

মধ্যাহ্নের কার্য্য সমাপন করিয়া সুধাংশু যখন কুটীরে বিশ্রাম করিতেছেন তখন ব্রহ্মচারিণী আসিয়া বসিলেন।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের অনেক কথা বলিলেন ও শুনিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ব্রহ্মচারিণী সেই পর্ণাশ্রমের আরত্রিক কার্য্যাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহাতীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটি যুবক। তিনি তেজস্বী, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট বিভূতি যুক্ত, উজ্জ্বল চক্ষু প্রায় স্থির, বদন মণ্ডল প্রসন্ন, গাম্ভীর্য্য জড়িত।

যোগেশ্বর মহাতীর্থের কতকগুলি শিষ্য আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই যুবকই তাঁহার প্রধান শিষ্য, নাম অমরেন্দ্র নাথ। ইঁনি কলিকাতার নিকটে কাশীপুরে বাস করেন, কিন্তু অনেক সময়ই মহাতীর্থের নিকটে থাকেন। অমরেন্দ্র নাথ কৌমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

সুধাংশু দুই জনকেই প্রণাম করিলেন, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাতীর্থ বলিলেন,—

আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক। সব ভার এখন তোমার উপরে। আমার শিষ্য এই অমরেন্দ্র নাথ যথা সাধ্য তোমার সহায়তা করবেন।

সুধাংশু অমরেন্দ্রের নিকটে গিয়া বলিলেন,—দাদা, তোমার কথা স্বামীজী আমাকে রাজনগর হতেই সব বলে দিয়েছেন। তুমি ত সবই অবগত আছ, আমার সহায়তা আবশ্যক। তুমিই এখন ভরসা।

অমরেন্দ্র।—সে বিষয় তোমার আর অধিক বলবার আবশ্যক

নাই। গুরুদেব তোমার সম্বন্ধে সকল কথাই আমাকে বলে ছেন। সে সবই আমি স্থির করেছি। তবে একটা সন্দেহ আছে, কি জানি, অভিরাম যদি বাধা দেয়—

সুধাংশু।—আমি এখানে এলে প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর মনোভাব বুঝে দেখলাম,—তিনি বাধা দেবেন। সে বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। সময়ে যা ঘটে ঘটবে।

তখন সুধাংশু প্রথম সাক্ষাতে অভিরামের ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহারা দুই জনে অনেক পরামর্শ করিলেন। কি রূপে কার্য্য করিতে হইবে, অমরেন্দ্র তৎ সমস্তই সুধাংশুকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং প্রস্তুত হইয়া থাকিবার জন্য বিশেষ উপদেশ প্রদান করিলেন।

শেষে অমরেন্দ্র বলিলেন, সুধাংশু, এখন আমরা আসি, কথাগুলির যেন অন্যথা না হয়।

মহাতীর্থ বলিলেন,—সুধাংশু, সব শুনেছ? ঠিক সময়ে যেন কার্য্য হয়, নতুবা সব গোলমাল হয়ে যাবে। এখন তুমি নিজের কার্য্য কর, আমরা চল্লাম। দেবী তোমার সহায়, ভয় কি? "বয়ম্ অজরামরাঃ।"

সুধাংশু প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি প্রস্তুত থাকতে পারি।

মহাতীর্থ ও অমরেন্দ্র গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নবম কথা।

তিন খানি পত্র।

রজনীযোগে আশ্রমের কার্য্যাদি শেষ করিয়া ব্রহ্মচারিণী সুধাংশুর নিকটে গিয়া বসিলেন।

সুধাংশু বলিলেন,—দিদি, কুমারীকে আমি দেখি নাই।

ব্রহ্মচারিণী।—সুধাংশু, তোমাকে ত আমি কুমারী সম্বন্ধে সমস্তই বলেছি।

আমাদের কুমারীর মনটি বড় পবিত্র। বোধ হয় যেন সে মন এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গ হতে পড়েছে। কুমারীর প্রেমবিগলিত চক্ষু দুটি যে একবার দেখেছে, সে আর ভুলতে পারবে না। কুমারীর অবয়বের যে কিরূপ কমনীয় ভাব, সে কথা বলে উঠা যায় না। কমলের গায়ে রবিকর সহ্য পায়, কুমারীর অঙ্গ রবিকরে ননীর ন্যায় বিগলিত হয়। ননীর গায়ে তাপ লাগলে ননী গলে, কিন্তু অন্যের গায়ে তাপ লাগলেই কুমারীর হৃদয় গলে যায়। অমৃত মৃতসঞ্জীবনী, শুনেছি, দেখি নাই, কিন্তু দেখেছি,—কুমারীর বাক্যামৃত যথার্থই মৃত সঞ্জীবনী; সে বাক্যে তাপিত প্রাণ জুড়ায়। সে বাক্য শুনলে অন্নহীনের ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা থাকে না। এমন রত্নকে বিদায় দিয়ে রত্নগর্ভা জননী কেমন করে জীবন ধারণ করবেন? হয়ত গঙ্গাগর্ভেই ঝাঁপ দেবেন! আমিও যে কোথায় যাব, বলতে পারি না। তাতেও আমার ক্ষোভ নাই, কিন্তু কুমারীকে স্বামী-সুখে সুখী হ'তে দেখলেই আমি কৃতার্থ হব।

এই অত্যধিক স্নেহ বশেই জননী এই বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি একটি সুপাত্র এনে গৃহ-জামাতা রূপে রাখলেই পারেন, তাও যে কেন করেন না, তা কেউ বুঝতে পারে না। তিনি বলেন "পোষ্যপুত্র আর ঘর-জামাই ঘর নষ্টের গোড়া"। তাই তিনি কুমারীকে কখনও বক্ষে ধারণ করে রাখেন, কখনও চক্ষে চক্ষে রাখেন। এই বিবাহের কথা শুনে তিনি বলেছেন, তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন, তথাপি কুমারীকে গৃহ হতে বহির্গত হ'তে দেবেন না। আর কোথায়ই বা সেই দেব-কন্যার উপ-যোগী দেবপুত্র মিলবে? সেই পদ্মিনী পাছে কোনও অগ্নি শীখায় নিপতিত হয়, এই ভয়েই জননী আকুল হন। সবই তোমাকে বল্যাম; যদি গুণের বিষয় জেনে থাক, তবে দেখার আবশ্যক কি? রূপজমোহ-উৎপাদক দর্শনাদি গুরুদেবের নিষেধ। তবে কুমারীর রূপলাবণ্যের ও গুণের কথা এই আমি তোমাকে বল্যাম। বলতে বাধা নাই।

সুধাংশু।—আপনাকে অধিক আর বলতে হবে না।

আমি এক খানি পত্র লিখে দেই, আপনি তার উত্তর এনে দিলেই হল।

ব্রহ্মচারিণী।—তবে তাই ভাল।

সুধাংশু তখন কাগজ বাহির করিয়া এক খানি পত্র লিখিলেন। পত্র লিখিয়া পাঠ করিলেন,—

চারুশীলে, আমি তোমার নাম শুনিয়াছি, দেখি নাই। তোমার গুণের বিষয়ও বিশেষ রূপ শুনিলাম। তুমি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা, তাহাতে যদি আমার সহধর্ম্মিণী হও, তবে আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দেন নাই। পরে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অন্ন প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন,—

"অহো বয়ং ধন্যতমাঃ যেষাং নস্তাদৃশী স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ"।

অর্থাৎ যাহাদের পত্নীগণ এতদূর ভক্তিমতী, সেই আমরা ধন্য হইলাম!—যে পত্নীগণের অপার ভগবদ্-ভক্তি দর্শনে শ্রীহরিতে আমাদের স্থির বুদ্ধির উদয় হইয়াছে।

শুভে, তোমার গুণের বিষয় ও ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, পূর্ব্ব সুকৃতি বশেই আমি তোমার পাণি গ্রহণে বাসনা করিয়াছি। তোমার সঙ্গলাভে আমি ধন্য হইব। আমার কর্ত্তব্য আমি এখন পালন করিব, তোমার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি। ইতি

তোমার সঙ্গাভিলাষী

সু—

সুধাংশু পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্রহ্মচারিণীর হস্তে দিলেন। ব্রহ্মচারিণী পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন; ধীরে ধীরে গিয়া মহা-তীর্থের বাটিতে উপস্থিত। তিনি অন্তঃপুরে কুমারীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুমারী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া দিব্যাসনে উপবেশন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া কুমারী বলিলেন,—কি, ব্রহ্মচারিণী দিদি, কি মনে ক'রে?

ব্রহ্মচারিণী নিকটে গিয়া এক খানি আসনে উপবেশন করিলেন ও বলিলেন,—কুমারি, ক'দিন থেকে তোমাকে বলব বলব মনে করছি, দেখ, আমাদের পাড়ার মনীর মা বড়

দুঃখিনী। ননী মারা পড়ার পর থেকে তার দুঃখের সীমা নেই। এখন পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, দেখে আমার বড় দুঃখ হয়।

কুমারী।—দিদি, আমাকে ত তুমি এক দিনও সে কথা বল নাই। আহা, একটি টাকা নিয়ে যেও, তুমি তাকে একখানি কাপড় কিনে দিও। আর তাকে বল্‌বে, সে যেন দুপুর বেলা থালা নিয়ে আসে, আমি তার জন্য প্রতিদিন ভাত রাখব। দাসীদের কাছে যেন চায় না, আমার কাছে আসতে ব'ল।

ব্রহ্মচারিণী।—আহা কুমারি, তা হলে সে বাঁচে। তুমি তাকে দুটি দুটি অন্ন দিও। অন্নদানের তুল্য পুণ্য আর নাই।

কুমারী।—দিদি, আমি না খেয়েও তার জন্য রেখে দেব, তুমি তাকে আসতে ব'ল।

ব্রহ্মচারিণী।—কুমারি, তোমার জন্য এক খানি পত্র এনেছি, প'ড়ে দেখ।

কুমারী ব্রহ্মচারিণীর হস্ত হইতে পত্র খানি লইয়া পাঠ করিলেন। ব্রহ্মচারিণী দেখিলেন, পত্র পাঠ করিতে করিতে একটি নির্ম্মল মুক্তা ফল অজানিত ভাবে কুমারীর মুক্তা-বর্ষী নেত্রকোণে উদয় হইয়াছে। কুমারী কিছুক্ষণ ব্রহ্মচারিণীর হস্ত মধ্যে হস্ত রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

ব্রহ্মচারিণী দিদি, হয়ত বিবাহ ক'রে শেষে একটা জড়ীভূত অবস্থায় প'ড়ে, সংসার-সমুদ্রে একবারে ডুবে যাব, আর উঠতে পারব না, তখন কি হবে?

ব্রহ্মচারিণী।—কুমারি তা যাবে না, যাবে না। একবারে ডুবে যাবে না। সংসারে পড়া সমুদ্রে পড়ার মত নয়, সেটি বিষম ভুল। সংসারে পড়া ঠিক যেন লুচি ভাজার মত। এক কড়াই ঘিয়ের মধ্যে একখানা লুচি ফেলে দিলেই একবারে ডুবে যায়, বোধ হয় যেন আর ভাসবে না; কিন্তু একটু ভাজা ভাজা হলেই ভুস ক'রে ভেসে ওঠে, তখন তাকে লৌহদণ্ড দিয়ে শতবার ডুবাও, কিছুতেই ডুবে থাকে না, পুনঃ পুনঃ ভেসে ওঠে। ঠিক সেইরূপ সংসার-কটাহে প্রথমে ডুবে গেলে আর উঠতে পারব ব'লে কারো ভরসা থাকে না, একটু ভাজা ভাজা হলেই সে ভাসতে থাকে, আর ডুবালেও ডোবে না। দেবীই ডুবান দেবীই ভাসান, কুমারি, দেবীর শরণাপন্ন হও।

তখন কুমারী বলিলেন,—ব্রহ্মচারিণী-দিদি, আচ্ছা, সত্য বল, কিরূপ দেখলে?

ব্রহ্মচারিণী।—আমি ত আগে সবই ব'লে গিয়েছি। রূপে কি করে? গুণেরই আদর। রূপের কথা শুনতে চাও ত বলি, বলায় দোষ নাই।

আহা, এখনও বয়স কাঁচা! চন্দ্র-বদনে যেন জ্ঞান-সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে! দেখতে যেন দেবপুত্র!

কুমারীর নয়ন-নলিনীর দুইটি দল অবনত হইল, তিনি নীরবে মৃত্তিকার উপরে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী আবার বলিলেন,—কুমারি শুনলে?

কুমারী।—আবার বল।

তখন ব্রহ্মচারিণী কুমারীর মুখের নিকটে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন—

কুমারি, তার কথা আর বলব কি? শুনবে যদি ত বলি, বলায় দোষ নাই।

তোমার ঐ স্বর্ণ-বর্ণ, গর্ব্ব তার চূর্ণ,
সেই দেব-কান্তি যেন ব্রহ্ম-তেজে পূর্ণ!
সে মুখে যে সূর্য্য-শোভা, নাই তার তুল,
পদ্ম-মুখি, হতে হবে সূর্য্য-মুখী ফুল।
ফুটবে এবার, বুঝি তোমার, নয়ন-পদ্মপর্ণ,
দেখে নেত্র, প্রভাতের তরুণ অরুণ বর্ণ!
তোমার ঐ দন্তপাঁতি কুন্দ কুসুম আঁকা,
তার দন্তে শরতের চন্দ্র-বিম্ব মাখা!
যে চাঁদ ধ'রবে তোমার বিম্বাধর-ফাঁদ,
তার অধরে নাচে সেই চতুর্থীর চাঁদ।
তোমার মুখ দেখে বুঝি পেটে আছে ক্ষুধা,
সে অধরে এনেছে সে সুধাকর-সুধা!
স্বর্গচ্যুতা স্বর্ণলতা দেবকন্যা তুমি,
এসেছে দেব-কুমার, বুঝি তব স্বামী।

কুমারী বলিলেন, ব্রহ্মচারিণী দিদি, সে কথা তোমায় কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তুমি দেখ দেখি, মা আসছেন কি না? আমি পত্রখানি লিখি।

ব্রহ্মচারিণী উঠিলেন, চারিদিক দেখিয়া আসিয়া বলিলেন,—কই, কোথাও কেউ নাই!

তখন কুমারী কাগজ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে একখানি পত্র লিখিলেন; লিখিয়া বলিলেন—ব্রহ্মচারিণী দিদি, এই নেও, কাকেও দেখিও না।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—একি গো? তিন ছত্রেই পত্র সারা? ভাল, যা দিলে তাই দেব, আমি পত্র-বাহক মাত্র।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। "তবে এখন আসি"—বলিয়া ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গেলেন; বহির্দ্বার দিয়া যাইবার সময় চণ্ডী-দালানে বসিয়া মহাতীর্থ জপ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—কে যায়?

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দিলেন। মহাতীর্থ বলিলেন, ব্রহ্মচারিণি দুখানি পত্র আমার ঠিকানায় এসেছে, নিয়ে যাও।

ব্রহ্মচারিণী গিয়া পত্র দুইখানি লইয়া বর্হিগত হইলেন এবং মধুর তানে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে আশ্রমে গিয়া, সুধাংশুর হস্তে পত্রগুলি অর্পণ করিলেন।

সুধাংশু পত্রগুলি গ্রহণ করিয়া কুটীরে বসিয়া পাঠ করিলেন।

প্রথম পত্রখানিতে এই রূপ লেখা আছে—

শ্রীপাদপদ্মেষু।

আমি দুর্ব্বলা, আগেই অশ্রু আসিয়া সকল কার্য্যে বাধা দেয়। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সহায় জানিয়া সুভদ্রার ভয়ের কারণ ছিল না। আমার একহস্ত ধরিয়াছেন দাদা মহাতীর্থ, আর এক হস্ত—

সেবিকা—

দ্বিতীয় পত্রখানি এই রূপ—

সোদরাধিক ভাই, তোমার পত্র পাইয়া সমস্তই অবগত হইলাম। আমি ৺বিশ্বনাথের পুরীতে মাতাজী প্রণব-দেবীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছি। দেবী তোমার ভবিষ্যৎ বলিলেন, শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সে বিষয় সমস্ত পরে জানিতে পারিবে। দাক্ষিণাত্যে যোগাত্মার আশ্রমে দেবী বল্লভা-

সখীর সহিত সাক্ষাত করিয়া আমি কাশ্মীর চক্রে আসিয়াছি। তুমি বারাণসী আশ্রমে পৌঁছিলেই আমি সবান্ধবে গিয়া উপস্থিত হইব, তাহার অন্যথা হইবে না। চির মঙ্গলমিতি—"বয়ম্ অজরামরাঃ"।

তোমার "অল্‌টার্ ইগো" সুরেশ।

তৃতীয় পত্রখানি এইরূপ,—

প্রাণ-প্রতীম সুধাংশু,—

স্বামী শারদানন্দের নিকট সমস্ত শুনিলাম। মাতা প্রণব-দেবীর আদেশ প্রতিপালনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত, জানিবে। তবে এ দিকে বীরসিংহ, ও দিকে অভিরাম, কি করিবে বলিতে পারি না। যে রূপই হউক, আমি সকল সংবাদ রাখিতেছি, তোমার চিন্তার কারণ নাই। তুমি বারাণসী পৌঁছিবার অগ্রেই স্বামীজী তথায় গিয়া পৌঁছিবেন। আমি পরে যাইব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ইতি

তোমার "দ্বিতীয় আমি" ভূপেন্দ্র।

পত্রগুলি পাঠ করিয়া শেষে সুধাংশু দেখিলেন রাত্রি অধিক হইয়াছে; তখন তিনি শয়ন করিলেন ও চিন্তামগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মচারিণী সুধাংশুকে শয়ন করিতে দেখিয়া নিজেও শয়ন করিতে গমন করিলেন।

দশম কথা।

সম্মতি।

পর দিনে মহাতীর্থের বাটীর উত্তর খণ্ডে অন্তঃপুরে কুমারী মাধ্যাহ্নিক সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া দ্বিতলস্থ বিশ্রাম গৃহে উপবেশন করিয়াছেন, বয়স্যাগণ চারিদিকে গোলাকারে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন, বোধ হইতেছে যেন সেই গৃহে চন্দ্রশোভা হইয়াছে।

দাসীরা কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ তাম্বুল সজ্জা করিতেছে, কেহ বা মালতী, মাধবী, চম্পক, গোলাপ নানাবিধ পুষ্প আনিয়া পুষ্পাধারে সজ্জিত করিতেছে। কেহ বা মালা গাঁথিবার জন্য সূত্র মার্জ্জিত করিতেছে। কুসুম-সৌরভে সেই গৃহ আমোদিত হইতেছে। কেহ বা সুবাসিত বারি আনিয়া জলপাত্র পূর্ণ করিতেছে; স্বর্ণ-পিঞ্জরে বসিয়া শুক-শারী মাঝে মাঝে "কুমারী! কুমারী!" বলিয়া ডাকিতেছে।

কুমারী বয়স্যাগণকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন; অভিমন্যুর পতনের পরে উত্তরার শোক বৃত্তান্ত বর্ণনা পাঠ করিতেছেন, আর মুক্তাবর্ষী দুইটী নেত্রে ঝর্‌ঝরে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে। কুমুদ-মালার ন্যায়, সখীগণের সজল নয়ন কুমারীর চন্দ্র-বদন দর্শন করিতেছে! অতি বৃষ্টিতে যেমন কমল-দল সিক্ত ও বিশৃঙ্খল হয়, সকলের আয়ত নেত্রের সেই দশা ঘটিয়াছে।

চন্দ্রমা-নক্ষত্র খচিত একখানি সুকোমল সুনীল পশম-আসনে

কুমারী উপবিষ্টা। পার্শ্বদেশে স্বর্ণমণ্ডিত কয়েকখানি গ্রন্থ বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া আছে।—একখানি ভাগবত, একখানি মেঘদূত, একখানি গীতা, একখানি চণ্ডী।

উত্তরার কথা অনেক ক্ষণ পাঠ করিয়া কুমারী মহাভারত খানি রাখিয়া দিলেন; পরে একবার এ পুস্তকখানি, একবার ও পুস্তকখানি হস্তে লইতেছেন, আর একটু একটু দেখিয়া রাখিয়া দিতেছেন। বয়স্যা সুলোচনা বলিলেন,—ভাই, গীতাখানি পড়, একটু শুনি।

কুমারী গীতাখানি হস্তে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সকলে শুনিতেছেন; কিছুক্ষণ পরেই ইন্দুমতী বলিলেন,—ভাই, দেখ দেখি, কে যেন উপরে আসছে।

সুবাসিনী একটু উঠিয়া গিয়াই দেখিলেন, মহাতীর্থ আসিতেছেন। মহাতীর্থ আসিয়া কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিয়া বয়স্যাগণ একে একে উঠিয়া গেলেন, দাসীগণও পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। মহাতীর্থ প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নবোদিত চন্দ্র-কিরণের ন্যায় কুমারীর নবোদিত যৌবন-শ্রী কক্ষটি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

কুমারি, কি পড়ছ?

কুমারী বলিলেন—দাদা এস, বস। এ খানি গীতা, তুমি দিয়েছিলে, সেই খানি, আর এ খানি চণ্ডী।

দাদা, ত্যাগী আর সন্ন্যাসী কি? নিষ্কাম ভাব কি রূপ? ভাল বুঝতে পারি না। শক্তিই বা কি রূপ? চণ্ডীতে দেখি, কেবল মারা কাটার কথা লেখা আছে। দাদা, মারা-কাটাতেই

কি শক্তি প্রকাশ? আবার মারা-কাটা ব্যতীত আত্মরক্ষাই বা কি রূপে হয়? আমি চণ্ডীর এ সব কথা বুঝতে পারি না।

মহাতীর্থ বলিলেন,—কুমারি, চণ্ডীর উদ্দেশ্য অসুর-বধ নয়। "আত্ম রক্ষা ও ইন্দ্রিয় সংযমই" চণ্ডীর উদ্দেশ্য। আর্য্যগণ আত্ম রক্ষাই জানিতেন, সেই আত্ম রক্ষার জন্য যে শক্তি আবশ্যক, সে শক্তি পাশব শক্তি নয়। "বাহুবল যার, অধিকার তার" একথা আর্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন—শক্তি পশুত্ব নয়, শক্তি দেবত্ব।

"ত্যাগ ও সংযমেই" দেব-শক্তির বিকাশ হয়।

এই মহা নিঃস্বার্থতা বা ত্যাগই শক্তি। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগে সমর্থ সে সেই পরিমাণে শক্তিমান্ বলতে হবে। মুনি-ঋষিগণ এই ত্যাগ-শক্তিতেই রাজ্যেশ্বর গণকে মুষ্টির মধ্যে রেখেছিলেন। চাণক্য মগধের রাজ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর উপদেশেই রাজা চন্দ্র গুপ্ত সার্ব্বভৌম পদে প্রতিষ্ঠিত হন। চাণক্যের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অন্যান্য রাজন্যবর্গ কম্পিত ও পরিচালিত হ'তেন। সেই চাণক্য রাজ সভা হ'তে আপন ঘরে যাচ্ছেন, সেই ঘরখানির বর্ণনা শোন,—

"উপলশ কলমেতৎ ভেদকং গোময়ানাং।
বটুভি রুপহৃতানাং বর্হিষাং কূটমেতৎ॥
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমানাভিরাভিঃ।
বিনমিত পটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্॥

এক দিকে শুষ্ক গোময় ভাঙ্গবার জন্য প্রস্তর খণ্ড প'ড়ে আছে। এক দিকে ব্রাহ্মণ বালকেরা কুশতৃণ এনে এনে স্তূপাকার ক'রে রেখেছে। চালের উপর যজ্ঞ-কাষ্ঠ শুকাতে দেওয়ায়, তার

তারে চালের ধারগুলি ঝুলে পড়েছে, এরূপ এক খানি জীর্ণ ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর দেখা যাচ্ছে, তাতেই মহামতি চাণক্য বিশ্রামার্থে প্রবেশ করলেন। এই ত ত্যাগ, এই ত সন্ন্যাস, এইত নিষ্কাম ভাব, এই ত শক্তি।

কুমারি, তুমি ত পড়েছ, ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই এইরূপ ত্যাগী ছিলেন, তাই তাঁদের চরণ-ধূলিতে রাজমুকুট পবিত্র হ'ত।

আধুনিক জটিল রাজনীতি "মারা-কাটার" পক্ষপাতী, কিন্তু সেটি উন্নত আর্য্যনীতির লক্ষ্য নয়। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভর, ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই আর্য্যনি িির লক্ষ্য। কুমারি, তুমি যোগাশ্রার আশ্রমের দেবী বল্লভাসখীর "ভৈরবী চক্রের" কথা শুনেছ কি? তাঁরা এই আর্য্যনীতির পক্ষপাতি। "কূটস্থ-চক্রের" দ্বারা অনেকটা ভবিষ্যৎ জেনেই ঐ চক্রের কার্য্য হয়ে থাকে। যোগীগণ ভ্রূ-মধ্যস্থলে যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, তাকেই 'কূটস্থ চক্র' বলে, বোধ হয় জান।

কুমারী বলিলেন—দাদা, আমি তা শুনেছি।

মহাতীর্থ।—কোথায় শুনলে?

কুমারী।—ব্রহ্মচারিণী-দিদির কাছে।

মহাতীর্থ।—হাঁ, বটে। তা যাক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম, এই বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

কুমারী অবনত নয়নে বলিলেন,—আমি আর কি বলব? দেবীর ইচ্ছা।

মহাতীর্থ বলিলেন,—দেখ, আমি দেখছি, বিশ্বময়ীর ইচ্ছাতেই এ সব হচ্ছে। তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর, সুফলহবে।

এ জগতে ভালবাসা ব্যতীত হৃদয় প্রসারিত হয় না। প্রেম ব্যতীত প্রাণটা ক্ষুদ্র, নীচ হয়ে যায়। প্রবৃত্তি গুলি চেপে রাখলে নিবৃত্তি হয় না, সুপথে, পবিত্র পথে গতি হলেই প্রবৃত্তি গুলি বিকসিত হয়। সেই বিকসিত প্রবৃত্তিই ভগবানকে দেখিয়ে দেয়। প্রবৃত্তি চেপে রাখলে প'চে দুর্গন্ধ ছোটে। পবিত্র প্রেমের ন্যায় এ জগতে উৎকৃষ্ট জিনিষ আর কিছুই নাই। ঐ পবিত্র প্রেমই ঈশ্বর-প্রেমের সোপান। কামিনী-কাঞ্চনের মোহ-বুদ্ধিকে প্রেম বলে না। প্রেমে জড়-সম্বন্ধ নাই। শুধু প্রাণের সম্বন্ধ—আত্মার সম্বন্ধ। প্রেমহীন হৃদয় ভীষণ মঁরু ভূমির সমান। প্রেমহীন লোক আত্মহত্যাকারীর তুল্য। মরুময় শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্ম দাঁড়ান না। কেবল পবিত্র প্রেমেই মানুষের মন "অমরত্বা" অনুভব করে। যে প্রেমে অমরতা-বোধ হয় না, সে প্রেম প্রেমই নয়। সেটি পার্থিব আসক্তি বা মোহ মাত্র। সে মাটির জিনিষ, ঠুক করে পড়বে, আর ভাঙ্গবে।

"প্রেম" মৃত্যুকে তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করে। প্রেমের নদী পৃথিবী হ'তে ঊর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত, ক্রমেই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দেশে গিয়ে, প্রাণকে ভাসিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে তুলে দেয়, শেষে অমর দেশে নিয়ে যায়। সেই দেশে গিয়ে ঐ প্রেমের নাম হয় "অমৃত"। এই প্রেম পরিপক হয়ে পূর্ণতা পেলেই তাকে বলে অমৃত-সাগর। সেই অমৃত-সাগরে ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক এক একটি দ্বীপ মাত্র।

দেখ কুমারী, সুধাংশু আমাকে যে সব পত্র লিখেছে, তার একখানি এই শোন।

এই বলিয়া মহাতীর্থ সুধাংশুর পত্রখানি পাঠ করিলেন,—

"দেব, আমাকে যাহা প্রবোধ দিয়া লিখিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষ বুঝিলাম। ভগবৎ প্রেম ও বিশ্বপ্রেম লক্ষ্য করিয়াই আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। আমি জানি, কেবল পবিত্র প্রেমই অমরতা দিতে পারে। সে প্রেম কামিনী-কাঞ্চনের মোহ নহে। ভগবানের চরণামৃত পান করিতে হইলে, পবিত্র প্রেমের উৎসই খুঁজিতে হয়। জড়ীয় মায়া-মোহকে নষ্ট করিতে হইলে, এই জড়াতীত "প্রেমের" ন্যায় ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই। জন্ম হইতেই ভালবাসার সঞ্চার, আর সেই ভালবাসা নানা অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়া শেষে সেই প্রেমস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্মে উপস্থিত হয় ও পূর্ণতা লাভ করে। আমি শুষ্ক বৈরাগ্যের পক্ষপাতী নহি। প্রেমেরই পক্ষপাতী। শুষ্ক হৃদয়ের হাহাকারের ধর্ম্ম নারকীয় ধর্ম্ম। যাহারা কঠোরতা ভালবাসে, তাহারা কঠোর তপশ্চারণ করুক, বহু তপস্যার ফলে, তবে এই মহাপ্রেমের "অমরতা" বুঝিতে পারিবে। এই প্রেমে, ক্রমে ক্রমে হৃদয় প্রশস্ত হইলে, তবে তাহাতে বিশ্ব-প্রেম প্রতিফলিত হয়, এই আমি জানি।

দেবী ভরসা। আমার সংকল্প স্থির। আর সব আপনি স্থির করিবেন। ইতি—

মহাতীর্থ বলিলেন—কুমারি শুন্‌লে ? এখন কি বল ?

কুমারীর রক্তোৎপল দলের ন্যায় আয়ত নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ মুদিত হইয়াছে, স্থির হইয়াছে, নেত্রকোণে নীরব ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। মহাতীর্থ দেখিয়া দেখিয়া, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—কুমারী আমি এখন যাই, ব্রহ্মচারিণীর নিকট বলবে।

তখন কুমারী অর্দ্ধস্ফুট ভাষে বলিলেন—দাদা, ব্রহ্মচারিণী দিদির নিকট সব বলেছি, তুমি শুনবে।

মহাতীর্থ তখন চণ্ডীদালানের দিকে আপন আসনে চলিলেন। তিনি চণ্ডীদালানে গিয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারিণী বসিয়া আছেন। মহাতীর্থ বলিলেন—ভালই হ'ল, ব্রহ্মচারিণি এসেছ? বল দেখি কুমারীর অভিপ্রায় কি রূপ?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—বাবা, কাল থেকে কুমারীর আহার নিদ্রা নাই; কেবল চিন্তাভারে অভিভূত দেখছি। তাকে এই বিষম চিন্তার অবস্থায় রাখা আর ভাল বোধ হচ্চে না। সময় যাচ্চে, তুমি যা হয়, ব্যবস্থা কর।

মহাতীর্থ বলিলেন, বেশ, তার জন্য চিন্তা কি? আমি সিংহ গ্রামে যাব, সন্ধ্যার পরেই ঘাটে ঠিক থাক্‌বার জন্য বিশু মাঝিকে ব'লে যাব। আর গঙ্গাপারেই প্রহরী ও লোক জন গোপনে রেঁখে যাব। অমরেন্দ্রকে দেবী-দালানে রাত্রে শয়ন করতে বলব। তুমি রাত্রি এগারটার সময় নীরবে কুমারীকে লয়ে অমরেন্দ্রের নিকট দিয়ে যাবে, তা হলেই আর চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। অমরেন্দ্রকে আমি সব বলে ঠিক ক'রে রাখব। কা'ল তার কাছে শুনতে পাবে। এখন তোমার উপরেই নির্ভর। ভাবছি, মায়ের পূজা করেই যাত্রা করব। অমাবস্যাও এসেছে, তুমি সব অয়োজন করতে পারবে?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—বাবা, তোমার আজ্ঞা পেলে কি না করতে পারি?

মহাতীর্থ বলিলেন—আচ্ছা তবে আজ আশ্রমে যাও, আমি জপে বসি। ব্রহ্মচারিণী প্রণাম করিয়া কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন।

একাদশ কথা

গুপ্ত মন্ত্রণা।

পর দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারিণী তাঁহার আশ্রম খানিতে গোময় দিতেছেন। সুধাংশু নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া "বয়ম্ অজরা মরাঃ" ইত্যাদি মহা বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিতেছেন। তখন অমরেন্দ্র নাথ পর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া অমরেন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মচারিণি, কেমন আছ?

ব্রহ্মচারিণী গোময়-হস্তে বলিলেন, দাদা, আর কেমন আছি! জালায় জালায় মরণটা না হয়, তা হ'লেই বাঁচি! "বয়মজরা-মরাঃ"! বাবা বলেছেন—"চির মঙ্গলমিতি"। অমরেন্দ্র বলিলেন—ব্রহ্মচারিণি তুমি একটু কৃশ হয়ে যাচ্ছ কেন?

ব্রহ্মচারিণী।—দাদা, বাবা যে কি সব কথা বলেন, তাই ভেবে ভেবে দিন দিন যেন কেমন একটা "অখণ্ড মণ্ডলাকার" হয়ে যাচ্ছি!

এই বলিয়া ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া উঠিলেন।

তখন সুধাংশু বলিলেন, দাদা, এস এস। অমরেন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন।

সুধাংশু।—দাদা এখন কি মনে ক'রে?

অমরেন্দ্র।—ভাই একটা বিশেষ কথা আছে। একটা বিষম গোলমালের সূত্র পাত হয়েছে, শোন। শেষ পর্য্যন্ত কি হবে, বলতে পারি না।

অভিরামের সঙ্গে প্রতিদিনই আমার কথা হয়। তাঁকে এই পথে আনতে আমি অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর কোন দিকেই বড় বেশী ঝোঁক নাই। তবে কা'ল তিনি আমার কাছে স্পষ্ট বলেছেন,—"সুধাংশুকে আমি দেখেছি এখানে একদিন এসেছিল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ সুধাংশুর এই বিবাহের জন্য গোপনে সমস্ত সাহায্যই করচেন, আমরা জানতে পেরেছি। রাজা বীরসিংহ গুপ্তচরের দ্বারা সমস্ত সংবাদই রাখচেন।

বাবার সঙ্গে বীরসিংহের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, পরে বীরসিংহের একটি জমীদারী মা খরিদ করেন, তদবধি তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব সদ্ভাব চলছে। ভূপেন্দ্র ঐ জমীদারী খরিদ জন্য একান্ত বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্তু বীরসিংহ তাঁকে না দিয়ে আমাদিগকে ঐ সম্পত্তি দেওয়াতে ভূপেন্দ্র আমাদের উপর ও বীরসিংহের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তদবধি তিনি আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করছেন। এখন সুধাংশুর এই বিবাহের পৃষ্ঠ-পোষকতার দ্বারা তিনি আমাদের অনিষ্ট করবেন, এই তাঁর চেষ্টা।

মা বীরসিংহকে সকল কথাই পত্রের দ্বারা জানিয়ে থাকেন। সংপ্রতি বীরসিংহ শেষ পত্রের উত্তরে মাকে লিখেছেন,—আপনি বিশেষ সতর্ক থাকবেন, কারণ ভূপেন্দ্র শীঘ্রই কুমারীকে কাশীধামে নিয়ে গিয়ে সুধাংশুর সহিত বিবাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করচেন।

তিনি আরও লিখেছেন যে, ভূপেন্দ্রের মন্ত্রী শারদানন্দস্বামীর দাস দাসীর নিকট হতে তাঁর গুপ্ত চরেরা এই সংবাদ পেয়েছে।

দেখ সুধাংশু, এই সকল কথায় আমি বুঝলাম, আমাকে একটু ভয় দেখানই অভিরামের উদ্দেশ্য। যাহোক, ভাই, দেখ ব্যাপারটা কিরূপ ঘটেছে!

আমরা স্থির করেছি, আর বিলম্ব না ক'রে, কল্যই যাত্রা করব। ব্রহ্মচারিণীকে ব'লে সব স্থির করতে হবে।

সুধাংশু বলিলেন,—দাদা, আমি বীরসিংহকে বিশেষ জানি, তিনি না পারেন এমন কার্য্য নাই; তাই ভয় হচ্চে, পাছে তিনি—

অমরেন্দ্র প্রশস্ত চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"বয়ম্ অজরা মরাঃ!" দেবীর ইচ্ছায় কি না সম্ভবে? তা হলে আমরাও প্রস্তুত থাক্‌ব। বাধে ত একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। আমি ভূপেন্দ্র-নারায়ণকেও আজ সব লিখে জানাব, তিনিই তার বন্দোবস্ত করবেন।

এইরূপ কথা হইতেছে, ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারিণী একখানি থালাতে কিছু মিষ্টান্ন ও সুমিষ্ট ফল আনিয়া অমরেন্দ্র ও সুধাংশুকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। সুধাংশু বলিলেন,—দাদা, স্নানাহ্নিক শেষ করেই এসেছ দেখচি, একটু মিষ্টান্ন গ্রহণ কর।

অমরেন্দ্র।—মিষ্টান্ন? পক্ক দ্রব্য? ও না। আমায় একটি ফল দেও।

সুধাংশু।—কেন, মিষ্টান্ন খাবে না?

অমরেন্দ্র।—না, আমি স্বপাক ভোজন করি। অন্যের পাক গ্রহণ করি না।

সুধাংশু।—কেন দাদা, অন্যের পাক খেলে দোষ কি?

অমরেন্দ্র।—যে সব খাদ্য দ্রব্য পর হস্তে প্রস্তুত হয়, তা ভোজন করলে অনেক ব্যাধি হতে পারে, আর সত্ত্বগুণের হানি হয়। ইউরোপের চিকিৎসকগণও এখন বলেন যে, সাধারণ লোকের হস্তে প্রস্তুত ঔষধাদিও দোষাবহ। সেই জন্য ইউরোপে বড় বড় ঔষধের কারখানায় যত ঔষধ প্রস্তুত হয়, তার শিশির গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে "হস্তদ্বারা প্রস্তুত হয় নাই"। সে সব ঔষধ যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, হস্তে স্পর্শ করা নিষেধ আছে।

এই জন্য আর্য্যগণ বহুকাল পূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন,—

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈবচ,
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ।

লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত তৈল ও লেহ্য পেয় নানাবিধ ভোজন-দ্রব্য হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রদান করিলে তাহা ভক্ষণ করিতে নাই।

ইহা শুনিয়া সুধাংশু মিষ্টান্ন রাখিয়া দিলেন ও অমরেন্দ্রের সহিত আনন্দে ফল ভোজন করিলেন।

পরে অমরেন্দ্র ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন,—ব্রহ্মচারিণি, বাবা তোমাকে যা বলেছেন তাই তুমি করবে। আর বিলম্ব করা হবে না। কল্যই অমাবস্যা, তুমি দেবী-দালানে মহামায়ার পূজার আয়োজন করবে। পূজা সমাপন করেই বাবা সিংহ গ্রামে যাত্রা করবেন। কুমারীকে তুমি দেবী দর্শনের জন্য রাত্রে দেবী-দালানে এনে রাখবে, আমি সেখানেই থাকব,সেখান থেকে কুমারীকে সঙ্গে লয়ে যাব। সুধাংশু সেই সময় আমাদের বিশু-মাঝির নৌকায় গিয়ে অপেক্ষা করবেন। তুমি শেষে আমার দোষ দিয়ে সকলকে বলবে যে, অমরেন্দ্র নাথ কুমারীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন, কোথায় গিয়েছেন, জানি না।

ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া বলিলেন,—তা বেশ! কুমারীও যাবে আমি ও একদিকে চলে যাব। তোমার দোষ দিতে পারব না। আমি গেলেই বালাই যাবে। কাকে আর জিজ্ঞাসা করবে? কে বা আর উত্তর দেবে?

অমরেন্দ্র শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তা বেশ। "বয়মজরামরাঃ"।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন,—পূজার আয়োজনও করব, কুমারীকেও সব বলে ঠিক ক'রে রাখব। তার জন্য চিন্তা নাই।

সুধাংশু বলিলেন দাদা, আমার একটু ভয় হচ্ছে, অভিরাম দেব জানেন যে, আমি সে দিন এসেই চলে গিয়েছি। এখানে প্রথম এসেই, আমি তাঁর দেখা পেয়ে, ঐরূপ বলেছিলাম। তার-পর এখন শুনছি তিনি জান্‌তে পেরেছেন যে আমি যাই নাই পর্ণাশ্রমে আছি, তাহ'লে তিনি এর মধ্যেই একটা কিরূপ কি করবেন, বলা যায়না, তাই একটু ভয় হচ্ছে।

অমরেন্দ্র।—ভাই, ওসব চিন্তা এখন রেখে দেও। তুমি ত স্ত্রীলোক নও যে অত ভয় করছ। দেখ দেখি ব্রহ্মচারিণী কেমন?—কিছুই গ্রাহ্য নাই। সৎ কার্য্যের জন্য এত ভয় কি? বিশেষতঃ তুমি কি জন্য এসেছ? যদি প্রতিজ্ঞার বল না থাকে, তবে বাবার নিকট দেবীর নামে প্রতিজ্ঞা করেছ কেন? পাছে তুমি সকলকে দোষী ক'রে মাঝখানে ভঙ্গ দেও, এই আশঙ্কা থাকাতেই তোমাকে নূতন ক'রে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে।

দেখ, অভিমন্যু যখন সপ্তরথীর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন

উত্তরা বড় কাতর হয়েছিলেন; তাই অভিমন্যু বলেছিলেন,- প্রিয়তমে, এ শরীর ক্ষণস্থায়ী, কিছুই নয়, একটা ছায়া মাত্র; এ জগৎও নশ্বর, যেন একটী বুদ্‌বুদ্ মাত্র; এমন-কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নশ্বর, কেবল অবিনশ্বর তোমার আমার এই "চির অম্লান ভালবাসা!" এই অনাদি অনন্ত প্রেমের যোগেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদির সহিত এই অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহ চলেছে!

যে ভালবাসার মহাযোগে যুক্ত হয়ে জগতের সেই আদি-কারণ "পরম পুরুষ" অর্দ্ধাঙ্গরূপে "পরাপ্রকৃতিকে" চিরদিন আপন বক্ষস্থলে রক্ষা করেছেন, যে ভালবাসাতে কমলাপতি চিরদিন কমলাকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করেছেন, যে ভালবাসার অম্লান কুসুমে হরপার্ব্বতী, ভ্রমর ভ্রমরীর ন্যায়, নিয়ত মধুপান করেন, প্রেমময়ি, তুমি আমিও সেই ভালবাসার মহাযোগে যুক্ত আছি; মুক্ত হওয়ার পথই এই অবিনাশী ভালবাসা। শতবার শরীরের পতন হ'লেও অম্লান ভালবাসার প্রস্ফুটিত কুসুম কিছুতেই মলিন হয় না।

ভাই সুধাংশু, যাকে আত্মার অংশ ব'লে যথার্থ জানতে পারা যায়, তার সঙ্গে ভালবাসা অচ্ছেদ্য। এক আত্মার অংশে অংশে, মনোভাবের বিনিময়ে, যতই মেশামিশি হয়, ততই প্রকৃত অবি-নাশী সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। সেই আত্মার অংশ-সম্বন্ধ শেষে একাত্মরূপী হয়ে যায়। সেই নিত্য যোগ সম্বন্ধই ব্রহ্মের স্বরূপ, পরমাত্মার পবিত্রতম ভাব।

তা যদি বুঝে থাক, তবে বুঝে দেখ "অচ্ছেদ্যো'য়মদাহ্যোয়ম্।" আত্মা অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য।

সুধাংশু, "ভালবাসা দেবী'র পাদপদ্মে শতশত প্রণাম কর।

কোটী কোটী সৌরজগৎ ঐ ভালবাসার অমৃতের স্রোতে ভাসছে, উঠছে, ডুবছে, এই রূপে নৃত্য করছে, একটিও একবারে ডুবে যায় না,—এর মধ্যে ভয় কোথায়? কাকেই বা তুমি ভয় বল? জাননা, "বয়ম্ অজরামরাঃ!" আমরা গগন-বিহারী আত্মা। পূর্ব্বাকাশ হ'তে সূর্য্য উদয় হন। এই পূর্ব্বাকাশই জড় চক্ষুর দর্শনীয় জড়াকাশ। পরে সত্ত্বাকাশ সত্ত্বগুণের আকাশ, সেই বিষ্ণু-লোক; তার পরে চিদাকাশ, চিন্ময় আকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য।

এই তিনটি আকাশ জ্ঞাননেত্রে যখন ভেদ হয় অর্থাৎ পরিষ্কার দেখা যায়, তখন সেই বালুকা-কণা পৃথিবী কোথায় থাকে? সেই পৃথিবীর ভয়ই বা কোথায় থাকে? আর সেই বালুকা কণায় উৎপন্ন মৃত্যু-কীটই বা কোথায় থাকে?

সুধাংশু, নেত্র খোল, ঐ দেখ আকাশে দেবী আসছেন আর হাসছেন!

আবার নেত্র মুদিত কর, ঐ দেখ সত্ত্বাকাশে দেবী বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রে দিলেন, মহাসত্ত্বে প্রবেশ কর।

আবার ঐ দেখ, ধীরে ধীরে সত্ত্বাকাশের মধ্যে অদ্বৈত চিদাকাশ কেমন প্রকাশ পাচ্চে!

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং শান্তমূর্ত্তিং।" পুনরায় ঐ দেখ নিরাকার শূন্য-আকাশের মধ্য হ'তে যেমন রাঙ্গা রবি-ছবি উদয় হয়, তেমনি ঐ নিরাকার অনন্ত চৈতন্যের মধ্য হতে আমাদের সাকারা দেবী কেমন প্রকাশ পাচ্চেন!

অমরেন্দ্রনাথ নীরব হইলেন। সুধাংশুর চক্ষু নিমীলিত, তিনি ধ্যানস্থ নীরব, নিস্পন্দ। ব্রহ্মচারিণী মুদিত নয়নে কর-

ঘোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। নির্জ্জন পর্ণাশ্রম, নিঃশব্দ কুটীর, যেন সে কুটীরে বায়ুর প্রবেশ নিষেধ!

বহুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ হল। অমরেন্দ্র বলিলেন, ভাই, তুমি এখন আপন কার্য্য কর, আমি একবার অভিরামের সঙ্গে দেখা করে যাই। কা'ল অনেক কথা হয়েছে, দেখি আজ যদি আর কিছু জানতে পারি!

এই বলিয়া অমরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন ও পর্ণাশ্রম ছাড়িয়া ক্রমে মহাতীর্থের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিরাম-দেব আপন বৈঠক-খানায় বসিয়া আছেন, অমরেন্দ্র সেই স্থানে গমন করিলেন। অভিরাম বলিলেন কি অমরেন্দ্র? কি মনে ক'রে?

অমরেন্দ্র বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

অভিরাম।—কি কথা? বল।

অমরেন্দ্র।—কুমারীর বিবাহের কি স্থির করলেন?

অভিরাম।—সুধাংশু ত একদিন এসেছিল, দেখেছিলাম, তার পরে চলে গেছে। মা তাই শুনে একেবারে অস্থির হন, দাদার সঙ্গে দিন রাত বাক্‌বিতণ্ডা হয়, শেষে দুজনার কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়েছে। তার পর বীরসিংহের প্রেরিত সংবাদে যেন "অগ্নিতে ঘৃত" দেওয়া হয়েছে।

অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি কি বলেন? চারিদিক বিবেচনা করে দেখুন। কুমারীর অবস্থা আপনি ভাল জানেন। এরূপ রূপবতী গুণবতী কন্যাকে বিবাহ না দিয়ে, গৃহে রাখা কত দূর সঙ্গত, আপনিই বুঝে দেখুন।

অভিরাম শান্তভাবে বলিলেন, দেখ অমরেন্দ্র, আমি সে

বিষয়ে অনেক চিন্তা ক'রে দেখেছি। মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে মায়ের মনে কষ্ট দিতে আমি পারব না, এ তুমি নিশ্চয় জেন।

অমরেন্দ্র।—সে কথা সত্য, কিন্তু গুরুদেব মহাতীর্থের যে ইচ্ছা তা ত আপনি তাঁর কাছেই সব শুনেছেন। তাঁর সেই সব অখণ্ডনীয় বাক্য কি আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন? স্ত্রীলোকে পূর্ব্বাপর না বুঝেই একটা করতে পারেন, তা ব'লে আপনি ত তা পারেন না। গুরুদেবের বাক্য পরিণামে ঠিক ফ'লে থাকে, আপনি ত অনেকবার দেখেছেন।

অভিরাম।—অমরেন্দ্র, কথাটা বড় শক্ত কথা, তুমি বুঝে দেখ। আমার উভয় সঙ্কট। সুধাংশুর সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের কুলমান থাকে না। তবে দাদা মহাতীর্থের কথাও আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না, আমিও তাঁর বাক্য গুরুবাক্য ব'লেই মনে করে থাকি। কিন্তু কি করি? কোনও উপায় দেখি না। আমি কাকেও কিছু বলতে পারচি না। জানি না ভগবানের কি ইচ্ছা!

অমরেন্দ্র।—আপনি যদি কোনও পক্ষে কিছু না বলেন, তা হলেই ভাল হয় না কি?

অভিরাম নীরবে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—সে মন্দ নয়, গতিকেই তাই।

অমরেন্দ্র।—তবে আপনি কুমারীর মুখের দিকে চেয়ে, তার বর্ত্তমান অবস্থা ও বয়ঃক্রম মনে ক'রে, এইটুকু বলুন যে, আপনি কোনও পক্ষে হস্তক্ষেপ করবেন না। আর রাজা বীরসিংহ যদি অস্ত্রধারণ করেন, তবে আপনি তাঁর সঙ্গে অস্ত্রধারণ করবেন না।

গুরুদেব মহাতীর্থ আপনাকে এই কথা জানাবার জন্য আমাকে বলেছেন।

অভিরাম অস্ত্রধারণের কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন, আর কিছুই বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্র বলিলেন—তবে আপনি কি করবেন? বিশেষ ভেবে দেখুন।

অভিরাম বুঝিলেন, মহাতীর্থের সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে। বিবাহ অনিবার্য্য। অনেক ভাবিয়া অভিরাম বলিলেন,—তবে তাই হবে।

অমরেন্দ্র।—কি হবে?

অভিরাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি কারো স্বপক্ষেও থাকব না, বিপক্ষেও থাকব না। দেখি ঈশ্বরের কি ইচ্ছা।

অমরেন্দ্র বলিলেন,—অবশ্য আপনার সেইরূপ থাকাই উচিত। এই উভয় সঙ্কটে মহামায়ার যা ইচ্ছা, তাই হোক। মানবের কি হাত আছে? তবে এখন আমি আসি।

অভিরাম বলিলেন—আচ্ছা, এস।

অমরেন্দ্র দেবী-দালানের দিকে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ কথা।

পূজার উদ্‌যোগ ও প্রবোধ।

অদ্য মহাতীর্থের বাটীতে মহামায়ার পূজার আয়োজন হই-তেছে। মহা সমারোহ।

দেবী চতুর্ভুজা দেবী-দালানে দিব্য সজ্জায় শোভা পাইতে-ছেন। পূর্ব্বাহ্ন হইতে ভারে ভারে দ্রব্যসম্ভার আসিতেছে, দেবী-দালান পূর্ণ হইতেছে। লোক জনের যাতায়াতে চারিদিক কোলাহল ময় হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন ব্রহ্মচারিণী ছুটাছুটি করিতেছেন,নানা লোকের দ্বারা নানা আয়োজন করাইতেছেন। তিনি একবার অন্তঃপুরে যাইতেছেন—কুমারীর মায়ের নিকট, আবার সেইস্থান হইতে যাইতেছেন কুমারীর কক্ষে, পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশে আসিতেছেন। কুমারীর মাতা বিমলা-দেবী বলিলেন—

ব্রহ্মচারিণি, দেবীর পূজার সময় আমি দেবী-দর্শনে যাব, গিয়ে আজ মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, কুমারীর যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। বীর সিংহের লোক আসা অবধি আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। আহা মা কি আমাকে সুস্থির করবেন?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—দিদিমা, অত অধীর হবেন না। মহা-মায়া অবশ্যই মঙ্গল করবেন। আজ যাতে মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হয়, তাই করুন।

এই বলিয়া অপরাহ্নে ব্রহ্মচারিণী কুমারীর দ্বিতল কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি কুমারীকে দেখিয়া বলিলেন,—কুমারি বস, কথা আছে, স্থির হয়ে শোন—

দেখ কুমারি আজ অমাবস্যা, বিশেষ ভাবে মহামায়ার পূজা হবে, বাবা বলেছেন। তিনি পূজা সাঙ্গ করেই সিংহগ্রামে যাত্রা করবেন। রাত্রে দিদি-মা দেবী দর্শন করতে যাবেন, তুমিও তাঁর সঙ্গে যাবে। দর্শনের পরেই দিদি-মা চলে আসবেন, তুমি আর সকল প্রতিবাসিনী বউ-ঝির সঙ্গে ভাণ্ডার ঘরে বসে থেক, বলবে যে আমি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি দেখে শেষে যাব। বাবার যাত্রা করার পরেই অমরেন্দ্র-দাদা তোমাকে সেখান হতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। গঙ্গার ঘাটে নৌকা ঠিক থাক্‌বে। সুধাংশু সেইখানে উপস্থিত থাক্‌বেন। এই সকল কথা তোমার যেন খুব ঠিক থাকে।

কুমারী বলিলেন,—

দিদি, কি বল্যে ? শুনে যেন ভয় হচ্চে! মায়ের মুখখানি মনে পড়চে! আর প্রাণ কেমন কর্‌চে! ভাল, দিদি, দেখ-দেখি, তুমি বুঝে দেখ, আমি বুঝতে পার্‌চি না,—

তোমার মত ব্রহ্মচারিণী হয়ে মায়ের কাছে থাকলে হয় না ? আমার মন অস্থির হচ্চে!

এই বলিয়া কুমারী ব্রহ্মচারিণীর হস্ত মধ্যে মুখ রাখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন,—

ভাল! কুমারি, তবে একটু বসতে হল, শোন। তুমি স্থির হও, স্থির হও। স্থির না হ'লে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। শোন বলি—

ব্রহ্মচারিণী হয়ে কি কেউ মায়ের কোলে উঠে বসে থাকে ? না, কেউ মায়ের কোলেই থাকতে পারে ?

অনিত্য সংসারে অনাসক্ত ভাবে থেকে পতিসেবা রূপ পরম

ধর্ম্ম গ্রহণ কর ; আর যদি সে রূপ ইচ্ছা না হয়, তবে আমার ন্যায় বৈরাগ্য ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। অট্টালিকায় ব'সে ঘৃত মাখন খেয়ে এখনকার লোক যে ব্রহ্মচর্য্য করে, সে ব্রহ্মচর্য্যে আর কাজ নাই! তাতে হবে না, নিশ্চয় জানবে, "পরম পদ" লাভের জন্য বিশেষ ভাবে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানকরা চাই।

পতি-সেবাই সহজ সাধন, ব্রহ্মচর্য্য কঠিন! কিন্তু মায়ের কোলে বসে থেকে, এর একটিও সাধন হয় না। যে পথেই যাও, মায়ের ক্রোড় হ'তে ঝাঁপ দিতেই হবে।

কুমারি, যদি আমার মত হ'তে চাও, তবে বিলাসিতার পথে পদাঘাত কর। তোমার রত্ন খচিত গৃহ সজ্জা পদ-দলিত ক'রে আমার মত হও। তোমার মখমলের পালঙ্ক-শয্যায় ধূলি নিক্ষেপ কর। তোমার হীরা-মুক্তা-বিজড়িত অলঙ্কার সকল চূর্ণ ক'রে কূপের জলে নিক্ষেপ কর ; তোমার মাতৃ ক্রোড় ছেড়ে আজ আমার মহামায়ার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়।

তোমার মুক্তা ভূষিত বেণীবন্ধন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কর্ত্তন ক'রে আমার মত কেশ-বেশহীনা হও।

যদি পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে মহামায়ার নাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ ক'রে আমার মত নিঃসম্বলা হও। যদি অসার সংসারকে বিদায় দিতে পার, তবে আমার মত হতে পারবে। কুমারি, ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় পবিত্র পরম সুখ ত্রিজগতে আর পাবে না, এ যে পবিত্রতম, পরম সুখের চরম অবস্থা।

দেখ, তোমার মা আর তোমার বিবাহ দেবেন না, তার বিশেষ কারণ আছে, তা আমরা জানি। তা হলে এই

সুখ সম্ভোগে থেকে কাঞ্চন-ভোগের মধ্যে চূড়ান্ত বিলাসবতী প্রতিবেশিনী ও বয়স্থাগণের সঙ্গে আজীবন অবিবাহিতা অবস্থায় কাল যাপন করা, এই বয়সে কত কঠিন, তা বুঝে দেখ। তা যদি বুঝে থাক, তবে দাদার সঙ্গে যাও। বাবা তোমার ভবিতব্যতার চিত্রখানি আমার সম্মুখে ধ'রে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। তাঁর বাক্য অব্যর্থ। এ গৃহে তোমার মঙ্গল নাই! যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি আমার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী হও, আর না-হয়, পতিসেবা রূপ সতীধর্ম্ম অবলম্বন কর, এই দুইটি রাজপথ। এই সংসারে থেকে, কুসঙ্গের মধ্যে প'ড়ে পবিত্র জীবন কলঙ্কিত করবে—তোমার সে শোচনীয় পরিণাম আমি এ চক্ষে দেখতে পারব না!

কুমারি, এই প্রমোদ-পূর্ণ গৃহে বাস ক'রে, উত্তম আহার বিহারের মধ্যে থেকে, উত্তম শয্যায় শয়ন ক'রে, কতক্ষণ ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনাকে চেপে রাখতে পারবে? ভোগ-বাসনার আগুন যেখানে দপ্‌দপ্‌ ক'রে চারিদিকে জ্বলছে, সেখানে অবিবাহিতা অবস্থায় থেকে "থাম্ থাম্" বল্যেই কি আর বাসনার বেগ থামে? মূলটি কেটে শিরে জল ঢালা বৃথা! বাহিরে লোক ভয়ে সাবধান থাক্‌লেও, মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হয়, তার সন্দেহ নাই! অবোধেরাই ভাবে যে, কেহ কিছু না জানতে পারলেই হ'ল, গৃহছিদ্র সর্ব্বতোভাবে গোপন করাই কর্ত্তব্য!

কুলীন কন্যা আর বাল্য বিধবাগণ, ভ্রাতা-ভগ্নীর ও মাতা পিতার মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয়-সেবা আজীবন দর্শন করুক, উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত থেকে ঘৃত মাখন ভোজন করুক, আর নীরব

নিশীথ কালে নির্জ্জন গৃহে ছট্‌ফট্ করুক,—স্বার্থপরা গৃহিণী-গণের ইচ্ছাই এই রূপ।

কুমারি, ঐ দেখ পতিসেবা রূপ সতী-ধর্ম্মের রাজপথ,—ঐ বৈকুণ্ঠের পবিত্র সোপান তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত রয়েছে, পতি-গৃহে গমন কর, সুখ সচ্ছন্দতা পাবে, নারায়ণের পাদপদ্ম লাভ করতে পারবে।

ব্রহ্মচারিণীর যাহা বলিবার তাহা বলা শেষ হইল; আর কি বলিবেন? কিন্তু মাতৃ পরায়ণা কুমারী মাতৃস্নেহের সুদৃঢ় বন্ধন কিছুতেই কাটিতে পারিতেছেন না।

তিনি বলিলেন,—দিদি, তুমি যা যা বল্যে, সব শুনলাম, ভালই বলেছ, আমার মঙ্গলের জন্যই বলেছ, কিন্তু কি করব, আমি বুঝতে পারছি না। আমার কপালে যা হয় হৌক, মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করা মহাপাপ।

ব্রহ্মচারিণী স্তম্ভিত হইলেন। বড় বিষম সমস্যা হইল। ক্ষণকাল চিন্তার পরে তিনি বলিলেন,—কুমারি তুমি যথার্থ বলেছ। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ, মাতৃ বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু দেখ, কেবল দুই স্থানে পিতা মাতার বাক্য লঙ্ঘন করা যায়।

কুমারী।—দিদি, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! পিতামাতার বাক্য লঙ্ঘন করা যায়, এমন একটি কার্য্যও দেখি না, এমন কথাও কখন শুনি নাই—দেশেও নাই, ধর্ম্মেও নাই, শাস্ত্রেও নাই। দিদি, তুমি বলচ দুই স্থানে পিতামাতার কথা অন্যথা করা যায়; সে কি কথা?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন,—

কুমারি, তুমি যা বলেছ তা ঠিক। কিন্তু আমি দুটি কাজ তোমাকে দেখিয়ে দেই, সেই দুটি কাজে পিতৃমাতৃ আজ্ঞাও লঙ্ঘন করা যায়,—দশেও আছে, ধর্ম্মেও আছে, শাস্ত্রেও আছে।

কুমারী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন,—দিদি, এমন ত কখনো শুনি নাই। তবে বল, সে কি কাজ? ব্রহ্মচারিণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—

রমণীর "সতীত্ব রক্ষা" আর "নিজের কর্ত্তব্য পালন।"

কুমারী নীরবে রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মাতৃস্নেহের বশে মাতৃ পক্ষ সমর্থন করিলেন, ও বলিলেন—

দিদি, সত্য কথাই বলেছ। কিন্তু আমার কপালে যা হয় হোক, যাতে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে না হয়, আবার স্বধর্ম্মও রক্ষা হয় তাই করাই ভাল নয় কি?

মা এই পাত্রের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অসম্মত। আমি আমার নিজের ইচ্ছা ও স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, মাতৃ ইচ্ছাই পূর্ণ করব, না হয়, অন্য পাত্রের পাণি গ্রহণ করব, তা হলেই দু দিক বজায় থাক্‌বে।

ব্রহ্মচারিণী।—কুমারি এ কথাও উত্তম কথা, কিন্তু আমি ত সব জানি, তোমার মায়ের যদি বিবাহ দেওয়ার তেমন ইচ্ছাই থাকত, তবে অনেক কুলীন পাত্র পাওয়া গিয়েছিল, দিলেই হ'ত। কিন্তু তিনি আর তোমার বিবাহ দেবেন না। তা না জানলে বাবা কি এই বিবাহের জন্য এত চেষ্টা করেন? না, আমরাই তোমাকে এত কথা বলি?

কুমারি, আরও দেখ, পূর্ব্ব হতেই তুমি এক জনে মন সমর্পণ

করেছ, সে পাত্র ত্যাগ ক'রে, কেমন ক'রে আবার অন্য পাত্রে মন দেবে? সত্য কি মিথ্যা, তুমি বল? তুমি সেই পত্রখানিতে তিন কথায় কত কথা লিখেছিলে, তা কি মনে আছে? আমি পত্র দেখেছি,—

"আমার এক হস্ত ধরেছেন দাদা, আর এক হস্ত—"

এইরূপ নয় কি? তাতে কি সম্মতি দেওয়া হয় নাই? আর তার নিম্নে "সেবিকা" লিখেছিলে কেন?

দেখ, কুমারি, তুমি কি পড় নাই?—তপোবনে সাবিত্রী যখন সত্যবানের পাণিগ্রহণে মনন করেন, তখন তাঁহার পিতা মহারাজ অশ্বপতি ও মাতা রাজ্ঞী মালবী দেবর্ষি নারদের নিকটে সত্যবানের স্বল্পায়ুর কথা শুনে, তাঁকে বিবাহ করতে সাবিত্রীকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। তাতে সাবিত্রী কি বলেছিলেন?

"সকৃদাহ দদানীতি"

পিতঃ, "আমি দিলাম" এই বাক্যটি একবারই বলিতে হয়, দুই বার বলিব কি রূপে?

তবে কুমারি, শুধু বলা নয়, তুমি যা লিখেছ, তাতে "আমি তোমার হস্তে আমাকে দিলাম" এই কথাই কি লেখা হয় নাই? ঐ কথা একবার একস্থানে ব'লে পুনর্ব্বার অন্য স্থানে বল্‌বে কি রূপে?

সাবিত্রী পিতামাতার কথা লঙ্ঘন ক'রে নিজের সতীধর্ম্ম কি রক্ষা করেন নাই? কুমারি, নিজ "কর্ত্তব্যের" উপরে আর কিছুই নাই। ভারত রমণীর "সতীত্বের" উপরে আর কিছুই নাই! পিতা-মাতার কথা দূরে থাক, হিন্দু-রমণীর "সতীধর্ম্ম" রক্ষার জন্য ব্রহ্মবাক্যও অন্যথা করা যায়। আমি "ন্যায়বাগীশ"

তোমাকে এই ব্যবস্থা দিলাম; পণ্ডিত সমাজে দেখাও গিয়ে, দেখি কে এই ব্যবস্থার অন্যথা করতে পারে?

কুমারী পুনর্ব্বার বলিলেন,—দিদি, সে যা হোক, মায়ের অনুমতি ব্যতীত আমি ঘরের বা'র হই কি রূপে?

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন—তবে তুমি কি করবে, বল।

কুমারীর নেত্র-শুক্তি-কোণে মুক্তাফল ঝলমল করিতেছে! ক্রমে তাঁহার নীরব-নিস্পন্দ অবস্থা হইল, তিনি চিত্রাঙ্কিতা পুত্তলিকার ন্যায় আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, আর কোন কথাই বলিলেন না।

ব্রহ্মচারিণী বুঝিলেন—"মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্।" তিনি তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ কথা।

মহামায়ার পূজা।

কুমারীর নিকট হইতে আসিয়া ব্রহ্মচারিণী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি আশ্রমের সমুদায় দ্রব্যাদি যথাস্থানে সুরক্ষিত করিয়া, সজল নয়নে দেবদেবী গণকে প্রণাম করতঃ গৃহগুলির দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি বহির্দ্বারের তালা বন্ধ করিয়া চাবিকাঠিগুলি একটি প্রতিবেশী

যুবকের হস্তে দিয়া বলিলেন—বৎস, আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি, আমি না থাকলে তুমি যে রূপ ক'রে থাক, তেমনি এখন আশ্রম-সেবা রক্ষা কর। আমি কখন আসৃব তোমাকে পরে জানাব। আশ্রম-সেবার ত্রুটি না হয়।

যুবক বলিল—আপনি যেরূপ অনুমতি করবেন, আমি তদ্রূপই করব।

ব্রহ্মচারিণী দেবী-দালানে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তাঁহার নেত্রধারা বিগলিত হইতেছে।

এ দিকে মহাতীর্থ সিংহগ্রামে গমন করিবেন তজ্জন্য সমস্ত আয়োজন করিতেছেন। অভিরাম মহামায়ার পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। মহাতীর্থ তাঁহাকে বলিলেন,—অভি, আমার সঙ্গে অনেক জিনিষ পত্র যাবে, তুমি না গেলে সে সব রাত্রিকালে নৌকায় পার করা কঠিন হবে, কোথায় কি যাবে, ঠিক থাকবে না। তুমি আমার যাওয়ার সমস্ত ঠিক করে রেখ।

অভিরাম।—দাদা, তার জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে যাব, আর সমস্ত ঠিক ক'রে রাখব।

ক্রমে দিনমান অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগতা। সূর্য্যদেব উদয় হইয়া যেমন বহির্দ্দৃষ্টি প্রদান করতঃ লোকচিত্ত প্রমত্ত করিয়া অন্তর্জগৎকে একবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলেন সেইরূপ রজনী আসিয়া লোকের সেই বহির্দ্দৃষ্টির পথটিও রুদ্ধ করিয়া দিল, এবং জীবগণকে বিপুল অন্ধকার জালে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমে জড়পিণ্ডের ন্যায় করিয়া তুলিতে লাগিল। শশীকলা-প্রবাহ দিন-দিন অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়া অদ্য অমাবস্যা তিথি উপস্থিত। তিমির রাশি আসিয়া জগন্মণ্ডল মসী-আবরণে

আবৃত করিতে লাগিল, দেখিয়া দুষ্টাশয় গণ ও পাপিষ্ঠ গণের বরিষ্ঠ তস্কর-নিকর বহির্গমনে উদ্‌যোগী হইয়া উঠিল।

মহাতীর্থের বাটীর চতুর্ভাগে শত শত দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হইল; সেই উজ্জ্বল আলোক-মালায়, সুরূপা-সপত্নী-তাড়িতা কুরূপা সীমন্তিনীর ন্যায়, নিবীড় তমোরাশি বিতাড়িতা হইল। যামিনী-যোগে সকল লোক নীরব নিস্তব্ধ হইলে, শান্তি প্রাপ্ত হইয়া নৈশ সমীরণ যেমন কুসুম-সুবাস ছড়াইয়া পরা-প্রকৃতির প্রীতিবর্দ্ধন করিতে থাকে, সেইরূপ সাধুগণও সকল লোক নিস্তব্ধ হইলে রজনীযোগে জগন্ময়ীর অর্চ্চনা আরম্ভ করেন। তাই মহাতীর্থ অদ্য উপবাসী আছেন; সন্ধ্যার পরেই তিনি স্নান করিলেন ও পট্টবস্ত্র পরিধাণ করতঃ যথাকালে মহামায়ার পূজার জন্য আসনে উপবেশন করিলেন। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইল। কুলবধূ গণের হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে, ঢাক ঢোলের বাদ্যে বাড়ীখানি যেন টলমল করিতেছে। মহাতীর্থ ক্রমে মহামায়ার পূজা সমাধা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইলেন।

অন্তঃপুর হইতে বিমলা-দেবী দেবী-দর্শনে চলিয়াছেন। তিনি কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কুমারীকে বলিলেন—মা, চল, দেবীদর্শন ক'রে আসি। মা, তোমার মঙ্গল-কামনা করাই আজ আমার উদ্দেশ্য। মায়ের পদধূলি তোমার মস্তকে দিয়ে আনি চল।

আর দেখ, কুমারি, তোমার দাদা যোগেশ যদি তোমাকে কখনও কোথাও যাওয়ার জন্য বলে, তুমি তা শুন না। ওরা সব অধর্ম্মে সর্ব্বনেশে লোক! তোমার ভাবনা কি মা? আমি তোমাকে কোলের কাছে রাখব, খাবে পরবে, সুখে সচ্ছন্দে

থাকবে, কে তোমাকে বারণ করবে? কার বাপের সাধ্য আছে যে আমি থাকতে তোমাকে এক কথা বলে?

কুমারী সজল নয়নে মৃদুস্বরে বলিলেন,—মা এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এত সুখভোগে থাকলে ধর্ম্ম যাবে। আমি এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আর থাকতে পারব না। আমি ব্রহ্মচারিণী দিদির কাছে গিয়ে থাকি! আহা, দিদি কেমন আপন ধর্ম্ম রক্ষা করছে, দেখ দেখি! মা আমাকে আজ সেই অনুমতি দেও; আজ আমাকে বিদায় দেও, আমি ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে ধর্ম্ম পথে দাঁড়াই।

বিমলা-দেবী কুমারীর অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া ও এই আকস্মিক কঠোর বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বুদ্ধিমতী গৃহিণী বুঝিলেন যে কুমারীর মনের গতি চঞ্চল হইয়াছে। এই হেতু তিনি কুমারীর গাত্রে ধীরে ধীরে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—

তাতে আর কি, মা? ব্রহ্মচারিণীর ঘরও যা, আমার ঘরও তাই। তোমার যদি সেরূপ মন হয়, তবে তুমি ব্রহ্মচারিণীর কাছেই থেক। তাতে আর ক্ষতিই বা কি? তাতেও আমার অমত নাই।

কুমারী এইরূপে বহির্গমনের জন্য মাতৃ অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

বিমলা-দেবী বলিলেন,—কুমারি, আমার এত ধন ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করবে মা? তোমাকেই সব দিয়ে যাব। তোমার ভাবনা কি? কেন তুমি পরের কথায় কাণ দেও?

তোমার দাদা কেবল বলেন,—ধর্ম্ম, ধর্ম্ম! দেখ মা, ধর্ম্ম কি আর বাইরে আছে? মনেই আছে। ও পাড়ার হরিমতী

নিকেশ কুলীনের মেয়ে., তারও ত ঘর বর পাওয়া গেল না, আজ ত্রিশ বৎসর ঘরে খাঁটি আছে; তার কি হয়েছে? সচ্ছন্দে খাচ্ছে দিচ্ছে বেড়াচ্ছে। কে কি বলতে পারে, বলুক দেখি? আর আমাদের শৈবলিনী, শিশুকালে বিধবা হয়ে এত কাল কাটালে, এখনও তার গায়ে দেখ্‌চি জড়োয়া গহনা ধরে না, আর তার শ্রীই বা কি? কই, তার কি দিন যাচ্ছে না? কেমন ঠাকুর পূজা করে, কেমন মালা জপ করে, তার কি ধর্ম্ম নেই? ও সব অধর্ম্মেদের ঘর নষ্ট করার কথায় কাণ দিও না। আমি যা বলি শোন; কা'লই তোমার নামে বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক'রে দেব। আর চাও কি?

তখন কুমারী নীরবে পট্টবস্ত্র অলঙ্কারাদি সজ্জা করিয়া মাতৃহস্ত ধারণ পূর্ব্বক দেবী-দর্শনে চলিলেন। বিমলা দেবী কন্যাকে লইয়া অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য নারীগণ ও প্রতিবেশিনী বধূগণের সহিত একত্র হইয়া দেবী-দালানে গমন করিলেন। তিনি সেই স্থানে গিয়া মহাদেবীর সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। পরে সকলেই প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মহাতীর্থ ধ্যানস্থ আছেন। বিমলাদেবী গলবস্ত্রে করযোড়ে দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুমারীর জন্য নানারূপে মঙ্গল-কামনা করিলেন, পরে দেবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। দেবী-দর্শনের পরে তিনি অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন কন্যাকে বলিলেন,—কুমারী, এখন চল যাই।

কুমারী বলিলেন,—মা, তুমি এখন যাও, আমি ব্রাহ্মণ ভোজন দেখে আসি। ভাণ্ডার ঘরের পার্শ্বের ঘরে আমরা সবাই মিলে থাকব, দেখে শুনে সকলে একত্রে যাব।

"আচ্ছা মা, তাই এস" এই বলিয়া বিমলা দেবী দক্ষিণ খণ্ড হইতে উত্তর খণ্ডে গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে মহাতীর্থের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও অভিরামকে বলিলেন,—অভি, এখন ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা কর, রাত্রি অধিক হয়েছে, আমার যাত্রা করার সময় হ'ল।

তখন অভিরাম ও অমরেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণকে ভোজন দিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ ভাণ্ডার-গৃহ হইতে কুমারী ও অন্যান্য পুরবাসিনী গণ আহারীয় দ্রব্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

মহা সমারোহে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন হইল। পরে অন্যান্য বহু লোকের ভোজন শেষ হইল। সকলেই পরিতুষ্ট রূপে আহার করিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তখন মহাতীর্থ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, ও অভিরামকে বলিলেন,—অভি, আর বিলম্ব কেন? এখন শীঘ্র চল!

অভিরাম ভৃত্যগণকে দ্রব্যাদি লইয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। মহাতীর্থ দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"প্রসীদ ভগবত্যম্বে প্রসীদ পরমেশ্বরি,
প্রসাদং কুরু মে দেবি, দুর্গে দেবি নমো'স্তুতে।"

অভিরাম দেবীকে প্রণাম করিয়া মহাতীর্থ দাদাকে অগ্রে লইয়া গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন ভাণ্ডার-গৃহের নারীগণ আনন্দ-কোলাহলে দেবীর প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত হইলেন। ক্রমে দেবী-দালানে আহারাদির

কার্য্য শেষ হইল, পরে সকলেই স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন।

বিমলা দেবী সমস্ত দিন উপবাসে ছিলেন, এক্ষণে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সারা দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, কে কোথায় আছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই। তখনও কেবল ব্রহ্মচারিণী ছুটাছুটি করিতেছেন।

ক্রমে সেই পুরী অমাবস্যার নিশীথ অন্ধকারে আবৃত ও গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ কথা।

কুমারী-হরণ।

রাত্রি গভীর নিঃশব্দ হইয়াছে। বসুধার অসাড় দেহে আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। নিবীড় আঁধার-বসনে অঙ্গ-ঢাকা নিস্তব্ধতার বিরাট মূর্ত্তি বিমান-তলে আসিয়া, পদতলে ভূতল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দর্শনাভাবে বসুমতী গত-শ্রী হইয়াছেন, কেবল ছত্রাকার নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্র মালার অনির্ব্বচনীয় শোভা হারসূত্রে প্রোত হীরক-রাজিকেও লজ্জা দিতেছে। মৃদু মন্দ সমীরণ লীলা-বিনোদন নিশীথ-কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রমোদিত করিতেছে। ধ্যানশীল

ধ্যান-মগ্ন হইয়াছেন, চিন্তাশীল চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়াছেন, ভোজনশীলের নাসিকা-ধ্বনি প্রবল হইতেছে। শোক-সন্তপ্ত চিত্ত হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। জাগ্রত যোগীর চিত্ত সমাধি-যোগে সুধাময় হইয়া উঠিতেছে।

তখন ব্রহ্মচারিণী দেখিলেন সকলেই দেবী-দালান হইতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অমরেন্দ্রকে বলিলেন—দাদা, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি কুমারীকে নিয়ে আসি; আমিও তোমাদের সঙ্গে যা'বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি; আমিও যাব।

অমরেন্দ্র।—সে কি? তুমি কোথা যাবে? কেনই বা যাবে? তোমার যাবার ত কিছু আবশ্যক দেখি না।

ব্রহ্মচারিণী।—না দাদা, আমিও যাব। কুমারীর জন্য কখন কি কর্‌তে হয়, বলা যায় না, কখনও বাইরে যাওয়া তার অভ্যাস নাই, যদিই পথে কোনও অসুখ হয়, কি যদিই কোন বিপদ ঘটে, তবে আমি যথাসাধ্য সেবা করতে পারব।

অমরেন্দ্র অকরুণ প্রাণে বলিলেন—না, না, তা হবে না, তোমার যাওয়া হবে না। তুমি সেবা করতে পারবে, আর আমি বুঝি পারব না?

ব্রহ্মচারিণী।—না দাদা, অসুখ হ'লে কি তুমি সেবা করতে পারবে?

অমরেন্দ্র।—তা খুব পারব, সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। তোমার যাওয়া হবে না।

ব্রহ্মচারিণী।—দেখ দাদা, আমি যাব ব'লে পর্ণাশ্রম বন্ধ ক'রে এসেছি; আমায় যদি যেতে না দেও, তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ

দেব, সেও ভাল, তবু কা'ল প্রাতে উঠেই যে বিমলা-দেবীর সহস্র ভৎর্সনা, গঞ্জনা সহ্য করব, তা আমি পারব না।

অমরেন্দ্র।—না, না, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না, তুমি গেলে আরও খারাপ হবে; কুমারীকে আমি নিয়ে গেলাম, তার কোনও কথাই নাই। তুমি ক্ষান্ত হও; তুমি যদি যাবে, তবে আগে বাবাকে বল নাই কেন?

ব্রহ্মচারিণী একটু অপ্রতিভ হইলেন, পরে বলিলেন—দাদা তা বটে। তুমি যখন বারণ করছ তখন আর কি করব, বল! তবে তুমি কুমারীকে নিয়ে যাও।

ব্রহ্মচারিণী সেই অন্ধকারের মধ্যে কুমারীর হস্তধারণ পূর্ব্বক লইয়া আসিয়া তাঁহাকে অমরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন—

দাদা, আমার অদৃষ্টে যাই থাক, কুমারীকে আজ তোমার হস্তে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম; এখন তুমি দায়ী!

পরে তিনি কুমারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—কুমারি, ঐ শোন, আকাশে "মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!" শব্দ হচ্চে! দাদার সঙ্গে নির্ভয়ে প্রস্থান কর।

কুমারী অন্তরে অন্তরে ডাকিতে লাগিলেন—"কোথায় পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি!"

অমরেন্দ্র ও কুমারী দেবীকে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইলেন। ব্রহ্মচারিণী সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দেবী-দালানের দ্রব্যাদি সাবধানে উঠাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্র কুমারীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন। কুমারী ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে ভয়ে পশ্চাতে পশ্চাতে

যাইতেছেন। সহসা তিনি নিকটস্থ একটি উচ্চ অট্টালিকার ধবলিত অঙ্গে একটি বৈছ্যতিক আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি ভীত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—দাদা ঐ কিসের আলো? দেখ!—

বলিতে বলিতে কুমারী দেখিলেন, উজ্জ্বল বৈছ্যতিক আলোকে অট্টালিকার গায়ে লেখা—"মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!"

অমরেন্দ্র বলিলেন, কুমারি ভয় কি? মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! ব'লে চলে এস। কুমারী নীরবে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

অমরেন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, অনেক নৌকা বাঁধা আছে। মহাতীর্থের আদেশে পূর্ব্ব হইতেই বিশু-মাঝি ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে জানিয়া তিনি, বিশু-মাঝি বিশু-মাঝি বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না।

তিনি নিরুপায় হইলেন, ও কুমারীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধারে ধারে গিয়া, দুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুধাংশু যথাসময়ে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিশু-মাঝি বিশু-মাঝি বলিয়া অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন তিনি আর এক ঘাটে গমন করিলেন ও পুনঃ পুনঃ মাঝিকে ডাকিলেন, তথাপি কেহ উত্তর দিল না।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইল, নিরুপায় হইয়া, সুধাংশু পারঘাটে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গাবক্ষ দর্শন করিতেছেন, আর এক এক বার ডাকিতেছেন—বিশুমাঝি?

রাত্রি গভীরভাব ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিঃস্তব্ধ, গঙ্গা-

বক্ষে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিতেছে—দেখিয়া সুধাংশু ডাকিলেন, বিশুমাঝি?

মাঝি গঙ্গাবক্ষ হইতে উত্তর দিল—আজ্ঞে, আমি এসেছি।

সুধাংশু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকাখানি অনেক নৌকার মধ্য দিয়া কুলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধাংশু ডাকিলেন,—বিশুমাঝি?

মাঝি।—আজ্ঞে এসেছি।

সুধাংশু।—অমরেন্দ্র দাদা কোথায়?

মাঝি।—আজ্ঞে তা জানি না।

সুধাংশু অবাক হইয়া রহিলেন। নৌকাখানি তীরে আসা মাত্র একটি সৌম্যমূর্ত্তি যুবা নৌকা হইতে দ্রুতপদে তীরে অবতরণ করিলেন ও সুধাংশুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—কি, সুধাংশু? এখানে এত রাত্রে কোথা থেকে? চল, চল, বাড়ীতে চল।

সুধাংশু দেখিলেন—অভিরাম-দেব। তিনি জানিতেন না যে, অভিরাম মহাতীর্থের সঙ্গে বিশুমাঝির নৌকায় গিয়াছিলেন। এখন সহসা অভিরামকে দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অন্যদিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু অভিরাম তাঁহার কর ধারণ করিয়া কথায় কথায় বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। সুধাংশু অভিরামের হস্তে পড়িয়া কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। নীরবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অভিরামও মনে মনে নানা সন্দেহ করিতে করিতে সুধাংশুকে লইয়া বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি বাটীর বহির্দ্দেশে সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন ; কিন্তু প্রথম নিদ্রার গাঢ়তা প্রযুক্ত কেহ শুনিতে পাইল না। এই জন্য তিনি বলিলেন,—সুধাংশু একটু দাঁড়াও, আমি অন্দরের দিকে গিয়ে ডাকি, পরে এসেই তোমাকে দোর খুলে দিচ্ছি ; একটু দাঁড়াও।

সুধাংশু বলিলেন—অচ্ছা, তাই যান।

বিমলা-দেবী ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী গণ দেবী-দালান হইতে অন্দরে প্রবেশ করিয়া কেহ আর দ্বার বন্ধ করেন নাই। তাই অভিরাম অন্দরের দিকে গিয়া দেখিলেন, অন্দরের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন, ও দেখিলেন, গৃহে আলোক জ্বলিতেছে, সকলেই আপন আপন স্থানে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। তিনি তৎক্ষণেই কুমারীর শয়ন-কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পাইলেন ; সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, কুমারীর শয্যা শূন্য পড়িয়া আছে, কুমারী সেই গৃহে নাই। তিনি দ্রুত গতিতে অন্যান্য গৃহে ও চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুমারীকে পাইলেন না।

এ দিকে সুধাংশু বাহিরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছেন, এই জন্য অভিরাম কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ব্যস্ততা বশতঃ অগ্রে আলোক সহ বহির্ব্বাটীতে গিয়া সদর দ্বার খুলিলেন। তিনি সুধাংশু, সুধাংশু, বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। তখন তিনি চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, সুধাংশু প্রস্থান করিয়াছেন। অভিরাম গঙ্গার ধারে, এত অধিক রাত্রে সুধাংশুকে দেখিয়া

মনে মনে যে আশঙ্কা ও সন্দেহ করিয়া ছিলেন, তাহা আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, অন্দরের দ্বার দিয়াই অমরেন্দ্র-নাথ কুমারীকে লইয়া গিয়া সুধাংশুর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাই অন্দর-দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সুধাংশু অদ্য কুমারীকে লইয়া যাইবেন বলিয়াই, গত কল্য অমরেন্দ্র নাথ তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিবার জন্য অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছেন।

অভিরাম কপালে ঘা দিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই বিষম সমস্যায় আমি নিরপেক্ষ থাকিব, অঙ্গীকার করিয়াছি ; এখন গিয়া মাকে জাগাইলে ও সমস্ত কথা বলিলে মহা সঙ্কট উপস্থিত হইবে। এই গভীর রাত্রিকালে চারিদিকে কোলাহল উত্থিত করিয়া কুমারীর কলঙ্ক আনয়ন করাও বুদ্ধির কার্য্য নহে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া অভিরাম মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—

মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কুমারীর মুখের দিকে চাইলে আমার অশ্রু সম্বরণ হয় না, আবার তোমার মুখের দিকে চাইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়েছি। এখন বুঝলাম, মানব-সন্তান ও পক্ষীশাবক উভয়ই সমান। পক্ষী-শাবক পাখা উঠলেই পলায়ন করে, মাতৃক্রোড়ে আর ক'দিন থাকে? মা, প্রত্যুষে উঠেই দেখবে, তোমার ক্রোড়ে পালিত পক্ষীশাবক তোমাকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে গিয়েছে? হায় আমরা কি নির্ব্বোধ! কে কা'কে বেঁধে রাখতে পারে? এই রূপ ভাবিতে

ভাবিতে অভিরাম ঝর্ঝর করিয়া নয়ন-বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরবে আপন শয়ন-কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে সুধাংশু অভিরামের হস্ত হইতে দৈব কর্তৃক মুক্ত হইয়া গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলেন, ও মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—বিশু তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

মাঝি।—মহাতীর্থ মশাই সিংহগ্রামে গেলেন। তাঁকে পারে নিয়ে গিয়ে তখনই ফিরে এসে ঘাটে থাকব,এই কথা ছিল। কিন্তু কি করব? জিনিষ পত্র তুলে দিতে দিতে বড় বিলম্ব হয়ে গেল। তাঁর ভাই সঙ্গে গিয়ে ছিলেন, তিনি আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না। তিনি এই নৌকায় ফিরে আসবেন বল্লেন, আমি কি করব, বলুন?

তখন সুধাংশু নৌকার উপরে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, অমরেন্দ্র-নাথ কুমারীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া নৌকাতে বসিয়া আছেন। সুধাংশু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, দাদা এসেছ? এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে? আমি এসে যখন তোমাদের দেখা পেলাম না, তখন বুঝলাম, সব গোলমাল হয়েছে। নিরাশ হয়ে এ-দিকে ও-দিকে দেখতে লাগলাম।

অনেক ক্ষণ পরে দেখি, মাঝি এল, কিন্তু নূতন বিপদ হল। দেখি, সেই নৌকায় অভিরাম-দেব এসেছেন। তিনি আমাকে দেখেই এসে আমাকে ধরলেন, ধ'রে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বাড়ীতে গিয়ে যেমন তিনি আমাকে বহির্দ্বারে রেখে অন্দর-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়েছেন, অমনি আমি গঙ্গার

দিকে ছুটলাম, একবারে ঘাটে এসে উপস্থিত হ'লাম। তোমরা এত ক্ষণ কোথায় ছিলে?

অমরেন্দ্র।—আমরা ঠিক সময়ে ঘাটে এসেছি, কিন্তু তোমাকেও পেলাম না, মাঝিকেও পেলাম না, তাই তীরে তীরে খুব দূরে গিয়ে বসে ছিলাম।

সুধাংশু।—যাহোক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় সেই ভাল, এখন শীঘ্র পারে যেতে হবে। বাড়ীতে সবাই জেগেছে, খুব সম্ভব, একটা ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হয়েছে, পশ্চাতে অনেক লোক ছুটবে, সন্দেহ নাই।

সুধাংশু দেখিলেন, অমরেন্দ্র-নাথের পশ্চাদ ভাগেই লজ্জাবতী লতার ন্যায় কুমারী অবগুণ্ঠনে মুখ-মণ্ডল আবরিত করিয়া বসিয়া আছেন। কুমারী মৃদু স্বরে অমরেন্দ্রকে বলিলেন—দাদা, ভয় হচ্ছে, কত দূর যেতে হবে?

অমরেন্দ্র।—কুমারি ভয় কি? এই এসেছি, পারে গিয়েই আমরা গাড়ী পাব, কোনও আশঙ্কা নাই। দাদা ও-পারে প্রহরী রেখে গিয়েছেন, তাতেই তাঁকে একটু আগে যেতে হয়েছে। কুমারি ভয়ের কারণ কি? আসবার সময় সেই বড় বাড়ীর উচ্চ প্রাচীরের গায়ে কি লেখা দেখেছিলে? তাই মনে কর। দেবী তোমার সঙ্গে আছেন। পশ্চাতে সিপাই-শান্ত্রী আসে আসুক, আমি আর সুধাংশু থাকতে কার সাধ্য তোমার নিকটে আসে? দেবীকে দর্শন করেই আমরা বা'র হয়েছি।

অমরেন্দ্রের আদেশ ক্রমে বিশুমাঝি ব্যস্ত হইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কুমারী শুনিতে পাইলেন, সেই অন্ধকারাবৃত

গঙ্গাগর্ভে অতি দূরে যেন কে বলিয়া উঠিল—মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!

ব্রহ্মচারিণীর স্বর অনুমান করিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, ব্রহ্মচারিণী-দিদি কোথায়? অমরেন্দ্র বলিলেন, তা ত আর জানি না।

সেই অমানিশির নিবীড় অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া গঙ্গা-বক্ষে ক্ষুদ্র তরণী নাচিতে নাচিতে চলিল, সঙ্গে সঙ্গে তরুণ-তরুণীর হৃদয় ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল! অমরেন্দ্র নাথ মৃদুস্বরে বলিলেন—বয়ম্ অজরামরাঃ!

শুধাংশুও বলিলেন—বয়ম্ অজরামরাঃ!

নৌকা পর পারে তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। অমরেন্দ্র কুমারী ও সুধাংশু নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। অমরেন্দ্র বিশু মাঝিকে বলিলেন—মাঝি আমরা তোমার নৌকায় পারে এলাম, বাড়ীতে কাহারও নিকটে ব'ল না।

মাঝি।—আজ্ঞে কর্ত্তা-মশাই আমাকে সে কথা পূর্ব্বেই ব'লে দিয়েছেন।

তখন তাঁহারা তিন জন একত্রে উপরে উঠিলেন, ও গাড়ীতে উঠিবার জন্য দ্রুত গতিতে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ কথা।

গঙ্গায় ঝাঁপ।

ব্রহ্মচারীণী সমস্ত কার্য্য শেষ করতঃ সকল দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দেবী-দালানে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

আমি কি করলাম? প্রাতঃকালে উঠেই দিদিমা যখন দেখবেন যে তাঁর প্রাণসমা কন্যা নাই, তখন তিনি নিশ্চয়ই গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন। আর আমার অদৃষ্টে যে কি হবে, তা ভগবানই জানেন। আমি ভিন্ন অন্যকেহ যে অন্তঃপুর হতে কুমারীকে বহির্গত করে দিতে পারে নাই, তা সহজেই সকলে বুঝতে পারবে। বিশেষ কুমারীর নিকট আজ বারংবার যাতায়াত করায় দিদিমায়ের একটু সন্দেহও হয়েছে, তাঁর একদৃষ্টে চেয়ে থাকা দেখেই আমি তা তখনি বুঝতে পেরেছি। কা'ল আমাকে অতিশয় অপমানিত হতে হবে, আর আজীবন কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা যে সইতে হবে তার সীমা নাই। দিদিমা যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যান, তবে আমি কি করব! আহা দিদিমা গঙ্গায় ঝাঁপ না দিয়ে, যদি আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরি, তবেই ভাল হয়। ব্রহ্মচারিণীর নয়ন যুগলে যুগল ধারা বহিতে লাগিল অবশেষে অশেষ দুর্ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে উদ্বেলিত-মনপ্রাণা ব্রহ্মচারিণী সহসা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হঠাৎ উঠিয়া দেবিকে প্রণাম করিলেন, ও সদর দ্বার খুলিয়া যেন

জ্ঞান শূন্য হইয়া বিহ্বল ভাবে গঙ্গাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি নিঃশব্দে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, একখানি নৌকা রহিয়াছে। তিনি নৌকা খানি হইতে একটু দূরে গিয়া জলের ধারে নামিলেন, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। মাঝি নৌকা হইতে সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিল। শেষ রজনীর অস্ফুট আলোকে সে দেখিল একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। ব্রহ্মচারিণীকে সে জানিত, একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, ব্রহ্মচারিণী দাঁড়াইয়া আছেন। সে ফিরিয়া নৌকায় আসিল, আসিয়াই শুনিতে পাইল—পুনর্ব্বার মা মা শব্দ হইল ও ঝপ্ করিয়া সশব্দে গঙ্গা গর্ব্ভে কি নিপতিত হইল।

মাঝি শব্দ শুনিবা মাত্রেই চমকিত হইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কোন দিকেই আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে জলের ধারে গিয়া দেখিল, ব্রহ্মচারিণী নাই, তাঁহার একখানি গৈরিক বস্ত্র জাহ্নবীর ফেণিল নৈশ তরঙ্গে তাড়িত হইয়া তটের নিকটে উঠিতেছে আর ডুবিতেছে। মাঝি চমকিয়া উঠিল ও বস্ত্র খানি তুলিয়া লইল। সে বুঝিল, ব্রহ্মচারিণীই গঙ্গা গর্ব্ভে ঝাঁপ দিয়াছেন, কিন্তু কেন যে তিনি ঝাঁপ দিলেন, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

পরে সে সহসা দেখিতে পাইল, যেন ব্রহ্মচারিণীর বৃহদাকার এক প্রতিচ্ছায়া গঙ্গার উপরে অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই সে "রাম! রাম!" বলিতে বলিতে চক্ষু মুদিত করিল এবং নৌকার মধ্যে আসিয়া আপাদ মস্তক কন্থা চাপা দিয়া পড়িয়া রহিল। সে প্রত্যুষে উঠিয়া ব্রহ্মচারিণীকে কোথাও

আর দেখিতে পাইল না। মাঝি জলের উপরে ব্রহ্মচারিণীর যে প্রেত-মূর্ত্তী দেখিয়া ছিল,তাহাতেই তাহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল।

ক্রমে ত্রিদিব-দুহিতা, কুসুম-কোমলা উষাদেবী আকাশ মণ্ডলে আসিয়া, কমল-করে স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। কল্পনা-দেবী যেমন চিত্তপটে চিন্তা-মালার অসংখ্য অলীক চিত্র অঙ্কিত করেন, সেইরূপ উষাদেবী গগন-পটে মেঘমালার কত যে সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ-ছবি অঙ্কিত করিতে লাগিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। শারদ নির্ম্মল নভোমণ্ডল সন্নিভ শ্যাম-কান্তি প্রান্তর শিশির-নিকরে সিক্ত হইয়া আছে। সুশ্যামল ঘন পত্র শোভিত তরুরাজি, আগুল্‌ফ কুসুমাকীর্ণা বন-বালা সাদৃশ, কণ্ঠালিঙ্গন-কারিণী পুষ্পময়ী হরিৎ লতিকাকে সারা-নিশি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, এক্ষণে উভয়ে প্রেম-বিগলিত চিত্তে ঝর্ঝরে শিশিরাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কূজন-কারী বিহঙ্গ গণ এই সময়ে কল-কল শব্দে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বন মধ্য হইতে দলে দলে বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। প্রান্তরস্থ সরো-বরের জল থৈ থৈ করিতেছে, পল্লী-প্রান্তে নৃত্যকারী রাখালের দল হৈ হৈ করিতেছে। প্রাভাতিক শীতল বায়ু ফুলদল-পল্লব রাজিকে কম্পিত করিয়া পল্লী প্রান্তর স্নিগ্ধ করিতেছে।

জ্ঞানোদয় হইলে জীব-কণিকা সকল যেমন পরমাত্মায় বিলীন হয়, সেইরূপ সূর্য্যোদয়ে তুষার-মিহিকা সকল নীলাকাশে নিলীন হইল। স্বর্ণ-ছটায় ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

আদিত্য-রথ ধীরে ধীরে জগতের দৃষ্টিপথে উদিত হইলে সৌরী প্রভা দর্শনে কমল-গর্ভা হাস্যমুখী সরসী সেই কবি-চিত্তহারী রবি-ছবি বক্ষে ধারণ করিলেন, ও ঈষৎ তরঙ্গ-রঙ্গে

নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পবন-ভর-বিলোল উৎপল-দল সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল। দেবী বসুমতী অরুণ-কিরণে প্রাতঃস্নাতা হইয়া পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অমরী 'সুখ-বাসনা' ও অমৃত-উৎস 'ভালবাসা' মানব-মনে নূতন করিয়া আবার স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল।

দেবী বসুন্ধরার প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইয়া গেলে তখন বিমলা দেবী গাত্রোত্থান করিয়া তদীয় মমতার পুত্তলি কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি গিয়া দেখিলেন, সে কক্ষে কুমারী নাই। ক্রমে তিনি চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও কুমারীকে পাইলেন না। সুধাংশু আসিয়াছিল—এই সংবাদ অভিরামের নিকট শুনিয়া অবধি তিনি সতত-শঙ্কিত ছিলেন, এক্ষণে বিপদ উপস্থিত জানিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলে স্নেহের নির্ঝরিণী ঝর্ঝরে ঝরিতে লাগিল। বাড়ীর সমস্ত লোক 'কুমারী কুমারী' বলিয়া ক্রন্দনের রোলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। অভিরাম-দেব আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; বিমলা দেবী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—অভি, আর কি দেখছ? কুমারী আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। এ সব তোমার দাদার কাণ্ড? মেয়ে আমার তাঁর সঙ্গেই গিয়েছে, তার ভুল নেই, সিংহগ্রামে যাওয়া একটা ছল মাত্র। বীরসিংহ যা যা বলেছেন, সব ঠিক কথা, আমি আগে অত টা বুঝতে পারি নাই। অভি, আগে গিয়ে ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে অনুসন্ধান কর, সেখানে সে কি বলে, শুনে এসে শীঘ্র আমাকে বল।

অভিরাম, মাতৃ আদেশে ব্যস্ত হইয়া পর্ণাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন—পর্ণাশ্রমের দ্বার রুদ্ধ, ব্রহ্মচারিণী বহির্দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ দেখিয়া অভিরাম মাতৃ সন্নিধানে আসিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

বিমলা দেবী বলিলেন—আমি সব বুঝতে পেরেছি। এখন শীঘ্র এক কাজ কর, কাশীর পথে ঝিনিয়া ষ্টেশনের কাছেই বীরসিংহ সেনা-সামন্ত নিয়ে তাঁর জমীদারী শাসনের জন্য গিয়েছেন, তাঁকে টেলিগ্রাফ্ কর। আমাকে সেখানে যাবার জন্য এখনই রওনা হতে হবে। আমি সেখানে পৌঁছিয়ে তাঁর সেনা-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে, তাঁর সাহায্যে কুমারীকে যেখানে গিয়ে পাই, সেখানে আটক করব; আমার প্রাণ থাকতে আমি বিবাহ হ'তে দেব না। যত দিন আমি আমার কুমারীকে না পাই তত দিন অন্ন জল ত্যাগ করলাম। আহা বাছার আমার কি দোষ? সে কি জানে?

আমি এখনি যাত্রা করব, আমার সঙ্গে দশ জন কর্ম্মচারী যাবেন, আর এক শত সিপাই যাবে, তুমি সকলকে প্রস্তুত হতে বল। আমার যাবার সমস্ত আয়োজন করে দেও। তোমার যাওয়া হবে না, তুমি গেলে বাড়ীর বিষয়-কর্ম্ম সব বিশৃঙ্খল হবে। তুমি বাড়ী রক্ষা কর।

অভিরাম চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—

মা, তোমার আজ্ঞা আমি এখনি পালন করব, তোমার সে জন্য চিন্তা নাই। তুমি স্থির হও, এই আমি চল্যাম।

অভিরাম বহির্ভাগে গমন করিলেন। বিমলা দেবী রোদন করিতে করিতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সেই দিবসেই অপরাহ্নে তিনি লোক-জন সমভিব্যাহারে ঝিনিয়াতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পরে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইল যে, ব্রহ্মচারিণী পর্ণাশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়াছেন অনেকেই অনুমান করিল—অমরেন্দ্র-নাথ ও কুমারীর সঙ্গেই ব্রহ্মচারিণী চলিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভিরাম-দেব গঙ্গার ঘাটে ভ্রমণ করিতে গিয়া শুনিলেন, বিশু মাঝি বলিল—

বাবু, গোপনে একটা কথা বলি, শুনুন, কেউ যেন শোনে না।

অভিরাম।—কি মাঝি, কি বল? ভাল ত?

বিশু মাঝি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া চুপে চুপে বলিল,—

বাবু, চুপ চুপ! ভাল বড় নয়! সেই ত অধিক রাত্রে এলাম, এসে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পল্যাম। অনেক ক্ষণ পরে একবার উঠে দেখি, সব নৌকা চলে গিয়েছে, আমি একা আছি। তখন দেখি, আপনাদের ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবু শেষে যা দেখলাম তা আর বলব কি? একা একা ভয়ে কেঁপে মরি! ব্রহ্মচারিণী রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছেন! আমি এই স্বচক্ষে দেখেছি! বাবু এর কারণ কি? আমি ত ভেবে চিন্তে কিছুই বুঝতে পারলাম না? দেখে অবাক্ হয়েছি? কিন্তু বাবু দেখবেন, এ কথা আমি বল্যাম—এ যেন প্রকাশ না হয়, শেষে একটা হাঙ্গামায় না পড়ে যাই! এই তাঁর কাপড় খানি ভেসে যাচ্ছিল, ধরে রেখেছি, নিয়ে যান।

মাঝি ব্রহ্মচারিণীর গৈরিক বস্ত্রখানি অভিরাম দেবের হস্তে অর্পণ করিল।

অভিরাম দেব বিশুর নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বিশু, তুমি কি তাঁকে দেখেছিলে?

বিশু।—বাবু, আগেও দেখেছি, শেষেও দেখেছি।

অভিরাম।—শেষে কি দেখেছ?

বিশু।—বাবু বলব কি? "ঝপ্" করে একটা প্রকাণ্ড শব্দ হল, তখন একটু এগিয়ে গেলাম। গিয়ে আর ব্রহ্মচারিণীকে দেখতে পেলাম না। কূলে গিয়ে দেখলাম, কাপড় খানি ভাসচে। বাবু কাপড় খানি যেই হাতে করেছি, অমনি দেখি, ব্রহ্মচারিণী জলের উপর হেঁটে বেড়াচ্চেন, আর গান গাচ্চেন। বাপ রে! লম্বা লম্বা হাত! লম্বা লম্বা পা, তাল গাছের মত!

অভিরাম দেব মাঝির নিকট এইরূপ শুনিয়া ও ব্রহ্মচারিণীর সেই গৈরিক বস্ত্রখানি দেখিয়া একবারে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি অবাক্ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারিণী এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিল। কুমারীকে বহির্গত ক'রে দিয়ে শেষে যার-পর-নাই অপদস্থ ও বিপদ-গ্রস্ত হইবে, এই ভেবেই সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে। বুঝি সে প্রতিজ্ঞা করেছিল—তার প্রাণ দিয়েও সে কুমারীর এই বিবাহ সম্পন্ন করবে।

অভিরাম ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ষোড়শ কথা।

দেবী-দাস।

কাশী যাইবার পথে, পাটনার পরে কিঞ্চিৎ দূরে ঝিনিয়া ষ্টেশন। ঝিনিয়াতে বাজার আছে, পুষ্করিণী আছে, ও অনেক লোকের বসতি আছে।

এই স্থান রাজা বীর-সিংহের জমীদারী। এখানে তাঁহার একটি কাছারি-বাড়ী ও তাহার এক খণ্ডে একটি অন্দর-বাড়ী এবং পৃথক আর একটি অন্দর মহল আছে। এতদ্ভিন্ন একটি গোলা-বাড়ী ও একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা বহু কাল হইতে তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজা ঝিনিয়াতে আসিয়া কাছারি-বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অনেক দাস দাসী, ভৃত্য গিরিধারী ও উল্লাসিনী সঙ্গে আসিয়াছে।

পুরাতন দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বস্থ শাল-শেগুন, তাল-তমাল, আম-জাম প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীর আশ্রয়ে শত শত সিপাহী ও রক্ষীদল শিবির স্থাপন করিয়া আছে। প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব পাঁড়ে সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সিপাহী গণের অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ বৃক্ষ-শাখায় দুলিতেছে, আর রবি-করে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে।

দীর্ঘিকার অনতিদূরে, গোলাবাড়ীর নিকটেই মন্ত্রীবর ভীম-পালের বাসা-বাটী। সেখানে মন্ত্রীবর অবস্থিতি করেন; পাচক ব্রাহ্মণ দেবীদাস পাঁড়ে ও একটি ভৃত্য তাঁহার বাসাতে নিযুক্ত আছে।

দেবীদাস শ্যাম বর্ণ সুপুরুষ। মুখ-শ্রী পণ্ডিতের ন্যায়। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল, ও মুখমণ্ডল সৌভাগ্য-সূচক; মস্তকে বিংশ হস্ত পরিমিত কাপড়ের পাগড়ী, অঙ্গে তুলাপূর্ণ আঙ্গরাখা, একখানি দীর্ঘ যষ্টি সর্ব্বদাই তাহার হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাত্রিশেষে নক্ষত্র দর্শন করিয়া সে স্নান করে, পরে সন্ধ্যা বন্দনা, পূজাপাঠ শেষ করিয়া, চন্দন-পঙ্কে ললাট-পট সুশোভিত করে। সে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পাকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়! বহুদিন সে বাঙ্গালায় ছিল, এই হেতু বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছে ও বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিয়া অতি সুমিষ্ট ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে শিখিয়াছে। তাহার রন্ধন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া মন্ত্রী মহাশয় অনেক সময় বলেন,—ঠাকুর, এমন মিষ্ট ব্যঞ্জন ত কখনো খাই নাই।

দেবীদাস আহারাদি সমাপন করিয়া, তুলসী-দাসের রামায়ণ ও দোঁহাবলী কক্ষতলে লইয়া, দীর্ঘ যষ্টি হস্তে করিয়া দীর্ঘিকার ধারে প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব পাঁড়ের নিকটে যায়। দুই পাঁড়েতে বড়ই ভাব। দেবীদাস রামায়ণ পাঠ করে, ও ব্যাখ্যা করে, এই হেতু সিপাহী সর্দ্দার গণ সকলে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসে ও কেহ মহারাজ, কেহ পণ্ডিতজী, ইত্যাদি সম্বোধনে তাহাকে সমাদর করে। সকলেই যেন দেবীদাসের গোলাম। ব্রহ্মদেব দেবীদাসের নিকটে যেন বিনা-মূল্যে বিক্রীত।

রাজার পুরাতন ভৃত্য গিরিধারী দেবীদাসকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। পাচক ব্রাহ্মণ না থাকায় মন্ত্রীবরের বড় কষ্ট হইতেছিল; গিরিধারী দেবীদাসকে আনিয়া উপস্থিত

করিলে তিনি দেখিলেন,—লোকটা বেশ শ্লোক শাস্ত্র বলে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহার কেহ কোথাও নাই, সে রোগে শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছে; আহারের সংস্থান নাই, তাই পাচকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। লোকটা সময় সময় বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়, আবার সময় সময় বিহ্বল হয়, একটু পাগলা-ভাব দেখা যায়। সে বলে, সে পূর্ব্বে সৈন্যদলে কাজ করিত, অনেক যুদ্ধও করিয়াছে।

মন্ত্রীবর, তাহার যুদ্ধ বিদ্যার একটু পরিচয় পাইয়া, তাঁহাদের লড়াই দাঙ্গা করিবার জন্য তাহাকে আদর করিয়া রাখিয়াছেন, অধিকন্তু তাহার দ্বারা পাচকের কার্য্য করাইয়া লন। দেবীদাসের সুরন্ধন ভোজন করিয়া মন্ত্রীবর তাহার সকল পাগলামী ও দোষ ভুলিয়া যান।

রাজা বীর-সিংহের কাছারি-বাড়ী দুই খণ্ডে বিভক্ত, অন্তর্ভাগে দাসী গণ থাকে, আর রন্ধনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বহির্বাটিতে ভৃত্যগণ থাকে, কাছারি হয় ও সর্ব্বদা লোক-জনের সমাগম হইয়া থাকে।

এই অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগের মধ্যস্থলে রাজার বৈঠকখানা, ভোজনাগার, বিশ্রামঘর ও শয়ন-ঘর আছে। বৈঠকখানা ও ভোজনাগারের তত্ত্বাবধানের ভার বিশ্বাসী ভৃত্য গিরিধারীর উপর ন্যস্ত আছে; উল্লাসিনী বিশ্রাম-ঘর ও শয়ন-ঘরের তত্ত্বাবধান করে। গিরিধারী ও উল্লাসিনীর আদেশে অন্যান্য দাস-দাসী গণ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

রত্নপুর হইতে বিমলা দেবী ঝিনিয়াতে আসিয়াছেন; তাঁহাকে পৃথক অন্দর-মহল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে পৃথক বাসা দেওয়া হইয়াছে। বিমলা দেবীর অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্তই স্বতন্ত্র। তাঁহার দাস দাসীই তাঁহার সকল কার্য্য সম্পন্ন করে।

মন্ত্রীবর ভীমপাল বিমলা-দেবীকে যথোচিত মান্য করেন। তিনি সময়ে সময়ে অন্দর-মহলে যান এবং বস্ত্রাবরণের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন ও নানা পরামর্শ প্রদান করেন; পরে তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজ সমীপে আসিয়া প্রকাশ করেন।

বিমলা-দেবী ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী নারী, এই জন্য স্বপাক-ভোজন করিয়া থাকেন। মন্ত্রীবরের নূতন পাচক ব্রাহ্মণ দেবীদাস পাঁড়ে বড় নিষ্ঠাবান, তাই বিমলা-দেবী তাহাকে একটু আদর করেন। তাঁহার রন্ধনের জল ও পানীয় জল দেবীদাসই আনয়ন করিয়া দিয়া যায়। তিনি অপরের আনীত জল গ্রহণ করেন না।

অদ্য বৈকালে রাজা কাছারি-বাড়ীতে ছিলেন, সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্ত্রীবরকে সঙ্গে লইয়া বিশ্রাম গৃহে আসিলেন। তিনি একখানি চৌকিতে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন,—মন্ত্রী, দেবী কি বল্যেন?

মন্ত্রী।—হুজুর, তিনি এখানে আসা অবধি কেবল কন্যার জন্য রোদন করচেন। আমাকে বল্যেন—"তারা নিশ্চয়ই এই পথে যাবে, কি গিয়েছে, আপনি সংবাদ নেবেন, যদি গিয়ে থাকে জানা যায়, তবে আর বিলম্ব না ক'রে কাশী যাত্রা করাই ভাল। সেখানে গিয়ে প্রণবাশ্রম অবরোধ করলেই কার্য্য সিদ্ধি হবে। তারা যে প্রণবাশ্রমে যাবে, তা তিনি জানেন।

রাজা।—তারা গেল কি না, তা জানবারই বা উপায় কি?

মন্ত্রী।—দেখি, সেটা অনুসন্ধান করি।

রাজা।—আচ্ছা, সেইটি শীঘ্র জান।

তখন উল্লাসিনী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কুসুম-স্তবক-স্তনী উল্লাসিনী বাসন্তি-বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। সে নূতন চন্দ্রহার পাইয়াছে, তাই আহ্লাদের সীমা নাই!

রাজা বলিলেন—উল্লাস, এতক্ষণ কি করছিলে?

উল্লাস।—করছিলাম আমার কাজ! মন্ত্রী মশায়ের একটা নূতন বামন-ঠাকুর এসেছে, সে যে কি রকম লোক, তা আর বলা যায় না! গিরিধারীর কাছে সে এসে বসে, কত ভাল ভাল কথা বলে, খুব শ্লোক শাস্ত্র জানে! আবার মাঝে মাঝে এমনি মজার মজার কথা বলে যে, শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ব্যথা হয়। তার কাছেই বসে ছিলাম।

রাজা।—মন্ত্রী, লোকটা কি রকম বল দেখি?

উল্লাস।—হুজুর সে বড় সাধু, গৈরিক বস্ত্র পরে, মাচ মাংস খায় না, প্রাতঃস্নান ক'রে ঠাকুর পূজা করতে বসে, সে খুব ভাল লোক।

মন্ত্রী।—লোকটা সাধুর বেশধারী, বেটার মনে মনে বদমায়েসী আছে, কেবল বাইরে ফোঁটা কেটে লাল কাপড় পোরে বেড়ায়, দেখায় যে আমি বড় সাধু!

রাজা।—ও আমি অনেক দেখেছি। তবে গেরুয়াধারী মাত্রেই বদমায়েস নয়। ঐ লাল কাপড় পরা ভাল লোকও আছে।

মন্ত্রী।—হুজুর, এখন বেশ্যারাও ঐ লাল কাপড় পরে, ও সব

বজ্জাতির চিহ্ন। তবে এ লোকটা রাঁধে খুব উত্তম, আবার শুনলাম সে আগে অনেক দিন সিপাইয়ের দলে কাজ করেছে, তাতেই লোকটাকে হাতে রেখেছি, আমাদের অনেক কাজে লাগবে।

রাজা।—বেশ, বেশ! তবে আমি ওকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব।

উল্লাস।—তা বেশ হবে।

মন্ত্রী।—হুজুর, আমি তা আগেই ভেবে রেখেছি। তবে এখন আমি আসি।

এই বলিয়া মন্ত্রী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ঝিনিয়াতে বানরের বড় উপদ্রব। অনেক সময় বানরে গৃহ হইতে খাদ্য দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। ঝিনিয়াতে আসিবার পরে রাজা বীরসিংহের অন্দর-বাটীতে ভাণ্ডার-গৃহে একটি বানরী প্রবেশ করে। তাহার বক্ষঃস্থলে তাহার একটি শিশু-সন্তান ঝুলিতে ছিল। বানরী ভাণ্ডার গৃহের অনেক দ্রব্য নষ্ট করিয়াছে ও সুপক্ব রম্ভা পাইয়া আনন্দে বসিয়া ভক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে একটি দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া ভৃত্যগণকে সংবাদ দেয়। "বানর! বানর!" বলিয়া কোলাহল উত্থিত হইলে, রাজা তাহা শুনিতে পাইয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন, এবং বানরীকে দূর করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। ভৃত্য গণ নানাবিধ উৎপীড়নের পরে সুতীক্ষ্ণ বর্শার আঘাতে বানরীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে। তখন অসহায় বানর-শিশুটি হতাশ হইয়া লোকের পীড়নে লম্ফঝম্প করিতে করিতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া তাহাদের

হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। বানর-শিশু দেখিয়া রাজার অতিশয় দয়া হয়। তিনি তাহাকে একটি লৌহ-শলাকাময় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া আপন বিশ্রাম-গৃহের সম্মুখে রাখিয়া দেন, ও সর্ব্বদা তাহাকে আহার প্রদান ও তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "রূপচাঁদ"। বিবিধ মিষ্টান্ন, রসাল ফল ও সুপক্ক কদলী প্রাপ্ত হইয়া রূপচাঁদ অনতিবিলম্বে রাজার একান্ত বাধ্য হইয়া উঠে। রাজা তাহার পরিধাণে এক খণ্ড উৎকৃষ্ট লাল বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া অঙ্গে একটি সবুজ সাটিনের কুর্ত্তা পরাইয়া দেন, এবং মস্তকে একটি জরীর টুপী লাগাইয়া দিয়া তাহাকে সুন্দর রৌপ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি আদর করিয়া তাহাকে রূপীবাবু বলিয়া সম্বোধন করেন। রূপীবাবু কখনও রাজার ক্রোড়ে বসিয়া অপূর্ব্ব হাস্ত রসের উদ্দীপন করে, কখনও হস্তে আরোহণ করিয়া বীর-রসের রঙ্গ করে, কখনও বা অবাধ্যতার জন্য রাজার চপেটাঘাত সহ্য করিয়া করুণ-রসের অভিনয় করিতে থাকে। রাজা বিশ্রামান্তে রূপচাঁদকে লইয়া একটু ক্রীড়া-কৌতুক সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

অদ্যও তিনি বিশ্রামান্তে রূপীবাবুকে লইয়া একটু ক্রীড়া করার পরে উল্লাসিনীকে বলিলেন—উল্লাস, আমাকে পান দেও, আমি একবার হাওয়া খেয়ে আসি। উল্লাস অমনি পানের বাটা সম্মুখে ধরিল। রাজা একটি মাত্র মস্লাদার পানের খিলি গ্রহণ করিয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইলেন।

উল্লাসিনীও সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া মন্ত্রীবরের পাকশালায় প্রবেশ করিল।

উল্লাসিনী দেবীদাসকে দেখিয়াই বলিল,—মহারাজ, আবার এলাম। তোমার কথা ভুলতে পারলাম না।

দেবীদাস বলিল—আমার কথা কি তোমার এত ভাল লাগে ?

উল্লাস --আহা, এমন কথা কখনো শুনি নাই! ঠাকুর-দেবতার কথা শুনতে আমি বড় ভালবাসি! আমার এক মাসী ছিল, সেই আমায় মানুষ করে; সে আমায় শক্তি ব'লে ডাকৃত। সে অনেক তীর্থ ধর্ম্ম করেছিল, সন্ধ্যাকালে রোজ বলৃত—শক্তি, আয় মহাভারত শুনবি। সে আমাকে অনেক ঠাকুর-দেবতার কথা বলত, আমি হা করে বসে শুনতাম। মাসী মরে যাওয়া অবধি আমার কপাল পুড়ল! ঠাকুর, আমার ইচ্ছা হয়, কাশী-বৃন্দাবন গিয়ে থাকি। আমার এক জ্যেঠাইমা বৃন্দাবনে আছেন। কেবল সঙ্গী পাই না ব'লেই যেতে পারি না! আমার আর এ সব ভাল লাগে না!

ঠাকুর।—শক্তি, এ সংসারে কেউ কারো নয়, কে কদিন থাকৃতে এসেছে ? আজ যে আদর করচে, কাল সে কোথায় যাবে, আমি বা কোথায় যাব ? ভগবানের নামই সার! শক্তি, কাশী যাও, বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে, পরে বৃন্দাবনে চলে যাও। যেখানে ইচ্ছা যাও, দর্শন কর, প্রাণ ভ'রে দেবতার সেবা কর, এই ত কাজ! মানুষের মন যোগালে কি ফল হবে ?

উল্লাস।—মহারাজ, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে ? তাহলে আমি বৃন্দাবনে যাই, আর এ সব ভাল লাগে না! কেবল মন যোগান, সত্যি বলেছ, আর পেরে উঠি না। মন যোগাতে যোগাতে আমার হাড় মাটি হ'ল!

উল্লাসিনীর মুখ-পূর্ণ তাম্বুলের রক্তরাগ ক্রমে অধর প্রান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া ঠাকুর বলিল—শক্তি, এত অধিক পান খাও কেন? ওটা ভাল নয়।

উল্লাস।—ঠাকুর, পান সাজতে সাজতে জান বেরুল। দিন রাত পান সাজা, তাই খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে পড়েছে! আর এখন ছাড়তে পারিনে। রাজা ত প্রায় খান না, তিনি ও-সব এখন ছেড়ে দিচ্চেন, যত বাবুরা আসেন, তাঁরাই দিবানিশি পান চিবুচ্চেন, তার পরে আবার পাল-মশায় তার উপর! আর ত কত জন আছেন, আসচেন আর পান চিবুচ্চেন, তার স্থির নেই, দিবারাত্রি সমান চলেছে!

ঠাকুর।—এত পান খাওয়াটা ছাড়তে পারবে না? শাস্ত্রে আছে—দুই একটি পান খেলে মুখশুদ্ধিও হয়, উপকারও হয়। দিবারাত্রি পান চিবায় কারা, জান?

উল্লাস।—কারা বল দেখি, ঠাকুর?

ঠাকুর।—পূর্ব্ব জন্মে যারা পত্রভোজী ছিল, সর্ব্বদাই কেবল বৃক্ষ-লতার পত্র ভোজন ক'রে বেড়াত, তারাই এ জন্মে, বহু পুণ্যে মনুষ্য-জন্ম পেলেও, সেই পত্রভোজী-স্বভাবটা ছাড়তে পারে নাই। তাই সর্ব্বদাই ঐ পানপত্র চর্ব্বণ ক'রে সেই প্রবৃত্তিটা পরিতৃপ্ত করে।

উল্লাস।—ও ঠাকুর! আর আমি সর্ব্বদা পান খে'য়ে বেড়াব না। এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলচি—ও কুস্বভাব এবার আমি ত্যাগ করব!

ঠাকুর।—শক্তি, মসলা আর আমলকী খেও। পান খেয়ে মুখটা লাল ক'রে বেড়ান, ভাল নয়। পান দু-একটিই উপকারী।

দেখ শক্তি, তুমি সময় সময় আমার কাছে এস, তোমাকে ভাগবত শুনাব, তারপরে কাশীধাম হয়ে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে লয়ে যাব।

উল্লাস।—মহারাজ, সেই ভাল। এখন এ কথা কাকেও ব'ল না, তা হলে সব নষ্ট হবে।

ঠাকুর।—না, না, না, যে যেমন লোক তার কাছে তেমন বলতে হয়। সকলে কি সকল কথা বুঝতে পারে? তুমি যদি ভগবানের পথে দাঁড়াও, আমি তোমাকে বৃন্দাবন, পুষ্কর, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কুরুক্ষেত্র দেখায়ে এনে শেষে পুরিধাম, দ্বারিকাধাম সব দর্শন করাব।

উল্লাস।—আচ্ছা মহারাজ, এই কথা রইল। খুব সাবধান, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মহারাজ, আর একটি কথা বলি—তুমি গেরুয়া-বস্ত্র ধারণ কর কেন? মন্ত্রী বলেন, ঐ লাল কাপড় দেখলেই আমি চটে যাই; তিনি বলেন, যত বেটা বদমায়েস তারাই ঐ লাল কাপড় পোরে সাধু সেজে বেড়ায়! ঠাকুর, তুমি কেন ঐ লাল কাপড় পর, ও ছেড়ে দেও না কেন?

ঠাকুর।—শক্তি, তোমার ঐ পা'লের কথায় আমি কি লাল কাপড় ছাড়তে পারি? তা পারি না। আমি নাম লিখে নিয়েছি।

উল্লাস।—নাম লিখে নিয়েছ? সে কি কথা ঠাকুর?

ঠাকুর।—শক্তি, তার নিগূঢ় কথা আছে, সকলকে তা বলা যায় না।

উল্লাস।—সে কি কথা ঠাকুর, বল তোমার পায়ে পড়ি।

ঠাকুর।—নিতান্তই শুনবে, তবে শোন। আমার গুরুদেবকে আমি বলেছিলাম—

বাবা, তোমার প্রদত্ত এই গেরুয়া দেখলে, সাধুর বেশ দেখলে, এখন অনেক লোকে অশ্রদ্ধা করে, ভণ্ড বলে, বদমায়েস বলে,—তার উপায় কি?

গুরুদেব বল্যেন,—বৎস, মা'রতে আসে না ত?

আমি বল্যাম—প্রায় মারতে আসাই বটে, অনেক লোক মারতেই আসে।

গুরুদেব বল্যেন—বৎস, মানবের মধ্যে কতক মানুষও আছে, কতক গরুও আছে।

আমি বল্যাম—বাবা, তবে কে বা মানুষ, কে বা গরু, তা স্থির করব কি রূপে?

গুরু বল্যেন—বৎস, লাল কাপড় দেখলেই দুষ্ট গরু গুঁতুতে আসে, তোমার ঐ গেরুয়া দেখে যারা গুঁতুতে আসবে, তারাই গরু জানবে। তখন তুমি তাদের নাম লিখে লিখে রেখ।

আমি বল্যাম—বাবা, নাম লিখে লিখে কি হবে?

গুরু বল্যেন—বৎস, নাম লিখে লিখে আমার কাছে আনবে। আমি শেষে দেখব—বাঙ্গলা দেশের মানবের মধ্যে কতগুলি বা মানুষ, আর কতগুলি বা গরু আছে, যারা সাধুর বেশ দেখলেই মারতে আসে।

উল্লাসিনী ঠাকুরের ঐ কথা শ্রবণ মাত্রে উচ্চহাস্য করিয়া করতালি দিয়া উঠিল, ও বলিল—ঠাকুর, ঠিক বলেছ, খুব বলেছ, তোমার পায়ের ধূলা আমি সাত বার মাথায় দেই। আচ্ছা ঠাকুর, তাহ'লে মন্ত্রীর নাম লিখে নিয়েছ?

ঠাকুর।—হাঁ, সর্ব্বাগ্রে।

উল্লাস।—তারপর আমার নামটাও লিখেছ?

ঠাকুর।—হাঁ, লিখে আবার কেটে দিয়েছি।

উল্লাস।—কেন ঠাকুর, কাটলে কেন?

ঠাকুর।—তোমাকে গরু পিটিয়ে মানুষ ক'রে নেব, এই ভেবে নামটি কেটে দিয়েছি।

উল্লাস।—দোহাই ঠাকুর, আর আমার নাম যেন লিখ না, আমাকে এবার মানুষ করে দেও, এই আমার প্রার্থনা।

ঠাকুর।—দেখ শক্তি, মন্ত্রী ত রাজাকে মাংসাহার শিখিয়েছে, তুমি যদি আমার কথা শুনতে চাও, তবে তুমি মাংসাহার ক'র না। ওতে নরকগামী হতে হয়। রাত্রে যদি অবসর থাকে তবে এস, তোমাকে গীতার শ্লোক শিখাব। গীতা না জানলে মনের অন্ধকার যায় না।

উল্লাস।—আচ্ছা মহারাজ, আর আমি মাংস খাব না। রাজাও ছাড়বেন বলেছেন। তিনি ঘুমালেই আমি আসব। আমাকে গীতা পড়াতে পার? আমি বই পড়তে পারি।

ঠাকুর।—পড়তে পার, তবে ত ভালই, তোমার গীতা কণ্ঠস্থ করিয়ে দেব, কিন্তু রাজা জানতে পেলে শেষে তোমাকে দূর করে দেবেন। শেষে একুল ওকুল—দুকুল যাবে।

উল্লাস।—ঠাকুর, আমাকে দূর করে, করবে, তার ভয়টা কি? আমার এক দুয়ার বন্দ ত হাজার দুয়ার খোলা। যে দিকে চোক যায়, সে দিকে চলে যাব। কাকে ভয় করি? মরতেও ভয় করি না। তিন বার মরতে গিয়েছি, আর মন্ত্রী-মশায় ধ'রে ধ'রে এনেছে, আমি ওই রাজা-গজা কাকেও গ্রাহ্য

করি না! তবে তেমন সঙ্গী পাই না, এই মুস্কিল, তাতেই বেরুতে পারি না, নইলে এত দিন কোন দিকে চলে যেতাম। ঠাকুর, দুকুল যাবে বলচ? দুকুল ত কখনও ভাঙ্গে না, "এক কুল ভাঙ্গে ত এক কুল গড়ে।" এটি বড় সত্য কথা, ভগবান আছেন। আচ্ছা ঠাকুর, তোমার কি চাকরীর মায়া আছে?

ঠাকুর।—দেখ শক্তি, পিতা-মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, সব ম'রে গিয়েছে। পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্চিলাম। তার পর একটু চৈতন্য হয়ে আহারের চেষ্টায় বেরুলাম; নইলে কি আর এই রসুই করতে এসেছি! সকল মায়া কাটিয়েছি, এখন এই ভগবানের পথ ধরেছি, জগতে আর কাকেও ভয় করি না, চাকরির মায়াও নাই, যেখানে মন হয়, সেখানে চলে যাই।

উল্লাস।—আচ্ছা ঠাকুর এখন আসি, রাত্রে আসব।

এই বলিয়া উল্লাসিনী চলিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়াই মন্ত্রীবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রীর সহিত অনেক কথা বলিল। অবশেষে মন্ত্রী বলিলেন,—উল্লাস, আর বিলম্ব ক'র না, খবরটা আনাই চাই। উল্লাস মৃদু স্বরে "যে আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়াই প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ কথা।

অনুসন্ধান।

সন্ধ্যা হইয়াছে, হাট বাজারে বড়ই গোল। ঝিনিয়া-বাজারে লোক জনের বড় ভিঁড়। বহু লোকের যাতায়াতে চারিদিকে একটা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। কেহ কাহারো দিকে চাহিতেছে না, আপন আপন কার্য্য সারিয়া আপন পথে সকলেই চলিয়াছে।

অমরেন্দ্রনাথ ও সুধাংশু কুমারীকে লইয়া কাশী যাত্রা করার পরে কুমারীর শ্রান্তি-জনিত অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে পথে একস্থানে নামিয়া কয়েক দিন একটি বাসা লইয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচারিণী এই জন্যই সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যথা করায় এক্ষণে তিনি বিলক্ষণ ক্ষোভ করিলেন, ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, কয়েক দিন সেবা শুশ্রূষা ও বিশ্রাম লাভের পরে কুমারী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন তাঁহারা তথা হইতে যাত্রা করিলেন। পাটনাতে নামিয়া আহার করিবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সেখানে অধিক লোকের জনতা হেতু তাহাতে সুবিধা বোধ হয় নাই; অগত্যা তাঁহারা আহারের জন্য ঝিনিয়া-ষ্টেশনে নামিয়া একটি ছোট-বাড়ী ভাড়া লইয়া আহারাদির আয়োজন করিয়াছেন। বীরসিংহ ঝিনিয়াতে আছেন, এ সংবাদ তাঁহারা জানিতেন না। কুমারী পাকের ব্যবস্থা করিতেছেন। সেখানে ভাল খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যায় না, মোটামুটি কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। দুগ্ধ লইয়া

গোয়ালিনী আসিল। অমরেন্দ্র দুগ্ধ লইবার জন্য গোয়ালিনীকে ডাকিলেন।

গোয়ালিনী দুগ্ধের পাত্র লইয়া পাক-শালার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। অমরেন্দ্র কুমারীকে দুগ্ধ লইতে বলিয়া বাহিরে গেলেন। গোয়ালিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া কুমারীর রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, শেষে সেই প্রিয়দর্শনার সম্মুখে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল; কেন,তাহা সেই জানে।

কুমারী বলিলেন, গোয়ালিনি, ব'স।

গোয়ালিনী।—হাঁ গা মা, রঙ্গপুর থেকে কারা এসেছেন? তাঁরা দুধ নেবেন, বলেছিলেন। তোমরাই কি রঙ্গপুর থেকে এসেছ?

কুমারী।—হাঁ, আমরাই দুধ নেব। দেও।

গোয়ালিনী।—হাঁ গা মা, তোমরা কোথা যাবে?

কুমারী।—বাছা আমরা কাশী যাব।

গোয়ালিনী।—ওঃ, বটে, বটে, তীর্থ করতে যাচ্চ? আমিও এবার কাশী যাব,—পাপ মুখে বল্‌তে নেই, তাই মনে করেচি। হাঁ গা, তোমরা বোধ হয় দু-একদিন এখানে থাকবে? দুধের "রোজ" নেবে? নেও ত রোজ দিয়ে যাব।

কুমারী।—হাঁ, থাকি ত দিও।

গোয়ালিনী।—হাঁ মা, তোমার শ্বশুর-ঘর কোথায়? কুমারী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাশী"।

গোয়ালিনী।—বেশ, বেশ, তা বেশ, বুঝি শ্বশুর-ঘরেই যাচ্চ? তবে ত তুমি বিশ্বনাথ দর্শন করেছ? আমার বড় ইচ্ছে, কাশী বৃন্দাবন যাই। মা, একবার যাব, গিয়ে তোমাদের

সঙ্গে দেখা করব। তোমরা বড় মানুষ, আমি দুঃখিনী, গেলে চিন্‌তে পারবে ত?

কুমারী।—তা পারব, বেশ তুমি যেও।

গোয়ালিনী।—আমার ভাগ্যে কি তা হবে? সে বড় কপালের কথা! মা তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি! আহা তোমাকে দেখতে যেন অন্নপূর্ণা। আহা কি মিষ্টি চেহারা! কি মিষ্টি কথা! মা, কাঙ্গালের কথা মনে রেখ, গেলে চরণে একটু স্থান দিও। বিশ্বনাথ দর্শন কি আমার ভাগ্যে হবে? দেখ মা, এখানে আর তোমরা থেক না, থেক না, এখনি চলে' যাও, এ বড় কুস্থান, এখানে বিপদ হবে। এই দুধ নেও, আমি যাই! বাবুদের বাড়ী দুধ দেব, ও-পাড়ার জমীদারদের বাড়ী দুধ দেব, মিত্তিরদের বাড়ী দুধ দেব, যাই, যাই—বলিতে বলিতে গোয়ালিনী দুগ্ধ ঢালিয়া দিল ও অমরেন্দ্র-নাথের নিকট গিয়া, মূল্য লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ ও সুধাংশু ভিতরে আসিয়া বসিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে তাঁহারা ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন।

তখন কুমারী মৃদুস্বরে অমরেন্দ্রকে বলিলেন,—দাদা, গোয়ালিনী "কোথা যাচ্চ,—কি নাম বৃত্তান্ত" সব জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

অমরেন্দ্র।—তুমি কি বল্যে?

কুমারী।—আমি বল্যাম, আমরা কাশী যাচ্চি।

অমরেন্দ্র।—কাশী যাচ্চি, বলা ভাল হয় নাই।

কুমারী।—আর বল্যে, এখানে থেক না, বিপদ হবে।

অমরেন্দ্র।—কেন সে এ কথা বল্যে? অবশ্য কোন কারণ আছে! একেই ত বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। আর এখানে থাকা হবে না। চল এই গাড়ীতেই আমরা কাশী যাই।

এই বলিয়া অমরেন্দ্র-নাথ সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, সুধাংশু ও কুমারীকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গমন করিলেন।

রাজা বীরসিংহ সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈঠক-খানায় বসিয়া ধূমপান ও গল্প করিতেছিলেন, এক্ষণে বিশ্রামাগারে আসিয়া পুনরায় ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

উল্লাস আসিয়া বলিল, মন্ত্রী মশায় বলেছিলেন, রত্নপুরের লোক এই পথে কখন যায়, খবর রাখ্‌বে, সেই খবর এনেছি। রাজা অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—কি খবর উল্লাস? কি খবর, শীঘ্র বল শুনি। এসেছে? এসেছে নাকি?

উল্লাস।—এসেছে না ত কি? এই বেলা যা করবেন করুন, আমি ব'লে কয়ে খালাস।

রাজা।—কোথায় কি রকম জানলে, বল শুনি।

উল্লাস।—আমি বাজারে ঢুকে দুধের ভাঁড় মাথায় ক'রে, ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, আর বল্যাম—দুধ নেবে গা? দুধ নেবে গা? দুধ নেবে গা? অনেক বাড়ী ঘুরে এসে একটি বাসাতে যেমন ঢুকেচি, অমনি তারা বল্যে—গোয়ালিনি, এস, এস, আমরা দুধ নেব। আমি একবারে গিয়ে, যেখানে একটি মেয়ে রাঁধচে দেখলাম, সেখানে বসলাম। বাবুরা বাইরে গেল, আমি মেয়েটির কাছে সব খবর নিয়ে এলাম।

রাজা।—মেয়েটি কি বল্যে?

উল্লাস।—আমি বল্যাম, রত্নপুরের বাবুরা দুধ চেয়েছিলেন, তোমরা বটে গা?

মেয়েটি বল্যে—হাঁ, ব'স, ব'স। তার পরে "কোথায় যাবে, কি বৃত্তান্ত" সব জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম কাশী যাবে। আর চাই কি?

রাজা। বটে, বটে, তুমি আর কি ন্য?

উল্লাস।—আর কত কি মাথামুণ্ডু বল্যাম, তার কি কিছু ঠিকঠাক আছে?

রাজা।—ডাক, ডাক, দ্বারবানকে ডাক দেখি।

উল্লাস দ্বারবানকে ডাকিল। দ্বারবান আসিয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন,—মন্ত্রীকে ডাক। দ্বারবান মন্ত্রীবরকে ডাকিতে গেল।

উল্লাসিনী রাজাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল,—

হুজুর, যে মেয়েটিকে দেখলাম, সে সামান্য মেয়ে নয়, এমন মেয়ে কখনও দেখি নাই, তার কথাই বা কি মিষ্টি। মুখের কথায় যেন মধু বর্ষণ হচ্চে! আহা এমন মেয়ে, তার বিয়ে দেয় না? এ কি কথা?

রাজা।—উল্লাস, তুমি তার বুঝবে কি? তারা কুলীন! কুলীন! কুলীনের মেয়ে অকুলে পড়বে, তাও কি হয়?

উল্লাস।—তবে কি ঘরেই থাকবে? বিয়েটিয়ে হবে না?

রাজা।—তা গতিকেই। ঘরেই থাকবে।

উল্লাস।— মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ব্যাঙ্গ করিয়া বলিল—হুঁ, হুঁ, হুঁ, এই যে ঘরে থাকচে! যত উল্ট বিচার!

রাজা।—তুই তার বুঝবি কি? ভূপেন্দ্রকে এইবার

জব্দ করব। মেয়ে যা করে, করুক, কিন্তু ভূপেন্দ্রকে আমি এইবার বেশ আক্কেল দিয়ে দেব। এবার সে বুঝবে যে, আমি কি ধন! আসুক মন্ত্রী, দেখ কি করি!

উল্লাস।—হাঁ, হাঁ, মন্ত্রীই সর্ব্বনাশ করবে। তাঁর ত খেয়ে খেয়ে আর কাজ নেই, কেবল—

"অক্ষর পাছে ফক্ক দিয়ে, পরের সর্ব্বনাশ করা।"

রাজা—তা বটে, বটে, মন্ত্রীই আমাকে জড়িয়ে ফেল্যে, কি করি? ঐ লোকটা থাকতে আর নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

বলিতে বলিতেই মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা বলিলেন—উল্লাস, আজ রূপী বাবুকে দেখি নাই। একবার নিয়ে এস দেখি, এই মেঠাইটা তাকে খাওয়াই।

উল্লাসিনী গিয়া রূপচাঁদকে লইয়া আসিল।

রূপচাঁদ আসিয়াই উল্লাসিনীর হস্ত হইতে ঝম্প দিয়া রাজার সম্মুখে পড়িল। রাজা তাহাকে মেঠাই খাওয়াইয়া পরে বলিতে লাগিলেন—

"থোম্‌কে নাচে রূপী বাবু,—থোম্‌কে থোম্‌কে নাচে!"

রূপচাঁদ অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—দেখ দেখ, মন্ত্রী দেখ, রূপী-বাবু কেমন চমৎকার নাচতে শিখেছে!

মন্ত্রী।—হুজুর, চমৎকার নৃত্য! বেশ কায়দা শিখেছে, দেখছি!

রাজা।—মন্ত্রী, শুনেছ? শুনেছ? কুমারীকে নিয়ে ভূপেন্দ্র এসে কোন খানে বাসা করে আছে! উল্লাস আজ গোয়ালিনী হয়ে গিয়ে দেখে এসেছে।

মন্ত্রী।—বটে, বটে? কি উল্লাস? গোয়ালিনী হয়ে গিয়েছিলে? কোথা, কি দেখলে?

উল্লাস।—হাঁ, আপনার কাছে সকল কথা শুনেই আমি তখনই গোয়ালিনী হয়ে, দুধের ভাঁড় মাথায় ক'রে বাজারে ঘরে ঘরে সন্ধান নিতে লাগলাম। তারপরে দেখলাম, বাজারের শেষ ভাগে রত্নপুরের বাবুরা মেয়ে ছেলে নিয়ে বাসা করে আছে।

মন্ত্রী।—তবে এখনই আমি লোক পাঠাই, আর একবার ভাল ক'রে দেখে আসুক, এখনই তাদের সকলকেই আটক করব, যাবে কোথা?

রাজা।—মন্ত্রী, তবে শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

মন্ত্রী "যে আজ্ঞে" বলিয়া বাহিরে গেলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে উল্লাসিনী চলিল।

উল্লাসিনীর ইচ্ছা এই যে, দেবীর আশ্রমে যাচ্ছেন যে দেবী, সেই দেবীকে দেবীদাস-ঠাকুর একবার দর্শন করিয়া আসুক, কাশীধামের পবিত্র কথা তুলিয়া একটু আলাপ করিয়া আসুক, আর এখান হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়া আসুক। এইরূপ অভিপ্রায়ে সে মন্ত্রীবরের পশ্চাতে পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—

মন্ত্রীমশায়, এ কাজ আর কারও দ্বারা হবে না। আমার কথা শুনবেন ত শীঘ্র গিয়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিন। আর কারো কর্ম্ম নয়।

মন্ত্রী।—উল্লাস, আমিও তাই ভেবেছি। তবে আমি বাসায় চল্যাম।

মন্ত্রীবর বাসাতে গিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরকে ডাকিলেন, পরে বলিলেন,—মহারাজ, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। শুনলাম রত্নপুরের বাবুরা এসেছে। বাজার ছেড়ে গিয়ে এক প্রান্তে তারা বাসা করেছে। গোপনে অনুসন্ধান ক'রে এস, বাস্তবিক রত্ন-পুরের বাবুরা মেয়ে ছেলে নিয়ে সেখানে এসেছে কি না? জল্‌দি খবরটা নিয়ে আসবে। তা হ'লে আর আমাদের কাশী পর্য্যন্ত যেতে হবে না। এখানেই তাদের সব আটক করব। এখানেই কার্য্য সিদ্ধি হবে, ভালই হবে।

দেবীদাস "যে হুকুম হুজুর" বলিয়া লাঠি লইয়া বহির্গত হইল। বাজারে গিয়া এধার-ওধার সমস্ত দেখিল, সকলকে জিজ্ঞাসা করিল "রতন পুরের বাসা কোথায়!" কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। উল্লাসিনীর কথা ক্রমে তখন তাঁহারা গাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে আসিয়া ঠাকুর মন্ত্রী-বরকে বলিল—হুজুর, সব ঝুট্! এই বয়সে অনেক দেখলাম, সব লোক বলে—কোথায় রতনপুর? এখানে রতন-পুর নেই!

মন্ত্রীবরের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, তিনি অধিক রাত্রে সেই সংবাদ পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যাও, চীৎকার ক'র না।

দেবীদাস আপন শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল। সে গিয়া দেখিল—উল্লাসিনী আসিয়া বসিয়া আছে।

উল্লাস।—ঠাকুর, তাদের দেখতে পেয়েছ?

ঠাকুর।—না।

তখন্ তাহারা নির্জ্জনে বসিয়া কুমারী সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিল, এবং স্থির করিল যে কাশীধামে গিয়া তাহারা কুমারীকে ও দেবীকে দর্শন করিবে।

ঠাকুর বলিল—শক্তি, তোমার কোকিল-কণ্ঠে একটী ভজন শুনিয়ে যাও।

উল্লাস।—ঠাকুর, আমি ত ভজন জানি না, এতকাল কেবল ভোজনই জানি, তোমার কাছে এই ভজন শিখচি মাত্র। তুমি গাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। লোকে বলে—

"মধুপুরে যাও কালাচাঁদ, আমি তোমার সঙ্গে যাব!"

আমারও হয়েছে তাই।

তখন উল্লাসিনীকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া ঠাকুর ভজন গাইতে লাগিল। উল্লাসিনী ঠাকুরের সেই মধুর কণ্ঠের সহিত বামা কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে আরম্ভ করিল—

গীত।

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল,
মুখরিত মুরলী সুতান,
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকিত,
যমুনা বহয়ে উজান!
তনু অনুলেপন ঘন,সার চন্দন
মৃগ-মদ কুঙ্কুম দানা,
অলিকুল-চুম্বিত অবনী-বিলম্বিত
গলে বনমাল দোলানা!

অতি সুকুমার শ্রীচরণ-তল শীতল,
জিতল শরদরবিন্দ,
চতুর ভকত-ভৃঙ্গ মধুপানে উনমত,
গাওত গীত-গোবিন্দ !

গানের পরে উল্লাসিনী বিদায় হইল।

দেবীদাস তোমার সমস্তই ভাল, কিন্তু নিশীথ কালে এরূপ সঙ্গ, তোমার পক্ষে ভাল কি? তুমি কি সিদ্ধ পুরুষ? ছিঃ! দেখিবে, এখনই চারিদিকে কত কথা উঠিবে।

অষ্টাদশ কথা।

দীঘার পাড়।

অদ্য প্রাতঃকাল হইতে বিমলাদেবী অন্দর-বাটীতে "কুমারী কুমারী" বলিয়া রোদন করিতেছেন। উল্লাসিনী তাঁহার নিকটে গিয়া বসিয়া আছে। কন্যার শোকে দেবীর অশ্রুপাত হইতেছে, দেখিয়া সেও নয়ন-জলে ভাসিতেছে!

বিমলা-দেবীর পানীয় জল অদ্য দেওয়া হয় নাই, এক জন ভৃত্য গিয়া মন্ত্রীবরকে জানাইল।

মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণঠাকুর, অন্দরে গিয়ে মাইজীর খাবার জল তুলে দিয়ে এস। অন্য লোকের হাতের জল মাইজী খাবে না।

দেবীদাস "যে হুকুম, হুজুর" বলিয়া অন্দর-বাটীতে প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়ে দেখিল,—"জমিদারণী" কেবল "কুমারী-কুমারী!" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, উল্লাসিনী তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছে। ঠাকুর বলিল,—মাইজী, বেটীর জন্ম এত কাঁদছিস কেন? তোর বেটী বিয়া করবে, ভালই করবে। বেটী-ছেলে কি ঘরে রাখতে আছে?

বিমলা-দেবী বলিলেন—দেবীদাস, কাঁদচি যে কেন, তা তোমাকে আর কি বলব? শোন,—আমার ঐ মেয়েটি জন্মাবার পরেই আমাদের গুরুগোষ্ঠী জ্যোতিষী ঠাকুর এক কোষ্ঠী প্রস্তুত ক'রে আমাকে গোপনে বলে গেলেন যে, মা, এই কন্যার বিবাহ দিও না, বিবাহ দিলেই এক মাসের মধ্যে হয় কন্যার মৃত্যু হবে, না হয় স্বামীর মৃত্যু হবে। বাবা সেই ভয়ে আমি বিবাহ দিই না। সে কথা বল্যেও কেউ মানে না, তাই কাকেও আর বলি না। বাবা দেবীদাস, আমার প্রাণের অধিক কুমারী আজ কোথায়? আমি যে তাকে চোখের আড়ালে রাখতে পারতাম না! আমি যে তাকে হাতে হাতে খেতে না দিলে সে খায়নি! আমার সেই বুকের ধন আমার বুক চিরে কে নিয়ে গেল! আর কি আমি আমার বাছার মুখখানি দেখতে পাব? আমি কি করতে কি করলাম! কোথায় গেলে আমি আমার সোণার বাছাকে পাব? কে আমার প্রাণের ধন চুরি ক'রে নিয়ে গেল! আহা কুমারী—কুমারী আমার! আর কি তোরে বুকে নিয়ে বুক জুড়ুতে পারব? মা, তুই কি আমায় জন্মের মত ভাসিয়ে গেলি! তোরে না পেলে আমি নিশ্চয় গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। তুই শুনতে পা'বি, তোর পাগলিনী মা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছে!

ঠাকুর।—মাই, কেন এত কাঁদচিস্। ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ। কোন চিন্তা নাই, আমি তোর বেটীকে এনে দেব, আমি এনে দেব, তার কিছু ভাবনা নাই, মাই তুই ঠাণ্ডা হ।

বিমলা-দেবী বলিলেন—দেবীদাস, মন যে বোঝে না! তোমার কথাগুলি আমার বড় মিষ্ট লাগে, বল দেখি, কি ক'রে তুমি আমার মেয়ে এনে দেবে?

ঠাকুর বলিল—মাইজী, তার ভাবনা কি? আমি বহুৎ রোজ সিপাহীর কাজ করেছি। পাঁচ শ সিপাই সঙ্গে পাই, ত এখনি তোর বেটীকে লিয়ে আসব! বলিস্ মাই, হুজুরকে বলিস, দেবীদাসকে সর্দ্দার ক'রে পাঠাবে, ত ঠিক সে মেয়ে লিয়ে আসবে, তার ভাবনা নাই।

বিমলা-দেবী।—দেবীদাস, তা যদি তুমি পার, তবে তোমাকে পাঁচ শ টাকা বকসিস দেব। মন্ত্রী মশায়কে আমি তোমার কথা ব'লে পাঠাব। ঠাকুর, আমাদের ঘর-বরও তেমন পাওয়া যায় না, আর মেয়েটি ছেড়েও আমি থাকতে পারি না।

ঠাকুর।—সীতারাম! সীতারাম! মাই তুই কি পাগলা হয়েছিস? তোর মেয়ে ঘরে এনে কি সিন্দুকে পুরে রাখবি? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, মাই; ছি, ছি! ও মতলব ছেড়ে দে!

বিমলা-দেবী।—ঠাকুর তুমি বড় বুদ্ধিমান, যা বলচ তা সত্য। কিন্তু এত দূর এসে ফিরে যাব না; না আসতাম ত ভাল হত। এসেছি ত একবার দেখে যাব—আমার সেই প্রাণের প্রতিমা খানি কোথায়? দেবীদাস, এখন যদি কাশী পর্য্যন্ত না যাই ত তোমার রাজা-বাহাদুর কি বলবেন? তাঁকে

আমি অনেক ব'লে কয়ে রেখেছি; তিনি আমার জন্য অনেক করেছেন।

ঠাকুর।—সীতারাম, সীতারাম! মাই, তোদের জমীদারের কথা, আমি কি বলব?

এই বলিয়া ঠাকুর জল তুলিয়া দিয়া বাসায় চলিয়া গেল। উল্লাসিনী এতক্ষণ নীরবে দেবীদাসের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, সে যাহা বলিল তাহা উল্লাসিনীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া ভীমপাল বলিলেন, মহারাজ, কি রসুই হবে? আজ ভাল ক'রে রসুই কর, কাশীজী যেতে হবে; সর্দ্দার হ'তে পারবে? লড়াই করতে হবে, দেখছ কি?

ঠাকুর।—হুজুর, বহুৎ লড়াই করেছি, হুকুম হয় ত তৈয়ার হই। হুজুর, এক কথা এই—জমীদারণী, ওর বেটীর সাদি না দিয়ে, কি ক'রে ঘরে রাখবে?

ভীমপাল হো হো হো! রবে হাস্য করিয়া বলিলেন,—ওরে ঠাকুর, সে ভাবনায় আমাদের কাজ কি? কি ক'রে ঘরে রাখবে, তা সে বুঝবে। রাজা-বাহাদুর এইবার ঐ সব লোক জব্দ করবেন, এই ফিকির। মেয়ে ত ভালই করেছে, ওর মা রাজা-বাহাদুরের শরণ নিয়েছে, রাজা-বাহাদুর এবার ভূপেন্দ্র নারায়ণকে কেমন জব্দ করেন, দেখ। আমরা কাশী যাব, তীর্থ হবে, লড়াইও হবে। লুঠপাঠ যত করতে পার, সব তোমাদের! লুঠপাঠ সিপাইয়ের ধর্ম্ম, আর শত্রুনাশ রাজার ধর্ম্ম।

সে যাক্, ঠাকুর, ওসব কথা এখন থাক, কাছে এস, কাণে কাণে একটা কথা বলি, শোন।

ঠাকুর অগ্রসর হইলে ভীমপাল বলিলেন—এ বাজারে ভাল নাচ-ওয়ালী আছে? আন্‌তে পারবে? তাহলে ভাল বক্‌সিস্‌ পাবে।

ঠাকুর।—সীতারাম, সীতারাম! হুজুর এ আর কোন কথা? হুকুম হয় ত ওর শির লিয়ে আসব!

ভীমপাল।—ওরে পাগল, শির না, শির না! কেবল ব'সে পুঁথি পড়তে পার, বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নেই? আমার সঙ্গে বাঙ্গলায় যাবে, মছলি খাবে, তবে এ সব বুঝ্‌তে পাবে। ছাতুখোর বক্ত নয়, পেটে কিছুই নাই!

এই বলিয়া ভীমপাল নিজের বিশাল উদরের উপর হাত বুলাইতে লাগলেন। ঠাকুর রসুই করিতে গেল। দেবীদাস রসুই-ঘরে গিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্নে ভীমপালকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইল। সে নিজে মৎস্য মাংস গ্রহণ করে না, সুতরাং সে পৃথক পাক করিয়া ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল, ও উল্লাসিনীর জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া দিল। উল্লাসিনী লুকাইয়া গিয়া দেবীদাসের প্রসাদ পায়, কেহ তাহা জানে না।

আহারান্তে দেবীদাস পাঁড়ে পুঁথি বগলে করিয়া দীঘীর পাড়ে ব্রহ্মদেব পাঁড়ের কাছে গেল। সেখানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতে লাগিল, আর সকলকে অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

এদিকে উল্লাসিনী প্রসাদ পাইয়া এক খানি মলিন বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কলসী কক্ষে দীঘির ঘাটে চলিল। সে ঘাটে

গিয়া গোপনে বসিয়া আছে—ঠাকুরের রামায়ণ পড়া শুনিবে, তার বড় সাধ।

সিপাহীগণ সেই রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পাঠের পরে, রামধীরাজ সিং জিজ্ঞাসা করিল,—

পণ্ডিতজী, লড়াই করতে আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে, হুজুরের হুকুম, শুনেছ?

ঠাকুর।—হাঁ, সব জানি, প্রাণ ত এক দিন যাবে, দু'দিন নয়! মৃত্যু ত আনন্দ! মরতেই ত জন্মেছি। বালক বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সব মরছে, আমি ভয় করব? সব লোক যে কাজ করে, সেই কাজই অতি সহজ কাজ। তোমরা মরবে, আর জন্ম নেবে। আমরা মরব, আর জন্ম নেব না। দাদা ব্রহ্মদেব, জগৎ সংসার মিথ্যা—"নলিনী দলগত জলবৎ তরলং।" এ সব তিন দিনের খেলা। রাম ভজ, রাম ভজ।

এই জমীদারণীর দুঃখ দেখে আমার ছাতি ফাটে! বলে, বেটীর সাদি দিবে না। কি জেনানা বুদ্ধি!

ব্রহ্মদেব।—ভাই, ও সেই মোটা ভুঁড়ির বুদ্ধি। সব বুদ্ধি তার! যাহোক, তিনি তোমায় প্রতিপালন করচেন, তোমার কর্ম্ম তুমি কর।

ঠাকুর।—হাঁ, তিনিই ত প্রতিপালন করচেন! ভগবান যেমন প্রতিপালন করছেন, তিনিও তেমনি করছেন—চখে কিছু দেখা যায় না।

শিবশরণ তেওয়ারি বলিল—সে মেয়ে আর মিলবে না, কোথা গেল, কে জানে?

ঠাকুর।—আরে আমি মিলিয়ে দেব; ব্রহ্মদেব আর আমার হুকুমে লড়াই হবে, হুজুরের হুকুম। মেয়ে দিয়ে কি হবে? ভুপেন্দ্রনারায়ণকে আমি বলব, আর সন্ধি ক'রে দেব, লাখ্ রূপেয়া মেরে দেব। তোমরা সব লুঠপাঠ করবে, সিপাহীর আর কি কাজ?

ব্রহ্মদেব।—ভাই দেবীদাস, সে কথা ত গেল, আর এক কথা বলি। তুমি রাগ কর না। তোমার সব ভাল। তোমাকে সকলে ভক্তি করে, কিন্তু তোমার একটা দুর্নাম হচ্চে, শুনে আমার দুঃখ হচ্চে। কেন? তুমি সাধু, তোমার এমন কথা হবে কেন?

ঠাকুর।—কি কথা, দাদা?

ব্রহ্মদেব।—লোকে বলে, উন্নাসিনী রাত্রি কালে তোমার কাছে গিয়ে বসে থাকে। এ কি কথা? তার অল্প বয়স, সে কেন রাত্রিকালে তোমার কাছে আসে? রাজা ও সব দেখতে পারেন না। শুনলে তোমার গরদান নেবেন, খুব সাবধান! খুব সাবধান!

ঠাকুর।—দাদা, আমি বহুৎ বারণ করি, সে শোনে না। আচ্ছা, আমি হুসিয়ার হব।

এই বলিয়া ঠাকুর ব্রহ্মদেবকে আলিঙ্গন করিল ও বিদায় হইল। তখন চারিদিক হইতে "গোড় লাগি, গোড় লাগি শব্দ উত্থিত হইল।

উন্নাসিনী গোপনে ঘাটে বসিয়া সমস্ত কথা শুনিল, সে দেবীদাসের কলঙ্কের কথাও শুনিয়াছে, শুনিয়া অবধি দরদরে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। সে মনে মনে চিন্তা করিতে

লাগিল, কি! আমার জন্য মহারাজকে এত কথা সহ্য করতে হল? আমার জীবনে ধিক, আমি মরেও যদি পারি মহারাজের এ ঋণ পরিশোধ করব। বর্ষার ধারার ন্যায় উল্লাসিনীর অশ্রুধারা উছলিয়া উঠিল। এই অবিরাম অশ্রুপাতেই তাহার হৃদয়ের পাপ-পঙ্ক ধৌত হইতে লাগিল। উল্লাসিনী উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ কথা।

রসুই ঘরের মন্ত্রণা।

অপরাহ্নে উল্লাসিনী গৃহে আসিয়া দেখিল—রাজা তাঁহার বিশ্রাম গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এবং আর কাহাকেও না পাইয়া রূপ চাঁদের সহিত আলাপ করিতেছেন। তিনি উল্লাসিনীকে দেখিয়া বলিলেন, উল্লাস কোথায় ছিলে? আজ রূপীবাবুর সাজ সজ্জা করে দিলে না, আমি এসে রূপীবাবুকে পোষাক পবিয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখ কেমন ছড়ী হাতে করে বেড়াচ্ছে! ঠিক বাবুদের মত না?

উল্লাস।—বটে, বেড়াতে গিয়েছিল? ভালরে রূপী-বাবু? রূপীবাবু এবার মানুষ হয়ে গেল!

রাজা।— রূপী বাবুকে কিছু খেতে দিতে হবে।

উল্লাস।—ঐ ত ফল রয়েছে, দিন।

রাজা একটি একটি করিয়া সুপক্ক কদলি রূপচাঁদের হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন, সে পরমানন্দে ভোজন করিতে লাগিল।

আহার সমাপ্ত হইলে সে একটী কদলি হস্তে করিয়া আপনার মস্তকের টুপীটি হেলাইয়া অপাঙ্গ ভঙ্গিতে উল্লাসিনীর সহিত রঙ্গ করিতে লাগিল। রাজা বলিতে লাগিলেন—

থোম্‌কে থোম্‌কে রূপী বাবু, থোম্‌কে থোম্‌কে নাচে রে!

এদিকে মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া রাজা বিশ্রাম-গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। মন্ত্রীবর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা।—কি মন্ত্রী, এখন কেন?

মন্ত্রী।—হুজুর, একটি অনুমতি নিতে এলাম।

রাজা।—আবার কি? কিসের অনুমতি?

মন্ত্রী।—হুজুর, সেই পাচক ব্রাহ্মণ দেবীদাস পাঁড়েকে সর্দ্দারের পদ দেওয়া হবে, বলা হয়েছিল, সে বিষয়ে একটা পাকা হুকুম চাই।

রাজা।—হাঁ সে হুকুম ত দেওয়াই আছে, যখন দরকার হবে, তুমি তাকে ব'লে দিও। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি। এখন যাও।

মন্ত্রী প্রণাম করিয়া বাসা বাটীতে চলিয়া গেলেন।

দেবীদাস প্রতি দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যা কালে বাসাতে আসে। অদ্য সে আসিলেই ভীমপাল তাহাকে বলিলেন, ঠাকুর শোন, তোমাকে বড় সর্দ্দার করে দেওয়া যাবে, কাশী গিয়ে লড়াই করতে হবে, পারবে ত?

ঠাকুর।—যে হুকুম, হুজুর! আমাকে প্রধান সর্দ্দারের পদ দিলে, আমি লড়াই ফতে করে দেব। সিপাহী সব নির্ব্বোধ, পশুর সমান। যুদ্ধ-পরিচালনা বিদ্যা সকলের নাই। বুদ্ধির সঙ্গে তাদের পরিচালিত করতে পারলে তবে যুদ্ধ জয় হয়। সময় জেনে আক্রমণ, আর সময় জেনে সন্ধি, এইত লড়াইয়ের অভিসন্ধি। হুজুর, আমি লড়াই জয় করব, আরও লাখ রূপেয়া মিলিয়ে দেব; সন্ধির প্রস্তাব পাঠাব, এ দিকে লুঠপাঠ আরম্ভ করে দেব। ভূপেন্দ্র নারায়ণকে বন্দী ক'রে এনে দেব, রাজা-বাহাদুরের কাছে বক্‌সিস্ নেব।

ভীমপাল।—বহুৎ আচ্ছা, তুমি আর ব্রহ্মদেব প্রধান সর্দ্দার হবে। কাশীতে গিয়ে সেই আশ্রম আটক করতে হবে। তারা ঠিক এই পথেই গিয়েছে শুনলাম। সে যাক্, ঠাকুর, এখন যাও, রসুই দেখ গে। সর্দ্দার হ'লে, তাই বলে যেন রসুই ভুল না।

ঠাকুর।—হুজুর, সর্দ্দারের পেট কোথা যাবে? রাজা হোক গজা হোক, পেটের চিন্তা আগে।

এই বলিয়া ঠাকুর পাকশালার দিকে চলিয়া গেল। সে পাক শালায় গিয়াই দেখিল, উল্লাসিনী আসিয়া বসিয়া আছে। ঠাকুর পাক করিতে আরম্ভ করিল, ও তাহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

উল্লাসিনী।—মহারাজ, শুনচি, তুমি না কি সর্দ্দার হয়ে যাবে?

ঠাকুর।—হাঁ হুজুরের হুকুম।

উল্লাসিনী।—বেশ, বেশ, শুনে সুখী হলাম। আজ কি রসুই হবে? মাংসের কি করবে?

ঠাকুর।—শক্তি, কি আর বলব! তুলসীজীর উপদেশ আজ অনেক পাঠ করা হ'ল। তুলসীজী বলছেন—জীব হিংসা করবে না। এখন এই সব শাস্ত্র পাঠ ক'রে, কি প্রকারে আমি ছাগমাস রসুই করি? এই পাল-মশায় রোজ রোজ একটা ছাগ কাটছে, ত্রিশ দিন ত্রিশটা ছাগ হত্যা? তিনশ পঁয়সট্টি দিনে, তিনশ পঁয়সট্টিটি ছাগ কাটা হচ্ছে! দশ বৎসরে প্রায় চার হাজার ছাগ হত্যা করে খাচ্ছে! বাঘের বাবা কোথায় লাগে? মানুষ হয়ে প্রাণীর মাংস কেটে খাওয়া কি ভয়ানক!

উল্লাসিনী।—মহারাজ, আজ তোমার কথায় আমার চৈতন্য হল! তোমার গোড় লাগি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন আমার পাঁটা-কাটায় মন না হয়। ঠাকুর কৃপা কর, আমায় দুটি দুটি প্রসাদ দিও, দেখব, সাধুর প্রসাদের মাহাত্ম্য কেমন? তোমার এঁট-ঝুঁট আমি ঘুচাব, আর কিছুই চাই না।

মহারাজ, তোমার কৃপায় আমার চৈতন্য হচ্চে! চল এবার আমরা বিশ্বনাথের পুরি দর্শন করতে যাই।

ঠাকুর।—শক্তি, তবে কি কিছু সম্বল করেছ? এত দিন রাজসংসারে আছ, কিছু পুঁজি হয়েছে?

উল্লাসিনী।—না, না, ঠাকুর তা আমার কিছুই নাই।

"ভানে কোটে খায় দায়, থাকে থাকে যায় যায়!"

আমারও তাই। ত্রিসংসারে আমার সহায় সম্বল কিছুই নাই। আমিও একরূপ সন্ন্যাসী। মাসী যাওয়ার পর হতে ভূণ পাছটির উপরেও আমার মায়া নাই। খাটি খুটি, দুটি খাই পরি, এই পর্য্যন্ত।

এই বলিয়া উল্লাসিনী নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

পরে ঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, উল্লাসিনীর নয়ন ধারা প্রবাহিত হইয়েছে।

ঠাকুর বলিল—শক্তি, তুমি কাঁদচ কেন?

উল্লাসিনী।—মহারাজ, আজ আমার বুকে যে শেল বিঁধেছে তার ব্যথাতে কাঁদচি!

ঠাকুর।—সে কি শক্তি? কি হয়েছে?

উল্লাস।—মহারাজ, আমি তোমার কাছে আসি ব'লে, লোকে তোমাকে কলঙ্ক দেয়! এ দুঃখ আমার হৃদয়ে সহ্য হচ্চে না! এ পাপ-সংসারে আমি আর থাকব না। রাজা-গজা কি আমি গ্রাহ্য করি? মহারাজ, ভগবান সাক্ষী, তুমিই আমার মহা রাজা! আমাকে তুমি বাঁচাও।

এই বলিয়া উল্লাসিনী রোদন করিতে লাগিল।

ঠাকুর।—সে কি শক্তি, তুমি একথা শুনলে কোথায়?

উল্লাস।—মহারাজ, তোমার রামায়ণ কথা শুনব ব'লে, আমি দীঘীর ঘাটে কলসী নিয়ে বসেছিলাম। সব কথা আমি শুনেছি। আর আমি এখানে থাকব না। চল আমরা কাশী হয়ে বৃন্দাবন ধামে চলে যাই! এরূপ স্থানে এমন নীচ কাজে তুমিও আর থেক না, আমিও আর থাকব না।

ঠাকুর।—দেবী কৃপা করেন ত সবই হবে। তুমি যদি বাঁচতে চাও, তবে মনে মনে রাত দিন দেবীকে ডাক। তিনি শীঘ্রই তোমাকে কৃপা করবেন। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর।

উল্লাস।—মহারাজ, তুমি সাধু পুরুষ, তোমাকে সকল কাজেই সন্তুষ্ট দেখি! এত জ্ঞানী হয়ে এরূপ নীচ কাজ কর কিরূপে? পরের হুকুমে খেটে মর, পরের রসুই করে খাও,

এতে তোমার মন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে কিরূপে, বুঝতে পারিনে।

ঠাকুর।—শক্তি সে কথা আর তোমাকে কি বলব? আমি সাধুগণের দাস, তাঁদের অনুসরণ করি মাত্র। নীচ কাজই হোক, আর উচ্চ কাজই হোক, সকল অবস্থাতেই সাধুগণ সন্তুষ্ট থাকেন। সকল কাজই দেবীর কাজ, এই মনেকরা উচিত। সেই আনন্দময়ী যাকে কৃপা করেন, তার সকল কাজেই আনন্দ হয়, তার সকল স্থানই আনন্দ ময়!

উল্লাসিনী।—ঠিক, ঠিক, মহারাজ, এখন বুঝতে পেরেছি।
"যার যখন চলে,—তার বাহ্যে ব'সে বাতি জ্বলে!"

আমি শুনেছি, তুমি পায়খানাতে গিয়েও আনন্দে গুণ গুণ স্বরে গান গাও, তোমার পায়খানাতেও বাতি জ্বলে, সত্যি, সত্যি! আর সকলের অট্টালিকাও অন্ধকার! ঠাকুর তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। মহারাজ আমি কিসে সেই দেবীর কৃপা পাব, তাই আমাকে বল, আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই জানি না, আমি পাপে পতিত হয়েছি! আমি পতিত, আমার দ্বারা দেবীর কি কার্য্য হবে? কিছুই হবে না, তুমি আমাকে কৃপা কর।

ঠাকুর।—শক্তি, সেফালিকা পতিত হয়ে থাকে, সেইরূপ অনেক পতিত পুষ্পেও দেবীর পূজা হয়। তুমি পতিত-কুসুম হ'লেও, সেফালিকার ন্যায় তোমার দ্বারাও দেবীর পূজা সম্পন্ন হবে। ব্যস্ত হ'য় না। আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধরে থাক, সেই দেবীর কার্য্য কর।

উল্লাসিনী।—মহারাজ, তোমার বাক্য আমার গুরু-বাক্য। কি করতে হবে বল?

ঠাকুর।—শক্তি তোমাকে গীতার স্থায় চণ্ডী খানিও কণ্ঠস্থ করতে হবে, না হলে, দেবী-মাহাত্ম্য জানতে পারবে না।

উল্লাসিনী।—মহারাজ আমাকে একটি একটি অধ্যায় পড়িয়ে দিও, আমি ঠিক কণ্ঠস্থ করে দেব।

তখন উল্লাসিনী ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল ও সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

বিংশ কথা।

বাইজী চম্পকা।

অদ্য অপরাহ্নে রাজা বীরসিংহ কাছারি বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্রাম-গৃহে বসিয়া আছেন, বেলা অবসান দেখিয়া উল্লাসিনী তাঁহার জলযোগের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিল। গিরিধারী আসিয়া নানা বিধ মিষ্টান্ন ও সুমিষ্ট রসাল ফল রৌপ্য থালায় করিয়া রাজার সম্মুখে রাখিয়া গেল। রূপীবাবু রাজার এ-দিকে ও-দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজা বলিলেন—রূপীবাবু, এস, একটু জলযোগ কর। রূপীবাবু সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া নাচিতে নাচিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা একটি ফলের অর্দ্ধভাগ নিজে ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ রূপীবাবুর হস্তে প্রদান করিতেছেন, একটু মিষ্টান্ন নিজে গ্রহণ করিয়া আর একটু রূপীবাবুর হাতে

দিতেছেন। দিতে একটু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রূপচাঁদের কিছু অসহিষ্ণুতা উপস্থিত হইল; সে ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া রৌপ্য থালা হইতে ফল ও মিষ্টান্ন টানিয়া লইল ও আনন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন— রূপী বাবু, এ ফলটি কেমন মিষ্ট বল দেখি? রূপচাঁদ নয়ন-ভঙ্গ করিয়া দন্ত পাঁতি দেখাইল ও ক্রমে ক্রমে থালা ধরিয়া টানিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—রূপী বাবু, তুমিই যে সব খেলে? আমি খাব কি?

উল্লাসিনী দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে ছিল, সে সক্রোধে বলিল, বাঁদরটা কি বালাই হয়েছে! ওকে ঝ্যাঁটা মেরে দুর করব।

এই বলিয়া সে থালা টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, পরে স্বতন্ত্র থালাতে উত্তম উত্তম ফল আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল।

ইতোমধ্যে মন্ত্রী আসিলেন। তিনি উল্লাসিনীকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া বলিলেন—উল্লাস কি হচ্চে?

উল্লাস বলিল, দেখুন রূপী বাবুর ভোজন হচ্চে!

মন্ত্রী রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—হুজুর, আজ রাত্রে আমোদ প্রমোদের জন্য সব প্রস্তুত রাখবার আদেশ ছিল আপনার উপদেশানুসারে নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

রাজা।—বেশ, বেশ! বাইজীর কথা বলেছিলে,তার কি হল?

মন্ত্রী।—হুজুর, বাইজী এসেছে।

রাজা।—আচ্ছা যাও, অধিক রাত্রি না হয়। কাশী যাওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখ।

"যে আজ্ঞে হুজুর," বলিয়া মন্ত্রী বহির্গমন করিলেন। তিনি বাসাতে গিয়া দেবীদাস ও ব্রহ্মদেবকে কাশী যাত্রার জন্য সব প্রস্তুত রাখতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এই সময়ে উল্লাসিনী পুনরায় রাজার বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিল। রাজা বলিলেন—উল্লাস বাইজী এসেছে, আজ নাচ হবে শুনেছ?

উল্লাস বলিল—কোথায় বাইজী?

রাজা।—মন্ত্রী বলেছে, বাইজী এসেছে।

উল্লাস।—তাঁর ত আর ব'সে ব'সে কাজ নেই! ভগ্নদূত!

"ভাঙ্গা মঙ্গল-চণ্ডী, কুস্বপনের গোড়া!" যত নষ্টের গোড়া উনি। যা যেখানে দেখচেন এসে কাণে তুলে দিচ্ছেন!

বলিতে বলিতে উল্লাসিনী রাজাকে বাতাস দিতে বসিল।

কাছারি-বাড়ীতে বাইনাচ হইবে, মন্ত্রী তাহার সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া রাখিয়াছেন। বাইজী কলিকাতা হইতে দেশে যাইতেছে, পথে ঝিনিয়া-বাজারে আসিয়া দুইদিন রহিয়াছে মন্ত্রীবর ভীমপাল তাহার সংবাদ পাইয়া স্বয়ং বাইজীর সহিত সাক্ষাত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে রাজ বাটীতে নৃত্যগীত হইলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া যত টাকা প্রদান করিবেন, তাহার অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে। বাইজী সেই বন্দোবস্তে অদ্য রাজার কাছারি বাটীতে নৃত্যগীত আরম্ভ করিবে। ক্রমে রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইলে বাইজী আসিয়া আসরে নামিল। বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে, অবশেষে রাজা আসিয়া আসর সুশোভন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

বাইজীর নাম চম্পাকিয়া, সে দিল্লীর এক মুসলমানের কন্যা,

বয়সে ষোড়শিনী। তাহার বর্ণ ঠিক চাঁপা ফুলের ন্যায়, তাহার উপরে অধরে অলক্ত, অঙ্গুলিতে অলক্ত, হস্ত পদতলে অলক্ত ও কপোল দেশ অলক্ত রাগে রঞ্জিত! নয়ন যুগল ও ভ্রূ-যুগল কজ্জল রাগে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। সাপিনীর ন্যায় বেণীর গাঁথনি পৃষ্ঠদেশে আগুল্‌ফ প্রলম্বিত হইয়া হেলিতেছে দুলিতেছে। বাইজী নৃত্য করিতেছে ও গান করিতেছে, দেখিয়া শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া আছেন, কেহবা বাহবা দিতেছেন।

রাজা, মন্ত্রী ও নিকটস্থ ভদ্র মণ্ডলী সকলে বসিয়া বহুক্ষণ নৃত্য গীত আমোদ সম্ভোগ করিলেন। বাইজী চম্পকার নৃত্য যেমন সুন্দর, সঙ্গীতও তেমনি সুমিষ্ট, অঙ্গ-ভঙ্গির চিত্তাকর্ষণ শক্তিও তদ্রূপ। নৃত্য দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্গের অপ্সরা আসিয়া নৃত্য করিতেছে! অনেকক্ষণ নৃত্যগীতের পরে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন,—মন্ত্রী, আজ এই পর্য্যন্ত থাক! এই বলিয়া রাজা অন্দর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রী বাইজীকে আতর গোলাপ ও তাম্বুল প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। নৃত্যগীত বন্ধ হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন মন্ত্রী বাইজীর নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার কর্ণমূলে বলিলেন,—বাইজী, তোমাকে অপেক্ষা করিতে হবে, আর সকলকে বিদায় দেও। তোমার প্রাপ্য টাকা এই দিলাম।

মন্ত্রীর আদেশে সকলেই বিদায় হইয়া গেল।

উল্লাসিনী ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছিল যে, পাল-মহাশয় অদ্য রজনীতে আমোদ-প্রমোদ করিবেন, বাসা-বাটীতে যাইবেন না। তাহাতে তাহার কিছু সন্দেহ হয়, সেইজন্য সে প্রত্যুষে উঠিয়া কাছারি-বাটীতে গিয়া দেখিল, নাচ-ঘরের দ্বার উন্মুক্ত,

ভীমপাল বমন করিয়া তদুপরে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, ফেণরাশি ও মক্ষিকা পুঞ্জে মুখমণ্ডল আবৃত রহিয়াছে। উল্লাসিনী গিরিধারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গিরিধারী বলিল—উল্লাস, কি আর বলব? রাত্রে বাইজী ঐ ঘরে ছিল, আমি লুকিয়ে দেখলাম, সে বোতল খুলে খুলে পাল মশায়ের মুখে ধরতে লাগল, তিনি বারবার তাই খেতে লাগলেন,আর মাংস খেতে আরম্ভ করলেন। অধিক রাত্রে তিনি বমন করে করে অজ্ঞান হয়ে পলেন। তখন বাইজী তাঁকে লাথি মেরে মেরে ঐ বমির উপরে ফেলে দিলে। তার পরে বাইজী গোলাপ-পাশ থেকে গোলাপ জল ঢেলে নিজের মাথায় দিয়ে ঐ পার্শ্বের পালঙ্গের উপরে গিয়ে শয়ন করলে, দেখে আমিও শুতে গেলাম। তার পরে কখন যে সে চলে গিয়েছে তা আর জানি না।

উল্লাসিনী বলিল—আহা, "থেকে থেকে মনে পড়ে, ন'টে শাকের চচ্চড়া!" গিরিধারী, পরের ধন পাই, ত বাহে বসে খাই। মন্ত্রীমশার তাই! তখন সে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে সমস্ত কথা বলিল। রাজা আসিয়া মন্ত্রীর দুর্দ্দশা দেখিয়া একবারে অবাক হইয়া রহিলেন। পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, মন্ত্রীর সুবর্ণের ঘড়ী ও চ্যেন্ নাই, এবং পার্শ্বস্থ একটি ক্যাস্-বাক্স ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। রাজা সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ভীম-পালের সুশ্রুষার জন্য গিরিধারীকে আদেশ করিয়া বিশ্রাম গৃহে গমন কারলেন। উল্লাসিনী বলিল—হুজুর আমি ত অনেক দিন থেকে আপনাকে বলচি। আজ ত স্বচক্ষে দেখলেন? এইরূপ মন্ত্রী যদি থাকে, তবে আমি আর এখানে এক দণ্ডও দাঁড়াব না। আজই আমি কলকাতায় রাণীমায়ের কাছে চলে যাব। রাজা

বলিলেন—উল্লাস, অত অধীর হয়োনা, দেখা যাক, কাশী যাওয়ার হুকুম দিয়েছি, এই কাজটা শেষ হলেই এসে মন্ত্রীকে দূর করে দেব। এরূপ লোককে আর আমি স্থান দেব না। তার এরূপ চরিত্র-দোষ আমি আর কখনও দেখি নাই।

একবিংশ কথা।

রাজা বীর-সিংহের মহত্ত্ব।

একদিন উল্লাসিনী একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধাণ করিয়া রাজার সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—উল্লাস, তোমার ছেঁড়া কাপড় কেন? তোমার কি কাপড় নাই?

উল্লাস বলিয়াছিল—আমার কাপড় থাকবে না কেন? ও পাড়ার একটি মেয়ে আসে, তার কাপড় নাই! সে সাত টুকরা যোড়া দিয়ে একটু ন্যাকড়া পোরে আসে, তাই তাকে আমার কাপড় খানি দিয়েছি! আহা, তারা কোথায় পাবে?

রাজা দেখিলেন উল্লাসিনীর নয়নে জল আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—তোমার কি অন্য কাপড় নাই?

উল্লাস।—নাই বল্যেই হয়। আমি কারো দুঃখ দেখে থাকতে পারি নে। তাই একে ওকে তাকে সব দিয়ে ফেলিচি।

রাজা।—আমাকে যদি বল ত আমি দিতে পারি, তোমার কাপড় গুলি কেন দেও?

উল্লাস।—আপনি আমাকে দেন, আমি তাদের দেই। আপনারই ত সব দেওয়া হল। এখানে চারিদিকে এত দুঃখী-লোক আছে যে তারা খেতে পায় না। আপনি যখন এখানে আসেন, তখনই ত ওদের সবাইকে একদিন খাওয়ান হয়ে থাকে তারা কত খুসী হয়ে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে করতে যায়।

সেই সময়ে রাজা সেই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—হাঁ, একদিন সবাইকে ভাল করে খওয়াতে হবে। তদনুসারে অদ্য কাছারি বাটীতে দীন-দরিদ্র অনাথাগণের ভোজন ও বস্ত্র বিতরণ হইতেছে। দূরাদুর হইতে প্রায় দশ সহস্র লোক আসিয়াছে। উল্লাসিনী নিজে রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। রাজা নিজ হস্তে সকলকে বস্ত্রদান করিলেন। দশ সহস্র লোক অন্ন বস্ত্র পাইয়া হাত তুলিয়া তুলিয়া "জয় মহারাজ বীরসিংহ!" বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে চলিয়া যাইতেছে।

এই সকল কার্য্য শেষ হওয়ার পরে উল্লাসিনী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল—রাণী-মা আর জিতেন-দাদা দীনদুঃখীকে অন্ন-দান বস্ত্র-দান করতে বড়ই ভালবাসেন। আহা ছেলেদের পড়ার জন্যে কলকাতায় না থাকলেও রাণী-মায়ের চলে না! যখনি বাড়ী আসেন, তখনই কোথায় কে দুঃখ পাচ্চে, খেতে পাচ্চে না,—কার ব্যারাম হয়েছে, ঔষধ পথ্য পাচ্চে না, কেবল এই অনুসন্ধান করেন। হয়ত তাঁরা এত দিন বাড়ীতে এসেছেন।

রাজা বলিলেন— না, না, জিতু, সুরু, বীরু কেউ বাড়ীতে যায় নাই, গেলে পত্র দিত। আমি এখানেই আছি, তাই তারা জানে, কিন্তু এই লড়াইয়ের জন্য শীঘ্র আমি কাশী যাব, সে কথা তারা জানে না।

উল্লাস।—আপনি তাঁদের লেখেন নাই কেন ?

রাজা।—মন্ত্রী লিখতে নিষেধ করেছে।

উল্লাস।—মন্ত্রীই আপনাকে ডুবাবে। মন্ত্রী আপনার জমীদারী নষ্ট ক'রে দিলে, সকলেই বলে।

রাজা।—উল্লাস, রাণীও ঐ কথা আমাকে পুনঃ পুনঃ বলেন। তিনি বলেন—তুমি সব উড়িয়ে দিয়ে গেলে, জীতু সুরু বীরুর উপায় কি হবে ? আমি বলি, তারা তাদের অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে তাদের অদৃষ্টে তারা খাবে। তাদের জন্য আমি রেখে যাব, আমার কার্য্য আমি ক'রে যাব না ? দেশে যে সময়ে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল, তখন লোকের কষ্ট দেখে আমি কি জিতুর নাম মনে ক'রে বসে থাকতে পারি ! লক্ষ লক্ষ টাকা আমাকে চারিদিকে ছড়াতে হল, নইলে আরও কত লোক মারা যেত তার সংখ্যা নাই ! তার পরে মহামারী উপস্থিত হল, তখন আর টাকা নেই, কি করি, ঝিনিয়া-জমিদারীর উত্তর খণ্ড বিক্রয় করতে হল। ঝিনিয়াতে বিদ্যালয় অভাবে ছেলেদের লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, সে বারে সকলে এসে আমাকে ধরলে ; সেই বার ঝিনিয়া-বিদ্যালয় স্থাপন করলাম। বীরনগরে ভাল চিকিৎসার অভাবে লোকের বড় কষ্ট হত, তাই আমি লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে বীরসিংহ-দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করলাম ! এই সব কারণেই বহু অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছে, এ সব ব্যয় না ক'রে আমি থাকতে পারি না।

উল্লাস।—হুজুর, আপনার এই সব কাজে দেশময় আপনার যশ হয়েছে, সকলেই ধন্যি ধন্যি করচে। এই ঝিনিয়াতে একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই, আপনি যদি একটি খয়রাতি চিকিৎসালয় করে দেন, তবে লোকের বড়ই উপকার হয়।

রাজা।—উল্লাস, সকলে আমাকে সেজন্যও ধরেছে, এ যখন আমার জমিদারী, তখন এর সকল দিকই আমাকে দেখতে হবে। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য কালই বন্দোবস্ত করব।

উল্লাস।—হুজুর, তাহলে বড়ই ভাল হয়, লোকে আপনাকে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে। কিন্তু হুজুর, হ'লে কি হবে? "অর্দ্ধেক সব গোষ্ঠী, আর অর্দ্ধেক মা-ষষ্ঠী!" অপনার মন্ত্রীই সে টাকার অর্দ্ধেক খাবেন।

রাজা।—উল্লাস ও কথা আর ব'ল না; দেখ ঈশ্বর আমাকে এত ধন ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, একা খাবার জন্য নয়। দশ জনকে প্রতিপালন করতে হবে। খাক খাক, কত খাবে? গরিব! আমার কাছে খেতে নিতেই এসেছে। ওতে যারা আঁটিসাটি-কৃপণতা করে, ভগবান তাদের হাতে আর ত ধন দেবেন না, ঐ পর্য্যন্ত বন্ধ করবেন। দেখ উল্লাস, একদিন রাণীতে আমাতে মেওয়া-বাগে গিয়েছি, তখন লোকে বাগানের গাছে জল দিচ্চে। কতকগুলি গরিব লোক দেখি, বড় বড় আমগাছের আর বড় বড় অশ্বথ গাছের গোড়ায় এক কলসি মাত্র জল ঢেলে দিয়ে পালাচ্চে! রাণী দেখে বল্যেন—পয়সা দিয়ে এদের রাখা কেন? এই সব বুড় গাছের গোড়ায় এক কলসি জল দিয়ে পয়সা নষ্ট করা কেন? বন্ধ করে দিন।

আমি বল্যাম, রাণি, ও পয়সা আমি বন্ধ করতে পারব না। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া নয়, ও কেবল ঐ গরিবদের অন্ন-জল দেওয়া! জল দিক বা না দিক, ওদের প্রতিপালন করতেই হবে। দেখ উল্লাস, পয়সার নাম "খরচ"—এ কথা কি সকলে বোঝে?

উল্লাস।—যার কাজ তারে সাজে! অন্যে তার কিবা বোঝে?

রাজা।—বীর-নগরে ভাল বিদ্যালয় নাই, সামান্য একটী আছে। সকলেই বলচে, একটি "বীরসিংহ-দাতব্য-বিদ্যালয়" স্থাপন করুন। বাড়ীতে গিয়েই সে চেষ্টা করতে হবে। তার পরে জিতুর বিবাহের জন্যও ভাবচি, সেও অনেক টাকার কাজ! পাত্রীও তেমন পাওয়া যাচ্চে না!

উল্লাসিনী বলিল—তার জন্য আর ভাবনা কি? আহা "বেঁচে থাক চূড়া-বাঁশী, কত শত মিল্‌বে দাসী।"

দ্বাবিংশ কথা।

প্রণবাশ্রম।

৺কাশীধামে বরুণার উত্তর ভাগে একটি ত্রিতল বাড়ী, লোকে উহাকে প্রণবাশ্রম বলে। নিশীথ কাল, চন্দ্র কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঐ ত্রিতল বাটীর সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ হইতে গবাক্ষ-পথে গঙ্গাবক্ষ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। ঐ প্রকোষ্ঠে গবাক্ষের নিকটে আশ্রমের অধিকারিণী প্রণব-দেবী পট্টবসন পরিধাণ করিয়া রত্ন-খচিত সুকোমল শ্যামল আসনে উপবিষ্টা। তাঁহার প্রৌঢ়াবয়বে গাম্ভীর্য্য শোভা পাইতেছে; সম্মুখে একটী সুগভীর গুহা তদীয় গাম্ভীর্য্যের অনুকরণ করিতেছে; ঐ গুহা প্রণব-দেবীর সমাধির স্থান। গুহার উপরেই আসন কমণ্ডলু অক্ষমালা, বিভূতি, ও পূজার্চ্চনার

নানাবিধ আয়োজন সজ্জিত রহিয়াছে! ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধে সেই প্রকোষ্ঠ আমোদিত। প্রণব-দেবীর কষিত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, যেন স্বর্ণ-প্রতিমা খানি পূজার জন্য স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহার গভীর ধীরতা-ব্যঞ্জক, চন্দ্র-বিম্বানুকারিণী উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছে। কমলালয়ার ন্যায় কমল-দলানুকারী নয়ন যুগল আকাশের দিকে স্থির হইয়া আছে, দৃষ্টির চাঞ্চল্য নাই। তিল-পুষ্পানু-কারিণী সুন্দর নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুর তরঙ্গ নাই! প্রশান্ত চিত্ত-সাগরে চিন্তার তরঙ্গ নাই! মাতাজীর অঙ্গ-আভাতে সেই গৃহ পবিত্রতা-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়াছে! অস্ফুট-যৌবনা এক সুন্দরী তাঁহার নিকটেই উপবিষ্টা। পদ্মরাগ মণি যেমন আপন জ্যোতিতেই টলমল করে, সেইরূপ নিজ রূপ লাবণ্যে তিনি ঘর খানি আলো করিয়া বসিয়া আছেন। একখানি সুন্দর আসনের উপর যেন একটি স্থিরতার প্রস্তর-মূর্ত্তি কে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষণ হইতে সেই গৃহ নীরব। সেই গৃহে নীরবতা যেন ঘনীভূত হইয়া দুইটী দৈব মূর্ত্তির প্রহরী রূপে বিরাজ করিতেছে! বহুক্ষণ পরে প্রণব-দেবী মৃদুস্বরে বলিলেন, কুমারি, আমার সঙ্গে এস।

কুমারী অস্ফুট রবে বলিলেন,—মা চলুন।

তখন সেই নিবীড় নিস্তব্ধ গম্ভীর গুহার মধ্যে অস্পষ্ট আলোকে প্রবিষ্ট হইয়া প্রণব-দেবী আপন আসনে উপবিষ্টা হইলেন, ও অন্য আসনে কুমারীকে আপনার সম্মুখে বসাইলেন। তিনি পদ্মাসনে সমাসীনা হইয়া অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে ক্ষণকাল

স্থিরতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হওয়াতে তদীয় সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু, তেজ ও স্থূল বায়ুকে ভেদ করিয়া অব্যক্ত চৈতন্য-রসে পরিপূর্ণ আকাশ মধ্যে অবস্থিতি করিল। হঠ্‌যোগে হঠাৎ বিষম ভাব আনয়ন করিয়া উৎকট ক্লেশ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করিতে পারে, এই জন্য প্রণব-দেবী হঠ্‌যোগের দ্বারা আকাশে চিত্ত লয় করেন নাই। উগ্র তপস্যা বা হঠ্‌যোগের কঠোরতার পরিবর্ত্তে তিনি কেবল বিচার, ধ্যান, সংযম ও একান্ত মনোযোগ বলেই তাদৃশ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, একমাত্র প্রবোধ-পূর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও উদ্দালক মুনির ন্যায় নিত্য সত্য উজ্জ্বল রসপূর্ণ সেই পূর্ণব্রহ্মের পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই হেতু প্রণব-দেবী কেবল ধ্যান-বলে কেবলী-ভাবাপন্না হইয়া অমৃত-দেশের মধ্যে গিয়া অমৃত-ভাব ধারণ করিলেন।

শারদাকাশের সুধাকরের ন্যায় তদীয় চৈতন্য রূপ "হংস" চিদানন্দ-সাগরে পরিশোভিত হইল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে গগন-বিহারী অমর বৃন্দ, সুর-ললনা গণকে সঙ্গে লইয়া এবং সিদ্ধ ও সাধ্য গণ অসাধারণ সিদ্ধি সমূহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পরি-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রণব-দেবী তাঁহাদিগের প্রতি দৃকপাত না করিয়া পরম পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তিনি সেই মহা রসায়নের মধ্যস্থা হইয়া পরমানন্দ-পূর্ণা হইলে তদীয় প্রাণ অমৃত-কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, সেই অমৃত-কিরণের প্রতিবিম্ব সম্মুখস্থিতা কুমারীর মন-প্রাণে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব তন্ময়-ভাব রচনা করিল।

প্রণব-দেবী সমাধিস্থা হইয়া কুমারীর দেহ-মনে শক্তি সঞ্চার করিলেন। সেই শক্তি লাভ করিয়া কুমারী দেখিতে পাইলেন, সাগর বক্ষে তরঙ্গ যেমন নাচিতে নাচিতে মিশাইয়া যায়, তিনিও তেমনি সেই মাতৃক্রোড়ে নাচিতে নাচিতে মিশাইয়া যাইতেছেন। ক্রমে তাঁহার চিত্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কুমারী সেই অমৃত-রসে তন্ময় হইয়া আনন্দ সমাধি লাভ করিলেন। সেই নিভৃত গুহামধ্যে এইরূপ নীরব-নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহারা কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন, এবং কুমারী সেই অবস্থায় কি কি উপলব্ধি করিলেন তাহা কে বলিবে? পরে দেবী নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা কুমারীকে ভৈরবী-চক্রে দীক্ষিত করিলেন; অবশেষে তাঁহারা গুহা হইতে উঠিয়া দেবীকক্ষে আসিলেন এবং উভয়ে আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে উপবিষ্টা রহিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে মাতাজী প্রণব-দেবী বলিলেন—বৎসে, এই যে তুমি দীক্ষিত হলে, তাতে তোমার মনে শান্তির উদয় হয়েছে ত? ভয় দূর হয়েছে ত? কুমারী বলিলেন,—মা, আর আমার ভয়ের সম্ভাবনা নাই, আমি প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করেছি।

দেবী বলিলেন, বৎসে, এই মহাচক্রের সাধুগণ তোমাকে রক্ষা করবার জন্য সবাই সমবেত হয়েছেন, শীঘ্রই কার্য্য সম্পন্ন হবে, আর চিন্তা নাই! কার সাধ্য এখানে প্রবেশ করে? আমি সমাধিতে ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে স্মরণ করেছি; সে শীঘ্র আসবে। চিন্তা নাই।

কুমারী।— মা, কি রূপে তিনি এ সংবাদ জানতে পাবেন?

দেবী।—বৎসে, তাড়িৎ-বার্ত্তার ন্যায় মনো-জগতের ব্যোম-

বার্ত্তায় সূক্ষ্মতম বায়ুর চালনা দ্বারা, সকল সংবাদই লওয়া যায় ও দেওয়া যায়। তোমার ভবিতব্যের চিত্র খানি স্থির পরব্যোমে আমার সম্মুখে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে!

কুমারী।—মা আপনি সকলই জানচেন। আমরা আপনারই সন্তান; সন্তানের রক্ত-প্রবাহ ও চিত্ত-প্রবাহ জননী অনুভব করতে পারেন। মা, আপনার সন্তান সন্তাত আপনি রক্ষা করুন।

রক্তপদ্মের ন্যায় কর উত্তোলন পূর্ব্বক দেবী বলিলেন,—মাভৈঃ মাভৈঃ! অচিরেই তোমরা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হবে ও অমৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হবে।

বৎসে, এই মৃত্যুময় অনিত্য সংসারে আর কিছুই সত্য নয়, কেবল প্রকৃত ভালবাসাই সত্য। মাঠের শ্যামল দূর্ব্বাদলগুলিও আমি ভালবাসি। তাতেও মনের কত সুখ! যখন দেবাসুরে অমৃত লয়ে বিবাদ হয়, তখন দূর্ব্বাদলে অমৃত পতিত হয়, তাতেই দূর্ব্বা অমর হল। তৃণেও অমৃত মাখান আছে। মানুষের হৃদয়ে, বিশেষতঃ নারী-হৃদয়ে মহামায়া কত যে অমৃত ঢেলে রেখেছেন তার সীমা নাই! চণ্ডীতে আছে,—

"স্ত্রীয়াঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ।" স্ত্রী মাত্রেই মহামায়ার অংশ, নারীতে মহামায়ার মধুরশক্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাচ্ছে! তাতে যদি অমৃত না থাকে, তবে আর থাকবে কোথায়? আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের হৃদয়ে অমৃত প্রকাশিত হোক।

কুমারী।—মা শুনেছি, রাজা বীরসিংহ শত্রু পক্ষ অবলম্বন করে একটা যুদ্ধ উপস্থিত করবেন। কিন্তু শুনেছি, এই চক্র যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী নয়। শত্রু উপস্থিত হলে কি হবে?

দেবী।—বৎসে, বিশ্বজননীর ভক্ত সন্তানগণ একটি পিপীলিকারও প্রাণ সংহার করতে ইচ্ছা করেন না। তাঁরা একটি ললিত লতার অগ্রভাগও ছিন্ন করতে চান না। আত্মরক্ষাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

তাঁরা ইন্দ্রত্ব চান না। তামসিক রাজসিক ভাবেই যুদ্ধাদি পরিচালিত হয়। মায়া-মুগ্ধতাই যুদ্ধ-অশান্তির হেতু। ভক্তগণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে থাকেন, তাঁরা জগতের সমর নীতির মূলোচ্ছেদ জন্য বদ্ধ-পরিকর। শ্রীকৃষ্ণের কংশবধ ও কুরুক্ষেত্র বাহ্যভাব মাত্র। গীতা ও চণ্ডী, বাহ্য জড়ীয় ভাব উপলক্ষ ক'রে নিষ্কাম সাত্ত্বিক মুক্তিতত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গোপীলীলাও চিন্ময়, কুরুক্ষেত্রও চিন্ময়। যদি এখানে শত্রু সমাগম হয়, তবে যাঁর আশ্রম, তিনিই রক্ষা করবেন। আত্ম-রক্ষা করতে পরমাত্মাই যথেষ্ট। বৎসে, ঐ পরমাত্মায় দৃষ্টি কর—এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। আবার সেই গৃহে স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা প্রহরার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দেবীদ্বয় স্থিরাসনে উপবিষ্টা—শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির, মন স্থির। চিত্ত-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল।

ত্রয়োবিংশ কথা।

সন্ন্যাসিনী।

এ দিকে রাজা বীরসিংহ স্বদল বলে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বরুণার দক্ষিণ ধারে একটি বিস্তীর্ণ স্থানে কয়েকটি বাড়ী আছে, সেই সকল বাড়ীতে সকল লোক অবস্থিতি করিতেছে, রাজা নিজে একটি পৃথক বাড়ীতে আছেন। বিমলা দেবীর একটি পৃথক বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বেলা অবসান হইয়াছে। রাজা আপন বাসাবাটীর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; কুমারী কোথায় কি ভাবে আছেন, কিরূপে তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবে, মন্ত্রীর সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছেন।

রাজা।—মন্ত্রী, বরুণার পারে তারা কোথায় কি ভাবে আছে, আগে জানতে হবে, তার চেষ্টা কর।

মন্ত্রী।—হুজুর, সেই আশ্রমের অন্দরে প্রবেশ করতে না পারলে কিছুই স্থির করা যাবে না। উলসীই এই কার্য্যের উপযুক্ত। সে ভিন্ন অন্দরে প্রবেশ ক'রে দেখে আসা অন্যের কর্ম্ম নয়।

রাজা।—তা বেশ বলেছ।

মন্ত্রী উল্লাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, উল্লাস, তোমাকে একটী কাজ করতে হবে, বরুণার পারে গিয়ে সেই আশ্রমের অন্দরে প্রবেশ ক'রে সব জেনে শুনে এস, আর দেখে এস, কুমারী কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন। উল্লাস বলিল, হুকুম হলেই পারি, আর বলতে হবে না, আমি এখনি যাব।

এই বলিয়া সে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। উল্লাসের উল্লাস দেখিয়া সকলেই উল্লাসিত! এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া, সে মন্ত্রীবরের বাসার দিকে চলিল, শেষে দেবী-দাসের পাক-শালায় গিয়া দেখিল, ঠাকুর একাকী বসিয়া আছে।

ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই বলিল, শক্তি, কি মনে করে?

উল্লাস।—ঠাকুর, বড় সুযোগ হয়েছে। রাজা বলেছেন—দেবীর আশ্রমে গিয়ে কুমারী কোথায় কি ভাবে আছেন, দেখে আসতে হবে। আমি দেখলাম ভালই হল, আমিও ঐ পথ খুঁজছিলাম, ভগবানই সে পথ দেখিয়ে দিলেন। এখন বল দেখি কিরূপ সময়ে যাই, কি ভাবেই বা যাই? আমি ত গিয়ে দেবীর চরণ দর্শন করব, কিন্তু কুমারীকে কিছু সাবধান করে দিয়ে আসব কি না? আর দেখ আমার ত দর্শন এই সুযোগেই হবে, কিন্তু ঠাকুর, তোমার দর্শনের উপায় কি? দুজনে এক সঙ্গে গিয়েই দর্শন করব ভেবে ছিলাম, তাত হল না, আমার কপাল খুল্‌চে আগে! মহারাজ আমি কি পুণ্য করেছিলাম, বল দেখি?

ঠাকুর।—শক্তি, তোমার পুণ্যের কথা কি বলব? বুঝি তোমার কর্ম্মভোগের অবসান হয়ে এসেছে। দেখ শক্তি, তুমি অনেক সাজ সেজেছ, আজ সেই বৈকুণ্ঠের সাজে সজ্জিত হও। এস আমি আজ তোমাকে সন্যাসিনী সাজিয়ে দেই, আর আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চির সন্ন্যাসিনী হও।

সন্ন্যাসিনীর বেশে ঠিক সন্ধ্যার পরে ভজন গাইতে গাইতে আশ্রমের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে। কুমারীকে আর সতর্ক করতে হবে না। তাঁরা সতর্ক আছেন। এখন দেখ,

আমরা যখন মনিবের কার্য্য স্বীকার করেছি, তখন আগে মনিবের কার্য্য করব, তার পরে আপন পথ দেখব। দেখ শক্তি, দুর্য্যোধন বড় পাপী ছিলেন, তথাপি মহাজ্ঞানী ভীষ্ম দ্রোণ তাঁর অন্ন গ্রহণ করেছিলেন ব'লে তাঁর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আমাদেরও তাই করতে হবে। তুমি ত আগেই দেবীর চরণ দর্শন পাবে, কিন্তু আমি যে কি রূপে দর্শন পাব, তা ভেবে স্থির করতে পারচি না।

উল্লাস।—ঠাকুর আমি এক কথা বলি শোন,—তুমিও মেয়ের বেশে আমার সঙ্গে চল। তোমার যেমন চেহারা, তাতে তুমি মেয়ে সাজলে তোমাকে ঠিক মেয়ের মত দেখাবে, কেউ পুরুষ ব'লে বুঝতে পারবে না।

ঠাকুর।—না, না, না, তা হবে না। সেখানে একবার গেলে আর আমি মনিবের কার্য্য করতে পারব না! আগে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করি, তার পরে আমি শান্তিময় অবস্থাতে গিয়ে দেবীর চরণ দর্শন করব। এখন এস, তোমাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে দেই।

এই বলিয়া ঠাকুর উল্লাসিনীকে আপন সম্মুখে বসাইয়া তাহার অঙ্গ-বস্ত্র উন্মোচন করিল। ভস্ম রাশি লইয়া প্রথমে তাহার চরণে নিক্ষেপ করিল, পরে বক্ষ ও পৃষ্ঠে মাথাইয়া বদন মণ্ডলে লেপন করিল, অবশেষে কেশ-পাশে ভস্মাচ্ছাদনে দিয়া জটাজুটের ন্যায় বন্ধন করিয়া দিল।

উল্লাসিনী বলিল,—ঠাকুর, তুমি কি আর জন্মে মেয়ে মানুষ ছিলে?

ঠাকুর।—কেন?

উল্লাস।—তোমার হাত দুখানি আমার হাত হ্তেও কোমল! আমার মাসীর হাত ঐ রূপ পদ্ম ফুলের মত ছিল।

ঠাকুর।—হাঁ, তা সত্য।

এই রূপে বিভূতি-সজ্জা করিয়া দিয়া ঠাকুর নিজের এক খানি গৈরিক বস্ত্র বাহির করিল, এবং ঐ বস্ত্র আজানুলম্বিত করিয়া উল্লাসিনীর কক্ষ-তল বেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে বন্ধন করিয়া দিল। পরে সে তাহার বাম হস্তে একটি "এক তারা" ও দক্ষিণ হস্তে একটি কমণ্ডলু প্রদান করিল। সে উল্লাসিনীর গল-দেশে রুদ্রাক্ষ-মালা পরাইয়া দিয়া বলিল—শক্তি, আজ তুমি "সন্ন্যাসিনী" হ'লে। সন্ন্যাসিনী ব'লেই তোমার পরিচয় দিও, আর আশ্রমের দ্বারে গিয়ে একতারাতে সুর সংলগ্ন ক'রে ভজন আরম্ভ করবে। তোমার যে মধুর কণ্ঠ, তাতেই দেবীর নিকট প্রবেশ লাভ করতে পারবে! তখন উল্লাসিনী দেবীদাসকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল এবং বলিল—মহারাজ, এখন আমি আসি। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার দেবী দর্শন হয়।

ঠাকুর বলিল,—দেবী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসিনী নিঃশব্দে বহির্গত হইলেন।

চতুর্বিংশ কথা।

দেবী দর্শন।

সন্ধ্যার পরে প্রণবাশ্রমে দেবালয়ে আরতির উদ্‌যোগ হইতেছে। সন্ন্যাসিনী তথায় উপস্থিত হইয়া আশ্রমের বহির্ভাগে একবার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবালয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বহু লোকের যাতায়াত হইতেছে। সকলেই সন্ন্যাসিনীর সমুজ্জ্বল মুখকান্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। অমরেন্দ্র-নাথ প্রণবাশ্রমে আসিয়া প্রতি দিন সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করেন; অদ্যও দেবালয়ে দাঁড়াইয়া আছেন, সহসা সন্ন্যাসিনীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, সন্ন্যাসিনী পূর্ণ-যৌবনা, বিভূতি সজ্জায় সেই রূপরাশি যেন চতুর্গুণ ফুটিয়া উঠিতেছে। জল রাশির উপরে কমল দল যেমন টলমল করে, সেইরূপ সেই রূপরাশির উপরে সন্ন্যাসিনীর প্রশস্ত নলিনী-নয়ন টলমল করিতেছে।

অমরেন্দ্র-নাথ নিকটে গমন করিয়া বলিলেন,—মা, এই স্থানে আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসিনী বাক্য ব্যয় না করিয়া গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, ও একতারাতে ঝঙ্কার দিয়া সুর লাগাইয়া, সেই বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে সুরের লহরী ছাড়িলেন। সেই সুমধুর সুরলহরী দেবালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া গগন পথে উত্থিত হইতে লাগিল।

দেবালয়ের সকল লোক অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পরে সন্ন্যাসিনী গান ধরিলেন,—দেবীদাসের শিক্ষা, সেই গান সন্ন্যাসিনী পুরবী রাগিণীতে গাইতে আরম্ভ করিলেন—

গীত।

মা হ'য়ে দিবে না দেখা, এ দুঃখ আর কোথা রাখি ?
না হেরিয়ে মাতৃ মুখ, আমি মরমে মরিয়ে থাকি !
[illegible] হয়, কুমাতা কখনো নয়,
এ কথা বিশ্বাসে মাগো, বিশ্বময়ি তোমায় ডাকি !
দিবা নিশি ডাকি ওগো, কুণ্ডলিনি, জাগ জাগ,
দেহ ত দিয়াছি মাগো, প্রাণ দিতে আছে বাকি !

সন্ন্যাসিনী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গানটি দুই তিন বার গাইলেন। যাঁহারা শুনিতে ছিলেন, সকলেই নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন। সনী একতারা রাখিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন।

তখন আরতির সময় হইয়াছে। সমস্ত দেবালয় শত শত আলোক মালায় সুশোভিত হইয়াছে। সিংহদ্বারের উপরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। ধূপদীপগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে সমস্ত দেবালয় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বহুক্ষণে আরতি সম্পন্ন হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবালয়ের সম্মুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন অমরেন্দ্র-নাথ সন্ন্যাসিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন—মা, আপনি কোথা হতে আসচেন? আপনি যদি আজ এখানে বিশ্রাম করেন, তাহলে আমরা কৃতার্থ হব।

সন্ন্যাসিনী।—দেবীর চরণ দর্শন জন্য এসেছি, দর্শন করেই স্বস্থানে গিয়ে বিশ্রাম করব।

অমরেন্দ্র বলিলেন,—মা আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে দেবীর নিকটে নিয়ে যাব।

সন্ন্যাসিনী অমরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে চলিলেন, ও উজ্জ্বল আলোক মালার মধ্য দিয়া অমরেন্দ্র নাথের সহিত প্রণব দেবীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবী বলিলেন,— বাছা, এসেছ? বস। সন্ন্যাসিনী বসিলেন, পরে ক্রমে দেখিতে লাগিলেন, দেবী যেন মানবী নহেন, জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা। তাঁহার পার্শ্বে অনতি দূরে কুমারী বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই শরচ্চন্দ্র-বিম্বমাখা মুখমণ্ডল দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই কক্ষ দিব্য আলোকে সমুজ্জল ও কি এক অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ। অমরেন্দ্র নাথের ন্যায় দেবাত্মা সকল চারিদিকে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসিনীর বোধ হইল—সেই স্থানটি যেন এই পৃথিবীর নহে।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—মা, তুমি কি আমার মা? আমি আমার মাকে খুঁজে বেড়াচ্চি।

দেবী।—হাঁ বাছা, এখন তুমি যাও, নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ ক'রে তবে আবার এস। কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ ক'রে এলেই তখন শান্তি লাভ করবে।

সন্ন্যাসিনী নয়ন জলে ভাসিয়া বলিলেন, মা আর কত দিন?

দেবী।—বাছা তোমার কর্ম্মভোগ অবসানের আর বিলম্ব নাই। এখন স্বস্থানে যাও, আবার এস।

সন্ন্যাসিনী বহুক্ষণ নীরবে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নয়ন-জল মুছিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া

অমরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন অমরেন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহির্দ্বার দেখাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, তখন সন্ন্যাসিনী মন্ত্রীবরের বাসা বাটিতে গিয়া উপস্থিত। অন্ধকারের মধ্যে গোপনে উল্লাসিনী ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিল, মহারাজ, তোমার জয় হোক।

ঠাকুর।—শক্তি এসেছ? খোল, বেশ ভূষা খুলে পুকুরে গিয়ে বিভূতি ধুয়ে এস। সব দিকে মঙ্গল ত?

উল্লাস।—হাঁ, ঠাকুর তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমার দেবী দর্শন হল। ঠাকুর, সে যে কি সুন্দর স্থান, তা আর তোমায় বলব কি? আর মাতাজীকে দেখে এলাম, তিনি মানুষ নন, তিনিই জগতের মা।

ঠাকুর।—শক্তি তুমিই ধন্য! মা তোমাকে কি বল্যেন?

উল্লাস।—মা বল্যেন, বাছা, নিজের কর্ত্তব্য কাজ শেষ ক'রে আবার এস, তোমার কর্ম্ম-ভোগ প্রায় শেষ হয়েছে।—তাই শুনে আমি আর বেশী কথা বলতে পারলাম না।

ঠাকুর।—তবে ত মা তোমাকে তাঁর কাছে যাবার জন্য আদেশ করেছেন। আহা আমার ভাগ্যে কি তা হবে?

উল্লাস।—ঠাকুর, হবে না কেন? শোন, আমি এক বুদ্ধি করেছি। আমি রাজাকে ব'লে রাখব যে, আমি এখান হতে বৃন্দাবন দর্শন করতে যাব। আর তোমার ত কথাই নাই, তুমি আজ আছ, কাল নেই; তোমার কে কি করবে? তুমি ব'লে রেখ যে, তুমি আর বাঙ্গলাদেশে যাবে না, এখান হতে বাড়ী

যাবে। এই ব'লে দুজনে লুকিয়ে থাকব। ওরা সবাই দেশে চলে যাবে, আমরা এখানেই থাকব।

ঠাকুর।—আচ্ছা শক্তি, আমার জন্ম তোমার চিন্তা নাই, আমি আগে মনিবের কার্য্য শেষ করি, তার পরে দেখা যাবে। তুমি তোমার পথ পরিষ্কার করে রেখ।

উল্লাস।—ঠাকুর, দেবীর আশ্রম ত দেখে এলাম। কুমারীকে সেই খানেই দেখলাম। আশ্রমের সন্ধান সব রাজার কাছে ঠিক ঠিক বলব কি? তা যদি বলি, তবেত এরা সচ্ছন্দে গিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু সকল সন্ধান না জানতে পেলে প্রবেশ করতে অনেক কষ্ট ও বিলম্ব হবে, হয়ত ঢুকতেই পারবে না।

ঠাকুর।—দেখ শক্তি "যা হবে তা হবেই"। সেইটিই দেবীর ইচ্ছা। ভবিষ্যৎ-দর্শী যোগী গণ সেইটি পূর্ব্ব থেকেই আত্ম শক্তিতে জানতে পান। এই বিবাহ হবেই, সেজন্য তোমা র চিন্তা নাই।

উল্লাস।—মহারাজ "যা হবে তা হবেই" তবে লোকের এত ব্যাকুলতা আর এত প্রাণপণে চেষ্টা করারই বা কারণ কি?

ঠাকুর।—শক্তি তবে শোন—কতক গুলি চোর রাত্রি হলেই চুরি করতে যাবে, ভেবে বসে ছিল। সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে বসে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না। তারা অনেক ক্ষণ বসে থেকে থেকে অধীর হয়ে উঠল। তখন তাদের সর্দ্দার বল্যে, ভাই, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। সন্ধ্যা হতে ত এখনও অনেক বিলম্ব আছে দেখতে পাচ্চি, যাতে এখন শীঘ্র সন্ধ্যা হয়, চল সকলে মিলে তার চেষ্টা করি।

সকলে বলিল—কি করা যায় বলুন! সর্দ্দার বলিল, এক

কাজ আছে, চল সকলে মাঠে যাই, সেখানে গিয়ে উপায় করা যাবে। সেই কথা শুনিয়া সকলে মিলিয়া পরমোৎসাহে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। সর্দ্দার বলিল, দেখ সূর্য্যবেটা-ত বড়ই পাজী, এখনও অস্তে যায় না, সকলে মিলে এই চষাভুঁই থেকে বড় বড় ঢিল নিয়ে নিয়ে সূর্য্যবেটাকে মার, ঢিলের চোটে বেটা এখনি পালাবে। মারের চোটে ভূত পালায়, ও বেটা কতক্ষণ থাকবে? এই কথা শুনবা মাত্রেই দস্যুদল মহা উৎসাহে সূর্য্যের দিকে ঢিল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করলে। ঢিলের উপরে ঢিল, তার উপরে ঢিল, শতশত ঢিল একযোগে মারতে মারতে দেখে সূর্য্যদেব একটু সরে গেলেন। সর্দ্দার অমনি চীৎকার ক'রে সদর্পে বলে উঠল, দেখলি দেখলি ঐ দেখ, বেটা যাবে না? ওরে বাবা যাবে। মারের চোটে ভূত পলায়, জানিস? মার ঢিল, মার ঢিল। বলবা মাত্রেই ক্রমাগত শত শত ঢিল সবেগে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। ঘণ্টা দুই ঢিল নিক্ষেপের পরে যথা সময়েই সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করলেন। তখন সর্দ্দারের আস্ফালন দেখে কে? সকলে মিলে জয়োল্লাসে লাফাতে আরম্ভ করলে। সর্দ্দার তখন সগর্ব্বে সকলকে বল্যে—ভাই, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই! দেখ সূর্য্য অস্তে গেল কি না? এইবার চল আমরা বহির্গত হই।

শক্তি, সাধারণ লোকে এই রূপেই চেষ্টা করে থাকে। যা হবার তা যথা সময়েই হয়ে থাকে, তবে ততক্ষণ মনুষ্যের ধৈর্য্য থাকে না ব'লে, সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই ঐরূপ ছুটাছুটি ও ঢিল ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করে। সূর্য্যকে যেমন ঢিল ছুড়ে একবিন্দুও সরান যায় না, তেমনি জগতের একটি কার্য্য বা

একটি তৃণও শুধু আমাদের ইচ্ছায় সরাবার যো নাই। যাঁরা একান্ত স্থিরতা অবলম্বন করতে শিখেছেন, তাঁরাই কেবল পরিণাম লক্ষ্য ক'রে, স্থির হয়ে থাকতে পারেন। তাঁরাও কখন কখন একটু একটু জীব-চেষ্টা দেখান। শক্তি, এই বিবাহ অনিবার্য্য, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রাজা বীরসিংহের শত সহস্র ঢিল নিক্ষেপেও এই বিবাহ-সূর্য্য একটুও সরবে না।

উল্লাস।—মহারাজ তুমি ভবিষ্যৎ বলতে পার, তুমিই জান, আমাদের ভয় হয়। তবে রাজার কাছে সব কথাই বলব কি?

ঠাকুর।—যেরূপ দেখে এলে, ঠিক সেই রূপই বলবে. তা হলেই তোমার কর্ত্তব্য কাজ করা হল। তার পরে তারা যা জানে, করবে। কুমারীর রক্ষার জন্য আমাদের ভাবতে হবে না। যিনি রক্ষা করচেন, তিনিই রক্ষা করবেন। আমরা এখন এদের কার্য্য শেষ ক'রে দিয়ে বিদায় হতে পারলেই উত্তম।

উল্লাস।—ঠাকুর সেই ভাল কথা। আমি এখন যাই। একবারে পুকুরে স্নান ক'রে চলে যাব।

এই বলিয়া উল্লাসিনী সন্ন্যাসিনীর বেশ সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ কথা।

শেষ প্রার্থনা।

রাজা ও মন্ত্রী বসিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রম অবরোধের জন্য নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, তখন উল্লাসিনী গিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উল্লাস, দেখে এলে?

উল্লাস।—হুজুর, কিরূপে সেখানে গেলাম আগে বলি। গৈরিক বসন ধারণ ক'রে, ভস্মমেখে, জটাজুট বেঁধে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরলাম, পরে সন্ধ্যার ঘোরে ঘোরে বরুণার পারে চলে গেলাম। দেবীর আশ্রমে গিয়ে দেখি, সম্মুখেই দেবালয়, দেবালয়ের সম্মুখেই সিংহদ্বার, তার উপরে নহবৎ বাজচে, মধ্যে গিয়ে দেখি, অনেক ঠাকুর-মন্দির আছে, মন্দিরে মন্দিরে আরতি হচ্চে। ধূপ ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, চতুর্দ্দিকেই শঙ্খঘণ্ঠা কাঁশর বাজচে। আমি গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আরতি দেখতে লাগলাম। তার পরে আরতি শেষ হল। একটি সাধুপুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বল্যেন—মা, আপনি কোথা হতে আসচেন, আজ এখানে থাকবেন কি? আমি বল্যাম, না, দেবীর চরণ দর্শন চাই। তখন তিনি আমায় সঙ্গে করে দেবীর নিকট নিয়ে গেলেন। আমি গিয়ে দেখি, দেবী উৎকৃষ্ট আসনে বসে আছেন, তাঁর পার্শ্বেই "কুমারী"।

রাজা।—তুমি কি ক'রে চিন্‌তে পারলে?

উল্লাস।— কেন? আমি যে গোয়ালিনী হয়ে গিয়ে ঝিনিয়া-বাজারে তাঁর সঙ্গে কত কথা ব'লে ছিলাম। চিনব না কেন?

তার পরে দেবীকে প্রণাম ক'রে আমি বসে বসে চারিদিক দেখতে লাগলাম। আহা সে বড় সুন্দর স্থান। দেখে ইচ্ছে হয় সেখানেই থাকি। কত যে সাধু দেখলাম তার সংখ্যা নাই। চারিদিকেই কেবল সাধুর দল।

মন্ত্রী।—আচ্ছা, উল্লাস, বাড়ীটার কোন খানে কেমন দেখলে, ঠিক আছে?

উল্লাস।—হাঁ, তা ঠিক থাকবে না ত গেলাম কি করতে?

মন্ত্রী।—তাই বটে। সেইটি দেখতেই ত যাওয়া। বল দেখি বাড়ীটি কেমন? ব্রহ্মদেব পাঁড়ে আর দেবীদাস পাঁড়ে, এই দুইজন আমাদের প্রধান সর্দ্দার হবে। তাদের বেশ ক'রে বাড়ীর ভাব বুঝিয়ে দিতে হবে; তাই বুঝে তারা আক্রমণ করবে।

উল্লাস প্রফুল্ল মুখে বলিল,—ঠিক ঠিক, দেবীদাস ভিন্ন আর কেহ সে সব সন্ধান বুঝতেই পারবে না।

এই শুনুন হুজুর, আশ্রমের উত্তর দিকে উপবন, সেটিকে তপোবন বলে। সে দিকে একটি সিংহদ্বার আছে। দক্ষিণে বরুণা দেখা যায়, সে দিকে একটি সিংহদ্বার। পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করলে গঙ্গাদর্শন হয়, সে দিকেও একটি সিংহদ্বার। পশ্চিম দিকে সদর রাস্তা। সেই রাস্তার ধারেই আশ্রমের সদর সিংহদ্বার, তার মধ্যে দেবালয়। দেবালয়ের মধ্যে পূর্ব্বধারে আর একটি বৃহৎ দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেই একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গন, সেই প্রাঙ্গনে পুষ্পোদ্যান আছে, জলের ফোয়ারা উঠচে। সেই প্রাঙ্গনের উত্তর দক্ষিণ দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা, সাধুরা সেই খানে থাকেন; আর পূর্ব্বধারে দেবীর স্থান; তিন-তালা বাড়ীর সকলের উপরে দেবীর গৃহ।

সেই গৃহের পূর্ব্ব জানালা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়, দক্ষিণ জানালা দিয়ে বরুণা দেখা যায়।

মন্ত্রী।—হুজুর, তবে আর কি? প্রত্যুষে যাতে আশ্রম অবরোধ করা হয় তার বন্দোবস্ত করি, আর বিলম্ব করা নয়।

রাজা।—হাঁ, তাই কর।

মন্ত্রীবর রাজাকে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বাসাতে গিয়া প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব ও দেবী দাসকে ডাকিয়া প্রত্যুষে প্রণবাশ্রম অবরোধ জন্য আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। উল্লাসিনী সুগন্ধী শীতল জলে পাখা ভিজাইয়া লইয়া রাজাকে ব্যজন করিতে করিতে বলিল—হুজুর, আমার দেশের লোক অনেকে কাশীধামে এসেছে, গঙ্গার ধারে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা এখান হতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাবে। আমি আপনার আশ্রিত হয়েও আমার অদৃষ্টে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হল না, আমার পাপের ক্ষয়ও হবে না। হুজুর আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দিন, অমি আর কিছু চাই না, আমি তাদের সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করে আসি। এই সঙ্গে না গেলে আমার ভাগ্যে ঘটবে না।

রাজা।—উল্লাস তার জন্য চিন্তা কি? কবে যেতে চাও বল?

উল্লাস।—হুজুর, তারা এখন দু-এক দিন কাশীধামে ঠাকুর দর্শন করবে, তার পরে বৃন্দাবন ধামে যাবে। যে দিন তারা যাবে, আমিও সেই দিন যাব, হুজুরের কাছে বলে রাখলাম। আমাকে যাবার জন্য অনুমতি দিন। এই আমার শেষ পুরস্কার, আমি আর কোনও পুরস্কার চাই না।

রাজা।—আচ্ছা বেশ, তাই হবে। তাই যেও. শীঘ্র আবার ফিরে এস। একশ টাকা নিয়ে রাখ, তোমার খরচের জন্য দিলাম।

উল্লাসিনী ব্যজন করিতে লাগিল, ক্রমে রাজা নিদ্রাভিভূত হইলেন। উল্লাসিনী উঠিয়া গিয়া নিজ কক্ষে শয়ন করিল।

ষড়্‌বিংশ কথা।

প্রণবাশ্রম অবরোধ, সুধাংশু বন্দী।

আর রাত্রি নাই, ঘোর ঘোর কুজ্ঝটিকা সমাবৃত অস্ফুট আলোকে অল্প অল্প দৃষ্টি চলিতেছে, ঐ প্রণবাশ্রম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে মুরমুর শব্দ ও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইয়া উঠিল, শুনিয়া পক্ষী কুল ঝট্‌পট্‌ শব্দে পাখা নাড়িয়া উড়িয়া গেল। আশ্রমের পূর্ব্ব দিকস্থ গঙ্গাবক্ষ হইতে কয়েক খানি নৌকা নিঃশব্দে আসিয়া তটে লাগিল। কতক গুলি লোক নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ঘোর ঘোর কুজ্ঝটিকা ভেদ করতঃ নিঃশব্দে উত্তর প্রান্তে চলিয়া গেল। তখনও কেহ জাগে নাই, বাহিরে কাহাকেও দেখা যাইতেছেনা, কেবল পশ্চিম প্রান্তে দেবালয়ের সম্মুখস্থ সমুন্নত সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি মহাপুরুষ দণ্ডায়মান আছেন। তিনি নীরবে

দেবালয় লক্ষ্য করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছেন ও সিংহ দ্বারের ধূলি লইয়া মস্তকে দিতেছেন। তাঁহার মস্তকে বস্ত্রের পাগড়ি, হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি ও ললাট তটে চন্দন-রেখা শোভা পাইতেছে। তাঁহার পশ্চাতেই আর একটি বীর পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি একান্ত স্থির ভাবে অপলক নেত্রে প্রণবাশ্রমের সুশোভিত সৌধ-মালা নিরীক্ষণ করিতেছেন ও ভাবিতেছেন, আশ্রমের অট্টালিকা-শিরে অদ্য এরূপ ধ্বজ পতাকা শোভা পাইতেছে কেন? তাঁহার মস্তকে উষ্ণীশ, বক্ষঃস্থলে বর্ম্ম, বামহস্তে চর্ম্ম, ও দক্ষিণ হস্তে কোষ মুক্ত অসি ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে! তাঁহারা উভয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সময়ে উষার স্বর্ণছটা প্রকাশ পাইল ও দেবালয়ের সিংহদ্বারের উপরস্থ নহবৎ বাজিয়া উঠিল!

প্রণবাশ্রমে অদ্য বহু সমারোহ। তরুণ অরুণ বিভাসিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে সাধু সাধ্বীগণের আনন্দ-ধ্বনি সমস্বরে উত্থিত হইল "বয়ম্ অজরামরাঃ"। তখন আনন্দ-উৎসব বিঘোষিত হইল। বিবিধ বাদ্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুগণ সম্মিলিত হইতেছেন। স্বামী শারদানন্দ পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য কুমারীর শুভ বিবাহের দিন, তাই এতাধিক লোকের সমাবেশ হইতেছে। নানা বাক্যে, নানা কর্ম্মে আশ্রম টলমল করিয়া উঠিল। সকলেই উৎসব আনন্দে উৎসাহিত!

এদিকে ব্রহ্মদেব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অসংখ্য সিপাহী দক্ষিণ দিকের বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া ও গঙ্গাবক্ষ দিয়া

আশ্রমের চতুর্দ্দিকে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যুষে দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ দেবী দাস ও বীরপুরুষ ব্রহ্মদেব পাঁড়ে নিজ নিজ পন্থা পরিদর্শন করিতেছিলেন। এক্ষণে দেবীদাসের আদেশে সিপাহীগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে আশ্রমের চারি দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। আশ্রমের চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার আছে। ব্রহ্মদেব ও দেবীদাস সুদক্ষ সিপাহী গণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটি সিংহদ্বার আক্রমণের আদেশ দিলেন। দেবীদাস বলিয়া দিলেন—রাজা বীরসিংহের বিশেষ হুকুম, কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার না হয়। আদেশ মাত্রেই শত শত সিপাহী অগ্রসর হইল ও ক্ষণ কালের মধ্যে আশ্রমের চারিটি দ্বার আক্রমণ করিল।

শত শত লাঠিয়াল ও সর্দ্দার লইয়া এইরূপ যুদ্ধাদি বা লড়াই সেই সময়ে জমীদারগণের মধ্যে সংঘটিত হইত। পূর্ব্ব বঙ্গের জমীদার ও ধনী লোকের মধ্যে এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বহুদিন প্রচলিত ছিল।

যে স্থানে সাধুগণ মিলিত হইয়া ছিলেন, সেই স্থানে রামানন্দ স্বামী অতি ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—আপনারা কি করচেন? বিপদ উপস্থিত জানেন না? পশ্চাতে পশ্চাতে ভৈরবী আনন্দ-মাই আসিয়া বলিলেন,—অসংখ্য সেনা সামন্ত সঙ্গে রাজা বীরসিংহ এসে আশ্রম অবরোধ করেছেন; শুনচি বীর সিংহ কুমারীর জন্যই শত্রু হয়ে এসেছেন।

এই কথা শুনিবা মাত্রে সকলেই বহির্দ্বারে ছুটিলেন। সাধু রামানন্দ স্বামী সেই স্থানে সংবাদ দিয়াই দেবালয়ের

সন্মুখস্থ সদর দ্বারে গিয়া দেখিলেন, সেই স্থানে স্বামী শারদানন্দ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি প্রায় একশত লোকের গতিরোধ করিয়া রহিয়াছেন। আশ্রমের শতাধিক সাধু সেই দ্বারে অসীম সাহসে দাঁড়াইয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—প্রবেশ নিষেধ! প্রবেশ নিষেধ! আমাদের সকলকে উল্লঙ্ঘন ক'রে যাওয়ার সামর্থ থাকেত যাও।

সেইস্থানে সাধু রামানন্দকে দেখিয়া সাধুগণ সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"বয়ম্ অজরামরাঃ"। অমরেন্দ্র নাথ ছুটিয়া আসিয়া দেবীকে বলিলেন,—মা, উপায় কি? মহামায়ার কি ইচ্ছা কে জানে? আজ বোধ হচ্চে, সাধু-শোণিতে আশ্রম প্লাবিত হবে।

দেবী বলিলেন,— মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! বৎস, শারদানন্দকে গিয়া বল, ভয় নাই! "সর্ব্বরূপ-ময়ী দেবী, "সর্ব্বদেবীময়ং জগৎ"।

অমরেন্দ্র বলিলেন, মা, কোতোয়ালিতে সংবাদ দেব কি?

দেবী।—রাজকর্ম্মচারীকে জানান কর্ত্তব্য। তবে ভয়ের কারণ কিছু নাই। কূটস্থে দেখলাম, ভূপেন আর সুরেশ আসচে।

তৎক্ষণে অমরেন্দ্র কোতোয়ালিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি দ্রুত পদে দক্ষিণ দিকের সিংহদ্বারে গমন করিয়া দেখিলেন, দশজন সিপাহির সহিত কয়েক জন সাধুর বাক বিতণ্ডা হইতেছে। তথা হইতে তিনি পূর্ব্ব দ্বারে গমন করিলেন, তথায় দেখিলেন একজন বীর পুরুষ, অনুমান ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সুবর্ণ উষ্ণীশ শিরে শোভিত, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মুখ মণ্ডল, নিষ্কোষিত অসি হস্তে, সমস্ত সিপাহির

গতিরোধ করিতেছেন। আরও অনেক সিপাহি সেই বীর পুরুষকে আক্রমণ করিয়াছে।

দেবকান্তি যুবা কমল-দল-নিন্দিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অসি ঘূর্ণন করিতেছেন, আর বলিতেছেন—প্রাণ লয়ে পলায়ন কর। এ দেবীর আশ্রম!

অমরেন্দ্র একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? তিনি বলিলেন,—সুরেশ চন্দ্র, এই মাত্র এসে পৌঁছেচেন। অমরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বয়ম্ অজরামরাঃ"। শুনিয়াই সেই বীরযুবক অসি অবনত করিয়া বলিলেন—"বয়ম্ অজরামরাঃ।"

অমরেন্দ্র উত্তর দ্বারে ছুটিলেন; সেই দ্বারে গিয়া দেখিলেন একটি হেমকান্তি যুবক, ব্রহ্মচারীর বেশ, প্রশস্ত ললাটে যেন ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া উঠিতেছে, উন্মুক্ত অসি হস্তে, তিন শত সিপাহির গতিরোধ করিতেছেন। অমরেন্দ্র একটী সাধুর নিকট শুনিলেন, ইনি সেই চির-কুমার ভূপেন্দ্র-নারায়ণ,। অমরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বয়ম্ অজরামরাঃ"!

কুমার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তরবারি অবনত করিলেন ও বলিলেন, "বয়ম্ অজরামরাঃ"।

অমরেন্দ্র সেই দ্বারের বাহিরে গমন করিলেন; গিয়া দেখিলেন সেই স্থানে বহু লোক সমবেত হইয়াছে। তাহারা দ্বারাভিমুখে আসিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সুধাংশু সেই স্থানে থাকিয়া বীরোচিত ভাবে ক্রমাগত বাধা দিতেছেন। বীরসিংহের প্রধান সর্দ্দার ব্রহ্মদেব পাঁড়ে সুধাংশুকে আক্রমণ করিয়াছেন। সুধাংশু ক্রমাগত আত্মরক্ষা করিতেছেন। অমরেন্দ্র-নাথ বিধূমিত গিরির ন্যায় দাঁড়াইয়া

দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ব্রহ্মদেব শ্রান্তি বশতঃ ক্ষান্ত. হইয়া যেই পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, অমনি অমরেন্দ্র-নাথ লম্ফ দিয়া সম্মুখে গিয়া পড়িলেন। তিনি ব্রহ্মদেবের দক্ষিণ হস্ত নিজ বাম হস্তের বজ্র মুষ্টিতে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের আঘাতে আঘাতে তাঁহাকে বহুদূর লইয়া গেলেন। ব্রহ্মদেব অমরেন্দ্রের বীরত্ব কৌশল দেখিয়া অবাক্ হইলেন, ও আরও পশ্চাৎপদ হইলেন; পশ্চাৎপদ হইয়া অপর সর্দ্দার শঙ্করসিংহকে গোপনে বলিলেন, দেখ শঙ্কর, আমি এই লোকের সঙ্গে লড়াই করব, একবার অগ্রগামী হব, একবার পশ্চাৎপদ হব, তুমি এই অবসরে দশ জন সিপাই সঙ্গে রেখে, গোপনে পশ্চাৎ দিক হতে গিয়ে, সহসা সুধাংশুকে আক্রমণ করবে। আমি জেনেছি, ঐ ব্যক্তিই সুধাংশু, ওর সঙ্গেই পাত্রীর বিবাহ হবে। আমরা যদি ওকে বন্দী করতে পারি, তবেই বিবাহ বন্ধ হল! আর চাই কি? ওকে বন্দী করাই চাই। তোমার বহুৎ বক্‌সিস মিলবে।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, সর্দ্দার, তোমার কৃপায় শঙ্কর সিং এখনই সুধাংশুকে বন্দী করবে, তার জন্য চিন্তা নাই। কিন্তু দেখ, এই লোকটা এসেই মুস্কিল করেছে, তুমি এই লোকটাকে ব্যস্ত করে রাখ, যেন মোটেই ফুরসুদ না পায়।

এই বলিয়া শঙ্কর সিংহ, এক জন সর্দ্দার ও দশ জন সিপাহী সঙ্গে লইয়া দূরে গমন করিলেন ও ঘুরিয়া সুধাংশুর পার্শ্ব দিক হইতে গোপনে আসিয়া সহসা আক্রমণ করিলেন। সুধাংশু বীর বেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, অমরেন্দ্রের ও ব্রহ্মদেবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ শঙ্কর সিংহের আক্রমণ দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সুধাংশুর অস্ত্রত্যাগ দেখিয়া

শঙ্কর সিংহ পশ্চাৎবর্ত্তী সমর সিংকে বলিলেন—সমর-সিং, দাঁড়াও। সমর সিং ও সিপাহিগণ আর অগ্রসর হইল না। তখন শঙ্কর বলিলেন--আপনি অস্ত্র ধারণ করুন, নিরস্ত্র পুরুষের উপর অস্ত্র চালনা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। সুধাংশু বীরোচিত ভাবে বলিলেন—সর্দ্দার, যুদ্ধ করা আমাদের ব্যবসা নয়, সে তোমাদের ব্যবসা। আমাদের অস্ত্র ধারণ একটা সজ্জা মাত্র, আত্মরক্ষার একটা বাহ্যাড়ম্বর; বস্তুতঃ আত্মরক্ষার জন্যও নয়, শত্রু নিপাতের জন্যও নয়। শত্রুর প্রাণ নষ্ট করা আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। আমাদের আত্মরক্ষার্থে আত্মাই যথেষ্ট।

শঙ্কর-সিংহ সময় বুঝিয়া বলিলেন—আপনি বীরপুরুষ, যুদ্ধনীতি বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমরাও সাধ্যমত প্রাণ হানি করি না, বন্দী করি। এই বলিয়া শঙ্কর একটী বাঁশীর সঙ্কেত ধ্বনি করিলেন ও বলিলেন বীরবর, আপনি বন্দী হয়েচেন। সুধাংশু দেখিলেন, তৎক্ষণেই আর একজন সিপাহি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার হস্তদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে; সেই সঙ্গেই আর কয়েক জন সিপাহি তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। শঙ্কর বলিলেন, সমর সিং, বহুৎ আচ্ছা! শীঘ্র নিয়ে যাও, হুজুরের সামনে হাজির কর। সমর-সিং বন্দীকে লইয়া প্রধান সর্দ্দারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুধাংশু বন্দী হওয়া মাত্রেই সেই দুঃসহ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আশ্রমের পরিচারিকাগণ অন্তঃপুরে ছুটিয়া গিয়া প্রকাশ করিল যে, সুধাংশু বন্দী হইয়াছেন। কুমারী বয়স্যাগণের সহিত আপন কক্ষে বসিয়া শত্রু পক্ষের কথা শুনিতে ছিলেন, ইতোমধ্যে সুধাংশুর বন্দী হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া

সহসা বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইল। আশ্রমের সাধ্বীকুল মধ্যে প্রবীণা বিমান-বাসিনী ও অমর-বালা আর সকলের সঙ্গে মিলিয়া কুমারীর অঙ্গে জলসেচন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র কোলাহল উপস্থিত হইল, সকলেই ভীত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। সুরেশ-চন্দ্র প্রমুখ সাধু বৃন্দ দ্রুত গতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেবীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ব্যস্ততা দেখিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—সংবাদ কি ?

সুরেশ।— মা, সুধাংশু বন্দী হয়েছে! আমি যদি এখন তাকে মুক্ত করতে না পারি, আমার জীবন বৃথা!

দেবী।— বৎস, তুমি কি করতে চাও ?

সুরেশ।—মা, আমি সঙ্গে থাকলে কিছুতেই তাকে বন্দী করতে পারত না। যখন বন্দী হয়েছে, তখন আর উপায় কি! আমি বীরসিংহের নিকটে গিয়ে একটা সন্ধি ক'রে সুধাংশুকে মুক্ত ক'রে আনি। নতুবা আমি স্থির থাকতে পারচি না।

দেবী।— বৎস, সন্ধি উভয় পক্ষেরই বাঞ্ছনীয়। এখন তুমি যাও, কেবল দ্বার রক্ষা কর। তোমরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত থাক, আমার প্রতিবিম্ব-শক্তি সুধাংশুর সঙ্গে আছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্রমের সাধু ও সাধ্বীগণ আশ্বস্ত হইলেন। সুরেশ প্রমুখ সাধুবৃন্দ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বার রক্ষার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ কথা।

সুধাংশু ও ব্রহ্মদেব।

রাজা বীর-সিংহের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে তিনটি পুত্র বর্ত্তমান—কুমার জিতেন্দ্র-সিংহ, কুমার সুরেন্দ্র-সিংহ ও কুমার বীরেন্দ্র-সিংহ। জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্র প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কণিষ্ঠ দ্বয়ের সহিত কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহাদিগের জননী কন্যা-সন্তান না থাকায় পুত্রগণের উপরে অত্যন্ত মমতা হেতু তাঁহাদের নিকটে গিয়া অবস্থিতি করেন, ও প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কুমার জিতেন্দ্র-সিংহ বাল্য কাল হইতে ভূপেন্দ্র-নারায়ণের অনুগত ছিলেন। ভূপেন্দ্র নারায়ণও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। এক্ষণে ভূপেন্দ্র-নারায়ণ কলিকাতায় গমন করিলেই জিতেন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন ও তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম-উপদেশ ও নানা রূপ পরামর্শ গ্রহণ করেন। জিতেন্দ্রের স্বভাব অতি নম্র ও মধুময়। তিনি সতত বিনয়াবনত ও ধর্ম্মালোচনায় অনুরক্ত। তদীয় জননীও ধর্ম্মপরায়ণা; তিনি ভূপেন্দ্র-নারায়ণের কোন দোষ দেখিতে পান না।

রাণী বাটীর পত্রে অবগত হইলেন যে, রাজা সংপ্রতি ভূপেন্দ্র নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কাশীধামে গমন করিয়াছেন। সহসা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অধীর হইলেন ও জিতেন্দ্র সিংহের দ্বারা রাজার নিকটে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন।

রাজা বরুণার ধারে বাসা-বাটীতে বসিয়া যুদ্ধ-সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে ঐ টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। টেলিগ্রাম এই মর্ম্মে লেখা আছে—

"বাবুজি, যুদ্ধের সংবাদ জানিয়া মাতা-ঠাকুরাণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আপনি বিবাদ বিসম্বাদে ক্ষান্ত হইয়া ৺বিশ্বনাথের পূজা দিয়া সত্বর বাটীতে আসিবেন। নতুবা আমরা সকলেই ওখানে যাইব।"

রাজা টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন— রাণী নিষেধ করেচেন, প্রাণাধিক জিতেনও আমাকে অনেক বার বলেছে, তথাপি আমি কেবল মন্ত্রীর পরামর্শে এই বিবাদে ক্ষান্ত হই নাই। যা হবার, হয়েছে, এখন কি ঘটে দেখে উত্তর দেওয়া যাবে। এখন একটী সন্ধি হলেই ভাল হয়।

এদিকে সমর-সিং বন্দীকে লইয়া ব্রহ্মদেব পাঁড়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মদেব তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি সুধাংশুকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, বীরবর আপনি আমাকে বিলক্ষণ হয়রাণ করেছেন, আমি আপনার বীরত্বের প্রশংসা করি। আপনি এখন বন্দী হয়েছেন, আমরা এখন আপনাকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আপনি যদি মঙ্গল চান, তবে যে কন্যার জন্য আমরা এসেছি, তাঁকে এনে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন, আপনার সঙ্গে আমাদের আর কোনও শত্রুতা নাই, যদি তাতে আপনি অসম্মত হন, তবে আমরা এখন আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করতে পারি।

সুধাংশু সহাস্যে বলিলেন—সর্দ্দার, আমি বন্দী হয়েছি সত্য এখন তোমরা আমার প্রাণ নষ্টও করতে পার, সেও সত্য, কিন্তু

প্রত্যর্পণ! প্রাণ থাকতে নয়। আমরা প্রাণ দিতে কাতর নই, প্রাণ নিতে কাতর। আমরা কাহারও প্রাণ নষ্ট করি না।

ব্রহ্মদেব।—আপনি কি প্রাণের মমতা রাখেন না?

সুধাংশু।— সর্দ্দার, তোমাকে বিলক্ষণ বিচক্ষণ লোক ব'লে বোধ হচ্ছে; তুমি বুঝতে পারবে বলেই বল্‌ছি, আমাদের প্রাণের মমতা অসীম। প্রাণই আমাদের সর্ব্বস্ব। সর্দ্দার, সাধুরা জানেন, এ প্রাণ কেহ নষ্ট করতে পারে না; এই জন্য প্রাণের মমতাই মমতা, অন্য মমতা ক্ষণিক ও বৃথা। যা থাকবে না, তার আবার মমতা কি? তুমি কি আমার প্রাণ নষ্ট করতে পার? পার না, জেনেই আমি বন্দী হয়েছি। নিশ্চয় রূপে তা না জানলে, নিশ্চয়ই আমি অস্ত্রধারণ করতাম। যারা জানে যে প্রাণ নষ্ট হয়, তারা সেই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই অস্ত্র ধারণ করে, বোঝে না যে "প্রাণ" সেই পরমেশ্বরের অংশ, তা কখনও নষ্ট হয় না, কেহ নষ্ট করতে পারে না। তবে যে আমরা অসি ধারণ করি, সে বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। কেহ কি ইচ্ছা করলেই কারো প্রাণ নিতে পারে? সর্দ্দার, তোমার প্রাণ, আমার প্রাণ, একই প্রাণ, তুমি আমার পরম সুহৃদ। ত্রিজগতে আমাদের কেহ শত্রু নাই। ব্রহ্মদেবের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিলক্ষণ শুনা ছিল। তিনি সুধাংশুর সম্পূর্ণ নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া ও অটল জ্ঞান-বিশ্বাসের বাক্য শুনিয়া একবারে অবাক্ হইলেন, ও চুপে চুপে বলিলেন, সমর সিং, এ লোক মহা সাধু, এরা মরণকে ভয় করে না!

ব্রহ্মদেব সুধাংশুকে আবার বলিলেন,—সাধুজী, আমরা নোকর, হুজুরের হুকুম তামিল করি। আপনি কন্যা প্রত্যর্পণ না করলে, আপনার প্রাণের আশঙ্কা আছে।

সুধাংশু বলিলেন, সর্দ্দার, তুমি আমার কোনই অনিষ্ট করতে পার না ; তোমার হুজুরও আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারেন না। এ জগৎটা তোমার হুজুর চালাচ্ছেন না। মৃত্যু কালে তোমার হুজুর কি নিজপ্রাণ রক্ষা করতে পারবেন ? তা যদি না পারেন, তবে তিনি অপরের প্রাণ নষ্টই বা করবেন কি ক'রে ? তোমার হুজুর কি প্রাণের কর্ত্তা ? এ জগৎ অরাজক নয়, জগতের রাজা আছেন, মানুষ যা-খুসি তাই করতে পারে না। যাঁর মঙ্গল বিধানে সূর্য্যদেব সুনিয়মে উদয় হন, এক দিনও এক বিন্দু স্বেচ্ছাচার করতে পারেন না, তাঁরই মঙ্গল-বিধানে জন্ম মৃত্যু সুনিয়মে বাঁধা আছে, কারও স্বেচ্ছাচারে কারও মৃত্যু হয় না।

সর্দ্দার সকল কাজই "সময় পূর্ণ" হলে সম্পন্ন হয়। অসময়ে অনিয়মে কোনও কাজ জগতে হয় না। যদি আমার "সময় পূর্ণ" হয়ে থাকে, তবেই আমার মৃত্যু হবে, নতুবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরও সাধ্য নাই যে, সেচ্ছাচারের দ্বারা আমার প্রাণ হরণ করেন। সর্দ্দার, তুমি ত তাল-পাতার সেপাই ! "প্রাণ" যে কি বস্তু তা জান না, তাই তৃণবৎ একখানি তরবারি হাতে ক'রে বেড়াচ্ছ, ওতেই কি সেই ঈশ্বরাংশ "প্রাণকে" কেহ নষ্ট করতে পারে, না, বাঁচাতে পারে ? ব্রহ্মদেব বলিলেন,—সাধুজী, আপনার কথা আমি সব বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনার দেহ ত যাবে ? দেহ গেলে কোথায় বা থাকবে এই বিবাহ ? কোথায় বা থাকবে এই বন্ধু সব ? এদের আশা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করতে হবে !

সুধাংশু বলিলেন—হাঁ, দেহ যাবে, কিন্তু আর কিছুই যাবে না। "ভাঙ্গলে ভয় কি বরে কেহ ?—বালির বাঁধ এই ক্ষণিক

দেহ ?" এ দেহও তোমার কথায়, কি তোমার হুজুরের কথায় যাবে না। "সময় পূর্ণ" হলেই যাবে। যদি "সময় পূর্ণ" হয়ে থাকে, এখনই যাক। সর্দ্দার, এইরূপেই আমরা আমাদের মৃত্যু-ব্রত উদ্‌যাপন করি, কুকুরের ন্যায় রোদন করতে করতে গৃহ-কোণে আমরা দেহ ত্যাগ করি না।

ব্রহ্মদেব বলিলেন—সাধুজী, এ কথা কি সব সময় ঠিক থাকে ? সুধাংশু বলিলেন—সর্দ্দার, একথা যাঁদের সকল সময়েই ঠিক থাকে, তাঁদেরই নাম সাধু। যিনি সাধু, তিনিই এই কথা ঠিক রাখেন। সাধুরা জানেন যে, কেবল রাজ্যলাভের লোভে, রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের আবশ্যক হয়, প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণই যথেষ্ট। আত্মার জন্য আত্মাই যথেষ্ট। সাধুদের অস্ত্র শস্ত্রের কোনই প্রয়োজন নাই। সর্দ্দারজী, দেহ গেলে সাধুর কিছুই যায় না। "দেহ টুটে ওই—ধানটি ফুটে খই !" তাঁদের যে প্রেম প্রণয় ভালবাসা বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা, সে সমস্ত কেবল আত্মার সম্বন্ধেই হয়, দেহ সম্বন্ধে নয়। পশুদের যেমন দেহটী নিয়েই পশুত্ব, সাধুদের তেমনি আত্মা নিয়েই আত্মীয়তা। সাধারণ লোকের দেহের কুটুম্বিতা দুদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সাধুদের সেই আত্মার আত্মীয়তা কখনও নষ্ট হয়ে যায়না, আমরা "কুটুম্বিতা" করতে জগতে আসি নাই, "আত্মীয়তা" করতেই এসেছি। দেহ গেলে ভয় কি ? দাঁত পড়লে হয় কি ? আমাদের দাঁত পড়াও যা, দেহ পড়াও তাই। "দেহ গেলেই আমরা তুষ্ট— ফুল ঝরলেই ফল পুষ্ট !" আমরা দেহত্যাগকে মলত্যাগ বলেই জানি। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে দেবীদাস পাঁড়ে দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ কথা।

শারদানন্দ বন্দী।

স্বামী শারদানন্দের সহিত যে স্থানে সিপাহী গণের সংঘর্ষণ চলিতে ছিল, দেবীদাস সেই স্থানে সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন; সহসা সুধাংশু বন্দী হইয়ছেন শুনিয়া তিনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবীদাসকে দেখিয়াই ব্রহ্মদেব বলিলেন—ভাই দেবীদাস, লড়াই ত শেষ হয়েছে। সুধাংশু বন্দী!

দেবীদাস বলিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! ব্রহ্মদেব, বন্দী করেছ সত্য, কিন্তু স্বর্ণ ফেলে অঙ্গার বেঁধেছ। রাজা বাহাদুর কি চান, বল দেখি? তিনি আসামী চান, কি কন্যা চান?

ব্রহ্মদেব।—হাঁ, হাঁ, হাঁ! বুঝেছি, আসামী পাকড়ালেই কন্যা মিলবে।

দেবীদাস বলিলেন—সেই পেটমোটা হুজুর বরাবর বলেছেন এখনও বল্যেন, ভুপেন্দ্র-সিংকে, কি তার বদমায়েস মন্ত্রী শারদানন্দকে পাকড়া করা চাই! এই দুজনকে বা একজনকে যে বন্দী করতে পারবে, হাজার রূপেয়া তার বকসিস্ মিলবে।

ব্রহ্মদেব, কিছুই খবর রাখ না? এই আসামী বন্দী ক'রে নিয়ে গেলে, ভীমপাল তোমার মুখে কালি দিয়ে দেবে! সুধাংশু ত সাধু! তার সঙ্গে রাজা-বাহাদুরের কি সম্বন্ধ আছে? কি বা শক্রতা আছে? রাজা-বাহাদুর কি সুধাংশুকে নিতে এসেচেন? না, কন্যা দায়েই রাজা-বাহাদুর এত রূপেয়া খরচ ক'রে এত দুরে এসেছেন? রাজা বীর সিংহ এসেছেন,

ভূপেন্দ্রসিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করতে। তাঁকে বন্দী করলে, কি, তাঁর মন্ত্রীকে বন্দী করলে, তবে হুজুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তখন ব্রহ্মদেব বলিলেন—ঠিক বাত, ঠিক বাত! তবে এখন কি করা যায়?

দেবীদাস বলিলেন, আমি তার উপায় করেই এসেছি। শারদানন্দকে ঘেরাও ক'রে রেখে এসেছি; পঞ্চাশ জন সিপাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। সর্দ্দার তুমি না গেলে সর্দ্দার শিবশরণ সিং এখনি তাঁকে বন্দী করবে, আর হুজুরে হাজির ক'রে বকসিস্ নেবে। ছেড়ে দাও, সুধাংশুকে শীঘ্র ছেড়ে দাও। ও যে সাধু! সাধু দিয়ে আমরা কি করব? শারদানন্দকে বন্দী করলেই সন্ধি হবে। ভীমপাল লাখ রূপেয়া নেবে, তবে তাকে খালাস দেবে। এখন বুঝলে?

এই বলিয়া দেবীদাস নিজে গিয়া সুধাংশুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। এ দিকে ব্রহ্মদেব দ্রুতপদে শারদানন্দের উদ্দেশে ছুটিলেন।

সুধাংশুর মুক্তি সংবাদে আশ্রমে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। ব্রহ্মদেব গিয়া দেখিলেন, সিপাহীগণ শারদানন্দকে ঘিরিয়া আছে। তিনি তৎক্ষণে হুকুম দিলেন, "বন্দী কর।" আজ্ঞা মাত্রে শিবশরণ সিং গিয়া শারদানন্দের হস্ত দ্বয়ে লৌহ শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া দিল। স্বামী শারদানন্দ বন্দী হইয়া রাজা বীরসিংহের সম্মুখে নীত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আশ্রমের অন্তঃপুরে সেই সংবাদ প্রকাশ পাইল। কুমারী ভীত হইয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, স্বামীজী বন্দী হয়েছেন, উপায় কি হবে?

দেবী বলিলেন, বৎসে স্থির হও, ভূপেন্দ্র তার উপায় করবে।

এ দিকে দেবীদাস "শীঘ্র সন্ধি হবে" এই কথা সিপাহীগণকে বলিয়া কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—কুমার, আমি রাজা বীরসিংহের দূত। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভূপেন্দ্র প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—আপনি কি জন্য এসেছেন বলুন। শুনচি, শারদানন্দ বন্দী হয়েছেন, সেজন্য আমি বড় ব্যস্ত আছি।

দেবীদাস।—হাঁ এখন বিষম সঙ্কট উপস্থিত। আপনার মন্ত্রী বন্দী হয়েছেন, এখন সন্ধি ব্যতীত আর উপায় নাই। আপনার হিতের জন্যই আমি বলছি, সন্ধি করুন। আর বিবাদ বিসম্বাদে কাজ নাই। এই বলিয়া দেবীদাস কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণকে অনেক প্রবোধ দিলেন। তিনি দেবী দাসের নম্রতা বিনয় ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—সর্দ্দারজী, আমি ত সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি। বল, আমাকে কি করতে হবে?

দেবীদাস।—পঞ্চসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত রাজা বীরসিংহের সহিত কিছুতেই সন্ধি হবে না। আমি আপনাকে নিশ্চয় কথা বল্যাম! আপনি ঐ মুদ্রা দিতে সম্মত আছেন এই কথা লিখিয়া দিন, তা হলেই রাজা বীরসিংহ আপনার মন্ত্রীকে মুক্ত করে দেবেন, সন্দেহ নাই; এখানে শান্তি সংস্থাপন ক'রে তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করবেন।

এইরূপে উভয়ের মধ্যে অনেক কথা-বার্ত্তা পরিচালনার পরে কুমার সর্ব্বদিক চিন্তা করিয়া অবিলম্বে একখানি সন্ধিপত্র লিখিয়া দেবীদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেবীদাস উহা লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি মন্ত্রাবর ভীমপালের নিকটে গিয়া

বলিলেন—হুজুর, লড়াই ফতে করেছি। ধূর্ত্ত শারদানন্দকে বন্দী করেছি। ভূপেন্দ্র নারায়ণকে সন্ধিতে সম্মত করেছি। ভীম পাল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, বটে বটে! মুদ্রা কই? আমাদের কই?

দেবীদাস।—হুজুর, শারদানন্দ বন্দী আছেন, শীঘ্র সেখানে যান, সব জানতে পাবেন। এই বলিয়া দেবিদাস মন্ত্রীবরকে পাঁচটি অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া দেখাইলেন ও সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পরে তিনি বন্দীর অবস্থা দর্শন ছলে বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন, ও সংগোপনে সন্ধিপত্র খানি বন্দীর হস্ত মধ্যে দিয়া, অলক্ষিত ভাবে এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শারদানন্দ বিস্মিত হইয়া পত্র খানি পাঠ করিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, লোকটি কে?

এ দিকে শারদানন্দ বন্দী হইয়াছেন, সেই সংবাদ পাইয়া অমরেন্দ্র নাথ নির্ভয়ে বহু লোকের কোলাহল ভেদ করিয়া, যে স্থানে রাজা বীরসিংহ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন স্বামী শারদানন্দ সেই স্থানে বন্দী হইয়া আছেন, তিনি আহত হইয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সেইস্থানে বহুলোকের সহিত কি কথা বার্ত্তা চলিতেছে দেখিয়া, অমরেন্দ্র নাথ সেখানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে ভীমপাল আসিয়া রাজার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। শারদানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে রাজা বীরসিংহকে বলিলেন—আমি বলি, আর বৃথা বিবাদে কাজ নাই। আমাদের সাধু উদ্দেশ্যে আপনি বাধা দিবেন না। আমরা আপনার কোনও অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই। কন্যার ভ্রাতাই নিজে উদ্‌যোগী হইয়া এই বিবাহ দিচ্চেন। আমাদের

কি দোষ আছে ? ভাল ভেবেই আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি।

দেবীদাস শুনিয়াছিলেন যে স্বামী শারদানন্দ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী পুরুষ, এই জন্য তাঁহার মুখ হইতে দুই চারিটি বিশেষ কথা শুনিবার মানসে তিনি সম্মুখে গিয়া বলিলেন—স্বামীজী, হুজুরের হুকুম হয়ত আপনার শির নিতে আমরা কাতর নই। যদি আপনার কিছুমাত্র প্রাণের মমতা থাকে, তবে এখনি হুজুরের আজ্ঞা পালন করুন।

স্বামীজী আহত হইয়া কাতর ছিলেন, তিনি সর্দ্দারের বাক্যের কোনও উত্তর দিলেন না। অমরেন্দ্র-নাথ বলিলেন—

সর্দ্দার, যারা মানুষ মেরে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাদের নাম পশু, আর যারা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাদের নাম মনুষ্য। মানুষেরই জ্ঞানে অধিকার আছে। এই দেখ, আমার এই নিশ্বাস-পথেই আমার চৈতন্য আমার এই দেহের মধ্যে আসচে ; নাসিকা টিপে ধরে রাখ, অমনি দেখবে, প্রাণ যায় যায় হয়েছে ! জ্ঞান বুদ্ধি বন্ধ হল। তবেই দেখ, নাসিকা-পথে শ্বাস প্রশ্বাসে আমার "জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমি" কেমন আকাশ হতে আসচি যাচ্চি ! আমার নাসিকার সাম্‌নে যে আকাশ রয়েছে, ঐ স্থানেই আমার শ্বাস যাচ্চে, ওখান থেকেই আবার জ্ঞান-বুদ্ধি-চৈতন্য নিয়ে ঐ শ্বাস আমার বুকের মধ্যে আসচে।

আমি—নাসার সামনে আকাশ-বাসী,
দেহে উঁকি দেই শ্বাসে আসি।

আমি জ্ঞান-বুদ্ধি-মন নিয়ে ঐ আকাশেই আগে ছিলাম,

এখনও ঐ আকাশে আছি, দেহের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে এক এক বার উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছি মাত্র। পরেও চিরদিন ঐ আকাশে থাকব। সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য মৃত দেহেও আছেন, কিন্তু খণ্ড চৈতন্য যে জীব-মন, সেটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেই আসচে যাচ্ছে। সেইটি "আমি আমি" করচে। আমার যে চেতন-মন সে দেহ মধ্যে বাস করে না, ঐ আকাশ থেকেই উঁকি ঝুঁকি দেয় মাত্র। তবে আর মৃত্যুভয় কার হবে, বল দেখি ? দেহটি ছেড়ে আমি যাব আজ, তুমি যাবে কা'ল, তোমার হুজুর যাবেন পরশু ! এই ত কথা ?

"দেহে আমি নেই ;—

আকাশ থেকে, বাতাস ধরে, শ্বাসের পথে উঁকি দেই।"

এই মন্ত্র বুঝে বুঝে প্রতিদিন যদি দশ হাজার বার জপ করা যায়, তবে দ্বাদশ বৎসরেই মন্ত্রসিদ্ধি হতে পারে। এ কথা যারা শোনে, তারা ধারণা ক'রে রাখতে পারে না, কিন্তু যারা দ্বাদশ বৎসর ধ'রে এই মন্ত্র শিক্ষা করচে, অভ্যাস করচে, সাধন করচে, তারা এ কথা দৃঢ় ধারণা করেছে। তারা দিব্য চক্ষে স্পষ্ট দেখছে যে, তারা চিরদিনই আকাশ-বাসী, দেহবাসী নয়। সর্দ্দার, যদি এই অমৃতজ্ঞান লাভ ক'রে অমর হতে চাও, তবে দেবীর শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর ; বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে, নারায়ণের পাদপদ্ম লাভ করতে পারবে।

দেবীদাস।—তা বেশ বুঝলাম, আমরা আকাশেই আছি বটে, আমরা অমর আত্মা। কিন্তু সেই প্রেমময় ভগবানের দর্শন পাব কিরূপে ?

অমরেন্দ্র।—সর্দ্দার, তুমি দেখচি, একজন ভক্ত। শোন,-

খ বলে আকাশকে, তাই 'সুখ' অর্থে "সুন্দর আকাশ"। সেই চির সুখময় আকাশেই চির-বসন্ত বর্ত্তমান, সেই খানেই ভগবান সর্ব্বদা প্রকাশমান আছেন। তাই,

"আকাশ প্রকাশ হ'লে প্রকাশিবে সব,
আসিল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব!"

অমরেন্দ্রনাথের জ্যোতির্ম্ময় মুখ-মণ্ডল, ও পদ্মপর্ণের ন্যায় আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন যুগল দর্শন করিয়া এবং অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বীরসিংহ স্তম্ভিত হইয়াছেন। তিনি সেই সাধু পুরুষের মুখ-শ্রীতে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—ওঃ! ইনিই বাস্তবিক সাধু! এরূপ তেজস্বী পুরুষ আমি দেখি নাই। ইঁহার বাক্য যেন আমার অন্তরে বিদ্ধ হচ্চে! আমি এরূপ সাধুও দেখি নাই, এরূপ বাক্যও কথনো শুনিনাই! শুনেছিলাম, কাশীতে অনেক সাধু আছেন, আজ দেখলাম, কাশীই বাস্তবিক সাধুর স্থান। কেন আমি এই কাশীধামে এসে এরূপ সাধুগণের সঙ্গে অনর্থক বিবাদে প্রবৃত্ত হল্যাম! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা মৃদুস্বরে ভীম-পালকে বলিলেন—মন্ত্রী, এই সাধুটি কে? ইনি কোথায় থাকেন, জেনে রেখ, আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

রাজা ব্যস্ত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন। অমরেন্দ্র নাথের মুখ মণ্ডলের জ্যোতিঃ ও জ্বলন্ত বাক্য সকল তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। নানা চিন্তায় ও ব্যস্ততায় রাজার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—আমার শরীর ক্রমেই অসুস্থ বোধ হচ্চে কেন? কিছুই ভাল বোধ

হচ্চে না। কাশীধামে এলাম, বিশ্বনাথ দর্শন হয় নাই। পত্নী ও পুত্রের নিষেধ সত্বেও আমি কেবল মন্ত্রীর পরামর্শে এই বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছি! এই সাধুর কি অসীম তেজ! ইনি কি দেবতা? ইনি যদি আমার গুরু হন, তবে আমি এ সংসারে উদ্ধার পেতে পারি। যাহোক, যা হবার হয়েছে, আমি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে শীঘ্র বাটীতে যাব। আর এ বৃথা বিবাদে কাজ নাই।

রাজা. স্বামী-শারদানন্দকে মুক্তি দিবার জন্য গিরিধারীকে দিয়া মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি স্বপ্ন যোগে দর্শন করিলেন, যেন সেই সাধু পুরুষ জলন্ত মূর্ত্তিতে আসিয়া শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

এ দিকে ভীমপাল শারদানন্দের মুক্তির আদেশ শুনিয়া স্বার্থ সাধন জন্য ব্যস্ত হইয়া স্বামী-শারদানন্দকে বলিলেন—আমরা আপনাদের এই কার্য্যের জন্য গুরুতর দণ্ড বিধান না ক'রে ক্ষান্ত হব না। শারদানন্দ বলিলেন—আপনার অভিপ্রায় কি?

ভীমপাল।—আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আপনাদের. সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে এ স্থান ত্যাগ করব না। বিমলা দেবী অন্নজল ত্যাগ করে আছেন, কন্যাকে পেলে তবে জল গ্রহণ করবেন।

শারদানন্দ মৃদুস্বরে বলিলেন—আমি আহত হয়েছি, আপনি আমার নিকটে বসুন, আস্তে আস্তে আপনাকে সব কথা বলি।

ভীমপাল।—আমি এই আপনার নিকটে বসলাম, বলুন কি বলবেন।

স্বামীজী দেবীদাস-প্রদত্ত সেই সন্ধি-পত্রখানি ভীমপালকে

দেখাইলেন। ভীমপাল পত্রখানি পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, নিম্নে লেখা আছে,

পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।—

ভূপেন্দ্র নারায়ণ।

ভীমপাল মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন; পরে বলিলেন,—আচ্ছা, রাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া তিনি বহির্দ্দেশে গমন করিলেন, ও কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—স্বামিন্, আরও আমাদের সহস্র লোকের পুরস্কার চাই। তখন স্বামীজী একটু বিবেচনা করিয়া, অমরেন্দ্র নাথকে সবিশেষ বলিয়া সুরেশচন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

সকলেই সেই গৃহে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। একটু বিলম্বে অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া একটি পত্র দিলেন। শারদানন্দ দেখিয়া উহা ভীমপালের হস্তে দিলেন। ভীমপাল পড়িলেন—

এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।—

সুরেশ।

কাগজখানি পাঠ করিয়া ভীম পাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও নিঃসন্দেহে স্বামী শারদানন্দকে মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রভাত কালীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আহত স্বামীজী সেইস্থান হইতে মুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বহির্গমন করিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথের স্কন্ধোপরি নির্ভর করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বয়ম্ অজরামরাঃ!"

অমরেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত সমস্ত মুদ্রা লইয়া গিয়া ভীমপালের হস্তে অর্পণ করিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে কোতোয়ালীর

প্রধান কর্ম্মচারী তদন্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ কার্য্যে দূরে গমন করিয়া ছিলেন, এই হেতু আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া অমরেন্দ্রনাথের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি রাজা বীরসিংহের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও কোন পক্ষেই আর কোন গোলযোগ নাই জানিয়া জলযোগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

উনত্রিংশ কথা।

শুভ পরিণয়।

সন্ধ্যার পরে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর বাড়ীতে মঙ্গলময়-আরতির বাদ্য হইতেছে, ধূপের সুগন্ধ ছুটিয়াছে। চারিদিকে নানাবিধ বাদ্য উত্থিত হইয়া কর্ণ বধির করিতে লাগিল। কোনও দিকের কোন কথা আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সৌধাবলীর শীর্ষদেশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে সেই আশ্রম প্রফুল্ল-বদন জনগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারে ভারে উপহার সামগ্রী আসিতে লাগিল। পুষ্প-স্তবক ও পুষ্প মাল্যে ঘরদ্বার যেন হাস্য করিতে লাগিল। অঙ্গনাগণ চারিদিকে কুসুম-লাজাদি ছড়াইতে লাগিলেন। আশ্রমের অন্তঃপুরে মহিলাগণের উপর্য্যুপরি হুলুধ্বনির প্রতিধ্বনি ছুটিতে আরম্ভ করিল। আনন্দ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

সমাগত কাশীবাসিনী কুল-বধূগণ ও সুমধ্যমা সাধ্বী সকল

দেবী-মহলে বসিয়া কুমারীকে বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন। সুন্দরীগণ সুনির্ম্মল সুবাসিত সলিলে কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া দিলেন, পরে কেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া, ভূপেন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের আনীত বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ কুমারীর বরাঙ্গে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্ণ জড়িত পট্টবসন পরাইয়া দিয়া, রত্ন রাজিতে কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ শোভিত করিলেন। মস্তকে হীরক খচিত স্বর্ণ মুকুট, তৎ পশ্চাতে অপূর্ব্ব কুন্তল বন্ধন, তাহার উপরে স্বর্ণ-কমল কম্পিত হইতেছে, যেন সুনীল কমলাকরে নলিনী নৃত্য করিতেছে। অনাবৃত ললাট-পটে বিলোল অলকাবলী দুলিতেছে! কর্ণে মণি-কুণ্ডল, নাসাগ্রে শ্বাস-কম্পিত মোতির বেসর; হস্তে স্বর্ণ বলয় ও মরকতময় চুড়ী, বাহুতে অনন্তের অনন্ত শোভা! গলদেশে সপ্ত গুচ্ছ মুক্তা-মালা ঝলমল করিতেছে; কটিদেশে স্বর্ণ মণ্ডিত রত্নময় চন্দ্রহার শোভা পাইতেছে, ও চরণ যুগলে মুখরিত নূপুর ঝঙ্কার দিতেছে!

নারীগণ দেবীর নিকট হইতে সচিত্র পত্রে লিখিত পরিণয়-কবিতা-মালা আনিয়া কুমারীর কর-কমলে অর্পণ করিলেন, ও শত শত কবিতা-পত্র লইয়া আশ্রমের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ পরিণয়-কবিতা-পত্রে এই কবিতাটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল, কুন্দমালা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন,—

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

কুলীন কুমারীর শুভ পরিণয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদ।

প্রেমের মাধুরি, এস মা কুমারি, আজি অগ্রসর হও,
প্রেম-পরিণয়— বিশ্ব মধুময়! বিশ্ব-প্রেম শিক্ষা লও।

দিগঙ্গনা গণ করিছে নর্ত্তন!—প্রেম ত অনিত্য নয়!
প্রেমের যে ছায়া, অনিত্য সে "মায়া," সেই মায়া দুঃখময়।
বিশ্বপ্রেম-সিন্ধু, তার এক বিন্দু এই প্রেম-পরিণয়,
যেন দুটিমনে এ প্রেম-বন্ধনে ভব-বন্ধ মুক্ত হয়!
সাধু সাধ্বীগণে সুধা বরিষণে আনন্দে বিভোর করে,
হেন প্রেম-ধনে, দাম্পত্য-জীবনে, শিক্ষা কর স্তরে স্তরে।
হেন পরিণয় দিন মধুময় উদয় হয়েছে আজি,
আনন্দেতে ভরা, নৃত্য করে ধরা, প্রেমের সজ্জায় সাজি!
লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি, হর গৌরীসতী চিরসুখী যে বন্ধনে,
সে সুখ-বন্ধন লও মা এখন কুমারি প্রফুল্ল মনে!
এস মা কুমারি, দেবী মূর্ত্তি ধরি, সাধু উপদেশ ধর,
"প্রেমে অমরতা," এ অমূল্য গাঁথা,—রত্নহার কণ্ঠে পর।
"প্রজাপতি-স্মৃতি মহতী মহতী!" নব দম্পতির আশা,
দুটি প্রাণ মনে দেয় যেন এনে ত্রিদিবের ভালবাসা!
যেমতি ভারতী, হও বিদ্যাবতী, সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা,
ধর্ম্মে থাক মতি, পাও গুণবতী, পতিসেবা-মধুরতা!
সুষমা ইন্দুর—সীমন্তে সিন্দুর চির দিন তুমি পর,
"হাতের বলয়, হাতে হোক ক্ষয়" আশীর্ব্বাদ শিরে ধর।
"সতী-পতি-প্রেমে, শিক্ষা হয় ক্রমে, বিশ্বপ্রেম সুধাঢালা।"
করিয়া যতন রাখিও স্মরণ, কুমারি কুলীন-বালা।

প্রণবাশ্রমে কাশীবাসী মহামতিগণ ও আর্য্যনারী সকল সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছেন। ধর্ম্মমতি নরপতি হইতে কুল-বধূগণ পর্য্যন্ত সকলেই উপস্থিত। দীন দুঃখী অনাথা সকল আশ্রমের আনন্দোৎসব দেখিতে আসিয়াছে। ভূপেন্দ্র-নারায়ণের

অনুমতি ক্রমে স্বামী শারদানন্দ পূর্ব্বেই আসিয়া বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

আশ্রমের মধ্যস্থলে দেবী মন্দিরের প্রাঙ্গনে বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। রত্নময় বহু সজ্জায় সেই মণ্ডপ সুসজ্জিত। তাহাতে সুকুমার কুসুম-মুকুল, পুষ্প-স্তবক, ফুলভার-বিনতা হরিৎ-লতার গুচ্ছ, ও নব পল্লবরাজি সুশোভিত! তদুপরে ঘন-সার চন্দন-পঙ্ক প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল অমোদিত করিতেছে! বিবাহের আয়োজন-সামগ্রীতে সেই মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়াছে। কত যে কাশীবাসী মহামতিগণ আসিয়া সেই সুন্দর সুসজ্জিত মণ্ডপে উপবেশন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই! সুধাংশুর ললাটপটে চন্দন লেপন, পরিধানে কৌষিক বস্ত্র, স্কন্ধদেশে কৌষিক উত্তরীয়। তিনি বর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই সাধু মণ্ডলীর মধ্য স্থলে উপবিষ্ট আছেন।

শত শত আলোক মালায় দীপ্তিময় হইয়া মণ্ডপ-গৃহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! এই সময়ে কুমারীকে মধ্যস্থলে লইয়া আর্য্যনারীগণ শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। কুমারীর রূপ-লাবণ্য-প্রভায় সভাস্থল উদ্ভাসিত হইল। সকলেই সবিস্ময়ে সেই লক্ষ্মীরূপার অপূর্ব্ব শ্রী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই পাত্রী কি মানবী?

পাত্র পাত্রী যথা বিধানে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে আচার্য্য ও পুরোহিত, বিবাহের মন্ত্রপাঠ ও ক্রিয়া কলাপ সুনিয়মে সম্পন্ন করিয়া বেদধ্বনি করিলেন। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ষোড়শিনী সুন্দরীগণ, কুমারীকে আসন সহ

উত্তোলন করিয়া, সুধাংশুর চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। পরে পাত্রের বামভাগে পাত্রীকে পুনরায় স্থাপন করতঃ তাঁহারা বারংবার হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে নব দম্পতিকে আবাস গৃহে লইয়া গেলেন।

তখন পুনর্ব্বার নহবৎ বাজিতে লাগিল, নানাবিধ বাদ্যে শ্রুতি রোধ হইয়া গেল। সেই আশ্রম নৃত্য গীতে পূর্ণ হইল, এবং জয়ধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে টলমল করিতে লাগিল।

সেই বাদ্যোৎসব-কোলাহল শ্রবণ করিয়া বিমলা দেবী আপন কক্ষে বসিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতেছেন—এই শ্রবণ-বধিরকর বাদ্যোৎসব কোথায় হইতেছে? তিনি মন্ত্রীবর ভীমপালকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এরূপ বাদ্য কোথায় হইতেছে? ভীমপাল বলিলেন,—মা, আপনার কন্যার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হ'ল। "নিয়তি কিংসে বধ্যতে?" মা, আপনি এখন জল গ্রহণ করুন, কোনও চিন্তা নাই। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি! "যত্নকৃত. যদি বা না সিদ্ধি. কর্ম্মদোষঃ?" সাধ্যের অতীত হলে কি করব?

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কার সাধ্য খণ্ডন করে? আপনি শান্ত হন। যা হবার তাই হ'ল। তবে আমি যাতায়াতের খরচটা আদায় ক'রে নিয়েছি। একবারে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আমি নই। এই এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আমি অতিকষ্টে আদায় করেছি, আপনি গ্রহণ করুন। এই এখন আমাদের যথেষ্ট মনে করতে হবে। আপনার কন্যা স্বামী সঙ্গে পরম সুখে রাজভোগে কাল যাপন করবেন, তার জন্য আর ভাবনা কি? দেখলাম, কত রাজা এসে দুয়ারে ঘুরছে! এক কথায় এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা

ফেলে দিয়েছে ! ধনের অভাব নাই, মানের অভাব নাই, সুখের সীমা নাই ! এখন চলুন আমরা যাত্রা করি। ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা।'

বিমলা দেবী এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে মলিন হইয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,—বাবা, আমি ত অর্থ নিতে আসি নাই, কন্যাকে নিতেই এসেছি। আপনারা শেষে কি এই করলেন ? আমি আপনাদের ভরসা পেয়েই এতদূর এসেছিলাম। এখন বুঝলাম আমার না আসাই উচিত ছিল। হায়, আমি কেন এলাম !

ভীমপাল।—মা, এ সব দৈবের নির্ব্বন্ধ। আমরা বহু চেষ্টা করেচি, সেজন্য ক্ষোভের কারণ নাই।

এই বলিয়া ভীমপাল প্রস্থান করিলেন ও রাজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—হুজুর, তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা। হা ! হা ! এই তিন সহস্র ভূপেন্দ্রের নিকট আদায় করেছি। এক সহস্র বিমলা দেবীকে দিলাম, দুই সহস্র আমাদের। আর শারদানন্দ, কি জব্দটাই হয়েছে ; উঠবার শক্তি নাই। এখন ছমাস শয্যায় পড়ে থাক।

বলিতে বলিতে ভীমপাল দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার তোড়া রাজার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। রাজা ম্রিয়মান হইয়া আছেন। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তা বেশ হয়েছে, আর আবশ্যক নাই। কাশীবাসী দীন দুঃখীকে ঐ টাকা দান ক'রে দেও। আমার সম্মুখে ঐ টাকা দান হোক, আমি দেখব। আমার শরীর ভাল নাই, শীঘ্র ঝিনিয়া যাবার বন্দোবস্ত কর। মন্ত্রী শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, একটু ভীত হইলেন, ও "যে আজ্ঞে, হুজুর" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ত্রিংশ কথা।

বাসর।

বিবাহের পরে আশ্রমে মহাভোজের আয়োজন হইয়াছে। অত্যুজ্জ্বল আলোক মালায় প্রণবাশ্রম রাজপুরির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। রাজ ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কেবল ভোজনের সামগ্রী বিতরণ হইতেছে। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কোনও সামগ্রী আর বাকি নাই, দেবী স্বহস্তে সমস্ত বিতরণ করিতেছেন। কত যে কাঙ্গাল অন্ধ খঞ্জ আর সাধু সাধ্বীর সেবা হইল তাহার সংখ্যা নাই। লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল।

এ দিকে বাসর-সজ্জা হইয়াছে। বাসর-গৃহে নব দম্পতি সুকোমল সুন্দর শয্যায় উপবেশন করিয়াছেন। চারিদিকে যুবতীগণ ও সুমধ্যমা মহিলাগণ বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই সুরসিকা। পাত্রীর অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া এক সুন্দরী বলিলেন,—"ভাই, চাঁদ কেন ঢাকা ?" আর এক রসিকা বলিলেন—"চাঁদ চাচ্ছে টাকা।" প্রথমা বলিলেন—"টাকা কোথায় বাছা ?" দ্বিতীয়া বলিলেন—"ধরগে বরের কাছা !" এই বলিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন সুপ্রভা উঠিয়া বলিলেন, ভাই দেখ, প্রতিমার বিয়ের দিন, বাসরে আমরা বল্যাম, আমাদের কি দেবে, বল ? জামায়ের বাবা বল্যেন— সে হবে না, সে হবে না, আমরা দিতে টিতে পারব না। ভাই লোকটা যেন কর্কশা চাষা ! মেঘমালা বলিলেন—নে ভাই নে, সে কথায় আর এখন কি হবে ? এখন যা করবি তাই কর।

তখন সুপ্রভা বলিলেন, ভাই, "ফেল্ল্যাম কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।" বলিয়াই সকলে হাসিয়া কুটিকুটি হইলেন, ও গা-টেপাটিপি আরম্ভ করিলেন।

সুধাংশু বলিলেন,—আপনারা ক্ষান্ত হন, টাকার ভাবনা কি? আপনাদেরই সব। যেরূপ বলবেন, সেইরূপই হবে।

সরসীলতা বলিলেন—ও কথা যাক। জামাই-ভাই একটা গান গাও দেখি? সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সুধাংশু বলিলেন—আপনারা যদি আগে আগে যান, আমি পেছু পেছু যেতে পারি। বিজনবাসিনী বলিলেন—বটে? আচ্ছা ভাই ক্রমে অগ্রসর হও "তিলে তিলেই তিলোত্তমা।" ত্রিদিবা, একটা গান গেয়ে শুনিয়ে দেত। ত্রিদিবা গান ধরিলেন,—

গীত।

আঁখিতে ভুলালে সখি, সেই আঁখি লো সখি।
সেই পদ্মপলাশ লোচন, হৃদয়ে রেখেছি আঁকি!
ধন দিলাম, মন দিলাম, প্রাণ দিতে আছে বাকি!

পরে ত্রিদিবা বলিলেন-- ভাই, এখন তুমি একটা গাও।

সুধাংশু বলিলেন,—না, এখন না, আপনারা আর দুই একটা গাইলে, পরে আমি গাইব।

"আচ্ছা, তবে শোন" এই বলিয়া চন্দ্রকলা গান ধরিলেন—

গীত।

নীলাব্জ নিলাজ কালা!
পীরিতি রাখতে নার, রাখতে নার, রাখতে নার;
মারতে পার ব্রজের বালা!

আমরা গোপের নারী, সইতে নারি,
আমরা সইতে নারি বিচ্ছেদ জ্বালা।
ছি, ছি, ছি ! প্রেম জান না,—
প্রেম জান না, প্রেম জান না, প্রেম জান না ;
জান না, প্রাণ দিয়েছে গোপের বালা !
এ ত নয় কংস ধ্বংস,—কালীয় বংশ,
এ ত নয় মানব দেহের ধূলা খেলা।
এ যে নিত্য সত্য, প্রেমের তত্ত্ব,
অমরত্বের নিত্য লীলা !

গানটি শুনিয়া ত্রিগুণা বলিলেন—সুধাংশু দেখ, প্রেমের কি অপূর্ব্ব শক্তি ! এমন প্রেম কি তোমরা জান? নারীহত্যা করতে পুরুষ এদিক ওদিক চায় না। প্রেম শুকালেই নারী গেল ! তোমরা আজ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পলে। ভাল, বল দেখি, প্রেম কেমন ? কিছু কি জান ? শিখেছ কিছু ? না শিখে থাক ত বল, আমরা গুরুমশায় হয়ে তোমাকে শিখিয়ে দেব। আমাদের কুমারীর চির শ্যামল হৃদয় খানি যেন শুষ্ক মরু করে দিও না।

সুধাংশু বলিলেন—আপনারা আমাকে এই উপদেশ দিয়ে বড়ই সুখী করলেন। আমি আর কি বলব? আশ্রমের সাধু সাধ্বীগণ সকলেই বিশ্বপ্রেম-পথের পথিক। ভালবাসাই জগতের সার মন্ত্র,—তাঁরা সকলেই জানেন। আমিও তাই জানি।

"জগতে যা আকর্ষণ প্রাণে তা মিলন-আশা,
বিশ্বে বিশ্ব ধরি টানে, প্রাণে প্রাণে ভালবাসা।"

শরীরে যেমন রক্ত, মনে তেমনি ভালবাসা। রক্তহীন শরীর, আর ভালবাসা হীন মন সমান।

নিরক্ত দেহই জীর্ণ জরা, ভালবাসা গেলেই মনটি মরা!

ভালবাসা গেলে, জীবনী-শক্তির আর মধুর লাবণ্য থাকে না।

এই দেখুন—জন্মের পরেই প্রথম দেখলাম মা; প্রথম শিখলাম মা। অক্ষর ব্রহ্ম, প্রথম অক্ষর উঠল "মা"। জগতের ভাষার প্রথম অক্ষর, ভালবাসার নন্দন-কাননের প্রথম পুষ্প, সেরা ফুলটি ফুটল 'মা'। সৌরভে ত্রিজগৎ আমোদিত, মোহিত হল। সুরাসুর নরনারী 'মা' ধ্বনিতে নৃত্য করে উঠল। ছেলের সম্মুখে "মা" ফুটলেন যেন সহস্র-দল পদ্ম! যোগীর মস্তকের সহস্রদল পদ্ম এই জগজ্জননী 'মা'। মায়ে আর সন্তানে কি অনীর্ব্বচনীয় ভালবাসা! এই খানে ভালবাসার মহা নদীর প্রথম উৎস উৎসারিত।

ভাষার দ্বিতীয় অক্ষর উঠল "বাবা।" এইটি ভালবাসার পুষ্পোদ্যানের দ্বিতীয় কুসুম! তৃতীয় ও চতুর্থ কুসুম—দাদা, দিদি। ক্রমে ভালবাসার উদ্যান ফুলে ফুলে ফুলময়। শেষে অপূর্ব্ব কুসুম প্রস্ফুটিত হল—দাম্পত্য প্রণয়। এই ভালবাসার ফুলটির যে ফল হয়, তার নাম 'অমরত্ব'! সে ফল অমৃত রসে পূর্ণ। মা-বাপে ভালবাসা, ভাই-বোনে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা, পুত্র-কন্যায় ভালবাসা, ঘর বাড়ীতে ভালবাসা, পশুপক্ষীতে ভালবাসা, বৃক্ষলতায় ভালবাসা, চারিদিকে ভালবাসার সমুদ্র উথলে উঠল। আহা, জগতে যেমন সূর্য্য, জীবপ্রাণে তেমনি এই ভালবাসা। যোগীর যেমন মুক্তি-আশা, জীবের তেমনি ভালবাসা!

ভালবাসাই মহাশক্তি! এই ভালবাসা যার হৃদয়ে উদয় হয়, সে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করে, সাঁতারে সাগর পার হয়। ভালবাসা কি অসামান্য নৈসর্গিক সামগ্রী! মানুষ এই ভালবাসার স্পর্শে প্রিয়তম আত্ম জীবনকেও তৃণবৎ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। এই স্বর্গীয় পদার্থের সংস্পর্শে মৃন্ময় পৃথিবী স্বর্ণময় হয়। ওঃ! অগ্নির কি এরূপ শক্তি আছে? তাড়িৎ কি এত শক্তি ধরে? না। ভালবাসার শক্তিই অসীম। নিদাঘের জলশূন্য মরুভূমি, আর এই পৃথিবীর প্রেমশূন্য হৃদয় যেন হু হু ক'রে জ্বলে যায়। আহা, কেহ যেন ক্ষণকালও এই ভালবাসা না হারায়। পশুপক্ষী তরু-লতাতেও যেন মানব-মনের ভালবাসা মাখান থাকে, তাতেও মনের কত শান্তি!

চিত্রলেখা বলিলেন,—বেশ কথা! কিন্তু ভালবাসার পাত্র ম'রে গেলে উপায় কি?

সুধাংশু।—দেহ গেলেও ভালবাসা যায় না। ভগবতী যোগমায়ার প্রিয়তমা প্রথমা কন্যাই ভালবাসা। ঐ কন্যাই মাতৃসন্নিধানে নিয়ে যাবার জন্য, মায়ের দুষ্ট শিষ্ট সকল সন্তানকেই, নিত্য ও অনিত্য ভাবে প্রলোভিত করছেন। ভয় কি? আর ভয় নাই, মৃত্যুময় ধরাতলে "ভালবাসা" আছে।

ভালবাসা সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীরেও বিরাজ করে। জীব ত মরে না, সূক্ষ্মদেহে থাকে, তবে ভালবাসা কেন মরবে? মরা দূরে থাক, সে যে মৃত-সঞ্জীবনী।

ভালবাসার লক্ষণই "সেবা।" কেবল সেবাতেই ভালবাসা প্রকাশ পায়, সেবাতেই ভালবাসার পূর্ণতৃপ্তি ও সম্পূর্ণ সার্থকতা।

পূজা ছেড়ে সেবা—করতে পারে কেবা?

অন্যের কথা দূরে থাক, ভগবানও কেবল এই সেবাতেই বশীভূত হন। সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে "পর-সেবাই" শ্রেষ্ঠ। এই "প্রেমের সেবাই" অসাধারণ ভালবাসার নিদর্শন, ও বিশ্ব-প্রেমের উজ্জ্বল লক্ষণ!

বাহ্যজগতে যেমন ত্রিতাপ-হারিণী গঙ্গা, অন্তর্জগতে তেমনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হতে প্রবাহিত এই কলুষ-নাশিনী "ভালবাসা"! ত্রিতাপ-দগ্ধ ক্ষুদ্র জড়-দেহের জড়ত্ব চূর্ণ চূর্ণ করবার জন্যই এই ভালবাসার সৃষ্টি। এতেই বিধাতার শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে!

জড়-জগতের ভালবাসাতেই আগে ভালবাসার সূত্র হয়। পরে অন্তর্জগতে ভালবাসা রাজত্ব আরম্ভ করে। শেষে সুপক্ক হয়ে এই ভালবাসা, নদী যেমন সাগরে পড়ে, তেমনি প্রেমস্বরূপ ভগবানে গিয়ে ছুটে পড়ে। যদি তেমন ভালবাসা থাকে, ভালবাসা যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আর মোক্ষ-মুক্তি কে চায়? ভালবাসার পূর্ণতাই ভগবান স্বয়ং। ভালবাসা সকল জিনিষকেই মনোহর করে তুল্‌তে পারে, এইটি তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা। মানুষের কুৎসিৎ স্ত্রী-পুত্রকেও ভালবাসা "নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের সমান" ক'রে দেয়। অজ্ঞান-অন্ধের নিকটেই ভালবাসা অস্থায়ী ব'লে বোধ হয়। বাস্তবিক ভালবাসা চিরস্থায়ী। ঈশ্বরই চৈতন্যময় ভালবাসা! পরমেশ্বরের যে সৃষ্টি, সে তাঁর ভালবাসার খেলা বই আর কিছুই নয়। সেই ভালবাসাই এই মানুষের মধ্যে "ঢালা-ফেলা" "ছড়াছড়ি" হচ্ছে!

এই ত অমৃতের ছড়াছড়ি! দেশকাল পাত্র দোষে অসুরেরা এই অমৃতের অপব্যবহার করে মাত্র। তাতে অমৃতের কি?

অমৃত কি নষ্ট হয়? দেহ নষ্ট হ'লেও প্রকৃত ভালবাসা সূক্ষ্ম দেহে বর্ত্তমান থাকে।

প্রাণের গভীর কূপে,　　লুক্কায়িত চুপে চুপে,
সঞ্জীবনী-সুধারূপে কে গো তুমি বল না?
সংসার-মুকুট-মণি　　প্রেমেভরা মুখ খানি
ভুবন-মোহিনী ধনি　সুরলোক-ললনা?
"ভালবাসা" মোর নাম,　　বৈজয়ন্ত-পুরে ধাম,
জীবের জীবনারাম,　স্বরগের নমুনা,
ধরাতলে নিপতিত,　　জীব-প্রাণে প্রবাহিত
বিষ্ণুপাদপদ্ম হ'তে　বিগলিত করুণা!
অণুতে অণুতে মিলে　প্রাণে প্রাণে সুখ ভোগ,
মানব সাধিবে এই　বিশ্বময় প্রেমযোগ।
জড়-দেহ মিলনেতে　পুনঃ পুনঃ ক্ষয় দুখ,
জ্ঞানময় প্রাণময়　মিলনে অক্ষয় সুখ!

তখন যুবতীগণ ও সুমধ্যমা সুন্দরী সকল সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ভাই সুধাংশু, ভাই শুধাংশু, তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! এই অমৃত পান কর, আর দান কর। ধন্য ভগবানের প্রেম! ধন্য তাঁর প্রেমিক ভক্তগণ! আমরাও শুনে ধন্য হল্যাম! তখন সমস্বরে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বয়ম্ অজরামরাঃ"। আনন্দ-কোলাহলে বাসর ভঙ্গ হইল।

একত্রিংশ কথা।

আনন্দ-সম্মিলন।

বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে মন্ত্রীবর ভীমপাল আসিয়া রাজাকে বলিলেন—হুজুর, ঝিনিয়া যাবার সকল বন্দোবস্তই ঠিক হয়েছে, কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত, উলসী শুন্‌চি বৃন্দাবনে চলে গিয়েছে।

রাজা।—হাঁ, হাঁ, সে আমাকে ব'লেই গিয়েছে। সে এক মাস পরেই আসবে। একশত টাকা তার খরচের জন্য আমি দিলাম, দীনদুঃখীদের হাতে দেওয়ার জন্য শেষে আরও কিছু দিয়েছি। আহা, শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করে আসুক, আমার ভাগ্যে হবে কি না, জানি না!

মন্ত্রী।—হুজুর, দেবীদাসকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; সেও বৃন্দাবন গিয়েছে, শুনতে পাচ্ছি।

রাজা।—সে বৃন্দাবন যাবে কেন? তাকে পুরস্কার দিতে হবে, সেইত সব করেছে শুনেছি। সে ত খুব ভাল লোক।

মন্ত্রী।—হুজুর, গিরিধারীর নিকট আর ব্রহ্মদেব পাঁড়ের নিকট জানতে পেলাম, দেবীদাস বাঙ্গলায় আর যাবে না, এ কথা সে তাদের নিকট প্রকাশ করেছে। আবার উলসী, শুন্‌তে পাচ্চি, ঝিনিয়া থেকেই অধিক রাত্রে দেবীদাসের কাছে যাতায়াত করত, দেবীদাসকে এক দিন না দেখলে সে থাক্‌তে পারত না; দেবীদাসের কাছে সে গান শিখত। এ কথা আমি পূর্ব্বে জানতে পেলে বেটাকে দূর করে দিতাম। বৃন্দাবন যাওয়া মিথ্যা, ঐ

বেটা উলসীকে নিয়ে গিয়েছে! হুজুর, উলসী কোথায় মজা খুঁজতে গিয়েছে, আপনি তার কিছুই বুঝতে পারেন নাই।

রাজা।—না না, উল্লাসিনী ত সেরূপ নয়! তুমি ওরূপ কথা দ্বিতীয়বার আমার নিকট ব'ল না, আমি তাকে কন্যার ন্যায় দেখি। তোমা চেয়ে তার ধর্ম্ম-ভয় অধিক আছে! সে আমাকে কত ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে কত সময় রক্ষা করেছে। আমাকে ধর্ম্ম পথে রাখার জন্য সে কত চেষ্টা করেছে, কত তাড়না করেছে! আমি আগে তার কথায় কর্ণপাত করতাম না সত্য, এখন দেখছি, তোমা অপেক্ষা তার উপদেশ আমার অধিক মঙ্গলকর। আমি শুনেছি পঞ্চসহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতে সন্ধি হয়েছে, আরও এক সহস্র তুমি নিয়েছ!

ভীমপাল। হুজুর এ কথা কে বল্যে, কে বল্যে? কখনই না, কখনই না!

রাজা।—দেবীদাস আমাকে বলেছে।

ভীমপাল।—হুজুর, সে বেটার কথা আপনি শোনেন কেন? সে বেটা ত পালিয়েছে। একটা মিথ্যা ব'লে দিয়েছে!

রাজা।—যাক, সে কথায় এখন কাজ নাই। এখানে আমার মন স্থির হচ্চে না, অসুস্থতাও বৃদ্ধি পাচ্চে। শীঘ্র বাটী যাওয়ার উদ্যোগ কর। ভীমপাল "যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজার মুখে কঠিন বাক্য শুনিয়া তিনি অদ্য হইতেই নিজ পন্থা দেখিতে লাগিলেন।

এক্ষণে রাজা ৺বিশ্বনাথের পূজা দিতে যাইবেন প্রকাশ করিলেন, তৎক্ষণেই সমস্ত আয়োজন হইল। তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে বিশ্বনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন,

বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া যথারীতি পূজা সমাপন করতঃ ভীমপালের প্রদত্ত সন্ধির সমস্ত অর্থ কাশীবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারে ভারে নূতন বস্ত্র ও মিষ্টান্ন আনিয়া রাজা নিজ হস্তে দীনদুঃখীকে বিতরণ করিতে লাগিলেন ও বিশ্বনাথের ভবনে "অন্নক্ষেত্র" করিতে আদেশ করিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে কাঙ্গাল, অন্ধ খঞ্জ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র কাশীবাসী জনগণ দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া "জয় জয় বিশ্বনাথ! জয় জয় মহারাজ বীরসিংহ!" উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে কাশীধাম আন্দোলিত করিয়া তুলিল! রাজা কাশীধামে একটী বীরেশ্বর-শিবের মন্দির ও অন্নপূর্ণার ভবন প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশ্বেশ্বরের মোহন্ত-মহারাজের উপরে ভারার্পণ করিয়া, ও সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া দিয়া বাসা বাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিমলা দেবীও ভীমপাল-প্রদত্ত মুদ্রা বিশ্বনাথ-মন্দিরে অর্পণ করিয়া আসিলেন। রাজা সেই দিনই বিমলা দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদল-বলে ঝিনিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্ব দিন রজনীযোগে দেবীদাস ও উল্লাসিনী উভয়ে ভূপেন্দ্র-নারায়ণের নিকটে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে। দেবীদাস তাঁহার দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, উল্লাসিনী সেবিকার কার্য্য প্রার্থনা করিয়াছে। কুমার উল্লাসিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াই দেখিলেন সে যুবতী, অমনি মৃত্তিকাতে দৃষ্টিস্থির করিয়া বলিলেন,—মা, তুমি এখানে এখন থাক, আমি তোমাকে প্রণবাশ্রমে নিয়ে যাব। যদি দেবীর অনুমতি হয়, তবে তুমি সেইখানে থাকতে পারবে।

ভূপেন্দ্রের ইচ্ছা, দেবীর অনুমতি লইয়া উল্লাসকে কুমারীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিবেন।

উল্লাসিনী।—বাবা, আমি আপনার কন্যা, আমাকে আশ্রমে নিয়ে যাবেন। দেবী আমাকে জানেন।

ভূপেন্দ্র।—মা, দেবী তোমাকে জানেন কি রূপে?

উল্লাসিনী।—বাবা, আমি পূর্ব্বে একদিন দেবীর চরণদর্শন করতে গিয়েছিলাম।

ভূপেন্দ্র।—মা, তবে ত ভালই হবে।

কুমার, উভয়ের ধর্ম্মভীরুতা, বিনয় ও শিষ্টাচার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের যথেষ্ট আদর করিলেন। তাহারা দেবী-চরণ দর্শন-বাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, সন্ধ্যার পরে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেই দেবী-দর্শন হইবে, তজ্জন্য চিন্তা নাই।

এ দিকে প্রাতঃকালে প্রণবাশ্রমে একে একে সকলে একত্র হইতেছেন। সুধাংশু বহির্ব্বাটীতে গিয়া দেখিলেন, ভূপেন্দ্র-নারায়ণ আসিয়া সুরেশচন্দ্রের কর ধারণ পূর্ব্বক প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতেছেন। সুধাংশু আসা মাত্রই ভূপেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—ভাই, কেমন ছিলে, বল? দেবীর কি ইচ্ছা, দেখ।

সুরেশচন্দ্র গিয়া সুধাংশুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—ভাই সুধাংশু, ভাই সুধাংশু, আমরা আবার একত্র হল্যাম, আজ কি আনন্দের দিন!

শুধাংশু বলিলেন—ভাই, তোমাদের আসাতেই আমার সকল আশা পূর্ণ হল, আমি তোমাদের কাছে চিরদিনই

বিক্রীত। দেবীর কৃপায় আজ সমস্তই সুসম্পন্ন হল। স্বামীজী কোথায় ?

ভূপেন্দ্র বলিলেন, স্বামীজী এখন ধ্যানে আছেন। শীঘ্রই আসবেন। এই সময়ে অমেরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—"বয়ম্ অজরামরাঃ।" সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"বয়মজরামরাঃ !" সুধাংশু অগ্রসর হইলেন এবং ভূপেন্দ্র ও সুরেশের সহিত অমরেন্দ্রের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা অমরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন, ভাই, দেবীর কৃপায় আজ তোমাকে পেলাম, তুমি আমাদের বলস্বরূপ, এত নিকটতম হয়ে আছ, এত দিন জান্‌তে পাই নাই।

তখন স্বামী শারদানন্দ আসিতেছেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন, 'বয়ম্ অজরামরাঃ।' স্বামীজী হস্তউত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'বয়ম্ অজরামরাঃ !' পরে বলিলেন, সুধাংশু, কেমন আছ ?

সুধাংশু।—আপনাদের ভালবাসা পেয়ে আপনাদের অন্তরেই পরমানন্দে আছি।

স্বামীজী সুধাংশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন ; পরে অমরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, অমরেন্দ্র, তোমার ভরসাতেই ছিলাম তোমার কার্য্য তুমি সাধন ক'রে দেবীর আনন্দ বর্দ্ধন করলে, এর অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে ?

অমরেন্দ্র।—দেব, অপনারাই সকলের মূল। আপনারা না এলে উপায় কি হত ?

স্বামীজী।—কেন, দেবী ছিলেন, তিনিই সূর্য্য, আর সব

রশ্মি। যেখানে সূর্য্য সেখানেই রশ্মি! সুধাংশুর উপরে এখন গুরুভার পড়েছে।

শুধাংশু।—দেব, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

স্বামী।—তোমাতে বিশ্ব-প্রেম বিকাশিত হোক।

"শুধু ভালবাসা নয়—বিশ্ব-প্রেম অভিনয়!"

তোমাকে বিশ্ব-প্রেম অভিনয় করতে হবে। পর-সেবাতেই বিশ্বপ্রেম বিকাশিত হয়। আমাদের সকলেরই এই ব্রত।

তখন সকলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং সহাস্য মুখে দেবী-দর্শনে গমন করিলেন। তাঁহারা দেবীর কক্ষে গিয়া উপবেশন করিলেন। দেবী তখনও সম্মুখস্থ গুহাতে সমাধিস্থ আছেন। সকলে গবাক্ষপথে গঙ্গাবক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে দেবী গুহা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ কক্ষে আসিয়া সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন। সকলেই দেবীকে প্রণাম করিলেন। চারিদিকে "বয়মজরামরাঃ" ধ্বনি উত্থিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইল।

দেবী, কমলদল নিন্দিত কর-পল্লব উত্তোলন করিয়া সহাস্য মুখে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে ভূপেন্দ্র, সুরেশ ও সুধাংশুকে দক্ষিণ ভাগে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, শারদানন্দ অমরেন্দ্র প্রভৃতিকে বামভাগে বসিতে বলিলেন। আর আর সাধু পুরুষগণ সম্মুখে বসিলেন, সাধ্বীগণ পশ্চাতে রহিলেন।

দেবী বলিলেন, সুধাংশু, তোমরা দুজনে পরিণয় পাশে বদ্ধ হ'লে, এ বন্ধন অমৃতের বন্ধন! আশীর্ব্বাদ করি, এই "বন্ধনে" তোমাদের "ভববন্ধন" মুক্ত হোক। অনিত্যে আসক্তিই কাম, সেইটী বন্ধন। নিত্যে আসক্তিই প্রেম, সেইটী মুক্তি।

পত্নীকে ভালবাসতে গিয়ে অনেকে সমস্ত সংসারকে বিস্মৃত হয়, এত বড় যোগ আর নাই। যেখানে ভালবাসার যোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেখানে যদি "আত্মায়" দৃষ্টি পড়ে, তবে সেখানেই যোগ সাধনের সুযোগ ও সুবিধা অধিক হয়। তাই দাম্পত্য যোগ সাধনেই অমরত্ব লাভের সুযোগ অধিক। আত্ম-দর্শন যদি স্পষ্ট হয়, তবে স্বামী স্ত্রীতে অতি সহজেই দেখতে পায় যে, দুটী নিরাকার "আমি" পরস্পর দর্শন মাত্রে, পরস্পরে মিশে, এক হওয়ার জন্য, কেমন প্রাণপণে চেষ্টা করছে! দুটীই এক বস্তু, কেবল আনন্দ-লীলা বর্দ্ধনের জন্য, এক হয়েও দুটীর ন্যায় খেলা করছে। প্রাণ-বস্তুকে দেখা চাই, তা'হলেই সব সার্থক ও মধুময় হল। এই আত্মদর্শনের ভালবাসাই অমৃত। সুধাংশু, এই ত অমৃতের পথ। আশীর্ব্বাদ করি—পশু পক্ষী, তরু-লতা, তৃণ-গুল্ম পর্য্যন্ত তোমার বিশ্বময় "ভালবাসা" বিস্তৃত হোক। পরা প্রকৃতির চির অম্লান "স্থির-যৌবনের" মধ্যে, তোমরা দুটীতে চিরদিন সমাধিস্থ হয়ে থাক। একেই বলে "ভোগমোক্ষ-শোভা' জীবন্মুক্ত অবস্থা। এই অবস্থাই ভোগ কর। এই অমৃতের অবস্থায় তোমাদের আমিত্ব ডুবে যাক। ওঁ শ্রীঃ! ওঁ স্বাহা।

এই বলিয়া দেবী সমাধিস্থ হইলেন। তখন সমস্ত সাধুগণ কৃতাঞ্জলি পুটে নিমীলিত নেত্রে, স্পষ্ট ও মধুর স্বরে স্তব পাঠ করিলেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কার স্বরাত্মিকা,
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥

ত্বং শ্রী স্তমীশ্বরী ত্বং হ্রী ত্বং বুদ্ধি র্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্তং শান্তি ক্ষান্তিরেবচ ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তুঃ সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥
সর্ব্ব রূপময়ী দেবী সর্ব্ব দেবীময়ং জগৎ।
অতো'হং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নম স্তস্যৈ নম স্তস্যৈ, নম স্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

পরে সকলেই নিস্পন্দ নীরব হইলেন। বহুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গে তাঁহারা একে একে নিঃশব্দে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ কথা।

অপূর্ব্ব মিলন।

অপরাহ্নে অমরেন্দ্রনাথ এক খানি টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। বিমলা দেবী টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন। এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম লেখা আছে—

"বৎসে, আমি বাড়ীতে পৌঁছিয়াছি। তুমি যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, উভয়ে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ ভোগ কর। ব্রহ্মচারিণী আর নাই। সে তোমা-হারা হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে; আমি পারি নাই, তোমার মুখ খানি আবার দেখিবার আশায় আমি এখনও বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।"

অমরেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিয়াই নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল—কি? ব্রহ্মচারিণী আর নাই? বারংবার তিনি এই কথা বলিতেছেন, আর ধীরে ধীরে কুমারীর নিকটে যাইতেছেন। তিনি গিয়া বিহ্বল হইয়া কুমারীকে টেলিগ্রাম খানি পড়িয়া শুনাইলেন। কুমারী সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করতঃ রোদন করিয়া উঠিলেন। "হা ব্রহ্মচারিণী-দিদি! তুমি কোথায় গেলে? এই বলিয়া কুমারী ধূলায় পতিত হইয়া অশ্রুনীরে ভাসিতে লাগিলেন। সুধাংশু সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ছুটিয়া আসিলেন ও সমস্ত কথা শুনিলেন। তখন তাঁহারা তিনজনে রোদন করিতে করিতে দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। কুমারী শোক-বেগ ধারণ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, দেবী বলিলেন, বৎসে স্থির হও, স্থিরতার গুণে প্রস্তরও জগতে পূজিত। ব্রহ্মচারিণী আর কেহ নয়, সে আমারই দক্ষিণ হস্তের প্রতিবিম্ব, কায়া ধারণ ক'রে প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেই রক্ষা করেছে। তার জন্য চিন্তা নাই। ঐ ব্রহ্মচারিণী আমার সম্মুখে আসচে, দেখতে পাচ্চ না?

কুমারী বলিলেন—কই মা? দেখতে ত পাচ্চি না।

দেবী বলিলেন—আচ্ছা, দেখাব।

কুমারী সজল নয়নে বলিলেন—মা, আমার মায়ের সংবাদ পেয়ে আমার প্রাণ মায়ের জন্য অস্থির হচ্ছে। আমি আর চিত্ত-সংযম করতে পারচি না। মা, আমাকে রক্ষা কর—বলিয়া কুমারী মুদিত নয়নে দেবী-ক্রোড়ে পতিত হইলেন।

দেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রবোধ ও সান্ত্বনা দানে বলিলেন—বৎসে, কিছুই যাবে না, সবই আবার পাবে। দুঃখের কোন কারণই নাই।

ভূপেন্দ্র স্বরেশ স্বামীজী প্রভৃতি সাধুগণ ও সাধ্বী সকল অমরেন্দ্রের নিকটে ব্রহ্মচারিণীর জীবন বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে সকলেই দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "দেবীর ইচ্ছা!" এই বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনি উত্থিত হইল, আরতি আরম্ভ হইল। স্বরেশ সুধাংশু প্রভৃতি সকলে সন্ধ্যার পরে জপাদি সমাপন করিয়া পুনরায় একে একে দেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সকলে গিয়া দেবীর কক্ষে উপবিষ্ট হইলেন। ভূপেন্দ্রনারায়ণের আগমনে একটু বিলম্ব হইল। দেবীদাস ও উল্লাসিনী বলিয়াছে অদ্য তাহারা দেবীদর্শনে যাইবে। অদ্য তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া কুমার দ্বারবানকে আলোক লইয়া সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন।

দেবীদাস পাগড়ী বান্ধিয়া লাঠিখানি লইয়া আলোক-হস্তে অগ্রে চলিল। উল্লাসিনী কুমারের পশ্চাতে চলিল। দেবীর কক্ষদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলে কুমার উল্লাসিনীকে স্ত্রীলোকদিগের দিকে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবং দেবীদাসকে দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া দেবীদর্শন করিতে ও তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কুমার দেবীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া, উল্লাসিনী যথাস্থানে গিয়া দেবীকে প্রণাম

করিয়া উপবিষ্ট হইল। দ্বারবান দেবীদাস কক্ষদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া একদৃষ্টে দেবীদর্শন করিতে লাগিল।

কুমার দেবীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলেই বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন। ব্রহ্মচারিণীর পরিচয় ও পরিণাম জানিয়া, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন—মা, এমন যে ব্রহ্মচারিণী, যে তোমার প্রতিবিম্ব, তার কেন এরূপ পরিণাম হল ?

দেবী।—বৎস, সে আমার ছায়া, কর্ম্মসাধন জন্য এসে কুমারীকে রক্ষা করেছে! এখনও সেই প্রতিবিম্ব সমক্ষে ও অলক্ষ্যে ভ্রমণ করচে। তার জন্য দুঃখ কি ?

সুধাংশু।—মা, আমরা কেন দেখতে পাই না ?

দেবী।—পাবে।

দেবীর মধুর বাক্য শুনিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া ভূপেন্দ্র-নারায়ণের দ্বারবান দূর হইতে উঁকি দিতেছে, আর ভক্তির উচ্ছ্বাসে নয়ন-জলে ভাসিতেছে। সে অপনা-আপনি মৃদু মৃদু বলিতেছে—"আহা, আহা, মহাদেবী! যোগেশ্বরী! মা আমাকে কি কৃপা করবেন? আহা, এমন জ্যোতির্ম্ময় রূপ ত কখনও দেখি নাই! ধন্য ভূপেন্দ্রনারায়ণ! ধন্য সুধাংশু! আমিও আজ ধন্য হ'ল্যাম! এ কি জ্যোতিঃ! এ কি জ্যোতিঃ! এ যে ব্রহ্মাণ্ডময় জ্যোতিঃ!" এই বলিতে বলিতে দ্বারবানটী বিহ্বল হইয়া এক-পা দুপা করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আরে বাহির যাও, বাহির যাও।

দেবীর দুইটী কমল-নেত্র নিমীলিত হইয়াছে, ধীরে ধীরে দুই বাহু তুলিয়া তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন কাহাকে ডাকিতেছেন, ও মৃদুমৃদু স্বরে বলিতেছেন—

আয় আয়! আয় আয়! আমার প্রাণের মধ্যে আয়!

সহসা দ্বারবান বিদ্যুৎ গতিতে গিয়া দেবীর ক্রোড়ে ছুটিয়া পড়িল। দেবী দ্বারবানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিলেন—

ভূপেন্দ্র, এ লোকটি কে?

ভূপেন্দ্র।—মা, ওটি আমার দ্বারবান, ও বড় ভক্তিমান্ তাই আপনাকে দর্শন করে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে!

দেবীদাসের এই অবস্থা দেখিয়া উল্লাসিনী ছুটিয়া গিয়া ব্যস্ত হইয়া "আহা, আহা!" বলিতে বলিতে ব্যজন করিতে লাগিল। নয়ন-জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

অমরেন্দ্রনাথ উল্লাসিনীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ কে? দ্বারবানকে বাতাস দিচ্চেন, ইনি কে?

ভূপেন্দ্র।—ও আমার সঙ্গে এসেছে।

অমরেন্দ্র।—এ যে সেই সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বোধ হচ্চে! সেই অবয়ব, সেই ভাব ভঙ্গি, সেই কণ্ঠস্বর, সেই চক্ষু, দেখেই চিনতে পেরেছি। ইনিইত সে দিন সন্ধ্যার পরে "দর্শন" করতে এসেছিলেন। ইনিই সেই সন্ন্যাসিনী! তুমি এঁকে কোথায় পেলে?—কুমার সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন দেবী বলিতে লাগিলেন, হাঁ, এই সেই সন্ন্যাসিনী! এর কর্ম্মভোগের অবসান হয়েছে, তাই আমি একে আমার কাছে আসতে আদেশ করেছিলাম, নিয়তি আজ একে এনে উপস্থিত করেছে। পূর্ব্বজন্মে এ অসৎ স্বভাবা ছিল। শেষ জীবনে

এতদুর দেহ ক্লেশ, মনঃক্লেশ, ও অন্নক্লেশ পেয়েছিল যে, একবারে হতাশ হয়ে কেবল ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করেছিল। এ জন্মে সেই পূর্ব্ব পুণ্যফলে মাসীকে পেয়েছিল। ওর মাসী ওকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম উপদেশ দিত; সে জপ করত, ও বসে বসে দেখত।

তার পরে যেই "সাধুসঙ্গ"পেয়েছে, অমনি ওর পূর্ব্বকৃত পাপ রাশি অগ্নিযুক্ত তৃণ রাশির ন্যায় দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই সাধু-সঙ্গই ওকে এখানে এনে ফেলেছে, "সাধুসঙ্গের" অপূর্ব্ব মহিমাই এইরূপ! এই সন্ন্যাসিনী আমার বাম হস্তের ছায়া!

ভূপেন্দ্র ও সকলে শুনিয়া বিস্ময় মগ্ন হইয়া রহিলেন্।

ভূপেন্দ্র।—মা, দ্বারবানটি এখনও কি চেতন হয় নাই?

দেবী বলিলেন, দেখ। ভূপেন্দ্র দ্রুতগতি গিয়া দ্বারবানের পাগড়ি ও বস্ত্র খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, সে একটী স্ত্রীলোক।

অমনি ভূপেন্দ্র পশ্চাৎপদ হইয়া বলিলেন, মা, এ যে স্ত্রীলোক! এ যে স্ত্রীলোক! মা সকল, তোমরা এস, তোমরা এসে সেবা কর। দেবী বলিলেন—কুমারি, এস।

কুমারী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোকের মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন—কুমারি, এ কে? চিনতে পার?

তখন কুমারী একবারে নয়ন-জলে প্লাবিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—মা, আমাদের ব্রহ্মচারিণী, এই যে আমার ব্রহ্মচারিণী-দিদি। শ্রবণ মাত্রে "ব্রহ্মচারিণী! ব্রহ্মচারিণী!" শব্দে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। ভূপেন্দ্র সুরেশ অমরেন্দ্র ও সুধাংশু সকলেই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অমরেন্দ্র সুধাংশু ও উল্লাসিনী দেখিয়া অবাক হইয়া

রহিলেন। পরে অমরেন্দ্র বলিলেন—মা, এইত আমাদের সেই ব্রহ্মচারিণী। দেবী পট্টবস্ত্রে ব্রহ্মচারিণীর অঙ্গ আবরিত করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। কুমারী বাতাস দিতে লাগিলেন।

দেবী বলিলেন—বৎসে ব্রহ্মচারিণি, সমুদ্রে প্রবেশ করলেই নদীর সার্থকতা হল, এই আশ্রমে প্রবেশ ক'রে আজ তোমার সকল কর্ম্ম সার্থক হল। এখন সুস্থ হও, স্থির হও, কর্ম্ম-ভোগের অবসান হয়েছে। বৎসে এখন সকলকে বল—কেন তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলে? কি রূপেই বা এখানে এলে? সকলে শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।

এ দিকে উল্লাসিনীতে আর উল্লাসিনী নাই! সে ভাবিতেছে এ কি হ'ল? দেবীদাস কি স্ত্রীলোক? আমি কি এ সব স্বপ্ন দেখচি? না, এ সব সত্য? আমি কি মানুষ, না, প্রস্তর?

উল্লাসিনী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার অশ্রুধারা শুষ্ক হইয়া গেল, ও নেত্র-তারকা স্থির হইয়া আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ কথা।

পূর্ব্ব কথা ও পরিচয়।

ব্রহ্মচারিণী সুস্থ হইয়া দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করতঃ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

মা সবই ত তুমি জান। সেই রত্নপুরে দেবী-দালানে দেবী পূজার পরে কুমারী যখন অমরেন্দ্র-দাদার সঙ্গে বহির্গত হলেন, তখন আমার মনে হল, বীরসিংহ ঝিনিয়ার নিকটেই আছেন, কুমারীকে সেই মধ্য পথে আটক করবেন, লিখেছেন; দাদা

তার কিছুই জানেন না, সুতরাং ঠিক সেইরূপই ঘট্‌বে। এই মনে করেই আমি ঝিনিয়াতে যাব, স্থির করলাম। তখনই গঙ্গার ধারে এলাম, এসে দেখি নৌকা সব চলে গিয়েছে। তখন মা, তোমার নাম ক'রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলাম। তোমার কৃপায় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি সন্তরণে গঙ্গা পার হ'ল্যাম। বহুদিন পূর্ব্ব-বঙ্গে ছিলাম, তখন বড় বড় নদী সাঁতারে পার হয়েছি, সেই জন্যই সাহস হয়েছিল। তারপরে গাড়ীতে উঠে, পর দিন ঝিনিয়া-বাজারে এলাম। দাদা অমরেন্দ্রনাথের নাম ক'রে কত জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেহ কোন সন্ধান দিতে পারলে না। মনে হল, পথে কোন স্থানে কোন কারণে তাঁদের বিলম্ব হয়েছে। সেজন্য বড় ভাবিত হল্যাম। তাঁরা যে দিনই আসুন, আমাকে এই খানেই থাকতে হবে, এই বিবেচনা ক'রে, আমি মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগড়ি বেঁধে আঙ্গরাখাতে সর্ব্বাঙ্গ ঝেঁপে পুরুষের ন্যায় সজ্জা করলাম। শেষে বৃক্ষতলে ব'সে, মা তোমার নাম গ্রহণ করচি, তখন একটী লোক বল্যে, মহারাজ, পাক করতে পার? দশ রূপেয়া তলব মিলবে। আমি সুযোগ বুঝে সম্মত হ'ল্যাম। ভৃত্য গিরিধারীর সঙ্গে বীরসিংহের মন্ত্রীর নিকট গেলে, তিনি আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করলেন। আমার গুরুদত্ত নাম দেবীদাসী, তাই সেখানে বলে ছিলাম, আমার নাম দেবীদাস পাঁড়ে।

এই সকল কথা বলিয়া, তৎপরে ব্রহ্মচারিণী বিমলা দেবীর কথা, প্রধান সর্দ্দার হওয়ার কথা, আশ্রম অবরোধের কথা, সুধাংশুর বন্ধন মুক্তি ও শারদানন্দকে বন্দী করিবার যুক্তি,

সন্ধির প্রস্তাব ও ভূপেন্দ্র নারায়ণের নিকটে আগমন প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারিণী পরে বলিলেন—আমরা কুমারের সঙ্গে পরমানন্দে মাতৃদর্শনে আসতে পারব, এই ভেবে তাঁর কাছে যাই। আমি স্ত্রীলোক, জানতে পেরে পাছে তিনি কিছু মনে করেন, এই জন্য আগে তাঁর কাছে কিছু প্রকাশ করি নাই। শক্তিও আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে কখনও জানতে পারে নাই। কুমারের সঙ্গে এসে মাকে দর্শন ক'রে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমি দ্বারে বসে বসে দেখচি, যেন দেবী-অঙ্গে জ্যোতিঃ ফুটচে; জ্যোতিঃ যেন গৃহময় হল, শেষে পুরিময় হল, শেষে অনন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ হল! আমি পতঙ্গের ন্যায় অজ্ঞানে অবশে তাতে ঝাঁপ দিলাম। তার পর আর কিছুই আমার স্মরণ নাই। কেবল মনে হচ্চে, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব সুখের অবস্থা হয়েছিল! সেই প্রাণজুড়ান অবস্থা আমি প্রকাশ করতে পারচি না। দেবি, জননি, মা অন্নপূর্ণে, আর আমি তোমার পুরি ছেড়ে যাব না! এই বলিয়া দেবীদাসী দেবীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দেবী ব্রহ্মচারিণীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! শক্তি অর্দ্ধ অচেতন প্রায় বসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল। তখন সে বুঝিল, দেবীদাস পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক, তাঁহার নাম দেবীদাসী, তিনি ব্রহ্মচারিণী। এক্ষণে সে বুঝিতে পারিল, কেন দেবীদাস তাহার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া, তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইতে সাহসী হইয়া ছিলেন, কেনই বা তাঁহার বাক্য ও গীত এত মধুময়, কেনই বা তাঁহার হস্তপদ এত সুকোমল, আর কেনই বা তাঁহার ব্রহ্ম

এত দূর সুমধুর! তখন সে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া মা, মা, বলিয়া ব্রহ্মচারিণীর ক্রোড়ে পতিত হইল! রাজা বীরসিংহ যে একশত টাকা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহা সে আশ্রম-সেবার জন্য দেবী-পাদপদ্মে অর্পণ করিল। দেবী করপদ্ম উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে শক্তিকে বলিলেন—শক্তি, তোমার পরিচয়টা দেও।

ভূপেন্দ্র বলিলেন, মা, আমি যেন এঁকে কোথায় দেখেছি! কিন্তু আমার কাছে আসা অবধি ভেবে স্থির করতে পারচি না, কোথায় এঁকে দেখলাম।

অমরেন্দ্র।—মা, আমি প্রথমে দেখেই বলেছি, ইনি সেই সন্ন্যাসিনী। আমি ঠিক চিনেছিলাম।

ভূপেন্দ্র।—হাঁ, আমারও এখন বোধ হচ্চে, কোন বনস্থলীতে এঁকে দেখেছি। ইনি কি বন-বাসিনী ছিলেন?

শক্তি বলিল—না বাবা, আমি সন্ন্যাসিনীও নয়, বনবাসিনীও নয়। আমি ছিলাম রাজা বীরসিংহের দাসী। তাঁর সেবা কর্‌তাম, আর রান্না-বান্নার যোগাড় দিতাম।

অমরেন্দ্র।—রান্নার কাজ ভালই ছিল, তবে এলে কেন?

শক্তি।—বাবা, তাদের "রান্না চেয়ে বান্না বেশী!" অতদূর মন যোগাতে আর পারি না। মানুষের মন যোগালে আর কি হবে? ভগবানের সেবা করব ব'লেই এসেছি। দিবানিশি রাজার কাছে থাকতাম ব'লে লোকে দোষ মনে করত, কিন্তু তিনি আমাকে কন্যার মতনই দেখতেন। এই পাপিনী তাঁর গুপ্তচরের কার্য্যও করত। কুমার আমাকে বনমধ্যেই দেখেছিলেন সত্য। আমি সেই কাঠকুড়ানী। কমল-সরোবরের

ধার হতে তাঁদের অনুসরণ করি। পরে কুমারীকে লয়ে প্রণবাশ্রমে আসবার সেই গুপ্ত মন্ত্রণা আমি গুপ্তভাবে শুনে গিয়ে বীরসিংহকে বলেছিলাম। পরে স্বামীজীর সাধন-কুটিরে ফলওয়ালী হয়ে গিয়ে সুধাংশুর সঙ্গে তাঁর গুপ্ত পরামর্শ শুনে আসি, তার পরে সে দিন কাশীধামে এসে প্রণবাশ্রমের আকার-প্রকার কেমন, ও কুমারী কোথায় আছেন, তাই দেখবার জন্য আমি সন্ন্যাসিনী হয়ে এসে ছিলাম, কিন্তু দেবীর চরণদর্শন করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

অমরেন্দ্র বলিলেন—মা, তুমি সেই রাজবাটীর এত মমতা, এত প্রলোভন একেবারে ছাড়লে কি ক'রে? সে প্রলোভন ত্যাগ করা ত সামান্য কথা নয়!

শক্তি বলিলেন—বাবা, সে প্রলোভন ছাড়া বড় শক্ত কথা সত্য, আমি আগে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে প্রলোভন ছাড়তে পারি নাই। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলাম "যা থাকে কুল-কপালে, মেরে দেও ইঁট কপালে!" কেবল এই ভেবেই সেই রাজসুখের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে আসতে পেরেছি! সে সুখের মুখে ছাই, অমন দাসীপনাতে কাজ নাই!

পরে দেবীদাসের সহিত কি প্রকারে তাহার মিলন হইল, সমস্ত কথা শক্তি ক্রমে প্রকাশ করিল। সেই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপেন্দ্র, অমরেন্দ্র ও সুধাংশু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শক্তি অমরেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—বাবা, আমাকে চিনতে পার নাই? আমি সেই হতভাগিনী গোয়ালিনী!

অমরেন্দ্র।—কোন্ গোয়ালিনী?

শক্তি।—বাবা, আমি সেই ঝিনিয়া-বাজারের গোয়ালিনী। বীরসিংহ সেখানে ছিলেন, তোমাদের আটক করবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়ে ছিলেন। তোমরা আর দুদণ্ড সেখানে থাকলেই বিপদ হ'ত। আমি তোমাদের চরণ দর্শন করতে আসব বলেছিলাম, ঠিকানাও জেনে নিয়ে ছিলাম। আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল।

অমরেন্দ্র ও কুমারী সকল কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। নীরবে তাঁহাদের অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, ও উভয়ের দীন নয়ন নীরবে অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে বিশ্রামার্থে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ কথা।

তপোবন।

কয়েক দিন ধরিয়া বিবাহের আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন হইল! পরে এক দিন অপরাহ্নে দেবী বলিলেন, সুধাংশু, আমার তপোবনে যাবার সময় হয়েছে, চল যাই, আজ কুমারীকে দেবীদাসীকে শক্তিকে তপোবন দেখিয়ে আনি।

তখন সুধাংশু ও অমরেন্দ্র সকলকে সঙ্গে লইয়া দেবীর সমভিব্যাহারে তপোবন দর্শনে গমন করিলেন।

দেবী কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া উত্তর প্রান্তের সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া বহির্গত হইলেন। উত্তর দ্বারের বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ দূরে একটি সুন্দর উপবন আছে, দেবী সেই উপবনে গিয়া ধ্যান

করেন, এই জন্য সকলে ঐ বনটিকে 'তপোবন' বলে! দেবীর সহিত সকলে সেই বনে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন—তপোবনের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। তন্মধ্যে বিল্ব বকুল, পারিজাত পলাশ, শাল শেগুন, তাল তমাল, আম জাম, নারিকেল গুবাক, অশোক কিংশুক, নানাবিধ বৃক্ষরাজি শ্রেণীবদ্ধ রূপে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মাধবী মালতী ও লবঙ্গ-লতিকার লতা-মণ্ডপ বিরাজিত, তন্মধ্যে পরিপাটী উপবেশন-স্থান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে লৌহজাল নির্ম্মিত সমুচ্চ প্রশস্ত ঘরে টীয়া কাকাতুয়া, চন্দনা ময়না, তুরি ময়ূর পারাবত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পক্ষীকুল ক্রীড়া করিতেছে। সরোবরে নানাবর্ণের হংস বিচরণ করিতেছে; লোহিত পাটল নীল ও শ্বেতবর্ণের কমল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত ও মুদিত হইয়া দৃষ্টি গোচর হইতেছে। কোথাও আবদ্ধ জলে হরিৎ পীত লোহিৎ বর্ণের মৎস্য সকল ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকল স্তূপাকারে সজ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এদিক ওদিক দিয়া কৃত্রিম ক্ষুদ্র তটিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে, তাহার স্থানে স্থানে বান্ধা ঘাট শোভা পাইতেছে। কোনও স্থানে কৃষ্ণসার নীলগাভী ও পর্ব্বতীয় ছাগ বিচরণ করিতেছে।

কোনও স্থানে যাতি যুথি জুঁই, মল্লিকা সেফালিকা টগর, বক বকুল ও কুরুবক কুসুমের কুসুমাগার ও পুষ্প-বীথিকা দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও কেবল বছরা-গোলাপের পরিপাটী বেষ্টনের মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিকা প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে কত যে পুষ্প বিকাশিত হইয়া আছে, তাহার সংখ্যা

নাই। স্থানে স্থানে কুসুমরাশি ভূমিতে পতিত হইয়া আছে, বোধ হইতেছে যেন পুষ্পবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কোথাও শত শত পুষ্প-স্তবক দৃষ্ট হইতেছে, সৌরভে দশ দিক আমোদিত হইয়াছে, মধু-মক্ষিকা উড়িতেছে পড়িতেছে ছুটিতেছে! আকুল-ব্যাকুল হইয়া অলিকুল গুণ্ গুণ স্বরে উড়িয়া আসিতেছে!

দেবী বলিলেন, কুমারি, এই অশোক-বীথিকার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত কর, নিবীড় শাখা পল্লবের মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে, দেখ।

কুমারী তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করতঃ অমরেন্দ্রকে বলিলেন,—দাদা এ দিকে এস, দেখ কি অপূর্ব্ব লেখা! অমরেন্দ্র তথায় গিয়া ঘন পত্র রাজির মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—শাখা প্রশাখা ও পল্লব কর্ত্তিত করিয়া একটি ওঙ্কারের আকৃতি করা হইয়াছে, সুকর্ত্তিত শূন্যস্থানের মধ্য দিয়া সুনীল আকাশ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতেই একটি ওঙ্কার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অমরেন্দ্র সেইটি আবার সুধাংশুকে দেখাইলেন।

দেবী অন্য দিকে গমন করিয়া দেবীদাসী ও শক্তিকে দেখাইলেন— বিজড়িত মাধবী ও মালতী লতার মধ্যদেশে লতাগুচ্ছ বিন্যাস করিয়া যে শূন্যস্থান প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই শূন্যস্থানে নীলাকাশ প্রকাশ পাইয়া রাধাকৃষ্ণের সুন্দর যুগল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

দেবী বলিলেন, সুধাংশু,এ দিকে এস, দেখ এই ঘরে মার্জ্জার মুষিক কেমন খেলা করচে।

সুধাংশুর সহিত সকলেই অগ্রসর হইয়া তথায় দেখিলেন—লৌহ-জালাবৃত একটি কাষ্ঠের ঘরে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর মার্জ্জার রহিয়াছে, কোনটি পাটল, কোনটি দুগ্ধ-ধবল, কোনটি

নানাবর্ণে রঞ্জিত। সেই গৃহমধ্যে আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মুষিক চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। মুষিকগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর, কতক শ্বেতবর্ণ, কতক কৃষ্ণবর্ণ, কতক মিশ্রবর্ণ! দুগ্ধ পানের নিমিত্ত দুগ্ধ-পাত্রের নিকটে মুষিক মার্জ্জারে মহা ঘর্ষণ উপস্থিত হইতেছে! মার্জ্জারগণের পৃষ্ঠদেশে ও শিরদেশের উপরে উপস্থিত হইয়া মুষিকেরা অতি ব্যস্তে দুগ্ধপান করিতেছে।

তৎপরে দেবী সকলকে লইয়া তপোবনের অপর প্রান্তে গমন করিলেন ও বলিলেন—সুধাংশু, সিংহ দেখ!

সকলে অগ্রসর হইয়া একটী প্রাচীর-দ্বার হইতে দেখিতে লাগিলেন,—উচ্চ প্রাচীরাবদ্ধ বিস্তীর্ণ স্থানের মধ্যে একটি ভীষণ-কায় সিংহ ও একটি ভীম-কলেবরা সিংহী শাবক-সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। সেই বহু বিস্তৃত স্থানে নানাবিধ কুরঙ্গ ও কুরঙ্গিণী বিচরণ করিতেছে। একটি কৃষ্ণসার-শাবক ঝম্প দিয়া দিয়া সিংহ-শাবকের অঙ্গে পড়িতেছে, আবার সিংহ-শাবকটি লম্ফ দিয়া দিয়া মৃগ-শাবকের উপরে উঠিতেছে! কুরঙ্গিণী-সঙ্গে সিংহী ছুটাছুটী করিতেছে! মৃগের সঙ্গে মৃগেন্দ্র ক্রীড়া করিতেছে!

সিংহ ও সিংহীর দেবী-দত্ত নাম শিবদাস ও শিবদাসী। দেবী সহসা সেই স্থানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন—শিবদাস, শিবদাসি, এস। দেবীকে দর্শন মাত্রেই শিবদাস ও শিবদাসীর ভালবাসা উছলিয়া উঠিতে লাগিল; সেই যুগল মুর্ত্তি দেবীর পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েই সানন্দে পুচ্ছ আন্দোলন করিতে করিতে

অতি মৃদুভাবে দেবীর চরণ-লেহনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সুদীন নয়ন দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা কত আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে! দেবী তাহাদের গলদেশ আপন স্কন্ধ দেশে ধারণ পূর্ব্বক আদর ও ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাহাদের আহার আনিবার আদেশ করায়, তৎক্ষণে ভৃত্য একটি পাত্রে করিয়া ঘৃতপক্ক ক্ষীরান্ন ও অন্য পাত্রে প্রচুর দুগ্ধ আনিয়া তাহাদের সম্মুখে প্রদান করিল। শিবদাস ও শিবদাসী পরমানন্দে শব্দ করিতে করিতে ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। আহার শেষ হইলে দেবী মোহনভোগ ও মেঠাই লইয়া স্বহস্তে তাহাদের মুখে প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি কুমারীকে বলিলেন, বৎসে এস, তুমি স্বহস্তে এদের মুখে আহার দেও, শিবদাস শিবদাসী তোমাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসবে। এমন সরল প্রাণী জগতে বিরল। কুমারী শুনিয়া চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন!

দেবী তাহাদের মস্তকে বাম হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"শিবদাস শিবদাসি, দেবলোক-বাসী হও।"

কুরঙ্গ ও কুরঙ্গিণী গণের নাম হরিদাস ও হরিদাসী। দেবী 'হরিদাস, হরিদাসী' বলিয়া আহ্বান করিবা মা কুরঙ্গিণী-কুল নানা রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া সিংহের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিয়া আগমন করিল। কেহ দেবীর ক্রোড়ে মস্তক দিয়া দাঁড়াইল, কেহ করপদ্ম লেহন করিতে লাগিল, কেহ বা স্কন্ধদেশে আপন কণ্ঠদেশ সংলগ্ন করিয়া অব্যক্ত ভালবাসা প্রকাশ করিতে লাগিল। হরিদাসেরা ছুটিয়া আসিয়া দেবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, সন্নিকটে প্রবেশ লাভের চেষ্টা

করিতে লাগিল। দেবী সকলের গাত্রে হস্ত দিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"হরিদাস হরিদাসি, আমার ইচ্ছা-শক্তিতে তোমরা দেবলোক প্রাপ্ত হও।" তিনি একটী মৃগ-শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কুমারীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। দেবীর অনুজ্ঞায় ভৃত্য আসিয়া কুরঙ্গকুলকে বৃক্ষলতার হরিৎ পত্র ভক্ষণ করিতে দিল। মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। দেবী কুমারীকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস-হরিদাসী গণের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদ্ম-হস্তাবক্ষেপনে কুরঙ্গ-অঙ্গে কি এক তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল, তাহারা আহারে বিরত হইয়া নয়ন নিমীলিত করতঃ নীরবে দেবীকর-স্পর্শের অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। সকলেই মৃগশাবক-গণের অঙ্গ স্পর্শে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

তাঁহারা সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, হিংস্র পশুগণ হিংসা ভুলতে পারে কিরূপে? সিংহ কুরঙ্গের একত্রে বাস ত সহজ ব্যাপার নয়! দেবী বলিলেন,—আর কিছুই নয়, কেবল "ভালবাসা"।

সত্ত্বগুণ জাগলেই প্রেম বিকাশ হয়, সত্ত্বগুণেই সত্য উদ্ভূত, তাই সত্য ও প্রেম এক স্থানেই অবস্থিত আছে। যে রূপেই হোক, সত্ত্বগুণ জন্মাতে পারলেই হিংসা ভুলান যায়। তামসিক ও রাজসিক আহার সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ ক'রে শুধু সাত্ত্বিক আহার অবলম্বন করলে সত্ত্বগুণ ও সত্য সমুদিত হয়, তাতেই প্রেমের আবির্ভাব হয়। এই সাত্ত্বিক আহারে দুর্জ্জনের মনেও সত্ত্বগুণ আনয়ন করে। এটি অব্যর্থ সন্ধান। তবে যে

যথেচ্ছাচার আহার বিহার সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিতে সাধুত্ব দেখা যায়, সে পূর্ব্ব সুকৃতি ফলেই ঘটে থাকে, সে অতি বিরল। বেদবেদান্তে পণ্ডিত হলেও দুর্জ্জনের দুর্জ্জনতা যায় না; কিন্তু বেদ-বেদান্ত শিক্ষা না দিয়েও যে পরিমাণে সংযম-নিয়ম ও সাত্ত্বিক আহার অভ্যাস করান যাবে, দুর্জ্জনের দুর্জ্জনতা সেই পরিমাণে দূরীভূত হবে। তার সঙ্গে সাধুসঙ্গ ও সাধুর ইচ্ছা-শক্তি থাকলে আর কথাই নাই! এইটি যোগ-বিজ্ঞানের ভিত্তি-মুল। শিবদাস শিবদাসী শৈশব হইতে দ্বাদশ বর্ষ এই ঘৃতাতপ-ব্রত অবলম্বন করেছে, তার সুফল এই দেখ। সাধু সঙ্গে থেকে থেকে এরা যে দেবলোক প্রাপ্ত হবে, সে আর আশ্চর্য্য কি? সুধাংশু বলিলেন—মা, অনেকে বলেন "আহারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে?"

দেবী বলিলেন,—বৎস, এই ত অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ দেখ। সত্ত্বগুণ উৎপাদক দ্রব্য আছে, ক্রিয়া আছে; সেই সকল বৈজ্ঞানিক সুকৌশল অবলম্বনে পশুত্বের স্থানে দেবত্ব আনয়ন করা যায়। সুধাংশু, ঐ দেখ ঘনপত্র বৃক্ষলতার মধ্যে ময়না, চন্দনা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষী সকল পিঞ্জরে বসে আছে, কোন কোন শুকপক্ষী বৃক্ষশাখে বদ্ধ আছে!

সকলে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। দেবী সহসা বলিয়া উঠিলেন,

কালী কল্পতরু, শিব জগৎ গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!
পড় পড় আত্মারাম!

অমনি বৃক্ষরাজি ও লতাপুষ্পের মধ্যস্থল হইতে পিঞ্জরস্থ ও শাখা-উপবিষ্ট বহু পক্ষী সমস্বরে বলিয়া উঠিল—

কালী কল্পতরু, শিব জগৎ গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!
পড় পড় আত্মারাম!

সকলে শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও পুলকিত হইলেন। শক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, এই সব স্বাধীন পাখীকে ধ'রে এনে খাঁচায় বেঁধে রাখা কি ভাল? ওদের স্বাধীনতা হরণ করলে পাপ হয় না? দেবী বলিলেন—বৎসে, সাধারণে যাকে স্বাধীনতা বলে, সেটী শুধু স্বেচ্ছাচারিতা। ঐ স্বেচ্ছাচারিতা কেবল "মৃত্যুর" দিকেই ছুট্‌তে থাকে। "অমৃতে"র দিকে আনবার জন্যই সাধুগণ স্বেচ্ছাচারী জীবকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করেন। এই সকল পক্ষীকে প্রাতে ও নিশীথ কালে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, চল, দেখবে। সকলে তপোবনের এক প্রান্তে এক বিল্বমূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ বিল্বমূলে শুষ্ক লতা পাতার এক খানি কুটীর আছে। দেবী ডাকিলেন, সচ্চিদানন্দ? পাতার কুটীর-মধ্য হইতে একটী ক্ষীণ-কলেবর সাধু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার দেহ খানি প্রায় পঞ্জর সার। তিনি মৃদুভাষী, ধীরে ধীরে দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মা, আদেশ করুন।

দেবী সকলকে বলিলেন,—ইনি এই তপোবনে তপস্যায় নিরত আছেন, নিয়মাবদ্ধ সংযমী। ইনিই পশুপক্ষী দিগকে সুনিয়মে প্রভাতে সন্ধ্যায় ও নিশীথ কালে ভগবানের নাম শিক্ষা দেন। শক্তি বলিলেন—মা, পশুরা সাধু দর্শন করলে, আর পাখী সব ভগবানের নাম শিক্ষা করলে, তাতে কি তাদের কোনও ফল আছে? দেবী বলিলেন,—বৎসে, সত্যবস্তু সেই ভগবানের নাম যে রূপেই কর, কখনও ব্যর্থ হয় না, "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা"। হেলায় বা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেই মঙ্গল লাভ হয়। সে যে মহা সত্য! দ্রব্য-গুণের ন্যায় শক্তি প্রকাশ করে। বলিতে বলিতে দেবী আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ কথা।

নির্জ্জন শয্যা।

সমাগত সাধুবৃন্দ ও সাধ্বীগণ আপন আপন আবাসে গমন করিলেন। ব্রহ্মচারিণীকে পাইয়া কুমারী সুধাংশু ও অমরেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। অদ্য সন্ধ্যার পরে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, সুধাংশু তোমরা দুজনে আজ নির্জ্জন গৃহে একত্রে বাস কর, আমি দেখে নয়ন-মন সার্থক করি! এই বলিয়া ব্রহ্মচারিণী নব দম্পতীর নির্জ্জন শয়নাগারের সজ্জা ও শয্যা রচনা করিতে শক্তিকে আদেশ করিলেন।

মাতৃ উপদেশে শক্তি পালঙ্কের উপরে দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যা বিস্তার করিল, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পমাল্য, বহুবিধ সুগন্ধী বারি ও স্বর্ণ পাত্রে সুগন্ধী তাম্বুল প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিয়া স্থানে স্থানে স্বচ্ছ মুকুর স্থাপন করিল। রাত্রিকালে আহারের পরে ব্রহ্মচারিণী তাহার প্রিয়তমা কন্যার সহিত একত্র হইয়া নব-দম্পতীকে সেই নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন। শয়নের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, ও কুমারীকে সমস্ত উপদেশ দিয়া, ব্রহ্ম-চারিণী শক্তিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎ কাল বিলম্বে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ও সেই গৃহ দ্বারের বহির্ভাগেই কন্যার সহিত নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে উপবিষ্টা রহিলেন।

সেই সুসজ্জিত নির্জন গৃহে নবদম্পতি পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছেন, ক্রমে দুইজনের মধ্যে একটু কথা আরম্ভ হইল।

সুধাংশু বলিলেন—প্রিয়তমে, লজ্জার কি কারণ আছে?

বাহ্য সংসারেই লজ্জা ; যেখানে প্রাণসম্বন্ধ প্রকাশ পায়, সেখানে লজ্জা ভয় স্থান পায় না।

তখন মধুরাক্ষি কুমারী অলিগুঞ্জন স্বরে বলিলেন—আর্য্যপুত্র, সংসারে জড়িত হয়ে পাছে মায়ার অন্ধকূপে পতিত হই, এখন এই ভয় হচ্ছে।

সুধাংশু।—প্রিয়ম্বদে, সংসারাশ্রমে সততই পতনের আশঙ্কা আছে। কিন্তু দেবীর কৃপায় তোমার আমার সে আশঙ্কা নাই।

যে জন প্রাণতত্ত্ব না জানে, যে আত্মার অমরত্ব "অশেষ ও বিশেষরূপে" না জানে, সে কেন সংসারের ভীষণ স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে? সংসার আশ্রম উৎকৃষ্ট আশ্রম, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি যে "সংসার" "উপভোগ করে, তাকে "সংসারাশ্রম" বলে না, সে মরণের আশ্রম মাত্র। গৃহস্থ-সাধুর আশ্রমকেই "সংসারাশ্রম" বলে। সংযম-নিয়ম পালন, ও দেব দ্বিজ অতিথি সেবার আশ্রমই সংসারাশ্রম।

সাঁতার না জেনে জলে ঝাঁপ দেওয়া, আর "গার্হস্থ্যব্রহ্মচর্য্য" না জেনে সংসারী হওয়া, এই দুটীই আত্ম হত্যার পথ। যথেচ্ছাচারী লোকের এই সংসার উপভোগ, আর তৃণপূর্ণ গৃহে অগ্নিক্রীড়া, সর্ব্বনাশের জন্যই হয়ে থাকে। কমিনী কাঞ্চন দুটি কাল সর্প, তাদের নিয়ে খেলা করতে কে পারে? যে ব্যক্তি সাপের ওস্তাদ, সেই পারে।

তিনটী শিকড় আছে—সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা ও শাস্ত্র পাঠ।

"সাধুগুরু যেথানে,মানুষ মরে না সেথানে।" এইটি ব্রহ্মবাক্য।

শোভনে, দেবীর ইচ্ছায় আমরা সাপুড়ের জা'ত, ঐ কাল-সর্পের বিষ-দন্ত উৎপাটন ক'রে, মুখ ভোঁতা করে দিয়ে, তবে

তাকে নিয়ে খেলা করি। "সাধু গুরু শাস্ত্র—মৃত্যুঞ্জয়ের ব্রহ্মাস্ত্র।" গুরু হীন গৃহী, আর পিতৃহীন বালক দেখলে চক্ষে জল আসে! গুরু-হীন সংসার, আর কর্ণধার-হীন নৌকা নিশ্চয়ই ডুবে যায়। শুভে, এইজন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আট ঘণ্টা অন্ন বস্ত্রের চেষ্টায় দেও, আট ঘণ্টা নিদ্রা যাও, আরাম কর, আর আট ঘণ্টা সাধু গুরু শাস্ত্র সেবায় অর্পণ কর; তবেই দেখবে, ঐ দুই সর্পের বিষদন্ত উৎপাটিত হয়েছে। রাজপুত-জাতি বালকের হাতে তরবারি দেয়, ইংরাজ জাতি বালকের হাতে বন্দুক দেয়। তারা ওস্তাদের কাছে তরবারি বন্দুক চালান শেখে, আঁতঘাত বুঝে নেয়, তাই সে সব ত্যাগ করতে হয় না, ত্যাগ করতে কেহ বলেও না, বরং উৎসাহ দেয়। কামিনী-কাঞ্চনও ত্যাগ করতে হয় না। সকল কার্য্যেরই ইষ্ট ও অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, অনিষ্ট ভাগ ত্যাগকেই যথার্থ ত্যাগ বলে। ইষ্টভাগ ত্যাগ করার উপদেশ কোথাও নাই। প্রিয়তমে, সাধু-গৃহস্থের হৃদয় যেন অমৃত-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল! সেই শতদলে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভ্রমর হয়ে বসে আছেন। তবে আর সাধু-গৃহস্থের গৃহে পতনের সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, ব্রহ্মচারিণী তোমার জন্য কি না করেছেন? এই শক্তি তিনি কোথা হতে পেলেন?

পিকনাদিনী কুমারী মৃদুস্বরে বলিলেন—দেবীর কৃপায়! সুধাংশু তখন দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা কুমারীর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, প্রাণপ্রিয়ে, দেবীর কৃপাই আমাদের সর্ব্বস্ব। এই "প্রাণতত্ত্ব" যদি তুমি বেশ বুঝতে পার, আর ধরতে পার, তবেই আমাদের এই পরিণয় সার্থক হবে। এই "প্রাণতত্ত্বই" যথার্থ প্রেমতত্ত্ব। প্রাণতত্ত্ব বিহীন "ভালবাসা" বাস্তবিকই

প্রাণহীন ভালবাসা। "প্রাণটি" বুঝলে তবে "প্রাণের ভালবাসা" প্রকাশ পায়। "প্রাণতত্ত্ব আগে, পরে প্রেমতত্ত্ব জাগে।" দেব-দুর্লভ অমর-বাঞ্ছিত প্রেম-লাভের আশাতেই আমাদের এই পরিণয়। এই লাভই পরম ও চরম লাভ, আর সমস্ত লাভই অনিত্য! ইন্দ্রত্বও এই প্রেমের নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ হয়। "প্রেমই আত্মার কায়া,—"মায়াটি" তার ক্ষণিক ছায়া!

ভালবাসা বড় খাসা, হ'লে বিদ্যমান
দেহে নয়, মনে নয়, প্রাণে গাঁথা প্রাণ!

তখন কুমারী প্রিয়তমের হস্ত মধ্যে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,—

আর্য্যপুত্র, দেবী ঐ প্রাণতত্ত্বটি আমাকে আগে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারপরে দেখিয়ে দিয়েছেন। আকাশ-তত্ত্বে প্রাণতত্ত্বটি মাখা, আবার সেই প্রাণতত্ত্বেই প্রেমতত্ত্ব মাখা, এটি তোমার কাছে শিখলাম, আরও আজীবন শিখব। আমি যেন দেবীর সেবিকা হতে পারি, আর তোমার পাদপদ্মে যেন বিনামূল্যে বিক্রীতা দাসী হতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

সুধাংশু প্রেমভরে প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় মস্তক নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করতঃ আদর করিতে করিতে বলিলেন—প্রিয়তমে, এই প্রাণের মিলনই প্রেমের মিলন, এই মধুময় সম্বন্ধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে, নিত্যই নূতন। শুভে, সাধু মহাজনগণ এই প্রেমের বিষয় কিরূপ বলেছেন শোন—

জড়ে আকর্ষণ যথা প্রেমের মিলন তথা,
আকর্ষণ একভাব—বর্দ্ধন না হয়,
প্রেমের মিলন প্রাণে ক্ষান্ত হতে নাহি জানে,
অসীম চিন্ময় দেশে বাড়ে ক্রমান্বয়!

এমন পবিত্র প্রেম কভু নাহি শুনি,
পরাণে পরাণ বাঁধে আপনা আপনি !
প্রেমের নগরে বসতি করিব, প্রেমেতে বাঁধিব ঘর,
প্রেমিক দেখিয়ে পড়শী করিব, ভাবিনু সকল পর !
প্রেমের সরসে সিনান করিব, প্রেমের অঞ্জন লব,
প্রেমের ধরম প্রেমের করম, প্রেমেতে পরাণ দিব।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রয়েছে যে জন,কে আর দেখেছে তারে ?
প্রাণসম প্রেম, যে জন জেনেছে, সেইত দেখিতে পারে !
প্রেম প্রেম প্রেম নিকষিত হেম, ভজন পূজন সার,
শুদ্ধ প্রেমভরে, ভজন যে করে, জীবন সার্থক তার !

এই বলিতে বলিতে সুধাংশু নীরব হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মৃদুস্বরে মধুর কণ্ঠে গায়িতে লাগিলেন—

গীত।

কি যে ভাল বাসা-বাসি !
আত্মার আত্মীয় তুমি, তুমি আমি অবিনাশী।
কুটুম্বিতা নয়ত সখি, নয় দুদিনের দেখা-দেখি,
চিরসুখে আমরা সুখী, স্বাধীন বিমান-বাসী।

গান শুনিতে শুনিতে কুমারী স্বামী ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন !

কুমারী সুধাংশু-ক্রোড়ে নিদ্রায় মগন,
পরমাত্মা-ক্রোড়ে সুপ্ত জীবাত্মা যেমন !

ব্রহ্মচারিণী ও শক্তি দুইজনে দ্বারান্তরালে নির্জ্জনে বসিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে শয়ন করিতে চলিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন—দেবীর প্রতিবিম্ব-জ্যোতিঃ সেই গৃহদ্বারে থাকিয়া থাকিয়া প্রতিফলিত হইতেছে।

ষট্‌ত্রিংশ কথা।

প্রেম-সমাধি।

সুরেশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ সকলের নিকটে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমারী সুধাংশু ও ভূপেন্দ্র দেশে আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহারা প্রণবাশ্রমে আশ্রম-বাসী হইলেন, এবং ব্রহ্মচারিণী ও শক্তির সহিত পরসেবা-ব্রতে ব্রতী হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের একটি সুসজ্জিত নব ভবনে সুধাংশু ও কুমারী অবস্থিতি করেন। একদিন রজনী যোগে আহারাদির শেষে কুমারী সুকোমল কর-পল্লবে তপোবন হইতে আনীত কতক গুলি উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুল লইয়া বিশ্রাম-গৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সুধাংশু আসিলেন। তিনি প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া বলিলেন—

কুমারি, এত ফুল কোথায় পেলে? প্রীতির প্রতিমা কুমারী কোনও কথা না বলিয়া ফুলগুলি স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। সুধাংশু তন্মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপটি লইয়া সযত্নে প্রিয়তমার কুন্তলে পরাইয়া দিলেন। কুমারী অস্ফুট জ্যোৎস্নার ন্যায় মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—আমিও দেব!

সুধাংশু গৃহমধ্যে একখানি মখমল মণ্ডিত চৌকির উপরে উপবেশন করিলেন, কুমারী নিম্নদেশে একখানি পশম আসনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। সুধাংশু একটু বিশ্রাম করিয়া, প্রিয়তমার পুষ্পমালিকা গ্রন্থনে বিশেষ মনোযোগ

দেখিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং আতরদান হইতে আতর লইয়া তাঁহার গাত্র বস্ত্রে মাখাইয়া দিলেন; পরে নানাবিধ পুষ্পসার লইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রক্ষেপ দিতে লাগিলেন।

সুহাসিনী কুমারী মালা গাঁথিতে ছিলেন, এক্ষণে শশীকলা প্রবাহের ন্যায় হাস্য করিয়া এদিক ওদিক মুখ ফিরাইলেন, তথাপি সুধাংশু ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি গোলাপ-পাশ হইতে গোলাপ-জল লইয়া প্রিয়তমার চন্দ্র-বিম্বানুকারিণী মুখ মণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সুগন্ধী সলিলে কুমারী সরসী-লতার ন্যায় সিক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি আর কি করিবেন, অনন্যোপায় হইয়া মেদিনীর অননুভাবনীয় ধীর পদ বিক্ষেপে গিয়া তাঁহার কর-কমল-স্থিত গোলাপ-মালিকা প্রিয়তমের কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিলেন।

বাহিরের পুষ্প ক্রীড়ার সহিত নবদম্পতির মনোমধ্যেও প্রেম ও প্রীতির পুষ্পবন কুসুমিত হইতে লাগিল। সরোবরে সুধাকর-কর স্পর্শে ফুল্ল কুমুদিনীর ন্যায় সেই গৃহে সুধাংশু-কর স্পর্শে কুমারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। শারদীয়া কৌমুদীর ন্যায় সুখ-শান্তির হাসিরাশি উভয়ের প্রফুল্ল বদনে বিকশিত হইয়া উঠিল; বোধ হইতে লাগিল যেন প্রেম-প্রতিভার দুইটী ছবি সেই গৃহে লীলা করিতেছে! কুমারীর সুকোমল অঙ্গে রূপতরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রেম-প্রস্রবণ সুধাংশু তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া একদৃষ্টে মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মধুরাক্ষী কুমারী স্থির দৃষ্টিতে বলিলেন,—কি দেখচ?

সুধাংশু বলিলেন—স্বর্গের জ্যোতিঃ! অমৃতের আভাস!

কুমারী বিনতা লতার ন্যায় লজ্জাবনতা হইয়া আয়ত নেত্র নত করিয়া যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি সুধাংশু তাঁহার কাঞ্চন-জড়িত অঞ্চলাগ্র ধারণ করিলেন। ব্যাকুলতা প্রযুক্ত কুমারীর কুন্তল-বন্ধন সহসা বিচ্যুত হইল; অমনি মেঘমালার ন্যায় আপদ লুণ্ঠিত সেই কেশরাশির মধ্য দিয়া সুধাংশুর বাম হস্ত খানি বিদ্যুতের ন্যায় গিয়া প্রিয়তমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল! সুধাংশু ফুলধনুর ন্যায় কুমারীর ক্ষীণ কটীদেশ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া সেই স্বর্ণ-প্রতিমা উত্তোলন করতঃ পালঙ্কে বসাইয়া দিলেন, ও স্বয়ং পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সুকোমল কপোল-কমলে প্রগাঢ় চুম্বন দান করিলেন।

এইরূপে প্রেমমূর্ত্তি সুধাংশু সেই জ্যোৎস্নাময়ী কুসুমিতা লতাকে স্পর্শ করিলে মলয়-অনিল-স্পর্শে কম্পিতা পদ্মিনীর ন্যায় সেই সুবর্ণ-লতিকা সিহরিয়া উঠিল! সেই লক্ষ্মীরূপা সুতন্বীর অবয়বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার তখন উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। পুণ্যময়ীর প্রেম-বিকশিত আস্যে, কুন্দ-কুসুম গাঁথা দন্তপাঁতির মৃদু-মন্দ হাস্যে, নবযৌবন-লহরী উছলিয়া উঠিতে লাগিল। মস্তকের আলুলায়িত কুন্তল, কর্ণের দোদুল্যমান হীরকগাঁথা কুণ্ডল ও বক্ষঃস্থলের প্রলম্বিত রত্ন-হার ব্যস্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রেমময়ীর প্রেম-তরঙ্গে সুধাংশু ভাসিতে লাগিলেন। অত্যধিক প্রেম ও প্রীতি লাভ করিয়া তিনি শত শত চুম্বন দানে সেই অমূল্য প্রেমের মূল্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অশুল্কাদাসী কুমারী তাঁহার নিকটে বিনামূল্যে বিক্রীতা, এই হেতু মূল্য প্রাপ্তির লোভ সত্ত্বেও তিনি কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া সলজ্জ গ্রীবা-ভঙ্গীতে মূল্য লওয়ার পক্ষে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। প্রেম-

সুন্দর সুধাংশু সেই প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়া শত-চুম্বন বিনিময়ে সেই অমূল্য ধনের মূল্য পরিশোধ করিলেন। প্রেম-প্রতিভা মাখা যুগল মূর্ত্তির নয়নে নয়নে প্রেম-প্রীতির বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। আহা প্রেমতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে প্রেমময় ভগবান মানব-হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব প্রেমের উৎস সৃজন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশকরা মানবের সাধ্যাতীত!

সুধাংশু বলিলেন—প্রিয়তমে, তোমার বক্ষঃস্থলে আমি যেন মিশে যাচ্চি। এই সুখে চিরদিন থাকতে ইচ্ছা হয়।

কুমারী।—আমার মনেও আর দুই জন বোধ হচ্চে না। একই প্রাণ, একই মন, একই দেহ অনুভব হচ্চে!

সুধাংশু।—প্রিয়দর্শনে, পরমাত্মা ভগবানের বক্ষঃস্থলে আমরা এই রূপেই "এক" হয়ে আছি। এই প্রেমের বিকাশ দ্বারা সেই পূর্ণ প্রেম অনুভব কর। জীব-মনের উন্নতির এই পূর্ণ পরিণতি!
"আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চির দিন তব আমি,
আমি যে তোমার,তুমি যে আমার, আমিই তুমি, তুমিই আমি!"

সুধাংশু গান করিতে লাগিলেন—

গীত।

"আমি" হয়ে "আমি আমার" বলচ হরি বারে বারে,
তথাপি এ ভ্রান্ত জীব তোমারে ধরিতে নারে!
আমি বলি "আমি আমি" আমি নয় সে "তুমি তুমি"
লক্ষ "আমি" রূপ ধরেছ বিশ্ব-প্রেম-পারাবারে!"
আমি হয়ে থাক থাক, আমির "আমিত্ব" রাখ,
আমার বুকে সুখে থাক, "আমির" মাঝে একাধারে!

কুমারী বলিলেন, আর একটি—। সুধাংশু গাইলেন—

গীত।

তুলেছি অমৃত আমি ক্ষীরোদ-সাগর খুঁড়ে!
আমার, বিমুক্ত পিঞ্জরের পাখী, খাওরে উড়ে উড়ে!
আমার "আমি আমি" কুঁড়ে খানি, ভস্ম হ'ল পুড়ে,
এখন "আমি" গিয়ে "তুমি" থাক, সোণার জগৎ জুড়ে!
"আমি" ছুঁড়ে উঠল ইন্দু ভবসিন্ধু ফুঁড়ে,
সেই মনোহর সুধার আকর চন্দ্রচূড়-চূড়ে!

গান করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে উভয়ে আনন্দাশ্রু অপাঙ্গে লইয়া শান্তিদেবীর ব্যজনে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

গীত—বেহাগ।

প্রেমে, সমাধি মগন!
আবেশে দোঁহার অবশ অঙ্গ, চারু চারিচক্ষু মুদিত কেমন!
অঙ্গে অঙ্গ ধরি আছে মুখে মুখে,
বক্ষে বক্ষঃস্থল পরশিছে সুখে,
সুখ শান্তি দুটি ফুটেছে সে বুকে,
শিথিল হয়েছে বসন ভূষণ!
উভে উভয়ের বাহু শিরে দিয়া,
রয়েছে শয়নে, জুড়াইছে হিয়া!
মৃদু হাসি মুখে রয়েছে লাগিয়া,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে প্রাণের মিলন!
মিলেছে কেমন অন্তরে অন্তর,
দুটি দেহ এক হয়েছে সুন্দর!
কণ্ঠ আলিঙ্গন করে পরস্পর,
হেমলতা করে রসালে বেষ্টন!—

নীরব নিস্তব্ধ হল ভূমণ্ডল,
অমৃতে ডুবিল দম্পতি যুগল !
দেবী-প্রতিবিম্ব করিছে কেবল
থাকি থাকি আসি অঞ্চল ব্যজন

সপ্তত্রিংশ কথা।

কুমার জিতেন্দ্র সিংহ।

রাজা বীরসিংহ অসুস্থ হইয়া ঝিনিয়াতে আসিয়া শুনিলেন যে রূপীবাবু দিন দিন ক্ষীণ হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছে ; তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চিকিৎসকগণ হৃদ্‌পিণ্ডের অবসন্নতাই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা কাতর হইয়া পড়িলেন। কুমার জিতেন্দ্রসিংহকে তাঁহার জননী ও ভ্রাতৃদ্বয় সহ সত্বর বাটীতে আসিবার জন্য টেলীগ্রাম পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা তদনুসারে বাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজাও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার জিতেন্দ্রসিংহ পিতার নিকটে ভীমপালের অর্থাপহরণ ব্যাপার জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে তাড়না করায় ভীমপাল ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন। কুমার জিতেন্দ্র সিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া রাজ বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। রাণী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

উল্লাসিনী ও দেবীদাস প্রণব দেবীর শরণাপন্ন হইয়া প্রণব-আশ্রমেই অবস্থিতি করিতেছে, এবং দেবীদাস রত্নপুরের ব্রহ্মচারিণী—এই বিবরণ বিমলাদেবী অমরেন্দ্রনাথের নিকটে শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত কথা রাজা বীরসিংহকে জানাইয়াছেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া আরও অস্থির হইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে রাণী দেখিলেন—রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছেন,—গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার শরণাগত শিষ্য! আমার মুক্তি বিধান করুন।

রাণী এইরূপ প্রলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা বলিলেন, প্রিয়তমে, এ প্রলাপ নয়, আমার এখন চৈতন্য হয়েছে! ঐ আমার গুরুদেব আসচেন, দেখচ না? ঐ দেখ—কি জ্যোতির্ম্ময় মুখ! কি উজ্জ্বল প্রশস্ত চক্ষু! কি অগ্নিময় বাক্য! রাণী শুনতে পাচ্ছ না?

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরুদেব কে? রাজা বলিলেন—সেই, সেই, গুরু অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী! সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই বাক্য প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হচ্চে।

বলিতে বলিতে রাজা সহসা জিতেন্দ্র, জিতেন্দ্র, বলিয়া ডাকিলেন। কুমার জিতেন্দ্র সিংহ নিকটে আসিয়া নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে যখন রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন—বাবা জিতেন, আমার আর সময় নাই, আমার কণ্ঠরোধ হচ্চে। আমার গুরুদেব অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রত্নপুরে আছেন, তাঁকে সংবাদ দিয়ে আন, আমি সপ্নযোগে তাঁর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছি! আমি চল্যাম। আমার গুরুদেবকে এক সহস্র

স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। আমার আদ্যকৃত্য যেন কাশীধামে সম্পন্ন হয়। গুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কাশীবাসী ব্রহ্মণ মণ্ডলী ও প্রণবাশ্রমের সাধু মণ্ডলীর সেবা করবে। আর আমার বহু দিনের ইচ্ছা ছিল, বীরনগরে একটি দাতব্য বিদ্যালয় ও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করব, এত দিন করলেই ভাল হ'ত, কিন্তু তা আর হল না, সে ভার তোমার উপরে রইল। তুমি আমার বাক্য পালন করবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মহামতি রাজা বীরসিংহ গুরু পাদ পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। রাণী ও কুমারগণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে কুমার জিতেন্দ্রসিংহ শোক সংবরণ করিয়া পিতৃআদেশ পালন করিলেন।

এদিকে প্রণবাশ্রমে কুমারীর মাতৃ স্নেহ স্মৃতিপথে ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে লাগিল। তিনি মাতৃমুখ স্মরণ করিয়া দিন দিন ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একদিন অপরাহ্নে সুধাংশু কার্য্য বশতঃ শয়ন-গৃহে গমন করিতেছেন, দ্বারের নিকট গিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, কুমারী নির্জ্জন গৃহে শয্যায় পড়িয়া উপাধানে বদন চাপিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতেছেন ও বলিতে-ছেন—মা, কবে আমি তোমাকে দেখতে পাব ? মা-জননি, তোমার স্তন্যদুগ্ধ পান ক'রে তোমার কোলে মানুষ হয়েছি। মা, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে এখন বিশ্ব-জননীকে জানতে পেয়েছি। মা গো, সেই বিশ্ব-জননীই ত তোমার মধ্যে রয়েছেন। তোমার যে স্তন্য দুগ্ধ পান করেছিলাম, সে দুগ্ধ তুমি কোথায় পেয়েছিলে ?

মাগো, বিশ্বজননীতে আর তোমাতে কোনও ভিন্নতা দেখতে পাচ্চি না। তুমিই তিনি, নইলে এতদুর মধুর স্তন্যদুগ্ধ, এতদুর স্নেহ মমতা তোমার হৃদয়ে কোথা হ'তে উদয় হল? মা তোমাকে পূজা করলেই বিশ্বময়ীর পূজা হবে, এই সার জেনেছি। মাগো, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে? আর কি তোমায় মা ব'লে ডেকে প্রাণ জুড়াব!

সুধাংশু অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিলেন, ও নিঃশব্দে বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণেই শ্বশ্রুমাতা-ঠাকুরাণীকে প্রবোধ দিয়া কাশীধামে লইয়া আসিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। অমরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই বিমলা দেবীর নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া কুমারীর সমস্ত কথা জানাইতেন। এক্ষণে কুমারীর মাতৃদর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতার বিষয় দেবীকে সবিশেষ জানাইলেন। দেবীও প্রাণসমা কন্যাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে অমরেন্দ্রনাথ দেবীকে সঙ্গে লইয়া প্রণবাশ্রমে সুধাংশুর আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এত দিনের পরে মাতা ও কন্যা একত্র হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

বিমলাদেবীর পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইয়াছে; এক্ষণে তিনি শান্তিপূর্ণ অন্তরে সুধাংশুকে পুত্র সম জ্ঞান করিয়া, কাশী-বাসিনী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ কথা।

ভারতের সতা।

প্রিয়তম বলিলেন—

অমূল্য রতন প্রিয়ে তুমি মোর নিধি,
কতই যতনে তোমা নিরমিল বিধি!
দিবা নিশি বসি বসি অনিমেষ আঁখি,
যদি রে অনন্ত কাল প্রাণভরি দেখি,
তথাপি না মিটে সাধ, চাঁদেও কালিমা,
নহে ত শরৎ-শশী মুখের উপমা!
সহস্র বিজুরি ধরি করি এক ঠাঁই,
অমৃতে মাখিয়া যদি পুতলি গড়াই,
তথাপি না হয় কভু হেন দরশন,—
পীরিতি-প্রণয় মাখা মূরতি এমন!

প্রিয়তমা বলিলেন—

এ মাটি ছাড়ি, চিন্ময় বাড়ী, এ বাড়ী আমার নয়,
তোমার সাথে, যাইব পথে, সে পথ অমৃত ময়!
সূক্ষ্মে শক্তি, মায়া-মুক্তি, প্রেম-পীরিতির দেশ,
সেই দেশে নাথ, যাই তব সাথ, সকল দুঃখের শেষ?
মাটিতে যে ক্ষয়, সেখানে তা নয়, প্রেমের বন্ধন শুধু,
আনন্দ আনন্দ, আনন্দের মাঝে, কেবল পীরিতি-মধু?

তোমার লাগিয়ে স্বদেশ ভুলিয়ে
এসেছি জগতে আমি,
ছাড়ি পিতৃকুলে মাতৃক্রোড় ভুলে
এসেছি, যেথায় তুমি !
দিয়াছি এখন আত্ম বিসর্জ্জন,
স্বর্গ সুখ নাহি চাই,
এসেছি তা ছাড়ি শ্বশুরের বাড়ী,
যেখানে তোমাকে পাই !
বুকে কত আশা ! তোমারি ভরসা !
দেখিব তোমার মুখ,
যত দুঃখ থাকে সংসারের বুকে
লইব পাতিয়া বুক।
তোমার প্রেমের অমৃত লভিয়া
অমরতা আমি পাব,
হয়ে অর্দ্ধাঙ্গিনী, তোমার সঙ্গিনী,
ব্রহ্মলোকে ফিরে যাব !

প্রিয়তম বলিলেন—

কৃষ্ণ খ্রীষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলা যেমন,
এখন তা কহিছেন দার্শনিক গণ—
"মুক্ত হবে নর-চিত্ত পূর্ণত্ব পাইয়া
নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম দেখিয়া দেখিয়া !"
তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী, শেষে উত্তমার্দ্ধ হও,
শেষে আত্ম বিসর্জ্জন আমাকে শিখাও !
তোমার মত সর্ব্বত্যাগী আমি কভু নই,
তব পাশে চিরদিন ঋণে বদ্ধ রই !

প্রিয়তমা বলিলেন—

তুমি আমি এক প্রাণ জেনেছি এখন আমি,
হিয়ার বাহিরে নাথ কেমনে আছিলে তুমি!
মায়ামোহ দুঃখ যত গিয়েছে কর্ম্মের ভোগ,
আঁখিতে আঁখিতে এবে, রাখিব প্রেমের যোগ!
খেতে শুতে তিল আধ, না যাব জড়ের ঘরে!
আর না ভোগিব দুঃখ, আর না মরিব ডরে!

বলিয়া পড়িল সতী প্রিয়তম কোলে,
বক্ষ পাতি ধরি পতি ভাসে নেত্র-জলে!
সতী পতি সুমিলনে জীবন্মুক্তি যোগ,
দূরে গেল অনিত্যের জড়ত্বের ভোগ!
অনন্তের নিত্য প্রেমে চিত্তের বিলয়,
আত্মায় আত্মায় মিশে উভয় চিন্ময়।
ক্ষণেক চেতন পেয়ে গদ গদ ভায,
চারি চক্ষু ঢুলাঢুলি মধু মধু হাস!
নিত্যরসে সুরসিক পতি প্রেমদাতা,
এ কি সতী রসবতী গড়িলা বিধাতা!
আত্মার আত্মীয় দোঁহে জানি ভাল মতে,
দু'তনু সমাধি গত চিন্ময় জগতে।

আহা!

কি দিয়ে বিধাতা, গড়েছে এমন,
ভারতের সতী-দেহ?
কত প্রেম সুধা, সে প্রেম-সাগরে,
কহিতে কি পারে কেহ?

জিনি শুদ্ধতায়, কে দাঁড়াবি আর,
এ হেন সাধ্বীর কাছে ?
গিয়াছে ত সব, ভারত-গৌরব,
সতীর সৌরভ আছে !
ত্রিজগৎ এসে, দেখুক এ দেশে,
যাহা দেখে নাই কেহ,
আনন্দে শুয়েছে, জ্বলন্ত চিতায়,
জীবন্ত সতীর দেহ !
কি সংযম শুদ্ধি কি পবিত্র বুদ্ধি !
সুর-নরে দিয়া আশা
যায় মৃত্যু-কীটে, চরণে দলিয়া,
"মুর্ত্তিমতী ভালবাসা !"
এই অসামান্য প্রেমের প্রতিভা,
প্রমাণ করিছে শুধু—
নিত্য কাল সত্য, ভালবাসা-তত্ত্ব,
আত্মার অন্তর-মধু !
ত্রিজগৎ-আশা, এই ভালবাসা,
দিয়া কিছু নাহি চাই,
বণিকের কথা,— বিনিময় প্রথা,
ভালবাসা তথা নাই।
ইন্দ্রিয়ের যোগে, জড় উপভোগে,
মানব দুর্ব্বল যবে,
ক্রমে হয় ক্ষয়, বর্দ্ধিত না হয়,
কাম নাম তার ভবে।

নহে সে স্বপথ, সে সব বিপথ,
সংযত করিলে তায়,
সুরসিক সঙ্গে, নিত্য রসরঙ্গে,
ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গ ধায় !
হয় না দুর্ব্বল, বর্দ্ধিত কেবল,
অনন্ত সে বল তার,
পদ-তলে পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
মৃত্যুময় এ সংসার !
দাম্পত্য প্রণয়, অনিত্য ত নয়,
সুধার সাগর শুধু,
পশুত্ব সে নয়, দেবত্ব নিশ্চয়,
মধুরে মধুরে মধু !

ইতি "শ্রীপ্রেম-প্রতিভা" সম্পূর্ণা ।

"যে সিন্ধুর বিন্দু এই ভোগ-সুখাভাস,
সুর নর সর্ব্ব জীবে পাইছে প্রকাশ,
যাঁহার আনন্দ-কণা জীবন সবার
পরমাত্মা সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ।"